মেজর ডালিম

বাংলাদেশের ইতিহাসের না বলা সত্যকে জানুন

ডালিম বলছি...

অসীম শ্রদ্ধা এবং প্রত্যয়ের সাথে এই ওয়েব সাইট বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের তাদেরকেই উৎসর্গ করলাম; যারা স্বাধীনতা, সত্য, ন্যায় এবং অধিকারের জন্য সংগ্রাম করার সাহস রাখবেন।

বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হলেও পুরো সত্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। যারা প্রথম থেকেই ভারতীয় নীল নকশা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং শেখ মুজিবের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা তেমন কঠিন ছিল না যে দেশের সার্বিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে চরম পরিণতির দিকেই ধাবিত হবে। কিন্তু যারা শেখ মুজিবের উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেছিলেন তাদের পক্ষে তেমনটি যে ঘটবেই সেটা মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

শেখ মুজিব সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেটাও ছিল অসাধারণ। সমভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিও ছিল অত্যন্ত জটিল। সেদিক থেকে বিচার করলে এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি ইস্যুই বিশদ বিশ্লেষনের দাবিদার। আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব ছিলেন অতি জনপ্রিয় একজন কাংখিত নেতা কিন্তু স্বাধীনতাত্তোরকালে তিনিই হয়ে উঠেন জনধিকৃত নিকৃষ্টতম এক স্বৈরাচারী শাসক। তার এই দুই বিপরীত চরিত্রের মাঝে রয়েছে এক হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র। শেখ মুজিবের এই চারিত্রিক দ্বৈততাকে এক সূত্রে বেধেঁছিল কোন একটি বিশেষ তাড়নায় –
রাজনীতি? আদর্শ? ভীতি? হীনমন্যতা? আত্মম্ভরিতা? উচ্চাভিলাস? পাঠক বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন তার উপরেই নির্ভর করবে এর জবাব। ওয়েব সাইটের বিষয়বস্তুগুলো ঐ সমস্ত লোকদের জীবন থেকে নেয়া যারা শুধুমাত্র নিস্ক্রিয় নিরব দর্শক ছিলেন না। তারা সবাই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহনকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা। তখনকার ঘটনাপ্রবাহ এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির সাথেও তারা ছিলেন স্বাভাবিক কারণে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ সম্পর্কে কর্তৃত্বের সাথে কথা বলার অধিকার রয়েছে তাদের। জনগণের একাংশের মাঝে ঐ সমস্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে অস্বচ্ছতা রয়েছে তা দূর করার জন্য অনেক শ্রদ্ধেয়, পদস্থ, প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বক্তব্য এবং মতামতও এই ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে। পাঠকের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে এই ওয়েব সাইট প্রকাশ করা হয়নি। এর মূল লক্ষ্য হল পাঠকদের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক যোগানো। তথ্যবহুল ঘটনাসমূহের আলোকে তারা যেন সত্যকে খুঁজে নিতে পারেন।

যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি

পাকিস্তানের রাজনীতির পরিণাম – স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং আমাদের সিদ্ধান্ত

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়েই শুরু হয়েছিল ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

এ অঘটন এড়ানো সম্ভব ছিল।

পাকিস্তানের মত একটি বহুজাতিক দেশের জন্য শুরু থেকেই প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন জাতিসত্বার এলিট শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি কার্যকরী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশল এবং পরিকল্পনা নির্ধারনের জন্য যে সহযোগিতা অতি আবশ্যক ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল জাতীয় পরিসরে :-

১. সব জাতীয় এলিট শ্রেণীর সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিত্বকারী সরকার কায়েম করা।

২. বিভিন্ন জাতিসত্বার মধ্যে ঐক্যমত্য এবং একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩. সর্বক্ষেত্রে একতা ভিত্তিক সহজলভ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৪. জাতির লক্ষ্য এবং আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্বার এলিট শ্রেণীর জনগণকে অনুপ্রানিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

৫. যে কোন বিচ্ছিন্নবাদী প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া; বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয় এবং তা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই।

৬. অর্থনৈতিক সুবিধাদি যাতে জনগণ পর্যন্ত পৌঁছে তা নিশ্চিত করা। আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের সুফল সমভাবে যাতে সব জাতিগোষ্ঠিই উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জাতীয় এলিট শ্রেণীগুলো কর্তৃক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির জনগণের মাঝে জাতীয় সম্পদ ও সুবিধাদির সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

এ ধরণের কৌশল এবং পরিকল্পনা সব সমস্যার সমাধান অবশ্যই ছিল না, কিন্তু এর ফলে আশা করা যেত জাতীয় রাজনৈতিক অবকাঠামোতে বর্জনের পরিবর্তে ঐক্যের মাধ্যমে বহুজাতিক দেশের অখন্ডতা বজিয়ে রাখা।

ধারণা করা চলে, ন্যায্য অধিকার পাবার জন্য বিভিন্ন জাতিসত্বার জনগোষ্ঠি কিছুকাল হয়তো বা প্রলম্বিত শিল্পায়নের পরিকল্পনা এবং স্তিমিত আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকেও মেনে নিত। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে দরিদ্র হয়ে থাকাটা সহনীয় হয় তখনই যখন তার পড়শীরা সমাজে অর্জিত ধন-সম্পদের বড়াই করার সুযোগ না পায়। একটি দেশ উন্নত হতে পারে শুধুমাত্র ঐক্যের ভিত্তিতে। বৈষম্য এবং বিভক্তি এক অথবা একাধিক জাতিগত রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠিরই হয় সমূহ ক্ষতি।

এ জন্যই বহুজাতিক একটি দেশের এলিট শ্রেণীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় শ্রেণী স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থ দু'টোই বজিয়ে রাখার জন্য। কোন এক বিশেষ পর্যায়ে তারা অবশ্যই নিজ নিজ জাতি স্বার্থে একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের একে অপরের সহ্যশক্তি ও বোঝাপড়ার ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। তেমনটি হলে বিচ্ছিন্নবাদের বিপদসংকুল একতরফা রাস্তা অবশ্যই খুলে যাবে।

তথাকথিত ইসলাম ও ইসলামিক রাষ্ট্রের ধ্বজাধারী পাঞ্জাবী-মোহাজের নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকেই বাঙ্গালীদের নিঃস্ব, হীনমনা এবং পশ্চাদমূখী জনগোষ্ঠি হিসাবে গন্য করে আসছিলেন। তারা মনে করতেন বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি পশ্চিম পাকিস্তানের উপর একটি বোঝাস্বরুপ। তারা বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে বাঙ্গালীর জাতিগত চেতনা এবং তাদের হিন্দুয়ানী মনোভাব সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

যাই হোক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে আইয়ূব খানের প্রণীত অর্থনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প উদ্যোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ সমস্ত উদীয়মান শিল্প উদ্যোগীরা সরকারি মদদ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠা পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ যারা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তাদের সাথে হাত মেলান। সমস্তস বাঙ্গালী শিল্পপতিরা ইম্পোর্ট লাইসেন্স এবং বৈদেশিক মুদ্রার কোটা বাড়াবার জন্য ঐ আন্দোলনকে কেন্দ্রের উপর চাপ প্রয়োগকারী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন। শেষ পর্যায়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীকে একক একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী এলিট শাসক শ্রেণী অসঙ্গতভাবে তাদের বাঙ্গালী দোসরদের হীনমন্য, পশ্চাদমূখী এবং হিন্দু মনোভাবাপন্ন বলে চিহ্নিত করেন। এই ধরণের মনোভাব বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার উম্মেষ ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তদপুরি শেখ মুজিবের বিচার দেশের নাজুক ঐক্যের উপর হানে চরম আঘাত। এখানে আবারও উল্লেখ করতে হয় মুজিবের ৬ দফায় কোন নতুন কিছু ছিল না। অতীতে বহুবার এ ধরণের দাবিসমূহ বাঙ্গালী সাংসদগন কেন্দ্রীয় সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্রের ঘোষণার সময়টি ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ন। এ ঘোষণাটি করা হয় এমন এক সময় যখন সারা দেশ জুড়ে এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যা বিরাজমান। দেশ জুড়ে জনগণ তখন আইয়ূব শাহীর নিষ্পেষন এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

আইয়ূব শাহী আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের কোন প্রচেষ্টাতো করেইনি বরং পাঞ্জাবী-মোহাজের এলিট শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থকে লালন করে তাদের আধিপত্যকে আরো সুসংহত করে তোলে। সামরিক শাসনকালে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্ব একরকম ছিলনা বললেই চলে। ষাটের দশকে যখন বাঙ্গালীদের ধৈর্য্যের বাধঁ প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল ঠিক তখনই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুশক্তি ভারতের দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করার ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। বাংলাভাষী জনগণ যারা দ্ব্যার্থহীনভাবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন তারা পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে এ ধরণের ব্যবহার কখনোই প্রত্যাশা করেনি। পাকিস্তানের সৃষ্টিতে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এ সত্যটিই অতি সহজে ভুলে গিয়েছিলেন পশ্চিমা শাসকগন। যদিও বাহ্যিকভাবে মুজিবের দাবিগুলো ছিল চরম প্রকৃতির। পাকিস্তান তখনও ছিল অতিপ্রিয় প্রতিটি বাঙ্গালীর কাছে। বাঙ্গালী জনগণ শুধু চেয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের ন্যায্য অধিকার। তারা চেয়েছিল সাম্য ও সংহতির উপর একটি রাজনৈতিক কাঠামো।

তারা চাইছিল স্বৈরাচারী একনায়কত্বের পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক সরকার। স্বৈরাচারী একনায়কত্ব তাদের অতীতের হিন্দু আধিপত্য ও অত্যাচার এবং ঔপনিবেশিক শোষণকেই জোরালোভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিল। এ থেকে এটাই পরিষ্কারভাবে বলা চলে, বাঙ্গালীরা সুচিন্তিত কতগুলো লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্যই মূলতঃ সংগ্রাম করছিল। কোন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করার জন্য নয়। এটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, আইয়ূব শাহীর পতনকালে পূর্ব পাকিস্তনের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা মোটেই অবধারিত পরিণতি ছিল না। জাতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাঙ্গালীদের অংশদারিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে ক্ষমতাধর শাসকচক্র বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে জনগণের আন্দোলনের প্রতিই ঠেলে দিয়েছিল এবং তাদের নৃতাত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈষম্যকে পুর্নঃজীবিত

করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে বাধ্য করেছিল জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে। এ থেকে পরিশেষে এটাই বলা চলে যে অসম উন্নয়নই বাধ্য করেছিল বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিবর্তে বাঙ্গালীত্বকে উস্‌কে দিতে।

বাঙ্গালীত্বের চেতনাই তখন আঠারমত বাঙ্গালী এলিট শ্রেণীকে জনগণের সাথে এক অটুট বন্ধনে বেধেঁছিল। অসম উন্নয়ন, শোষণ, বঞ্চনা, এবং নৃতাত্ত্বিক চেতনা ঐ ধরণের লোভী জোঁক যা একে অপরকে শুষে বেচে থাকে সেই সময় অব্দি যখন সশস্ত্র সংঘাত অথবা গণঅভ্যুত্থানের বিকল্প কোন পথই খোলা থাকে না। দুঃখজনক হলেও সত্য পাকিস্তানও ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে অপরিহার্য এক মহা বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছিল ষাটের দশকের শেষে। অন্তিম অবস্থায় সামরিক জান্তা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বন্দুকের জোরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু হয় ২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর আর্মি ক্র্যাকডাউন। পাকিস্তান সেনা বাহিনী বাঙ্গালীদের আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য বর্বরোচিত সশস্ত্র অভিযান শুরু করে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে। এভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠে দেশ বিভক্তি।

পাকিস্তান ১৯৪৭-১৯৭১

১৯৭১ এর মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ।

পাকিস্তানের গঠন প্রকৃতিটিই ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক। ভৌগোলিকভাবে এই দেশের দুই অংশের মধ্যে ১০০০ মাইল এর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছিল ভারত। নৃ-তাত্বিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং আর্থ-সামাজিক দিক দিয়েও এই দুই অংশের মাঝে ছিল বড় ধরনের ব্যবধান। এই সমস্ত ব্যবধানগুলো ক্রমশঃ বেড়ে যায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিদের ছলে-বলে, কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নীতি গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি অন্যায়ভাবে গায়ের জোরে অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে চায় যাতে করে রাজনৈতিকভাবে পুরো দেশের উপর তাদের প্রাধান্য বজিয়ে রাখা সম্ভব হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষণ কায়েম রাখা যায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির জন্মলগ্নেই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে যখন ১৯৪৮ সালে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গর্ভণর জেনারেল হিসেবে ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা দেন উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ জানানো হয় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির পক্ষ থেকে যা পরবর্তিকালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। এরপর ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় রক্তের বিনিময়ে পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন। যার ফলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইউনাইটেড ফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীনরা এদের হাতে ক্ষমতা দিতে নারাজ হয়ে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা চালায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। একের পর এক সরকারের পতন ঘটানোর তামাশা শুরু করা হয় অতি চতুরতার সাথে; যার অজুহাতে পরে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ূব খান ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।

ষাটের দশকের ঘটনাবলী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয় যে, পূর্ণ সায়ত্ব শাসন অর্জন করা ছাড়া আর অন্যকোন উপায়েই তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্টা করতে পারবে না। সবক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের উপর চলতে থাকে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠিদের অবারিত শোষণের ফলে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চাদভূমি হিসেবে দেউলিয়া হয়ে পরে পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৬১-৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

১৯৬৬ সালে সায়ত্বশাসন এবং ন্যায্য অধিকার অর্জন করার জন্য শেখ মুজিবর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ তাদের ৬ দফা প্রোগাম পেশ করে। এতে জাতীয়তাবাদী চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। ৬ দফা ছিল পাকিস্তানের অবকাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ সায়ত্বশাসনের অধিকার আদায়ের দাবি। এতে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠি আতংকিত হয়ে উঠে শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে জড়িত কর দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবন্দী করে। কিন্তু বাংলাদেশের সিংহপুরুষ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সারা দেশব্যাপী এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন যার ফলে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আইয়ূব সরকার তাকে ও তার সহকর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মার্চ মাসে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশেই আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের চাপে জেনারেল আইয়ূব ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে জাতীয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচন করান। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকার গঠনের দাবিদার হয়ে উঠে। কিন্তু সামরিক জান্তা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধূর্ত রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টোর যোগসাজসে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফন্দি-ফিকির করতে থাকেন। তাদের এ ধরনের কুটকৌশলের জবাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে ১৯৭১ এর ৩রা মার্চ থেকে। ২রা মার্চ পূর্ব বাংলার ছাত্র ও যুব সমাজের পক্ষ থেকে আসম আব্দুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তার এই উদ্যোগের জন্য শেখ মুজিব জনাব রবকে তিরষ্কার করেছিলেন। এর চাক্ষুষ সাক্ষী আজো অনেকেই বেচেঁ আছেন। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনার ফলে শেখ মুজিব ক্ষুদ্ধ হন এবং সভাশেষে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘোষিত হয়েছিল সভাশেষে গণমিছিলের নেতৃত্ব দেবেন শেখ মুজিব। ৭ই মার্চ রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে তার বহুল প্রচারিত বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম- আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম- আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।" কিন্তু বক্তৃতা শেষ করার সময় তিনি ঘোষণা দেন, "জয় বাংলা, জয় পাঞ্জাব, জয় সিন্ধু, জয় বেলুচিস্তান, জয় সীমান্ত প্রদেশ এবং জয় পাকিস্তান।" তার ঐ বক্তৃতা পরদিন সবক'টি দৈনিক পত্রিকাতেই ছাপানো হয়। অবশেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব আলোচনাই যখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তখন সামরিক জান্তা অস্ত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর ২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর কালোরাতে। চালানো হয় পাশবিক শ্বেত সন্ত্রাস।

ছয় দফা

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ম্যানিফেষ্টো।

৬ দফা :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।
সংশোধিত: সরকারের চরিত্র হবে ফেডারেল এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক। জাতীয় এবং ফেডারেটিং ইউনিটসমূহতে প্রত্যক্ষ গণভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে ফেডারেল সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুইটি বিষয় থাকিবে। প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট বিষয়সমূহ স্টেট বা প্রদেশসমূহের হাতে থাকিবে।

৩. পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের দুইটি পৃথক অথচ বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকিবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হইতে পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।
সংশোধিত: ফেডারেল সরকার শুধুমাত্র পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং নিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্য দায়ী থাকিবেন। বিষয়গুলো হল:-

ক) দুই উইং এর জন্য দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিবর্তনশীল মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে হইবে অথবা
১। সারা দেশের জন্য একটি মুদ্রা ব্যবস্থাও রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক আইন প্রবর্তন করিতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ ও অর্থ পাচাঁর হইতে না পারে।

খ) আলাদা ব্যাংকিং রিজার্ভ সৃষ্টি করিতে হইবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য; আলাদাভাবে আর্থিক এবং আয়-ব্যয় এবং হিসাব-নিকাশের ক্ষমতা থাকিবে পূর্ব পাকিস্তানের।
১। দুইটি ভিন্ন কিন্তু পরিবর্তশীল মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রতিটি অংশে কিংবা অঞ্চলের জন্য অথবা একটি মুদ্রা ব্যবস্থাই চালু থাকিবে তবে কেন্দ্রিয় রিজার্ভ ব্যাংকিং সিষ্টেমের ভিতর আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে যাতে এক অঞ্চলের সম্পদ কিংবা অর্থ অন্য অঞ্চলে পাচাঁর করা সম্ভব না হয়।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রেভিনিউর একটি অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের মূলধন হইবে।
সংশোধিত: আর্থিক লেনদেন, আয়-ব্যয় এবং পরিকল্পনা হইবে ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর। ফেডারেটিং ইউনিটগুলো কেন্দ্রিয় সরকারকে বরাদ্দকৃত অর্থের যোগান দিবে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য। দেশের সংবিধানে নির্ধারিত বরাদ্দ আয় কেন্দ্র পাইবে যথাযথভাবে নির্ধারিত অনুপাতে। সংবিধানে এমন বিধান নির্ধারন করা হইবে যাতে কেন্দ্রিয় সরকার ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ পায় যাতে করে ফেডারেল ইউনিটগুলোর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতিগুলোর উপর ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রন রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে। এইসব অর্থ আঞ্চলিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল সমানভাবে দিবে অথবা সংবিধানের নির্ধারিত হারে আদায় হইবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানীর অধিকার আঞ্চলিক সরকারের থাকিবে।

সংশোধিত: বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সব হিসাব প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিটের নিয়ন্ত্রনে পৃথক পৃথক ভাবে রাখার বিধান সংবিধানে রাখা হইবে। কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিটি ফেডারেটিং ইউনিট কি অনুপাতে প্রদান করে সেটা সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকিবে। দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারনের দায়িত্ব হবে কেন্দ্রিয় সরকারের। কিন্তু সেই নীতির আওতায় আঞ্চলিক সরকারগুলো বর্হিবাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সর্ম্পকে সরাসরি আলোচনা এবং চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে সেই বিধানও সংবিধানে থাকতে হইবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন করা হইবে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে।

সংশোধিত: জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফেডারেটিং ইউনিটগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারী ফোর্স গঠন করিতে পারিবে।

পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারনের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটেছিল ৬ দফায়। ৬ দফার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল কিভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছিল। যাই হউক তবুও বলতে হয় ৬ দফার ঘোষণার সময়টা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরই ৬ দফা ঘোষিত হয়। সামরিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা পাকিস্তান সরকারের মনঃপুত ছিল না। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান আমেরিকান সরকারকে তার অসন্তুষ্টি জানিয়েছিল তাই নয়; বিকল্প উপায় হিসেবে আইয়ূব খান আমেরিকার শত্রু গণচীনের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তার এই উদ্যোগকে আমেরিকান সরকার তাদের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করে। তাই আইয়ূবের ঔদ্ধত্বের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য আমেরিকা আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা দিতে থাকে। এই চক্রান্তে মদদ যোগাবার জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিদগ্ধ হারুণ পরিবারের আলফা ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ভাতাপ্রাপ্ত সদস্য শেখ মুজিব ছিলেন অন্যতম। ঐ চক্রান্তের ফসল হিসেবেই বেরিয়ে আসে ৬ দফা। যদিও বলা হয়ে থাকে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি এবং অর্থনীতিবিদ যথা: ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ রেহমান সোবহান, ডঃ নুরুল ইসলাম, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরাই ছিলেন ৬ দফার জন্মদাতা। কিন্তু যে সত্যটি কখনোই প্রকাশ করা হয়নি সেটা হলো ৬ দফা প্রণয়নে আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মদদপুষ্ট হয়ে এই ৬ দফা দাবি প্রণয়নে কাজ করেছিলেন। ৬ দফা পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার জন্য নয় শুধুমাত্র আইয়ূব খানকে তার বেয়াদবীর উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই প্রণিত হয়েছিল। পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করতে কখনো কাউকে কোনরূপ সাহায্য আমেরিকা করেনি কারণ তারা কখনোই পাকিস্তান দ্বি-খন্ডিত হোক সেটা চায়নি। এ ব্যাপারে তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জে ফারল্যান্ড পরিষ্কারভাবে মুজিবকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক অবমৃশ্যতা থেকে একচ্ছত্র নেতায় পরিণতঃ

৬ দফা দাবির বর্হিপ্রকাশ ঘটার আগ পর্যন্ত শেখ মুজিবের ভূমিকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

১৯৫৪ সালে রাজনীতিতে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে মুজিব আকষ্মিকভাবে রাজনীতিতে আলোচ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্টের সংসদ অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ করে শেখ মুজিব তার গুন্ডাপান্ডা নিয়ে অতর্কিতে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করে হৈ চৈ শুরু করে লাঠিবাজী

এবং চেয়ার-টেবিল ছোড়াছুড়ি করে অধিবেশন পন্ড করে দেয়। ঐ তান্ডবলীলায় সংসদের স্পীকার মারা যান গুরুতররূপে আহত হয়ে। এই অপকর্মের নেপথ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ছিল। এই ঘটনা পরবর্তিকালে আইয়ূব খানকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার বিলুপ্ত করে সামরিক শাসন জারি করতে সুযোগ করে দেয়। ৬ দফায় কেন্দ্রিয় সরকার দেশদ্রোহিতার গন্ধ পায়। তাদের ধারনা হয় ৬ দফা দেশকে দ্বি-খন্ডিত করারই একটা কুটকৌশল। যদিও ৬ দফা ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সনদপত্র। ৬ দফায় পরবর্তিকালে বর্ণিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রিয় শাসকদের দ্বারা কী ধরনের শোষণ চালানো হচ্ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। যা হোক, শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের বেশকিছু শীর্ষস্থানীয় নেতাদের জড়িত করা হয় বিখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়'; যদিও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিব কিংবা তার দলীয় নেতারা কেউই জড়িত ছিলেন না। নেতাদের গ্রেফতারের ফলে ৬ দফা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। সেই ক্রান্তিলগ্নে আবারও অগ্রণীর ভূমিকায় এগিয়ে আসে জাগ্রত ছাত্রসমাজ। বাংলার সিংহপুরুষ মাওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় তারা গঠন করেছিল 'ইউনাইটেড এ্যাকশান কমিটি' এবং এর নেতৃত্বে ১১ দফার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলে দেশব্যাপী এক দুর্বার গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। ১১ দফা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কারণ এর মূল বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবি। সারা পূর্ব পাকিস্তানে ১১ দফাকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী আন্দোলনের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রচন্ডতায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল আওয়ামী লীগের ৬ দফা। মাওলানা ভাসানী এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার জন্য সামরিক শাসকরা শেখ মুজিব এবং তার দলীয় নেতাদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি পেয়ে রেসকোর্সে এক বিশাল জনসভায় মুজিব তার ভাষণে বলেছিলেন, "জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আমি দেখলাম আওয়ামী লীগের ৬ দফা ছাত্রদের ১১ দফায় বিলীন হয়ে গেছে।"

জনগণের চাপে মুক্ত হয়ে মুজিব নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। তিনি নিজেকে পেলেন সমগ্র বাংলাদেশী জনগণের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে। কিন্তু এমনটি হওয়ার পেছনে তার নিজস্ব কোন অবদান ছিল না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে নেতারা সবাই সবকালে চলেছেন পেছনে কিন্তু জনগণ কখনোই কোন ক্রান্তিলগ্নে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যার আবর্তে জাতি আজও ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই সময় জাতি উম্মুখ হয়ে উঠেছিল স্বাধিকার ও সায়ত্বশাসন পাওয়ার জন্য। তারা হয়ে উঠেছিল অস্থির, ধৈর্যহারা এবং বিষ্ফোরম্মুখ। কিন্তু তাদের প্রত্যাশাকে বাস্তবায়িত করার মত আস্থাভাজন কোন জাতীয় নেতা ছিল না সামনে। বিষ্ফোরম্মুখ জাতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিঃস্বার্থ চরিত্রের পরিক্ষিত একজন বিচক্ষণ নেতার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল বিকল্পহীন। মাওলানা ভাসানী ছিলেন তেমন মাপের একমাত্র নেতা। কিস্তু বয়সের ভারে তিনি তখন অনেকটাই দুর্বল। নেতা হিসেবে তাকে জনগণ অবশ্যই জেনে এসেছে আপোষহীন বৃহত্তর গরীব জনগোষ্ঠির বন্ধু হিসেবে। তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞতারও অভাব ছিল না। কিন্তু তার ছিল না সংগঠনভিত্তিক শক্তি। এ কারণেই এই বর্ষিয়ান নেতার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না গণআন্দোলনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আন্দোলনকে ক্রমান্বয়ে বিপ্লবে রূপান্তরিত করে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চরম বিজয় অর্জন করা তার পক্ষে শ্রদ্ধার ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেও এটা কার্যকরী করা তখন তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দৈবক্রমে শেখ মুজিবকে রাতারাতি এক কিংবদন্তির নায়কে পরিণত করেছিল। ভাসানীর সক্ষমতার মাওলানা নিজেই সবচেয়ে বেশি বুঝতেন তাই তারই আহ্বানে দেশের জনগণ মুজিবকেই একচ্ছত্র নেতা হিসেবে তখন গ্রহণ করে নিয়েছিল একান্ত বাধ্য হয়ে কোন বিকল্প না থাকায়।

স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তা করেছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও। কিন্তু শেখ মুজিব কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা চিন্তা করেননি। তিনি স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানিয়েছিলেন মাত্র।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ধারা বিবরণী খবরের কাগজে প্রকাশিত করতে থাকে আইয়ূব-মোনেম চক্র। তারা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানদের ভারত বিরোধী মনোভাবকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, মানুষ যখন জানতে পারবে শেখ মুজিব ভারতের দালাল হয়ে পাকিস্তানের অখন্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। কিন্তু পরিণাম হল সম্পূর্ণ উল্টোটাই। প্রকাশিত ধারা বিবরণীর মধ্যেই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠল আইয়ূব-মোনেম চক্রের ঘৃণ্য চক্রান্ত। এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলাকে তখন বাঙ্গালীরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেই ধরে নেয়। ফলে সারা বাংলার মানুষ আইয়ূব শাহীর বিরুদ্ধে রুদ্র আক্রোশে ফেটে পড়ল। এখানে আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানেও মুখ্য এবং অগ্রণী ভূমিকা ছিল ছাত্র সমাজের। তারা ইতিমধ্যেই সংগ্রামকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামে রূপ দেবার লক্ষ্যে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ১১ দফার ভেতরেই বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠে। ১১ দফার ভিত্তিতেই বাংলার মাটিতে ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের জোয়ার এক প্রচন্ড রূপ ধারণ করে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবিঃ

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শাসন শোষনের নিপীড়নে অতিষ্ট ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফা দাবিতে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি -

১। ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ, আইএসসি, আইকম ও বিএ, বিএসসি, বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার ৫০ ভাগ সরকারি সাবসিডি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

চ) হল ও হোস্টেলের সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাশ লইতে হইবে।

ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের কন্ডেন্স কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আইইআর ছাত্রদের ১০ দফা, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এমবিএ ছাত্রদের, ও আইন ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা ফ্যাকাল্টি করিতে হইবে।

ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কন্ডেন্স কোর্সের দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

ঢ) ট্রেনে, স্টীমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের আইডেন্টিটি কার্ড দেখাইয়া শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেসনে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকেটেও এইরূপ সুবিধা দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলেও বাস যাতায়াতে ৫০% কন্সেসন দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুলে ও কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের ৫০% কন্সেসন দিতে হইবে।

ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ন বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

থ) শাসক গোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ন বাতিল এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পুর্ন স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে।

ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ। এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতির প্রবর্তন করিতে হইবে।

ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সংগে সংগে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রে বর্হিবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মান ও নৌ বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদানকরতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ ভারী শিল্প জাতীয়করন করিতে হইবে।

৬। কৃষকদের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋন মওকুফ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মনপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারন ও আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কায়দা-কানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জন সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা ও আন্যান্য নির্যাতনমুলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বর্হিভূত স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে ।

ইতিহাস বিকৃতির প্রথম পদক্ষেপ আওয়ামী লীগই গ্রহণ করে

শেখ মুজিবের নির্দেশেই মেজর জিয়া তার ঐতিহাসিক ঘোষণা দেয় এ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ আষাঢ়ে গল্পের উপস্থাপন করে।

সেই লোমহর্ষক ক্রান্তিলগ্নে নেমে আসে ২৫-২৬শে মার্চের সেই কালোরাত্রি। পাকিস্তান সেনা বাহিনী নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙ্গালী জাতিকে শায়েস্তা করার জন্য। ২৫শে মার্চের বর্বরতা আধুনিককালের সব নজীরকেই ছাড়িয়ে যায়। হাজার হাজার নারী, পুরুষ, শিশুকে হত্যা করা হয় নির্বিচারে। সামরিক বাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বাঙ্গালী সদস্যগণও রেহাই পাননি শ্বেত সন্ত্রাসের হত্যাযজ্ঞ থেকে। ঢাকা, চিটাগাং এবং খুলনাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্রই অভিযান চালানো হয়। নিষ্ঠুর অভিযান। প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য হয় বাঙ্গালী জাতি। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে অনেক অনুরোধ ও আকুতি জানানো হয় শেখ মুজিবকে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য। কিন্তু সব অনুরোধ উপেক্ষা করে জাতিকে মৃত্যু ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে কাপুরুষের মতই তিনি কারাবরণ করে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। আত্মরক্ষার জন্যই অনন্যোপায় হয়েই শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়। প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দানে অসম্মত শেখ মুজিব বলেছিলেন, "আমি গণতন্ত্রের রাজনীতি সারাজীবন করেছি, অস্ত্রের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।"

এ কি পরিহাস! সমগ্র বাঙ্গালী জাতি যার কথায় বিশ্বাস করে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তাকে মেনে নিয়েছে একমাত্র নেতা হিসাবে; দীর্ঘ সংগ্রামে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে নির্দ্বিধায়; সে নেতাই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে পিছে ফেলে রেখে খোঁড়া যুক্তি তুলে বহাল তবিয়তে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমালেন। ক্ষনিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল বাঙ্গালী জাতি। মুজিবের সুবিধাবাদী আচরনে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল মুক্তিকামী জনতা। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। আওয়ামী লীগের নেতারাও সব যার যার মত গা ঢাকা দিলেন প্রাণ বাচাঁবার প্রচেষ্টায়। মুজিব গ্রেফতার হওয়ার সাথে তারাও পালিয়ে হাফ্ ছেড়ে বাচঁলেন। এ অবস্থায় জনগণকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রতিরোধ সংগ্রামের দায়িত্ব নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠে। গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাংলাদেশে। এ অবস্থায় ২৬শে মার্চ রাতে চিটাগাং এ অবস্থিত অষ্টম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক অখ্যাত তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান তার তরুণ বাঙ্গালী সহকর্মীদের পরামর্শ ও সহচার্যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেতার মাধ্যমে জাতির প্রতি আহ্বান জানান স্বাধীনতা সংগ্রামের। তার আহ্বানে আশার আলো দেখতে পেয়েছিল জাতি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিকালে স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তি সংগ্রাম।

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসে মেজর জিয়াউর রহমানের ক্ষীন কন্ঠ, **"Under circumstances however, I hereby declare myself as the Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government."** অবশ্য পরবর্তী ঘোষণায় এর সাথে যোগ করা হয়, **"Under guidance of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman."** স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে সেই সময় চুলচেরা বিশ্লেষন করার ফুরসৎ কারও ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ কালুরঘাট থেকে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা সর্ম্পকে সরকার ও আওয়ামী লীগের তরফ থেকে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি কাহিনী প্রচার করা হয়।

প্রথম গল্পটি ছিল: ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে গ্রেফতারের পূর্বক্ষণে চট্টগ্রামের জহুর আহ্মদ চৌধুরীকে টেলিফোনে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সামরিক

অভিযানের প্রাক্কালে সকল প্রকার টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অতএব ঐ গল্প ধোপে টিকেনি।

দ্বিতীয় গল্পে বলা হয়: ওয়্যারলেসের মাধ্যমে (?) চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানরত একটি অষ্ট্রেলিয় জাহাজের ক্যাপ্টেনকে স্বাধীনতার ঘোষণা জানানো হয়। ঐ ক্যাপ্টেন নাকি জনাব জহুর আহ্‌মদকে শেখ মুজিবের সেই ঘোষণা বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন! চট্টগ্রামের কোন নোঙ্গর করা জাহাজের সাথে ঢাকায় বসে ওয়্যারলেস সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা কোনভাবেই তখন সম্ভব ছিল না। কারণ ঐ সময় চট্টগ্রাম বন্দরে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিকদের সাথে পাক বাহিনীর লড়াই চলছিল। তাছাড়া ঢাকার ওয়্যারলেস সেন্টারসহ সবগুলো যোগাযোগ কেন্দ্র তখন পুরো মাত্রায় খানসেনাদের অধিনে। সুতরাং এ গল্পও সারহীন প্রমানিত হয়।

শেষ গল্পে বলা হয়: চট্টগ্রাম ইপিআর-কে জানানো হয়েছিল সারা দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা বা বাণী প্রচারের জন্য। 'স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস' নামক প্রকাশনায় এই কাহিনীটিই নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু একটুখানি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষন করলেই বুঝা যায় এ কাহিনীটিও আষাঢ়ে গল্প মাত্র।
প্রথমত: ঢাকার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যথা:- টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ঢাকা বেতার, ওয়্যারলেস সমস্তই তখন সম্পূর্ণরূপে পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে। এবার দেখা যাক ঢাকা ইপিআর এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম ইপিআর-কে নির্দেশ পাঠানোর প্রশ্নটি। ঢাকা ইপিআর যদি শেখ মুজিবের নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম পৌঁছাতে পারে তাহলে ঢাকা ইপিআর-থেকেইতো সারা বাংলাদেশে ঐ ঘোষণা প্রচার করার জন্য বলা যেত! তাছাড়া সবারই জানা ছিল ঢাকা ইপিআর-এর হেডকোয়ার্টার এবং পিলখানা সিগন্যাল সেন্টার ২৩শে মার্চেই আর্মি দখল করে নিয়েছিল। তারপরও কথা থাকে। চট্টগ্রামের ইপিআর-এর দায়িত্বে ছিলেন তখন বাঙ্গালী তরুণ অফিসার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। যে সমস্ত বাঙ্গালী অফিসারদের সাথে একত্র হয়ে মেজর জিয়াউর রহমান ২৬শে মার্চ রাতে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রফিক ছিলেন অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে ১নং সেক্টরে তিনি যুদ্ধ করেন। স্বাধীনতার পর তাকে হঠাৎ করে সেনা বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের উপর ক্যাপ্টেন রফিক একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ঢাকা থেকে পাবার ব্যাপারে কিছু লেখেননি। কেন? সর্বোপরি স্বাধীনতার ঘোষণা সত্যি সত্যি ঢাকা থেকে পাঠানো হয়ে থাকতো সেই ক্ষেত্রে মেজর জিয়া তার প্রথম ভাষণে নিজেকে অস্থায়ী সরকার প্রধান হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন কোন যুক্তিতে? তারপরও প্রশ্ন থাকে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন আরেক নেতা আবদুল হান্নান যিনি ৩০ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিকবার বক্তব্য প্রচার করেছেন, তিনিই বা কেন তার প্রচারণায় একবারও উল্লেখ করলেন না স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ঢাকা থেকে পাবার কথা? অতএব, ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াই যে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ধ্রুব সত্যকে শত চেষ্টা করেও কোন যুক্তি দিয়েই খন্ডানো সম্ভব নয়।

মহা পলায়ন

লেঃ মতি, সেকেন্ড লেঃ নূর এবং আমি সর্বপ্রথম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি।

জাতীয় রাজনীতির এই ক্রান্তিলগ্নে আমি তখন কোয়েটায় ১৬ ডিভিশনের ৬২ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্টে পোস্টেড। আমার আবাস কিংস রোডের আর্টিলারী অফিসার্স মেসে। আমি ছাড়াও তখন কোয়েটাতে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী অফিসার বিভিন্ন রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নে পোস্টেড ছিলেন। কর্নেল দস্তগীর জিওয়ান ডিভ হেডকোয়ার্টাস, মেজর হাফিজ ৬২ ফিল্ড রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন শহীদ ৩৩ ক্যেভারলী, ক্যাপ্টেন শরফুল ৩৩ ক্যেভারলী, ক্যাপ্টেন মহসীন বেলুচ রেজিমেন্ট, মেজর মালেক বি এম, মেজর কাদের ইঞ্জিনিয়ার্স, ক্যাপ্টেন মাওলা ইএমই ব্যাটালিয়ন, ক্যাপ্টেন আমছা আমিন ইনফ্যানট্রি স্কুল, ক্যাপ্টেন জাকের, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শাফায়াত, লেফটেন্যান্ট হারুণ ২৬ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন ইফতেখার, ক্যাপ্টেন মাজহার উদ্দিন মোল্লা, লেফটেন্যান্ট কে বি ৬৩ ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন জামাল এএমসি, ক্যাপ্টেন কাসেম এএসসি প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক জেসিও, এনসিও ও জোয়ান ভাইরা স্কুল অফ ইনফ্যানট্রি এন্ড ট্যাকটিকস, ইএমই ব্যাটালিয়ন, সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, ডিভ হেডকোয়ার্টাস, ষ্টাফ কলেজ এবং ৩৩ ক্যেভারলী রেজিমেন্টে।

কোয়েটায় বাঙ্গালীদের ছোট পরিবার ছিল একটি সুখী পরিবার। আমরা সবাই মিলেমিশে হাসি আনন্দে কাটাতাম দিনগুলো। প্রায়ই আমরা সমবেত হতাম কোথাও না কোথাও। চলতো আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, গল্প-গুজব। জাতীয় সংকট আমাদের মাঝের ব্যবধানকে কমিয়ে আনলো আরো। সবাই দেশ সম্পর্কে সচেতন, সবাই শংকিত। ভাবনায় আকুল, কি হচ্ছে? ঘটনা প্রবাহের পরিণাম কি? প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের ক্ষমতা লিপ্সা কোথায় নিয়ে যাবে দেশটাকে? পাকিস্তান টিকে থাকবে কি করে? অন্যায়, অবিচার, শাসন-শোষণ শেষ হবে কবে? আইয়ূব খানের প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে সম্পূর্ণরূপে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেবেন আলোচনার মাধ্যমে? নাকি ক্ষমতার মোহে দেশকে আরো রসাতলে টেনে নিয়ে যাবেন? গোপনে আমরা মিলিত হই বিভিন্ন জায়গায়। আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে পেতে চাই এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব। খবরা-খবরের আদান-প্রদান হয় নিজেদের মধ্যে। প্রতিটি নতুন খবর পর্যালোচনা করি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। খবর পাই দেশ থেকে আসা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। মনযোগ দিয়ে শুনি বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, ভয়েস অফ অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি। জাতীয় রেডিও এবং টিভি মাধ্যমের প্রচারিত খবর একপেশে হওয়ায় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। মাঝে মধ্যে সিগন্যালস্ সেন্টারের বাঙ্গালী ভাইরা নিয়ে আসে জিএইচকিউ থেকে প্রেরিত গোপন বার্তাসমূহের সারবস্তু। এ থেকে শাসকচক্রের মন মানসিকতা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সেটাই বা কতটুকু। পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের প্রতি মুহূর্তের ঘটনাবলী জানার জন্য মন উদগ্রীব হয়ে থাকে তীর্থের কাকের মত। দেড় হাজার মাইল দূরত্বে বসে সীমিত মাধ্যমে ঘটনা প্রবাহের যতটুকু খবরা-খবরই পাচ্ছিলাম, তার চুলচেরা বিশ্লেষন করে অবস্থার সাথে নিজেদের যতটুকু সম্ভব সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম আমরা। কিন্তু সবকিছুই করতে হচ্ছিল বিশেষ সতর্কতার সাথে। মনের দাহ ও আক্রোশ অতি কষ্টে চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম সবাই। নিজেদের সংযত রেখে ধৈর্য্য সহকারে অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে সবাইকে; এ সিদ্ধান্তই গৃহিত হয় গোপন বৈঠকগুলোতে। আশা-নিরাশার এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় কাটছিল আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত।

মার্চের ৩০ তারিখে আমরা বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ষ্টেশনগুলো থেকে প্রচারিত নিবন্ধ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটা ২৫-২৬শে মার্চ রাতের ঘটনা

ও পরবর্তী দিনগুলোর ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। বাংলাদেশে ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনদের অবস্থা ভেবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে মন। পাকিস্তান সরকার ও সেনা বাহিনীর ন্যাক্কারজনক আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। সেই সেনা বাহিনীতেই চাকুরী করছি বলে নিজের প্রতি আত্মধিক্কার জাগে মনে। ভাবি, এ অবস্থায় প্রবাসে বসে আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? বাঙ্গালীদের ঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কি কোন দায়িত্বই নেই? সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য আকুল হয়ে উঠে মন। অস্বস্তিকর পরিবেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় কাটতে থাকে আমাদের।

ইতিমধ্যে আমাদের কোর্সও প্রায় শেষ হচ্ছে। কোর্সে আগত বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে ক্যাপ্টেন তাহের, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নূর চৌধুরী এবং লেফটেন্যান্ট মতির সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। চিন্ত-ভাবনার মিলই ছিল আমাদের এই ঘনিষ্ঠতার প্রধান কারণ। আমি লোকাল অফিসার। এরা প্রায়ই আমার মেসে আসত। দল বেধে আনন্দ-ফুর্তি করে আমরা অবসর কাটাতাম। একসাথে খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখা, ক্লাবে আড্ডা মারা ছিল আমাদের বিনোদনের উপায়। লেফটেন্যান্ট সুমিও প্রায়ই আমাদের সাথে যোগ দিত। আমরা একত্রিত হয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতাম ঠিকই কিন্তু তার ফাঁকে আলোচনা চলত বাংলাদেশ নিয়ে। সবারই একই চিন্তা। আমাদের কিছু একটা করা উচিত। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে নির্বিকার হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জাতীয় সংগ্রামে আমাদের সাধ্যমত অবদান রাখতে হবে। কিন্তু কি করা সম্ভব! ইতিমধ্যে জানতে পারলাম আমাদের ১৬ ডিভিশনকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। অত্যন্ত সুখবর! ডিভিশন গেলে আমিও ইউনিটের সাথে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে পারব। খবরটা পেয়ে তাহের, নূর, মতি এবং সুমি সবাই খুশি। কোর্স শেষ হল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত কোন অফিসারকে তাদের ইউনিটে ফেরত পাঠানো হবে না। তাদের সবাইকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ইউনিটে পোষ্টিং দেয়া হবে। এ কি ব্যাপার! এমনটি তো হবার কথা নয়। আমরা সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পরলাম। কোর্স শেষে ইউনিটে ফিরে যাওয়াইতো নিয়ম; তাহলে এ ধরণের আদেশের উদ্দেশ্য কি? তাহের, নূর, মতি সবার ইউনিটই পূর্ব পাকিস্তানে। তারা সবাই আটকা পড়ে গেল। আর আমি ফিরে এলাম ইউনিটে। কিন্তু ইউনিটে যোগদান করেই বুঝতে পারলাম অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশও অনেক বদলে গেছে। ইতিমধ্যে দেশে ইমারজেন্সী ঘোষিত হল।

একদিন আমার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মিয়া হাফিজ আমাকে তলব করে পাঠালেন। তার অফিসে যাওয়ার পর তিনি কিছুটা বিব্রতভাবেই বললেন, "শরীফ ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে আমি তোমাকে এ্যাডজুটেন্ট পদে বহাল করতে চাই। দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমার ষ্টাফ অফিসার হিসাবে তোমাকেই আমি মনোনীত করেছি।" তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার সাথে কর্নেল হাফিজের সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। ব্যাচেলার হ্যাপিগোলাকি টাইপ কমান্ডো কর্নেল হাফিজ আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। আমি তাই সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার আমি ইউনিটে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে একজন। সে ক্ষেত্রে আমাকে ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে জুনিয়র পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? বেচারা কর্নেল হাফিজ মুখ কাচুমাচু করে বললেন, "দেখ, জিএইচকিউ থেকে অর্ডার এসেছে কোন বাঙ্গালী অফিসারকে দায়িত্বপূর্ন কোন পদে রাখা যাবে না। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় সব বাঙ্গালীদের উপর নজর রাখার নির্দেশও জারি করা হয়েছে। তোমার শুভাকাঙ্খী হিসাবে এই গোপনীয় নির্দেশের কথা তোমাকে বিশ্বাস করে বললাম। আমার অনুরোধ সব বুঝে তুমি চোখ-কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে চলবে। তোমার কোন কিছু হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি কষ্ট পাব। বোঝার চেষ্টা কর, নেহায়েত অপারগ হয়েই আমি এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

তার সিদ্ধান্তে কষ্ট পেলেও তার আন্তরিক স্বীকারোক্তি শুনে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। তার সতর্কবাণী সবাইকে জানাবার জন্য ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের

মেসে। সেখানে ডেকে পাঠালাম নূর এবং মতিকে। সব শুনে সবাই ঠিক করলাম আমাদের সবকিছুই করতে হবে অতি সাবধানে। পশ্চিমারা আমাদের সব বাঙ্গালীকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখছে। তাই এতটুকু অসতর্ক হলে আর রক্ষা নাই। মহাবিপদে পড়তে হতে পারে। সিদ্ধান্ত নিলাম স্বাভাবিকতা বজিয়ে চলতে হবে আমাদেরকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপনে মিলিত হব আমরা। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বস্ত লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে আলোচনা করা ঠিক হবে না। কর্নেল মিয়া হাফিজের সাথে আলাপের পর ঠিক বুঝতে পারলাম ইউনিটের সাথে আমার আর বাংলাদেশে যাওয়া হবে না। ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে চলল অতি দ্রুতগতিতে। হঠাৎ করে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারসের জিওয়ান বাঙ্গালী অফিসার কর্নেল দস্তগীরকে বদলি করে দেয়া হল জিওয়ান মুজাহিদ কোর হেডকোয়ার্টারস লাহোরে। তার এ বদলিতে আশ্চর্য হয়ে গেল কোয়েটাতে অবস্থিত সব বাঙ্গালী। আমাদের কাছে ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অন্যান্য বাঙ্গালীরা অবাক হয়ে গেল তার এ অস্বাভাবিক পোস্টিং এ। ডিভিশনের বাঙ্গালীরা যারা বাংলাদেশে যাবার আশায় উন্মুখ হয়ে ছিলেন তাদের গুড়ে পড়ল বালি। আমি ও নূর একদিন গেলাম কর্নেল দস্তগীরের বাসায়। তার পরিবার তখন বাংলাদেশে। তাকে বললাম,

— স্যার এরপরও কি আমাদের চুপচাপ বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত?
— কি করতে চাও? পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি বললাম,
— দেশের সংগ্রামে অবদান রাখার চেষ্টা করতে হবে যেভাবেই হোক।
— পাগল হয়েছ? দেড় হাজার মাইল দূরে বসে কি করতে পার তোমরা?
— পালিয়ে গিয়ে যোগদান করতে পারি স্বাধীনতা সংগ্রামে। নয়ত বেলেলির এ্যামুনিশন ডিপো উড়িয়ে দিতে পারি। এতে করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর সেকেন্ড লাইন এ্যামুনিশন ধ্বংস হয়ে যাবে। অপূরনীয় ক্ষতি হবে সামরিক জান্তার। যুদ্ধ করার ক্ষমতাও কমে যাবে অনেকাংশে।
— পাগল নাকি? কি সব অদ্ভুত কথা ভাবছ? ইমোশনাল হয়ে এ ধরণের পদক্ষেপ নিলে তোমরা তোমাদের জন্যই শুধু বিপদ ডেকে আনবে না, বিপদ ডেকে আনবে পশ্চিম পাকিস্তানের সব বাঙ্গালীর জন্য। অবাস্তবব চিন্তধারা।

তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন,

— পাসিং আউট করার দিন শপথ নিয়েছিলে, **" To remain loal to the constitution. So be faithful and Prove your integrity."**

পরিশেষে তিনি বললেন, তার উপর কড়া নজর আছে; তাই সাবির্ক মঙ্গলের জন্য এভাবে যখন তখন তার সাথে যেন দেখা না করি। কি আশ্চর্য্য! এই দস্তগীর সাহেবকে জানতাম ভীষণভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন সাচ্চা দেশপ্রেমিক হিসাবে। তাকে শ্রদ্ধাও করতাম সে কারণে। কিন্তু একি! আজ তার মুখ থেকে একি শুনছি! মুহূর্তে মনটা বিষিয়ে উঠলো, নূরকে বললাম,-চলো যাওয়া যাক। বেরিয়ে আসছিলাম। তিনি বললেন,

— **Don't be so sentimental. Even if Bangladesh becomes a reality, Preserve yourself, Bangladesh can't go without you and me.**

তার সুবিধাবাদী উক্তি শুনে গা'টা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠল। এ সংসারে সত্যিই মানুষ চেনা দায়! বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে আমি ও নূর ফিরে এলাম। এরপর যেদিন তিনি লাহোরের পথে যাত্রা করছিলেন সেদিনও তাকে আকুল মিনতি জানিয়েছিলাম, "স্যার এখনও সময় আছে। আপনার মত বিচক্ষণ সিনিয়র অফিসারের প্রয়োজন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। আপনি রাজি থাকলে আমরা বুকের রক্ত বাজি রেখে আপনাকে সাথে করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।"
তিনি রাজি হলেন না। রওনা হয়ে গেলেন লাহোরের পথে। ফিরে এলাম হতাশ হয়ে। এবার একাই সিদ্ধান্ত নিলাম বেলেলি ডিপো উড়িয়ে দেবার। কমান্ডো ট্রেনিং ছিল আমার। **Sympathetic Detonation** এর মাধ্যমে **Explosive** দিয়ে **Sabotage** করে উড়িয়ে দেব ডিপো। তখন আমার বিশেষ এক বন্ধু ছিল ডিপোর চার্জে। তার ওখানে যাওয়া-আসার মাধ্যমে সব

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম অতি গোপনে। পাঠান বন্ধুটি বাঙ্গালীদের প্রতি ছিল বেশ সহানুভূতিশীল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটা Trace তৈরি করে ফেললাম। Trace টা নিয়ে একদিন গেলাম ইঞ্জিনিয়ার্স এর মেজর কাদেরের বাসায়। উদ্দেশ্য তাকে দিয়ে পরখ করিয়ে নেব আমার Trace টা ঠিক হয়েছে কিনা। তাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে তার সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আমার প্ল্যান শুনে তিনি ভীষণভাবে আতঁকে উঠলেন। বললেন, "কি সাংঘাতিক! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ডালিম? তুমি কি বুঝতে পারছো না কি করতে যাচ্ছ তুমি? তোমার প্ল্যান কার্যকরী করলে প্রায় কোয়েটা শহরটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাতে আমরাও ধ্বংস হয়ে যেতে পারি। তাছাড়া তোমার এ কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আমি এ ব্যাপারে তোমাকে Encourage করতে পারি না। আমার অনুরোধ তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা।" এখানেও হতাশা। ফিরে আসার আগে তাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমার প্ল্যান সম্পর্কে তিনি যেন অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাথে আলাপ না করেন। তিনি রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদানে আমাকেও কথা দিতে হয়েছিল আমি এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকব। আমি কিন্তু আমার প্ল্যান কার্যকরী করার চেষ্টা করে চলেছিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই আমার বন্ধু একদিন বদলি হয়ে পিন্ডি চলে গেল। আমার মাথায় বাজ পড়ল। তার অবর্তমানে ডিপোতে আসা-যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে আমার পরিকল্পনাও বাদ দিতে হল। দুঃখ পেয়েছিলাম অনেক। কিন্তু অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিতে হল। নতুন করে আবার ভাবতে শুরু করলাম কি করা যায়? ঠিক করলাম পালিয়ে গিয়ে যোগ দিব স্বাধীনতা সংগ্রামে। এমন অবস্থায় একদিন নূর এল আমার মেসে। লনে বসে আলাপ করছিলাম দু'জনে। হঠাৎ করেই নূর বলল,

— স্যার, ক্যাপ্টেন তাহের আপনাকে ডেকেছেন। জরুরী আলাপ আছে।
— ঠিক আছে। আজ রাতে আমরা একসাথে তার মেসে ডিনার করব।

নূর চলে গেল। কি এমন জরুরী আলাপের জন্য ক্যাপ্টেন তাহের ডেকে পাঠিয়েছেন ভেবে কোন কুল কিনারাই পেলাম না। সন্ধ্যার পর গিয়ে হাজির হলাম তার মেসে। নূর ইতিমধ্যেই এসে গেছে। ডিনারের আগে তার রুমে বসে গান শুনছিলাম। গানের আওয়াজের আড়ালে নিচু গলায় আমরা আলাপ শুরু করলাম। কোন ভণিতা ছাড়াই ক্যাপ্টেন তাহের বলল,

— ডালিম, আমি ও নূর পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি চমন বর্ডার দিয়ে আফগানিস্তানে। সেখান থেকে বাংলাদেশ। আকবর বখ্তির ছেলেদের সাথে তোমার বন্ধুত্ব আছে। তাছাড়া তুমি স্থানীয় অফিসার। এ ব্যাপারে আমরা তোমার সাহায্য চাই।

স্বল্পভাষী ক্যাপ্টেন তাহেরের অনুরোধের জবাবে বললাম,

— স্যার আমিও পালাবার চেষ্টা করছি। ক্যাপ্টেন তাহের আমার জবাব শুনে খুব খুশি হলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,
— তাহলে তুমি সময় নষ্ট না করে যেভাবেই হোক বর্ডারটা একবার রেকি (Recce) করে আস।

আমি সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম মেসে। আমরা তিনজনে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাদের এ পরিকল্পনা সম্পর্কে কাউকেই কিছু বলা চলবে না। সুযোগমত একদিন Regimental Exercise Area Reece করার উছিলায় ইউনিটের গাড়ি নিয়ে প্রফুল্লচিত্তে (Reece) করে ফিরে এলাম। বন্ধুরা আমাদের পালাতে সাহায্য করবে জানতে পেরে নূর ও তাহের দু'জনেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল। এভাবে সব যখন প্রায় ঠিকঠাক হঠাৎ করে একদিন সিগন্যাল কোরের হাবিলদার নাজির রাতের অন্ধকারে আমার সাথে দেখা করতে এল। লোকাল বাঙ্গালী অফিসার হিসাবে সবার সাথেই আমার যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে জুনিয়রদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। নাজিরের মত সিনিয়র, জুনিয়র অনেকেই তাদের সমস্যাদি নিয়ে আমার কাছে আসতো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এবং আমার পরামর্শ নিতে। ভাবলাম, নাজিরও নিশ্চয়ই তেমন কোন ব্যাপারেই আলাপ করতে এসেছে। কিন্তু তাকে দেখেই আতঁকে উঠলাম। তার মুখ ভীষণভাবে থমথম করছিল। চোখ দু'টোও টলটল করছিল। তাকে

দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম ভীষণ কিছু ঘটেছে। আমি তাকে নিয়ে সোজা আমার ঘরে চলে গেলাম।

— কি হয়েছে নাজির? এত গম্ভীর কেন?

জবাবে নাজির অতি নিচুস্বরে বলল,
— স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে। ডিভ-কমান্ডার **GHQ**-তে **Cipher Message** এর মাধ্যমে জানিয়েছেন ২৯ **EME Battalion** এর ৩জন **Junior Commission Officer (JCO)** এবং ২জন **Non-Commission Officer (NCO)** চমন হয়ে আফগানিস্তানে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

খবর শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। নাজিরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিয়ে ছুটে গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের মেসে। ডেকে পাঠানো হল লেফটেন্যান্ট নূরকে। গভীর রাত অব্দি আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল চমন বর্ডার দিয়ে পালানোর প্রচেষ্টা হবে অত্যন্ত বিপদজনক। তাই এই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। অন্য পথ হিসাবে আমাদের সামনে খোলা থাকলো কাশ্মীর, লাহোর, শিয়ালকোট কিংবা ভাওয়ালপুর সেক্টর। ভাওয়ালপুর সেক্টর দিয়ে রাজস্থানের মরুভূমি পাড়ি দিতে সময় লাগবে দুই থেকে তিন দিন। অন্যান্য যে কোন সেক্টর দিয়ে বর্ডার পেরোতে লাগবে ৫ থেকে ৬ দিন। এত সময় পাওয়া যাবে কিভাবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ভাওয়ালপুর-ভাওয়ালনগর সেক্টরকেই বেছে নিলাম আমরা। এ সেক্টর দিয়ে পালাতে শুধু সময়ই কম লাগবে তা নয় আমাদের ডিভিশনের অপারেশনাল এরিয়া ছিল এই সেক্টর। ফলে প্রয়োজনীয় ইনটেলিজেন্স ইনফর্মেশন সংগ্রহ করাও সহজ হবে। পালাবার পরিকল্পনা করার দায়িত্ব যুক্তিগত কারণেই আবার আমাকেই নিতে হল। শুরু হল আবার এক নতুন পরিকল্পনা। এভাবেই সময় বয়ে যাচ্ছিল।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের এক ছুটির দিনে, দুপুরের খাওয়া শেষ করে মেস থেকে ফিরে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম, হঠাৎ করে দরজায় কড়া নড়ে উঠল। কে জিজ্ঞেস করতেই লেফটেন্যান্ট মতির গলা শুনতে পেলাম। ভেতরে এল মতি। শুকনো মুখ, মলিন চেহারা। চিন্তিত লাগছিল ওকে। জিজ্ঞেস করলাম,
— কি ব্যাপার! হঠাৎ কি মনে করে এলে?
— স্যার কিছুদিন যাবত মানসিক যন্ত্রনায় ভুগছি ভীষণভাবে। অবশেষে আজ মনস্থির করে এসেছি আপনার পরামর্শ নিতে।
— খুব সিরিয়াস ব্যাপার কিছু কি?
— -হ্যাঁ স্যার। মনস্থির করে ফেলেছি। পালাবো। যে করেই হোক পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হবো। চেষ্টা ব্যর্থ হলে যা হবার তা হবে। যে কোন ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত। আপনি কি বলেন?

ভালো করে তার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ছবি পড়বার চেষ্টা করলাম। না, তাকে ভীষণ সিরিয়াস মনে হল। কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্তের কথা কাউকে বলা যাবে না। তাই সে মুহূর্তে আমাদের চিন্তা-ভাবনার কথা না বলে শুধু বললাম,
— মতি তোমার আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কি করতে পারি?

মতি চুপ করে ভাবছিল কিছু। আমি বেয়ারাকে ডেকে নাস্তার ফরমায়েস দিলাম। নাস্তা এল। মতি তৃপ্তির সাথে খেলো নাস্তা। ওর খাওয়া দেখে বুঝতে পারছিলাম দুপুরের খাওয়া হয়নি তার। হঠাৎ করেই মতি প্রশ্ন করল,
— স্যার সবকিছু সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। এ অবস্থায় আমরা চোখ-কান বন্ধ করে হাত গুটিয়ে শুধু বসে থাকব? আমাদের কি কোন দায়িত্বই নেই?

আপনি কি কিছুই ভাবছেন না? আমি মতির প্রশ্নের তাৎক্ষনিক জবাব না দিয়ে বললাম,
— কাল বিকেলে চায়না ক্যাফেতে ৬টায় এসো; আলাপ হবে বিস্তারিত।

মতি চলে গেল। ও চলে যাবার পর আমি কাপড় পড়ে গাড়ি নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলাম নূরের কাছে। গিয়ে দেখি নূর দিবা নিদ্রা দিচ্ছে। ওকে উঠালাম ঘুম থেকে। প্রথমে নূর কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

— কি ব্যাপার স্যার হঠাৎ আপনি! এ সময়ে?
— বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নূর।

তাকে মতির ব্যাপারে সব খুলে বললাম। সব শুনে নূর বলল,
— মতির ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন।
আমি বললাম,
— ওকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়?

নূর কিছুক্ষন চিন্তা করে বলল,
— আমার আপত্তি নেই তবে ক্যাপ্টেন তাহেরের মতামতটা জানা দরকার।
— বেশ তবে চল তার ওখানেই যাওয়া যাক।
— তাই চলুন।

আমার গাড়িতে করেই গেলাম ক্যাপ্টেন তাহেরের ওখানে। তাকে সব কথা খুলে বলে জানালাম তাকে সঙ্গে নিতে আমার এবং নূরের কোন আপত্তি নেই। ক্যাপ্টেন তাহের আমাদের সাথে একমত হয়ে বললেন, ঠিক আছে ও যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে তাকে সঙ্গে নেয়া হোক। ফিরে এলাম; পথে নূরকে নামিয়ে দিয়ে। পরদিন নির্ধারিত সময়ে আমি ও নূর চায়না ক্যাফেতে গেলাম মতির সাথে আলোচনা করতে। গিয়ে দেখি মতি আমাদের পৌঁছার আগেই আমাদের প্রিয় ডিশগুলোর অর্ডার প্লেস করে অপেক্ষা করছে। চায়না ক্যাফে তখন কোয়েটা শহরের একমাত্র চাইনিজ রেস্তোরা। আমাদের বিশেষ পছন্দের আড্ডা মারার জায়গা। একটি চাইনিজ পরিবার বাবা, মা ও মেয়ে মিলে রেস্তোরাটা চালায়। আমরা তাদের পুরনো রেগুলার কাষ্টমার। তাই গেলে বিশেষ খাতির-যত্ন করে। আমরা যোগ দেবার পরপরই খাওয়া শুরু হল। সাথে আলোচনা। আমি প্রথমেই বললাম,
— মতি তোমার গতকালের প্রশ্নের জবাব আজ দিচ্ছি। কোন কারণবশতঃ সেটা কাল দেয়া সম্ভব হয়নি। আমি, নূর এবং ক্যাপ্টেন তাহের পালাবার চেষ্টা করছি বেশ কিছুদিন যাবত। চমন বর্ডার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু **EME Batalion** এর ঘটনার পর সে পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে। এখনও চেষ্টা করছি ভাওয়ালপুর-ভাওয়ালনগর হয়ে রাজস্থান বর্ডার ক্রস্ করব। তুমি আমাদের সঙ্গে ইচ্ছে হলে আসতে পার। মতির চোখে মুখে খুশি উপচে পড়লো।
— স্যার, আমি জানতাম আপনি এ সময়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।
— **I am so happy that I can't tell you. I am proud of you Sir.**

আমি পকেট থেকে ছোট্ট একটা কোরআন শরীফ বের করে তার উপর হাত রেখে ওকে শপথ নিতে বললাম। ও কোরআন শরীফের উপর হাত রাখলো। আমি বললাম,
— বলো, আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে কিছু বলা চলবে না, কোন পরিস্থিতিতেই। প্রয়োজনমত তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হবে সেটা বিনা প্রশ্নে তুমি পালন করবে। অযাচিতভাবে পরিকল্পনা সম্পর্কে কৌতুহলবশতঃ কোন প্রশ্ন তুমি করতে পারবে না। একে অপরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

আমার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল মতি। কোন জড়তা নেই। কোন দ্বিধা নেই। এভাবেই শেষ হল আমাদের বৈঠক।

আমার উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সবচেয়ে শর্টকাট এবং গ্রহণযোগ্য পথ খুজে বের করা এবং সে পথের **Operational map sheet** যোগাড় করে তার উপর **Own troops** এবং **Enemy troops position** এবং **Deployment Trace** যোগাড় করা। তাছাড়া কম্পাস, বাইনোকুলার এবং **Personal weapons** যোগাড়ের দায়িত্বও আমাকেই নিতে হয়েছিল লোকাল অফিসার হিসাবে। এর সবগুলোই আমার রেজিমেন্টে বিস্তর রয়েছে কিন্তু **Classified items** হিসাবে **Operational purpose** ছাড়া এগুলো ষ্টোর থেকে বের করার হুকুম নেই। তাই অন্যপথ খুঁজে বের করতে হল। ম্যাপ যোগাড় করার জন্য ঠিক করলাম ইনফ্যানট্রি স্কুলের ইনন্টেলিজেন্স এর বাঙ্গালী হাবিলদার শফিকের সাহায্য নেব। ছেলেটার সাথে কোর্স করার সময় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। কোর্সে বাঙ্গালী হয়েও ভালো রেজাল্ট করায় ও আমাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করত। ক্লাশের ফাকে ফাকে প্রায়ই ওর সাথে দেশ নিয়ে আলাপ হত। ও অনেক কথাই বলত আমাকে আপনজন ভেবে, বিশ্বাস করে। কোর্স করার সময় ও সবসময় আমাকে নানাভাবে সাধ্যমত সহযোগিতা করত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ঠিক করেছিলাম, দেখা যাক না চেষ্টা করে ও আমাকে ম্যাপের ব্যাপারে কোন সাহায্য করে কিনা। একদিন ওকে খবর পাঠালাম আমার সাথে দেখা করতে। ও ঠিক এল আমার মেসে। নানা ধরণের আলাপ-আলোচনা হল দেশ সম্পর্কে । এক সময় আমি ওকে বললাম,

— শফিক তোমার কাছে আমি একটি ব্যাপারে সাহায্য চাই। যদি ভরসা দাও তবে বলি।

ও যেন কিছুটা লজ্জা পেল। বলল,

— স্যার আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আপনি নির্দ্বিধায় বলুন কি প্রয়োজন আপনার?

— আমি যা চাইবো সেটা সাধারণ কোন জিনিস নয় শফিক।

বুদ্ধিমান তরুণ শফিক জবাব দিল,

— আপনি আমার কাছে কোন সাধারণ জিনিস চাইবেন না সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তবুও আপনি বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

ম্যাপ শীটের নম্বরগুলো তাকে লিখে দিয়ে বললাম,

— এগুলো আমার চাই।

ম্যাপ শীট নম্বরগুলো দেখেই বুদ্ধিমান শফিক হয়তোবা আঁচ করতে পেরেছিল আমার উদ্দেশ্য কি? আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চুপ করে বসে থাকলো শফিক। কি যেন পরখ করে খুজে দেখছিল আমার মাঝে।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বললাম,

— হ্যা, আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, তাই এ ম্যাপ শীটগুলো আমার প্রয়োজন।

আমার কথা শুনে ও বললো,

— আ-কিন্তু স্যার ...?

— জানি শফিক তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে তোমার শাস্তিও হতে পারে। তাই যা কিছুই করার সিদ্ধান্ত তুমি নেবে সেটা ভেবে চিন্তে স্থিরভাবেই তোমাকে নিতে হবে। এ ঝুঁকি নেবার ব্যাপারে আমার তরফ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আমার অনুরোধ এ ঝুঁকি তোমার পক্ষে যদি নেয়া সম্ভব না হয় তবে তুমি অন্য কাউকে আজকের আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলবে না। আশা করি তুমি এ অনুরোধ রক্ষা করবে।

হাবিলদার শফিক আমার মুখের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। কথা শেষ হতেই সে আমাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে বললো,

— স্যার আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এ বিশ্বাসের অবমাননা জান থাকতে হতে দেব না। কাল বিকেল ৫টায় খোকা বাজারে আমার সাথে আপনি দেখা করবেন। দেখি আমি আপনার জন্য কি করতে পারি।

পরদিন বিকেল ৫টায় আমি খোকা বাজারে নির্দিষ্ট স্থানে হাবিলদার শফিকের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল চরম উত্তেজনায়। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট হয়ে গেল ৫টা বেজে শফিকের দেখা নেই। শফিক কি তবে আসবেনা? কোন অঘটন ঘটলো না তো? নাকি মুখের উপর না বলে আমাকে বিব্রত না করে আজ না এসে বুঝিয়ে দিল এ কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। চুপচাপ দাড়িয়ে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছিলাম আর নানা ধরণের কথা ভাবছিলাম। ৫টা ২০ হয়ে গেল ভাবলাম শফিক আর আসবে না। চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি হঠাৎ দেখি ত্রস্ত পায়ে শফিক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে আমার দিকে। বাম হাতে একটি ঝোলা। ডান হাত উঁচু করে আমাকে ইশারায় তার আগমন বার্তা জানাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই লোকের ভীড় ঠেলে ও আমার কাছে এল। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো মন।

— স্যার স্যরি, একটু দেরী হয়ে গেল। ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শফিক। বললাম,

— চলো কোথাও বসা যাক।

মার্কেটের মধ্যেই সাজ্জি কাবাবের দোকানে গিয়ে বসলাম দু'জনে। ইন্টার ইউনিট ম্যাচ ছিল আজ। দারুন খেলা হয়েছে। তারপর ১ ঘন্টা হেভী এক্সারসাইজ করায় বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। আস্ত দু'টো মুরগির সাজ্জি সাথে কড়াই কাবাব এবং নান অর্ডার দিয়ে বসলাম দু'জনে। বেয়ারা কাওয়ার পট এবং কাপ রেখে গেল। কোনার দিকে একটি নিরিবিলি জায়গাতে বসেছিলাম আমরা। রেকর্ড প্লেয়ারে জনপ্রিয় ফিল্মিগান বাজছিল। ফলে আমাদের আলাপ করার সুবিধা হল। পাশের টেবিলের লোকরাও আমাদের কথা কিছু শুনতে পাবে না।

— আমিতো প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিছুটা চিন্তিত হয়েও পড়েছিলাম।
— কি কষ্ট করে যে আপনার জিনিস হাসিল করেছি, সে একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন। এতে ঝুঁকি আছে প্রচুর। কিন্তু আপনি দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু হলেও শান্তনা পাব এই ভেবে যে দেশের স্বাধীনতায় আমিও কিছু অবদান রাখার সুযোগ পেলাম। বলেই আস্তে টেবিলের নীচ দিয়ে সে ঝোলাটি আমার হাতে তুলে দিল।
— আমি তোমার অবদানের কথা সর্বদা স্মরন রাখব শফিক। ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে ছোট করব না। তবে একটি কথা জেনে রাখ। ২৫শে মার্চ ন্যাক্কারজনক পাশবিক ঘটনাবলীর পর থেকে দেশ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখার জন্য অনেক কিছুই ভেবেছি এবং অনেক বাঙ্গালীর সাথে আলাপ করেছি। কেউই তোমার মত নিঃস্বার্থ আন্তরিকতা দেখায়নি। কেউ আমার চিন্তা-ভাবনায় আতঁকে উঠেছেন। কেউ বা রেগে গিয়ে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। কোয়েটার অনেক বাঙ্গালীর কাছেই আমি ইতিমধ্যে বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছি। অনেকে আমার সাথে সব যোগাযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে তোমার এ সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার এ অবদান সামান্য নয়। যদি সংগ্রামে যোগ দেবার তৌফিক আল্লাহ আমাকে নছীব করেন; দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি বেঁচে থাকি তবে তোমার নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে থাকবে ভাই, এ ওয়াদা আমি তোমাকে দিলাম।

শফিকের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়ছিল। রুমালে চোখ মুছে নিয়ে ধরা গলায় বললো,

— স্যার আমার এ অবদান অতি সামান্য । ইচ্ছে হয় আপনার সাথে আমিও পাড়ি জমাই। কিন্তু আমি ফ্যামিলিম্যান। পরিবার ফেলে কি করে পালিয়ে যাই! আমার এ অক্ষমতা আমাকে পীড়া দেবে সারাজিবন। নিজেকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবো না স্যার।
— কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ ভাই। বাংলাদেশের সবার পক্ষে কি যুদ্ধে সরাসরিভাবে যোগ দেয়া সম্ভব হবে? অনেকেই নানাভাবে সংগ্রামে অবদান রাখবেন। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। যেমন আজকে তুমি রাখলে এক অমূল্য অবদান। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে তাদের অবদানের চেয়ে তোমার এ অবদানের মূল্য কোনক্রমেই কম নয়; সেভাবে তুমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা।

আমার কথায় শফিক নিজেকে সামলে নিল। বেয়ারা ইতিমধ্যেই খাবার পরিবেশন করে গেছে।

— এসো খাওয়া যাক।

দু'জনে তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খাওয়া শেষে শফিক বলল,
— আজ আমাদের নাইট ট্রেনিং আছে তাই চলে যেতে হবে। সময় প্রায় হয়ে এল।
— চলো তোমাকে নামিয়ে দেই।
গাড়িতে বসে শফিক বলল,
— স্যার একটি কথা, যদি আমার কিছু হয় তবে আমার পরিবারকে একটু দেখবেন।
— যদি বেঁচে থাকি তাহলে এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। কথা দিলাম।

শফিককে নামিয়ে দিয়ে মেসে ফিরে এসে লনের মাঝখানে ছাতির মত দাড়িয়ে থাকা প্রিয় আখরোট গাছটার নীচে গিয়ে বসলাম। বসন্তের ফুরফুরে বাতাস নানা ধরণের ফুলের সুবাস ছড়াচ্ছিল। গার্ডেন লাইটগুলোর স্বল্প আলোকে ম্লান করে দিয়ে বেশ বড় একটি চাঁদ সামনের মুরদার পাহাড়ের গা ছুঁয়ে উকি দিয়ে হাসছে। মনোরম এক শান্ত পরিবেশ। কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম হাবিলদার শফিক সম্পর্কে।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর মালেক তখন পর্যন্ত ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার ব্রিগেডের অপারেশনাল এরিয়ার আওতায় পরেছে ভাওয়ালনগর ফোর্ট আব্বাস সেক্টর। ভাওয়ালপুর হয়ে ভাওয়ালনগর। সেখান থেকে ফোর্ট আব্বাসের পথে ছোট ষ্টেশন হারুনাবাদ। হারুনাবাদ থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের পদযাত্রা। পাক বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর ডিফেন্স ভেদ করে ২৫ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছতে হবে শ্রীকরণপুর। মেজর মালেকের কাছ থেকেই পেতে হবে পাক বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর **Deployment trace.** এতে বিশদভাবে আঁকা থাকে **Top secret up-to-date intelligence information.** যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। ম্যাপ পাবার পরদিনই টেলিফোন করে মেজর মালেককে বললাম জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে দেখা করতে চাই। অনুমতি নিয়ে তার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম মতিকে সঙ্গে নিয়ে। অফিসে একাই ছিলেন মেজর মালেক।
দ্বারে উপস্থিত হতেই ভারী গলায় প্রশ্ন রাখলেন,
— কি ব্যাপার ডালিম?
— আপনার নতুন গাড়ি দেখতে এলাম। কেমন চলছে?
অল্প কিছুদিন আগে তিনি একটি **Skoda Sedan Car** কিনেছেন।
— তোমার **Volks Wagon** এর মত শানদার না হলেও **I have no complain.**
— স্যার বাসায় চলেন । লাঞ্চ খাব একসাথে।
— লাঞ্চ খাবে তা বেশতো; তোমার ভাবীকে ফোন করে বলে দাও। **But what is your problem? Have you picked up again on some one?** তা তোমার সাথের ছেলেটিকে তো চিনলাম না?
আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন তুলে নিয়ে রিং করছিলাম,
— হ্যালো ভাবী, ডালিম **here.** আমরা বাসায় আসছি, **Three of us over lunch.** অসুবিধে হবেনা তো?
— কোন দিকে সূর্য উঠলো আজ! এতদিন পর হঠাৎ ভাবীকে মনে করে যেচে লাঞ্চ খেতে চাচ্ছ?
ভাবীর জবাবে একটু লজ্জা পেলাম।
— বিশ্বাস করেন ভাবী, কোর্সের ঝামেলায় এত ব্যস্ত ছিলাম; তাই আসা হয়ে উঠেনি। আমার সময় কি করে কেটেছে সে শুধু আমিই জানি।
— চলে এসো; ভাবী বললেন।
কথোপকথন শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে বললাম,
— **All clear Sir at the home front.** ও হ্যাঁ, **Let me introduce Lieutenant Moti from 3rd East Bengal and Moti this is Major Malek from senior Tiger.**

মতি মেজর মালেকের সাথে হাত মিলিয়ে বললো,

— স্যার আপনার সাথে আগে দেখা হয়নি কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি।

আপনার সাথে আগে দেখা হয়নি কিন্তু আপনার কথা অনেক শুনেছি। প্রাণখোলা উচ্ছল প্রকৃতির মেজর মালেক স্মিত হাসলেন।

— Moti is here for OW-JTC. He has done pretty well in the course. বললাম আমি।

— You mean right away!

কিছুটা আশ্চর্য হলেন মেজর মালেক।

— That's correct. এতো চাকুরি করে কি আর হবে স্যার! বললাম আমি।

— চলো তবে।

মেজর মালেক Buzzer টিপলেন। পিএ এসে সেল্যুট করে দাড়ালো। তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে মেজর মালেক তাকে বললেন তিনি অফিসে আজ আর ফিরছেন না। এরপর আমরা বেরিয়ে এলাম অফিস থেকে। বাসায় ফিরে ড্রইং রুমে বসে আলাপ শুরু হলো।

— Well now tell me what's up? প্রশ্ন করলেন মেজর মালেক।

— Sir, the matter is very serious and urgent at the same time confidential আমরা পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জবাব দিলাম আমি।

অপ্রত্যাশিত জবাবে কিছুটা চম্‌কে উঠলেন মেজর মালেক। চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কিচেনে ভাবী রান্না-বান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

— Just a minute, বলে উঠে গেলেন মেজর মালেক।

অল্পক্ষণ পর সিগারেট হাতে ফিরে এসে বললেন,

— কি জানো, my batman is not that reliable. তাই বেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম ক্যান্টিন থেকে সিগারেট আনতে।

বুঝলাম আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি Precaution নেবার জন্যই তিনি এমনটি করেছেন।

— Now then are you sure? একরাশ প্রশ্ন তার চোখে।

— জি স্যার। এভাবে আর চাকুরি করার কোন মানে হয় না। নিজের প্রতি ঘৃণা বাড়ছে। আজ আমাদের মত লোকের প্রয়োজন স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য। What do you think Sir? প্রশ্ন রাখলাম আমি।

— Well you may be right. কিন্তু সংগ্রাম সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্যইতো আমরা জানতে পারছি না। সে অবস্থায় এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়াটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? Wouldn't it be too risky?

পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন মেজর মালেক।

— আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু যেভাবে এখান থেকে জরুরী ভিত্তিতে Re-enforcement পাঠানো হচ্ছে আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাশ আসছে তাতে করে এতটুকু নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে, সেখানে কিছু একটা ঘটছে। তদপুরি International media কি সবটাই মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে বলে মনে করেন আপনি?

জোরালো যুক্তি তুলে ধরলাম আমি।

— Well then, what can I do for you in this venture of yours?

জানতে চাইলেন মেজর মালেক।

— আমরা হারুনাবাদ থেকে শ্রীকরণপুর পৌঁছার চেষ্টা করবো। সবদিক বিবেচনা করে এ পথই সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করছি আমরা।

— Your decision is right. চমন বর্ডার ছাড়া এটাই সবচেয়ে ভালো পথ নিঃসন্দেহে। এপথে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে।

— স্যার, আপনাকে Operational Trace করে দিতে হবে।

অনুরোধ জানালাম আমি।

— Food has been served.

এ্যাপ্রন পরা ভাবী ন্যাপ্‌কিনে হাত মুছতে মুছতে টেবিলে যাবার অনুরোধ জানালেন। ভাবীর আগমনে পরিবেশটাকে হালকা করে দেবার জন্য হঠাৎ করেই মেজর মালেক কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

— এসো আগে পেট-পুঁজো করা যাক। খালি পেটে ঠিকমত চিন্তাও করা যায় না।

সবাই গিয়ে টেবিলে বসলাম। বাচ্চারা সবাই স্কুলে। খাবার দেখে জিভে পানি এসে গেল। টাটকা মাছের বিভিন্ন ব্যঞ্জন। জিজ্ঞেস করলাম,

— ভাবী **The Great!** এ জিনিসগুলো কোথা থেকে আমদানি করলেন?

জবাবে ভাবি বললেন,

— ওরোখ্‌ থেকে আজ সকালেই আনিয়েছি।

কোয়েটা শহর থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটি সবুজ উপত্যকা ওরোখ্‌। একটি পাহাড়ী ঝরনা বয়ে যাচ্ছে উপত্যকার ঠিক মাঝ দিয়ে। বিভিন্ন ফলের গাছ-গাছালিতে ছেয়ে আছে উপত্যকাটা। চারিদিকে ঘিরে আছে পাহাড়ের গায়ে চির-সবুজ বন। আকর্ষনীয় পিক্‌নিক্‌ স্পট। সেই ঝরনাতেই ট্রাউট এবং অন্যান্য জাতের মাছ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা সুযোগ পেলেই মাছ আনায় ওরোখ্‌ থেকে। আমরা **Bachelor Boys** প্রায়ই গাড়ি ভর্তি করে মাছ নিয়ে এসে ইচ্ছেমত যেকোন ভাবীর শরনাপন্ন হই টাটকা মাছ-ভাতের স্বাদ মেটাতে। হৈ চৈ করে তৃপ্তি মিটিয়ে খাওয়া শেষ করে আমরা আবার ড্রইং রুমে এসে বসলাম। খাবার সুযোগে সবকিছু ভেবে নিয়ে আমার অনুরোধের জবাবটা ঠিক করে নিয়েছিলেন মেজর মালেক। সোফায় বসে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে মেজর মালেক বললেন,

— **Well I admire your courage.** আমি নিশ্চয়ই তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবো। শুধু অনুরোধ এ ব্যাপারটা আমার এবং তোমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

— **Definitely Sir, we give you our words.**

আমি জবাব দিলাম।

— আমরা যোগাড় করেছি।

মেজর মালেক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাতেই তাড়াতাড়ি বললাম,

— **Not from my Regiment. From elsewhere.**

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলেন মেজর মালেক।

— **Then bring them to me tomorrow.** বললেন মেজর মালেক।

— **Not tomorrow.** এখনি **Map-Sheets** গুলো দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, কাল এসে নিয়ে যাবো।

মতিকে পাঠালাম গাড়ি থেকে **Map-Sheets** গুলো নিয়ে আসার জন্য। সেগুলো নিয়ে মতি ফিরে এলো। **Map-Sheets**গুলো পরখ করে মেজর মালেক স্বগোক্তি করলেন,

— **Incredible!** জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে কোন গোপন জায়গায় রেখে ফিরে এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে।

— আমরা তবে আজ উঠি স্যার, **Still a lot to be done.**

— বুঝেছি। কি জানো ডালিম, তোমাদের মত দেশপ্রেমিকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বাধীন হবে নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ্‌। ইচ্ছে হচ্ছে আমিও তোমাদের সাথে পালিয়ে যাই, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। পরিবারের দায়িত্ব বাধা হয়ে আছে। **How can I leave them and go?**

ভারী গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলছিলেন মেজর মালেক।

— আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু আমাদের সাহায্য করে আপনিতো কম অবদান রাখলেন না স্যার? সেভাবে বিচার করলে আপনিওতো একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা বেঁচে থাকলে আপনার এই অবদানের কথা দেশবাসী জানবে। বিশ্বাস করেন স্যার, আপনিই একমাত্র সিনিয়র অফিসার যার কাছ থেকে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলাম। বাকি সবাইকে চেনা হয়ে গেছে। **All are paper tigers.** তারা ভিতু, স্বার্থপর। মুখে মুখেই সব বাঙ্গালী এর বেশি কিছু নয়।

আমার কথায় মেজর মালেকের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। হৈ হুল্লরবাজ বলে পরিচিত মেজর মালেকের মাঝে সাচ্চা বাঙ্গালী দেশপ্রেমিক মেজর মালেককে খুঁজে পেয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সালাম জানিয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন তিনি। গাড়িতে বসতে যাচ্ছি ঠিক তখন আবেগে আমাকে এবং মতিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন,

— **I wish you all well boys, take care.** ফিরে এলাম মেসে।
— সত্যি অদ্ভুত লোক মেজর মালেক। বললো মতি।
— আমিও কিন্তু ভাবিনি তার কাছ থেকে ঠিক এতটা সহযোগিতা পাবো। সত্যি পৃথিবীতে মানুষ চেনা দায়; জবাব দিলাম।

আরো কয়েকটি বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর মতি চলে গেল।

লেফটেন্যান্ট সুমি ফিরে যাচ্ছে লাহোর। ভাবলাম ওর কাছ থেকেই চেয়ে নেব **Compass** এবং **Binocular.** যাবার আগের দিন বিদায় নিতে এসেছে সুমি। টকটকে ফরসা **Well Build** সুদর্শন যুবক সুমি। সব সময় মিষ্টি হাসি মুখে লেগেই আছে। সেদিন তাকে খুব মলিন দেখাচ্ছিল।

— সুমি খারাপ লাগছে লাহোর ফিরে যেতে তাই না? জিজ্ঞেস করলাম।
— ঠিক বলেছেন স্যার। আপনাদের সাথে বেশ কেটে যাচ্ছিল সময়গুলো হেসে খেলে। আপনাদের ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চাচ্ছে না। কিন্তু এর বিকল্পওতো কিছু নেই! যেতে তো হবেই। আপনার কথা কখনও ভুলতে পারব না স্যার। আপনি না থাকলে **Life out here would have been hell and most boring.**
— সুমি আজ তোমাকে একটা অনুরোধ করবো, রক্ষা না করতে পারলে কথা দাও এ ব্যাপারে তুমি কাউকে কিছুই বলবে না।
— কি এমন কথা স্যার, যার জন্য এমনিভাবে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন?

সুমির কথায় আন্তরিকতা ফুটে উঠলো। ওকে বিশ্বাস করা চলে।

— আমি পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেব ঠিক করেছি। রাজস্থান বর্ডার দিয়ে ক্রস্ করবো। তোমার **Compass** এবং **Binocular** টা পেলে সুবিধে হয়।
— **Fantastic, great idea.** আমি নিশ্চয়ই দেব **Compass** এবং **Binocular.** কিন্তু আমাকে কি সঙ্গে নিতে পারেন না স্যার? আকুতি ঝড়ে পড়ল ওর অনুরোধে। **I beg of you Sir, please take me along.** আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।
— **Well Shumi thanks a lot. I shall remain ever grateful for your help.** কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নেবার ব্যাপারে ঠিক এই মুহূর্তে কোন জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। **I hope you wouldn't mind.** আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে।
— **That's fine Sir. Do take your time. But be sure, even if you decide not to take me along for some reason you will get the things which you have asked for.** আমিও কিছুই মনে করবো না। উঠি আজ তাহলে?
— না না সে কি করে সম্ভব! লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, লাঞ্চ করে যাবে তুমি।

বলেই খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলাম বেয়ারাকে ডেকে। খাওয়ার পর সুমি যাবার জন্য বিদায় চাইল। আমি বললাম,

— সন্ধ্যায় মেসে থেকো, আমি আসবো। সম্মতি জানিয়ে চলে গেল সুমি।

সুমি চলে যাবার পর আমিও বেরিয়ে পরলাম। মতি ও নূরকে সঙ্গে করে সোজা ক্যাপ্টেন তাহরের ওখানে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো সুমিকেও সঙ্গে নেয়া হবে। সন্ধ্যার একটু আগেই সুমির ওখানে গিয়ে হাজির হলাম আমি একাই। প্ল্যানিং এই স্টেজে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যই **Strict compartmentation** মেনে চলা হচ্ছিল। **Need to know basis**-এ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলাম আমরা অতি সতর্কতার সাথে। সুমি আমার অপেক্ষা করছিল। ঘরে ঢুকে দেখি ওর ব্যাটম্যান সবকিছু গোজগাছ করছে। যাত্রার প্রস্তুতি।

— Let's have Chinese.

বলেই গাড়িতে সুমিকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেলাম China Café-তে। খাবার ফাঁকে ফাঁকে আলাপ হচ্ছিল।

— Sir, you said Rjasthan is the sector, is that correct? সুমি জানতে চাইলো।

— That's right. জবাব দিলাম।

— তাহলে আপনার সাথেতো আমার যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। আপনিতো জানেন, I am allergic to sand. বালির স্পর্শে আমার সমস্ত গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যায়। তা এর জন্য আপনার কোন অসুবিধা হোক সেটা আমি চাইনা, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি I shall stay back. সত্যিইতো এ কথাটা গতকাল আমাদের খেয়ালেই আসেনি।

— I don't want to be a liability. এতে আপনার বিপদও হতে পারে। আমার জন্য আপনার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হউক সেটা আমি চাই না। ছল ছল চোখে কথাগুলো বলছিলো সুমি।

আমি ওর হাত ধরে ওকে সান্তনা দিয়ে বললাম,

— Don't feel so bad. আমার সাথে মরুপথে যেতে পারছ না তাতে কি হয়েছে? That's not the end of the world. এখান থেকে যাবার পর লাহোরের কসুর কিংবা ওয়াগা বর্ডার দিয়েতো তুমি পালাবার চেষ্টা করতে পারবে।

আমার কথায় সুমির চোখ উজ্বল হয়ে উঠলো।

— তাইতো লাহোর থেকেই ক্রস্ করাটা সহজ হবে আমার জন্য। I promise you Sir, লাহোর পৌঁছেই পালাবার চেষ্টা করবো যে করেই হোক না কেন।

— নিশ্চয়ই করবে। আমি পরম করুনাময়ের কাছে দোয়া করবো যাতে তুমি তোমার প্রচেষ্টায় সফল হও।

দু'জনে ফিরে এলাম সুমির মেসে। সমস্ত মেসটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম।

— সুমি Thanks a lot once again for all that you have done for me. আমার জন্য দোয়া করো। বেচেঁ থাকলে স্বাধীন বাংলাদেশে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্। Otherwise good luck and good bye my friend.

আবেগ এবং বিচ্ছেদের অনুভূতি সব মিলিয়ে চোখে পানি এসে গিয়েছিল নিজের অজান্তেই। সুমি ধরা গলায় বিদায় জানালো,

— খোদা হাফেজ, Take care Sir may Allah be with you.

সুমির দিকে আর চাইতে পারলাম না। দ্রুতপায়ে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বসলাম। ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়ে ঝড়ের বেগে গেইট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিয়ার-ভিউ মিরর এ দেখলাম সুমি তখনও পোর্চে দাড়িয়ে হাত নাড়ছে।

এ পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকমতই এগুচ্ছিল। হঠাৎ করে ঘটলো প্রথম বিপর্যয়। আকস্মিকভাবে ক্যাপ্টেন তাহেরের বদলির অর্ডার এসে গেল। এবোটাবাদে বেলুচ সেন্টারে তার পোষ্টিং হয়েছে। অবিলম্বে তাকে যোগদান করতে হবে। খবরটা পেয়েই মতি, নূর এবং আমি ছুটে গেলাম তার কাছে। মেসে গিয়ে পৌঁছাতেই তিনি জানালেন কালই তাকে By Air চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একি বিভ্রাট! কি করবো এখন আমরা? জবাবে ক্যাপ্টেন তাহের বললেন,

— It's OK. এ অবস্থয় তোমাদের সাথে আমার যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। But so what? আমি এবোটাবাদ থেকে পালাবার চেষ্টা করবো। তোমরা তোমাদের প্ল্যান অনুযায়ী এগিয়ে যাও।

তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Plan execute করতে হবে। বুঝতে পারলাম পোষ্টিং অর্ডার একবার যখন আসা শুরু হয়েছে তখন যেকোন সময় মতি ও নূরের কিংবা আমার পোষ্টিং অর্ডারও এসে পরতে পারে। একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে। পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন তাহেরকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম। আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব

ক্যাপ্টেন তাহের! তরুণ চৌকশ কমান্ডো অফিসার। সবেমাত্র রেঞ্জারস্ কোর্স শেষে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। ফেরার পরপরই **Detailed** হয়ে কোয়েটাতে এসেছিলেন **Senior Tactical Course** করতে। স্বল্পভাষী, অসীম সাহসী, তেজদীপ্ত চেহারা, অস্বাভাবিক মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী যুবক ক্যাপ্টেন তাহের দেশপ্রেমের এক দুর্লভ নিদর্শন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের মন জয় করে ফেলেছিলেন তিনি। অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিলাম আমরা। পাকিস্তান থেকে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মতি, নূর এবং আমিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছিলাম। দ্বিতীয় ব্যাচে এসেছিলেন মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন তাহের। তারা এসেছিলেন শিয়ালকোট সেক্টর দিয়ে। আমরা একসাথে যুদ্ধ করেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। স্বাধীনতার সংগ্রামকালে এবং পরবর্তিকালে বাংলাদেশের গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরের নিঃস্বার্থ অবদান এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস সর্বজন বিধিত। কিংবদন্তির নায়ক কর্নেল তাহেরের আত্মগাঁথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করবে বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের দেশপ্রেমিকরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তার নাম। কোন অপচেষ্টাই শহীদ তাহেরের স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারবে না বাংলার মাটিতে। কর্নেল তাহের মরেও অমর হয়ে আছেন; আর থাকবেনও চিরদিন।

ক্যাপ্টেন তাহেরের হঠাৎ বদলিতে ভেঙ্গে পড়লেও আমরা নিজেদের সামলে নিলাম। তার চলে যাবার পর পুরোদমে আমরা আমাদের পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নিয়ে চললাম। সুমির পিস্তলটা পাওয়ায় আমাদের সুবিধা হলো। আমার ব্যক্তিগত হাতিয়ারের মধ্যে রয়েছে একটা পিস্তল আর একটা রিভলবার। সুমির পিস্তলটা আমাদের হাতিয়ারের সমস্যার সমাধান করে দিল। ক্রমান্বয়ে আমাদের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে আমাদের ১৬ ডিভিশনের ইউনিটগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। যে সমস্ত ইউনিটগুলো পাঠানো হচ্ছে সেগুলো থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে বাঙ্গালী সদস্যদের। এ থেকে ধরে নিলাম খুব শীঘ্রই আমার পোষ্টিং অর্ডার এসে যাবে। আমার ইউনিটে আমরা মাত্র দু'জন বাঙ্গালী। হলোও তাই। প্রায় একই সময়ে নূর এবং আমার পোষ্টিং অর্ডার এসে গেল। আমাকে যেতে হবে খারিয়ায় আর নূরকে যেতে হবে কোহাট। একই সময়ে পোষ্টিং অর্ডার পাওয়ায় দু'জনেই খুশী হলাম। এতে আমাদের **Movement co-ordinate** করতে সুবিধে হবে। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে পোষ্টিং অর্ডার পেয়ে নতুন জায়গায় যাবার পথেই কেটে পড়বো আমরা। এতে করে খুব সহজেই সপ্তাহখানেকের জয়েনিং টাইম কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল মতিকে নিয়ে। যেকোন কারণেই হোক না কেন ওর পোষ্টিং অর্ডার আসতে দেরী হচ্ছিল। ঠিক হল কিছু একটা করা দরকার। স্কুলে আটকে পরা সব বাঙ্গালীরাই প্রায় চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটে। হঠাৎ মতির মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ও সরাসরি পিন্ডিতে **MS Branch** এর সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাইলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের পোষ্টিং ইনচার্য কে? ভাগ্যক্রমে জানা গেল ঐ বিভাগের দায়িত্বে যে কর্নেল সাহেব রয়েছেন তিনি মতির পূর্ব পরিচিত। কর্নেল সাহেব মতির এক স্কুল-মেটের বাবা। পরিচয় জানার পর মতি আবদার করে বসলো,

— আংকেল, স্কুলের আটকে পরা সবারই পোষ্টিং হয়ে গেছে শুধু আমিই পড়ে রয়েছি। আমার একটা গতি করুন। একাকিত্বের যন্ত্রনা আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। **Please Uncle, you got to do something for me as soon as possible.**

জবাবে কর্নেল বললেন,

— তুমি চিন্তা করোনা, আজই আমি তোমার পোষ্টিং অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। **6 East Bengal Regiment** পেশাওয়ার এ যাবার জন্য তুমি প্রস্তুত হও।

মতি কর্নেল সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, সম্ভব হলে পেশাওয়ার যাবার পথে মুলতান হয়ে যাবার চেষ্টা করবে ও। উদ্দেশ্য কর্নেল সাহেবের পরিবারের সবার সাথে দেখা করে যাওয়া। পুরো পরিবারের সাথেই মতি পূর্ব পরিচিত। কথা শেষে মতি আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে উঠলো,

— It is all done Sir. Well done indeed, it's really great.
কর্নেল আংকেল এর কথা মত পরদিনই মতি তার পোষ্টিং অর্ডার হাতে পেলো। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

গেইমস্ থেকে ফিরে এক্সারসাইজ করছিলাম মেসে। মতি ও নূর এলো। দু'জনেই খুব রিলাক্সড। এক্সারসাইজ শেষ করে ফ্রেস হয়ে তিনজনেই গিয়ে বসলাম লনে। ঠিক করা হলো, নূর রওনা হবে ট্রেনে করে কোহাটের পথে। কিন্তু পথিমধ্যে ভাওয়ালপুরে নেমে যাবে নূর। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থান নেবে নূর। মতি ও আমি ওর যাত্রার পরদিন ভাওয়ালপুরে তার সাথে মিলিত হবো। মতি এবং আমি কিভাবে যাবো সে ব্যাপারে কিছুই আলাপ হলো না। আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী কেউ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলো না। আলাপ শেষে ক্লাবে চলে গেলাম "তাম্বোলা-নাইট" অ্যাটেন্ড করার জন্য।

আমাকে কমান্ডিং অফিসার নির্দেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোছগাছ করে খারিয়া চলে যেতে। স্বাভাবিকভাবে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম গোছগাছ নিয়ে। সমস্ত মালপত্র ব্যাটম্যানকে দিয়ে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিলাম খারিয়ায়। **CO**-কে বললাম ট্রেনে না গিয়ে **By Air** লাহোর হয়ে যাবো আমি। **Transit Period**-টা লাহোরে আমোদ-ফূর্তি করে কাটিয়ে দিয়ে খারিয়াতে চলে যাবো আমি। সমস্যা দেখা দিল সদ্য কেনা গাড়িটা নিয়ে। নতুন গাড়ি শখ করে কেনা তাই বেচে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এতে লোকজনের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। তাই ঠিক করলাম আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুকে দিয়ে যাবো গাড়িটা। এজাজ লাহোরের ছেলে। ওর পরিবারের সাথেও আমার ঘনিষ্টতা রয়েছে। আমাকেও তারা পরিবারের একজন হিসাবেই মনে করে। এজাজকে একদিন বললাম,

— এজাজ আমি **By Air** লাহোর হয়ে যাচ্ছি। তুই আমার গাড়িটা রেখে দে। সুবিধামতো লাহোর পাঠিয়ে দিস। আমি পরে এক ফাঁকে খারিয়া থেকে লাহোর গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসবো।

এজাজ আমার প্রস্তাবে খুশী হয়েই রাজি হলো এবং বললো,
— **Don't you ever think about it. I shall manage everything. You just go and have fun at Lahore. By the way when are you planning to leave?**
— **Tentatively around mid April.**
জবাব দিয়েছিলাম আমি। এভাবেই গাড়ির ঝামেলারও সুরাহা হল।

এরই মধ্যে ঘটলো চরম অঘটন। একদিন গেমস এর পর স্কুলের মেসে এ্যান্টিরুমে বসেছিল নূর। কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারও বসেছিল সেখানে। কথায় কথায় এক সময় বাঙ্গালী জাতি এবং শেখ মুজিব সম্পর্কে কটুক্তি করে নূরকে চটাবার চেষ্টা করছিল। ওদের একজন নূরকে উদ্দেশ্য করে বললো,
— নূর তেরাতো কিসমত খুল গিয়ারে। শেখ মুজিব আভি তুঝে একদমসে জেনারেল বানা দেগা, **Bastard Mujib is a traitor don't you think so?** সারে বাঙ্গালী কওম হিন্দু হ্যায়।
উসকানিমূলক এধরণের বক্তব্যে নূর ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওদের কথার জবাবে গর্জে উঠে,
— **If Mujib is a Gaddar then Yahia is a rogue. He is killing thousands of Bengalees, he has let loose the forces to rape and dishonour our mothers and sisters. Therefore, he is a bigger Bastard.**

এ ধরণের কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি নূর। রাগের চোটে সামনের ষ্ট্যান্ডে রাখা প্রেসিডেন্টে ইয়াহিয়া খানের ছবি তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে গটগট করে হেটে বেড়িয়ে যায় নূর। প্রেসিডেন্টের ছবি পা দিয়ে মারিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার গুরু অপরাধে তক্ষুণি তার বিরুদ্ধে **Open Arrest** এর আদেশ জারি করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। শুরু হয়ে যায় কোর্ট মার্শাল প্রসিডিংস্।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমার ও মতির মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। হতভম্ব হয়ে যাই আমরা। খবর পেয়েই ছুটে গেলাম ওর কাছে।

— একি করলে নূর? ক্ষণিকের উত্তেজনার বসে সবকিছু ভন্ডুল করে দিলে কি করে? তোমার এ ধরণের হঠকারি কার্যকলাপের পরিণামে আমরাও বিপদে পড়তে পারি। তোমার সাথে আমাদের হৃদ্যতার কথা সবাই জানে। **How could you be so stupid to do a thing like that. Shame on you.** এ ধরণের কাজ তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। হঠাৎ করেই ওর উপর ভীষণ রাগ হল।
— **I am sorry Sir. I was totally out of my head.** যা ঘটেছে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং অনুতপ্ত, এখন আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা না করে প্ল্যানমত আপনারা চলে যাবার ব্যবস্থা করেন যত শীঘ্র সম্ভব। **Summery Of Evidence** শুরু হলে আপনাদের ডাক পরা অসম্ভব কিছু নয়, কেসে জড়িয়ে পরার আগেই পালিয়ে যেতে হবে আপনাদের। আমার যা হবার তা হবে। কিন্তু আপনারা ফেঁসে পড়লে আর যাওয়ার সুযোগ হবে না। তাই আমার আন্তরিক অনুরোধ **Please leave me alone to my fate and just think to escape as quickly as possible.** আপনাদের কিছু হলে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। ছেলে-মানুষের মতই ডুকরে কেঁদে উঠলো নূর।

ওকে সান্তনা দেবার ভাষা খুজে না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম। হঠাৎ করে কি থেকে কি হয়ে গেল এখন আমাদের কি করা উচিত; ভেবে কোন কূলকিনারাই পাচ্ছিলাম না। নূরের ভবিষ্যত ভেবে শংকিত হয়ে পড়লাম। বেচারা নূর! অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক করলাম মতি এবং আমি ১৬ই এপ্রিল আমাদের যাত্রা শুরু করবো। তখনকার দিনে করাচি থেকে একটি ফ্লাইট কোয়েটা, মুলতান হয়ে লাহোর যেত প্রতিদিন। ১৬ তারিখের ঐ ফ্লাইটেই রওনা হব আমি লাহোরের পথে। মতি স্কুল এ্যাডজুটেন্টকে জানিয়ে দিয়েছে ট্রেনে না গিয়ে ও **By Air Travel** করবে। পথিমধ্যে মুলতানে কয়েকদিন কর্নেল সাহেবের পরিবারের সাথে কাটিয়ে চলে যাবে পেশাওয়ার। **MS Branch** এর কর্নেল সাহেবের নাম শুনে অতি স্বাভাবিকভাবেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল স্কুলের এ্যাডজুটেন্ট. একই ফ্লাইটে আমাদের সিট বুক করলাম। **Open Arrest** এ থাকার ফলে আমরা নূরের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারছিলাম। **Closed Arrest** হলে ওর সাথে কোন যোগাযোগ রাখা সম্ভব হতো না। নূর বন্দী হওয়ার পর থেকেই মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলাম। ওকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। ঘুরে ফিরে শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছিল, কোন মতেই কি নূরকে উদ্ধার করে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না? অনেক চিন্তা ভাবনার পর একটা উপায় আমার মাথায় এলো। ১৫ তারিখ সকালে গিয়ে উপস্থিত হলাম মতির মেসে। গিয়ে দেখি মতির ঘর একদম খালি। বুঝলাম মতি তার মালপত্র ব্যাটম্যানের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। বাথরুমে গোসল করছিল মতি। অল্পক্ষণ পরই মতি বেরিয়ে এলো,
— কি ব্যাপার স্যার, এতো সকালে আপনি?
— একটা বিশেষ ব্যাপারে আলাপ করতে এলাম। মতি তুমি ভালো করেই জানো নূরের বন্দী হওয়ার পর থেকেই আমি ভীষণভাবে মানসিক অশান্তিতে ভুগছি। সর্বক্ষণ ওকে নিয়েই ভাবছি। বললাম আমি।
— নূরের বিষয়েই কিছু কি?
আমার মানসিক অবস্থা আচঁ করেই বোধহয় প্রশ্নটা করলো মতি।
— হ্যা তাই, নূরকে সঙ্গে নেবার একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়....।
আমাকে শেষ করতে না দিয়েই মতি বলে উঠলো,
— **Are you mad Sir?** বন্দী অবস্থা থেকে তাকে নিয়ে যাবার কথা কি করে ভাবলেন? ওকে সঙ্গে নিলে আমরা ধরা পরতে বাধ্য।
— আহা আগে শোনই না আমার আইডিয়াটা। মতিকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

— বেশ বলেন কি বলতে চান।

— দেখো মতি, নূরই প্রথম আমার কাছে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মানছি হঠাৎ করে ও একটা ভুল করে ফেলেছে। মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। তাছাড়া ওর ভবিষ্যতটা একটু ভেবে দেখ। এ অবস্থায় ওকে অসহায় একা ফেলে রেখে যেতে বিবেকে বাধছে, ওকে ফেলে রেখে যাওয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না মতি।

— But then how? প্রশ্ন মতির।

— শোন মন দিয়ে। আমি ওর জন্য ৩ দিনের Attend ‘C’ (Sick in quarters) যোগাড় করে আজই ওকে রওয়ানা করিয়ে দিতে চাই ভাওয়ালপুরের উদ্দেশ্যে। ওখানে পৌঁছে সে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ওকে কিছুই বলা হবে না। শুধু এতটুকুই বলা হবে আগামীকাল ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে ওর সাথে নির্ধারিত সময়ে আমাদের দেখা হবে। সময় দুপুর ২-৩টার মধ্যে। That’s all. এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে ও যদি যেতে রাজি হয় তবে Let’s take him. If at-all something goes wrong with him on his way even then we would be safe, as he wouldn’t be in a position to reveal anything about our rout or the next step and thus our secret will not be compromised. What do you say?

— ঠিক আছে, বুঝলাম আপনার প্লানে যুক্তি আছে। কিন্তু Attend ‘C’ কি করে যোগাড় করবেন? প্রশ্ন মতির।

— First of all tell me do you agree or not to take him with us on principle?

— Well it is still risky but I shall buy it.

জবাবে বললো মতি। আনন্দে মতিকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

— Thanks, you are really great Moti. Now come-along and see what I do.

গাড়ি করে ছুটে গেলাম CMH এ ষ্টাফ সার্জেন ক্যাপ্টেন জামালের কাছে। আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়তেন জামাল। ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে পরিচয় হয় আমাদের সেই পরিচয় আর্মিতে যোগদানের পর আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠে। বয়সে ক্যাপটেন জামাল আমার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও আমরা একে অপরকে তুমি বলে সম্বোধন করতাম। CMH এর Out Patient এ গিয়ে দেখি জামাল রুগী দেখায় খুবই ব্যস্ত। এক ফাঁকে এগিয়ে এসে বললো,

— কি বন্ধু হাসপাতালে কেন? বস কিছুক্ষণ একটু হালকা হইয়া লই।

জবাবে বললাম,

— না দোস্ত, বসনের সময় নাই খুব একটা জরুরী কামে আইছি।

— কও তইলে।

মতিকে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম,

— কাইল যাইতাছি, দেখা না কইরা গেলেতো আমারে কাইট্টা ফেলাইতা তাই খোদা হাফেজ কইতে আইলাম। কিন্তু দোস্ত যাওনের আগে একটা শেষ আবদার লইয়া আইছি। নূরের লাইগা ৩ দিনের Attend ‘C’ লেইখা দাও। বেচারার মন-মেজাজ খুবই খারাপ।

নূরের ঘটনা কোয়েটার সব বাঙ্গালীর মনেই সমবেদনার উদ্রেক করেছিল। অনেকেই ওর প্রতি ছিল Sympathetic ক্যাপ্টেন জামাল ছিল তাদেরই একজন। মুহূর্তে নির্দ্বিধায় এর একটা চিট প্যাডে লিখে সেটা আমার হাতে দিয়ে জামাল বললো,

— এরই মধ্যে একদিন সময় কইরা যামুনে দেখতে কইও তারে। পোলাডা খামাখা নিজেরে কি বিপদেই না ফেলাইছে আল্লাহই জানেন, Young blood খুনকা গরমি বুঝলা বন্ধু। অনেকটা আফসোস করেই কথাগুলো বলেছিল জামাল।

— ঠিক কইছো দোস্ত। এখন তাইলে যাই, ভাবীরে বুঝাইয়া কইও সময়ের অভাবে দেখা করতে পারলাম না। বুঝতেই পারো কি তাড়াহুড়ার মইধ্যে আছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিকেল ৩:৩০ মিনিটে 'বোলান এক্সপ্রেস্' এ তুলে দিতে হবে নূরকে। লাঞ্চ সেরে মতি ও আমি সোজা চলে গেলাম নূরের মেসে। গিয়ে দেখি নূর লুঙ্গি পরে খালি গায়ে শুয়ে আছে।

— **Get up you lazy bum!**

আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে লুঙ্গি বাধতে বাধতে উঠে বসলো নূর।

— বিনা প্রশ্নে আমার কথা মেনে নিতে রাজি থাকলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারি। বলো রাজি।

আমার কথা বলার ধরণে প্রথমে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিল নূর। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,

— কিন্তু............।

— কোন কিন্তু নয়। সময় নষ্ট না করে বলো রাজি। দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞেস করলাম আবার।

— রাজি। জবাব দিল নূর।

— বেশ এবার শোন মনযোগ দিয়ে- **You have 3days Attend 'C', means complete bed rest OK? Send this Chit to the Adjutant through your Batman then give him Chutti for 3days. Call him now and do as I said.**

নূর তক্ষুণি তার ব্যাটম্যানকে ডেকে তাকে নির্দেশ দিল চিট টা **Adjutant** এর কাছে পৌঁছে দিয়ে ছুটিতে বাড়ি চলে যাবার জন্য। অপ্রত্যাশিতভাবে একসাথে ৩ দিনের ছুটি পেয়ে ব্যাটার বত্রিশ দাঁত আর বন্ধই হচ্ছিল না। খুশীর ঠেলায় গদগদ হয়ে লম্বা একটা সেল্যুট মেরে ছুটে চলে গেল হুকুম তামিল করতে।

— বেশ এবার শোন মনযোগ দিয়ে- **You have 3days Attend 'C', means complete bed rest OK? Send this Chit to the Adjutant through your Batman then give him Chutti for 3days. Call him now and do as I said.**

— এবার কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও। একটা হ্যান্ডব্যাগে দুই প্রস্ত **Extra Change** ভরে নাও জলদি। তোমাকে বোলান এক্সপ্রেস ধরতে হবে। লাহোর পর্যন্ত টিকিট থাকবে কিন্তু ভাওয়ালপুরে নেমে যাবে তুমি। সেখানে সার্কিট হাউজে অবস্থান নেবে তুমি। আগামীকাল দুপুর ২ থেকে ৩টার মধ্যে ভাওয়ালপুর ষ্টেশনে আমরা মিলিত হবো ইনশাল্লাহ্। ভাওয়ালপুর পৌঁছে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। সেখান থেকে ভাওয়ালনগর যাবার উপায় কি কি এবং কোন উপায়ে কতটুকু সময় লাগবে সেটা জেনে রাখতে হবে তোমাকে। **All the way you will behave like an army officer travelling to your place of posting at Bhawal Nagar. Am I clear?**

— **Yes Sir.**

বলেই ছোট একটা হ্যান্ডব্যাগে অতি প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে নূর তৈরি হয়ে নিল। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমরা ছুটলাম রেলওয়ে ষ্টেশন। বোলান এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে ছিল। একটা ফার্ষ্টক্লাশ ক্যুপেতে নূরের জন্য একটা সিট রির্জাভ করা হলো। নির্দিষ্ট কামরায় উঠে বসলাম আমরা। পকেট থেকে ৫হাজার টাকা, একটা পিস্তল এবং ২৫টা গুলি নূরের হাতে তুলে দিলাম। কোন কথা না বলে সেগুলো ব্যাগে ভরে রাখলো নূর। কিছুক্ষণ পর গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা এবং হুইসেল দু'টোই বেজে উঠলো। নূরকে জড়িয়ে ধরে বললাম,

— **Take care, see you tomorrow.** খোদা হাফেজ।

গাড়ি নড়ে উঠলো। আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। তীব্র হুইসেল বাজাতে বাজাতে বোলান এক্সপ্রেস ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমরাও ফিরে এলাম।

আজ রাতে **Div Arty** এর তরফ থেকে আমার **Farewell dinner.** তাই মতিকে মেসে নামিয়ে দিয়ে ফেরার সময় বললাম, "কাল এয়ারর্পোটে দেখা হবে।"

মেসে সে রাতে **Div Arty**-র ব্যান্ড এর সাথে অনেক রাতঅব্দি পানাহার চললো। ব্যান্ডের তালে তালে নাচগানও হলো রেওয়াজ অনুযায়ী। বেশ কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করছিলাম সারাদিনের ব্যস্ততায়। তার উপর মাথায় রয়েছে নূরের ব্যাপারে টেনশন। কিন্তু কিছুই করার নেই। সব

চিন্তা মনে চেপে রেখে স্বাভাবিকভাবেই সব Formalities শেষ করে অনেক রাতে ফিরে এলাম নিজের কামরায়। সেদিন হঠাৎ করে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় বেশ একটু ঠান্ডা পরেছে। তাই বেয়ারা ঘরের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সঙ্গে নেবার জিনিসপত্র আগেই গোছগাছ করে রাখা হয়েছে। টেবিলের উপর রাখা আমার সবচেয়ে প্রিয় ফটো এলবাম দু'টো। সাথেই আখরোটের সুক্ষ্মকাজ করা লেটার বক্সে রাখা আছে নিম্মীর লেখা চিঠিগুলো। বেড-সাইড টেবিলের উপর ফটো ষ্ট্যান্ডে রাখা নিম্মীর ছবিটাকে ভীষণ জীবন্ত লাগছে। মনে হচ্ছে ও যেন গভীর দৃষ্টিতে আমাকে পরখ করে দেখছে। এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কোন সূত্র রাখা চলবে না। এতে করে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ফায়ার-প্লেসের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পোড়াবার আগে শেষবারের মত এলবামের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। প্রতিটি ছবির সাথে জড়িয়ে আছে একেকটা স্মৃতি। ফটো দেখা শেষ হলে এলবাম দু'টো ছুঁড়ে দিলাম ফায়ার-প্লেসে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। চিঠিগুলোও ফেলে দিলাম সেই আগুনে। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিল সব। কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সযত্নে তুলে রাখা এতদিনের অমূল্য সম্পদগুলোকে এভাবে বিসর্জন দিতে হবে সেটা কখনো ভাবিনি। আগুনের দিকে চেয়েছিলাম। দু'চোখ বেয়ে নিজের অজান্তেই পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অতীতের স্মৃতিতে তলিয়ে গেলাম আমি। মনে পরে গেল নিম্মীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা।

রিয়াজুল ইসলাম চৌধুরী (বাপ্পি)-র বোন নিম্মী। বাপ্পি আমার ঘনিষ্টতম বন্ধুর একজন। আমি, স্বপন, টুটু, হায়দার, বাপ্পি একে অপরের হরিহর আত্মা। ছুটিতে ঢাকায় এলে ২৪ ঘন্টা একসাথে থাকা, খাওয়া, হৈ হুল্লর করে সময় কাটে আমাদের। কখনো সিনেমা, কখনো পিকনিক নয়তো শিকার এভাবেই আনন্দে কেটে যায় আমাদের সময় ঝড়ের বেগে। এসব কিছু ভালো না লাগলে চলে যাই সিলেটের চা বাগানে, কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি কিংবা কক্সবাজার-টেকনাফ। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ছুটিতে ঢাকায় এসেছি। হৈচৈ করে কেটে যাচ্ছিল সময়। একদিন হায়দার খবর নিয়ে এলো যমুনার চরে মৌসুমী পাখির আগমন ঘটেছে প্রচুর তাই শিকারে যেতে হবে। শিকারের প্রতি একটা অদ্ভুত নেশা ছিল হায়দারের। সেদিন রাতেই দল বেধে শিকারে বেরিয়ে পরলাম। আরিচা ঘাট পর্যন্ত গাড়িতে তারপর নৌকা যাত্রা। মধ্যরাতের পর খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকায় উঠলাম। পরদিন দুপুর পর্যন্ত শিকার করে শেষ বিকেলে ফিরে এলাম। শিকার ভালোই পাওয়া গেছে। ১টা রাজহাস, ৪টা চখা এবং ২০টা বালিহাস। শীতকালে মৌসুমী পাখি সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসে বাংলাদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে। গরমের শুরুতেই আবার উড়ে ফিরে যায় তুন্দ্রা অঞ্চলে। পাসপোর্ট কিংবা ইমিগ্রেশনের ঝামেলা নেই তাদের। যখন যেখনে খুশি উড়ে চলে যায় ওরা। শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকেই বৈষয়িক স্বার্থে এই স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। বাসায় ফিরতেই আমার ছোট দুই বোন মহুয়া ও কেয়া বায়না ধরে বসলো, বৃটিশ কাউন্সিলে একটা ফাংশন হচ্ছে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। সারা দিন রাত শিকারের ধকলে সবাই ক্লান্ত। কেউই ওদের নিয়ে যেতে রাজি হলো না। ক্লান্ত থাকা সত্বেও আমি ওদের মানা করতে পারলাম না। অনেক কষ্টে বাপ্পিকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজি করালাম। যখন বৃটিশ কাউন্সিলে পৌঁছলাম তখন রাত ৯টার উপর। বারান্দায় কয়েকটি মেয়ে দাড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। ফাংশন অথচ লোকজনের ভীড় নেই একদম। গাড়ি পোর্চের নিচে দাড় করাতেই মহুয়া কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এই নিম্মী এদিকে এসো।"

নিম্মীটি আবার কে! দেখলাম একটি মেয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো।

"কি এত ফাঁকা কেন? প্রশ্ন করলো মহুয়া।"

"ফাংশন শেষ। জানালো মেয়েটা।" বাপ্পি ওকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, "তুমি এখনও এখানে কি করছো?"

"রিক্সা পাচ্ছি না। জবাব দিল মেয়েটা।" মহুয়াই পরিচয় করিয়ে দিল, "ভাইয়া, নিম্মী বাপ্পি ভাইয়ার বোন আমাদের হলিক্রসে পড়ে।" বাপ্পিদের বাসায় যাওয়া আসা থাকলেও নিম্মীর সাথে আগে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

“চলো না ভাইয়া নিম্মীকে নামিয়ে দিয়ে আসি ফাংশন যখন আর দেখাই হলো না।” মহুয়া অনুরোধ জানালো।
“বেশ চল।” নিম্মীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাপ্পিদের বাসার দিকে রওনা হলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্নের একহারা গড়নের নিম্মী কেয়া-মহুয়ার সাথে পেছনের সিটে বসেছে। বাপ্পি আমার পাশের সিটে। রিয়ার ভিউ মিরর এ নিম্মীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, সুন্দর ফিগারের অধিকারিণী নিম্মী দেখতে আকর্ষনীয় এবং মিষ্টি। সবচেয়ে আকর্ষনীয় তার চুল। ঘনকালো চুলের একটা অসাধারন মোটা বেনী হাটু ছাড়িয়ে প্রায় গোড়ালির কাছ অব্দি ঝুলছে। হালফ্যাশানে বাঙ্গালী মেয়েদের মাঝে এ ধরনের ঘনকালো লম্বা চুল খুব একটা দেখা যায় না। গাড়ো নীল রং এর বুটিদার কামিজ ও চুড়িদার পায়জামা পরেছিল নিম্মী। কথা বলার ধরণও ভীষণ আন্তরিক। সবকিছু মিলিয়ে প্রাণবন্ত উচ্ছল প্রকৃতির নিম্মীকে প্রথম দেখাতেই ভালো লাগলো। সেই ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা। আশ্চর্য হয়েছিলাম নিজেই। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি জীবনে শুধুমাত্র লেখাপড়ার জন্যই নয় বিভিন্ন কারণে বেশ নাম ডাক ছিল বরাবরই। একনামে পরিচিত ছিলাম বিভিন্ন মহলে। মেয়েদের সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগও হয়েছে ছোটকাল থেকেই। কিন্তু প্রেম-ট্রেমের ধার ধারিনি কখনো। দু’একটা প্রেমপত্র গল্পের বই আদান-প্রদানের মাধ্যমে হাতে এসে পৌঁছায়নি তাও নয়। কিন্তু সেগুলো মনে তেমন একটা দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। ঘটনাগুলো নেহায়েত নেকামী বলেই মনে হয়েছে সবসময়। অবশ্য পছন্দ না হলেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অনেক বন্ধু-বান্ধবকেই নানাভাবে সাহায্য করতে হয়েছে এ পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে। ছাত্র রাজনীতি, খেলা-ধুলা, গান-বাজনা, নাটক, সমাজসেবা ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকাটাই ছিল আমার নেশা। তাই মেয়েদের ব্যাপারে ধ্যান দেবার সময় ছিল না মোটেও। কাউকে দেখে তেমনভাবে আকর্ষণও বোধ করিনি কখনো। সেই আমিই কিনা প্রথম দেখার ভলোলাগা থেকে একেবারে ভালোবেসেই ফেল্লাম নিম্মীকে! এমনটিই বোধহয় হয়। যাকে ভালোলাগে তাকে প্রথম দেখাতেই ভালোলাগে। প্রথমে নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হয়তোবা ক্ষণিকের মোহ; কিন্তু না এতো মোহ নয়। এরপর যতই দিন গেছে নিম্মীর প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে আমার। গভীর হয়েছে আমার ভালোবাসা। এক অদ্ভুত অনুভূতি! প্রতিদানে নিম্মীও সবটুকু মন উজাড় করে ভালোবেসেছে আমাকে। তার পবিত্র, আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার গহীন অতলে তলিয়ে গেছি আমি। নিম্মী তার প্রথম যৌবনের কুমারী মনের সবটুকু মাধুর্য্য বিলিয়ে দিয়ে একান্ত বিশ্বাসে আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল তার ভালোবাসার মানুষ হিসাবে। আমি স্থান পেয়েছিলাম তার মনের মণিকোঠায়। আমি ধন্য হয়েছি তার ভালোবাসা পেয়ে। আমাদের ভালোবাসাকে সানন্দেই গ্রহণ করে নিয়েছেন দুই পরিবারের সবাই বিশেষ করে গুরুজনরা। খুশী হয়েছে বন্ধু-বান্ধবরা। এবার ছুটি থেকে ফেরার আগে আমাদের বিয়ের ব্যাপারেও সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ বছরের শেষাশেষি কিংবা আগামী বছরের প্রথম দিকে আমাদের বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই দৈবচক্রে সবকিছুই ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ভবিষ্যত হয়ে উঠল অনিশ্চিত। ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর কোন চিঠিপত্র পাইনি ওর কাছ থেকে। জানিনা ঠিক এই মুহূর্তে ও কোথায়, কি অবস্থায় আছে! নিম্মীর বাবা জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৬৯ সাল থেকে কোলকাতায় পাকিস্তান দূতাবাসে কূটনৈতিক হিসেবে পোষ্টেড আছেন। তিনি নিম্মীর ছোটবোন মানুকে নিয়ে কোলকাতাতেই থাকেন। খালাম্মা মানে নিম্মীর আম্মা, বাপ্পি, নিম্মী এবং নিজের পড়াশুনার জন্য ঢাকাতেই থাকেন অনেকটা বাধ্য হয়েই। ছুটিছাটায় কোলকাতায় যান মানুদের দেখে আসতে। আব্বা, মহুয়া, কেয়া, স্বপন, হায়দার, টুটু, বদি ওদেরও কোন খবরা-খবর নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ওরা কিছুতেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। ওরা নিশ্চয়ই জনগণের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। আমি যে ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পাড়ি জমাচ্ছি তার জন্য একজন পদস্থ সরকারি অফিসার হিসেবে তার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসতে পারে। পাক-বাহিনীর অত্যাচারের শিকারেও পরিণত হতে পারেন তারা। কথাটা ভেবে মনটা হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে পড়লো। ব্যথায় বুকটা ভারী হয়ে উঠলো। কিন্তু না, এ পর্যায়ে এমনভাবে দুর্বল হওয়া চলবে না। সবকিছুর বিনিময়ে এমনকি জীবনের পরোয়া না করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্তে অটল থাকতেই হবে। ব্যক্তি,

গোষ্ঠি, পারিবারিক সব স্বার্থ থেকে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ অনেক বড়। সে প্রশ্নে কোন আপোষ করা চলবে না কিছুতেই। আমার এই সিদ্ধান্তে-র ফলে কারো কিছু হলে দুঃখ পাবো কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনে কোন অবদান রাখতে না পারলে নিজের কাছে নিজেই হেয় হয়ে যাবো। কাপুরুষতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে সারাজীবন। ইতিমধ্যে অনেক দিনের জমানো স্মৃতির নিদর্শনগুলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত শরীরে। আগামীকাল ভোর ৭টায় এয়ারর্পোটে যেতে হবে তাই শ্লথগতিতে উঠে পরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম।

পরদিন ভোর ৬টায় অভ্যাসমত ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেস ওয়েটার বেড টি দিয়ে গেল। বেড টি শেষে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে শেষ বারের মত ডাইনিং হলে গেলাম নাস্তার জন্য। হেড ওয়েটার ফিদা খান নিজেই সমাদর করে নিজের তদারকিতে নাস্তা করালো। নাস্তা শেষে বয়, বার্বুচী, ওয়েটার এবং হেড ওয়েটার সবাইকে বকশিশ দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মেসের সামনের কারপার্ক গাড়িতে ভরে গেছে। **Div Arty** -র প্রায় সব অফিসারই জমায়েত হয়েছে আমাকে এয়ারপোর্টে **See Off** করতে যাবার জন্য। ওদের আন্তরিকতা আমাকে বিহব্ল করে তুলেছিল। সামরিক জান্তার পাশবিকতা আর এদের বন্ধুসুলভ আন্তরিকতায় কত তফাৎ! ভাবছিলাম আজ ইয়াহিয়া খান ও তার দোসররা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারের যে ষ্টিমরোলার চালিয়ে দিয়েছে তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কতটুকু সমর্থন রয়েছে ? সময় হয়ে এল। আমার **CO** মিয়া হাফিজ এসে বললেন,

— **Sharif it's time, let's go.**
— **Yes Sir.**

বলে যারা এয়ারপোর্টে যাবে না তাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্নেল হাফিজের পাশে গাড়িতে উঠে বসলাম। তিনি গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার সাথে সাথে যারা যাবার তারা সবাই যার যার নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে বসলো। কাফেলা চললো এয়ারপোর্টের দিকে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। মতি আমার আগেই পৌঁছে **Check-In** করে অপেক্ষা করছিল।

— আরে মতি তুমি এখানে? ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করলাম।
— মুলতান যাচ্ছি পেশাওয়ারের পথে। জবাবে বললো মতি।
— **I see that's good.** প্লেনে তাহলে গল্প করে সময়টা ভালোই কাটবে। বললাম আমি।

Check-In পর্ব শেষ করে সবার সাথে কথাবার্তা বলছিলাম, হঠাৎ দেখি **Div Arty Commander** ব্রিগেডিয়ার বাদশা এয়ারপোর্টে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির। ব্রিগেডিয়ার বাদশা আমাকে **A young good gunner officer** হিসেবে খুবই স্নেহ করতেন। ব্রিগেডিয়ার বাদশা জাতিতে পাঠান। তিনি এগিয়ে আসতেই আমরা সবাই সেল্যুট করে দাড়ালাম।

— আলাকা শরিফ তু হামকো ছোরকে যা রাহা হ্যায় ইসলিয়ে হামে দুখ্ হ্যায়, লেকিন এহি জিন্দেগী হ্যায় বেটা। নয়া ইউনিটমে আচ্ছা রেহ্না অওর খোশ রেহ্না এহি মেরা দোয়ায়ে হ্যায়।

পিতৃসুলভ ব্রিগেড কমান্ডারের কথাগুলো মনে দাগ কেটেছিল। বোর্ডিং এর ঘোষণা হল। সবার সাথে কোলাকুলি করে বিদায় নিলাম। ব্রিগেডিয়ার বাদশার ইশারায় কয়েকজন **Young Officers** কাঁধে তুলে নিয়ে **He was a jolly good fellow** বলতে বলতে আমাকে প্লেনের সিড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল। পুরনো বন্ধুদের ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে প্লেনে উঠে বসলাম। মতিও উঠে বসেছে। জানালা দিয়ে দেখলাম সবাই লাইন করে দাড়িয়ে হাত নাড়ছে। অল্পক্ষণ পরেই প্লেন ষ্টার্ট নিয়ে **Take-Off** করলো। সবাই তখনও দাড়িয়ে। কেউ কেউ রুমাল নাড়িয়ে শেষ বিদায় জানাচ্ছিল। প্লেন এয়ারপোর্টের উপর দু'টো চক্কর দিয়ে মেঘের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে গেল। সবাইকে পিছনে ফেলে প্লেন উড়ে চললো মুলতানের উদ্দেশ্যে। এভাবেই শুরু হলো আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই আমাদের বহনকারী ফোকার-ফ্রেন্ডশিপ বিমানটি মুলতান এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। প্লেন থেকে বেরুতেই মুখে লাগলো গরম

বাতাসের ঝাপটা। কোয়েটার তুলনায় মুলতানের আবহাওয়া অনেক উষ্ণ। ভাওয়ালপুর ভাওয়ালনগরের দিকে উষ্ণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ছোট এয়ারপোর্ট ক্যান্টনমেন্টে এরিয়ার মধ্যেই অবস্থিত। প্লেন থেকে অবতরণ করে ট্রানজিট লাউঞ্জে না গিয়ে মতির সাথে সোজা চলে গেলাম **Arrival** এ। ওখানে **PIA** কাউন্টারে গিয়ে আমার লাহোর যাওয়া **Cancel** করে দিয়ে বেরিয়ে এলাম এয়ারপোর্ট থেকে। মুলতান শহর এয়ারপোর্ট থেকে প্রায় ৫মাইল দূরে অবস্থিত। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা চলে এলাম শহরে। কিছু কেনাকাটা করার ছিল। **Survival Kit, FirstAid Box, Anti Snake Bite Kit** এগুলো সব সঙ্গে করে আনা হয়েছে। তিনজনের জন্য **Desert Shoes,** এক বোতল ব্রান্ডি, সুইটস-চুইঙ্গাম, বিস্কিটস, কিছু ড্রাই ফ্রুটস প্রভৃতি কেনা হলো।

তারপর গেলাম সোনার দোকানে। ওখানে দু'টো আংটি বানালাম এককেটা দেড় ভরি ওজনের। একটাতে খোদাই করলাম '**S**' এবং অন্যটাতে '**M**'। আমি ও মতি আংটি দু'টো পরে নিলাম। কেনাকাটার পাঠ চুকিয়ে গেলাম **Railway Station**-এ। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম ১২টার ট্রেন ধরলে দু'টো-সোয়া দু'টোর মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে ভাওয়ালপুর। ঠিক করলাম দুই বাঙ্গালীর একসঙ্গে সফর করাটা ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো মতি যাবে ট্রেনে আর আমি যাব বাসে। বাসে করে আমি মতির আগেই পৌঁছে যাব ভাওয়ালপুর। ওখানে ষ্টেশনে মিলিত হব আমরা। মতিকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ট্যাক্সি করে গিয়ে পৌঁছালাম বাস ষ্ট্যান্ডে। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর বাস ছাড়ছে ভাওয়ালপুরের উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষমান বাসে উঠে বসলাম। মালপত্রের বেশিরভাগই মতি নিয়ে গেছে সাথে। আমার কাছে রয়েছে হালকা ছোট্ট একটা ব্যাগ। দু'টো বাজার আগেই পৌঁছে গেলাম ভাওয়ালপুর। বাস ষ্ট্যান্ডে নেমে টাঙ্গা করে পৌঁছলাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূর প্ল্যাটফর্মের একপ্রানে- একটা খবরের কাগজ হাতে দাড়িয়ে আছে। সোয়া দু'টোর দিকেই মতির ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে এসে দাড়ালো। মতি নামলো ট্রেন থেকে। একে অপরের সাথে চোখাচোখি হল কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বললাম না। তিনজনেই আলাদাভাবে সার্কিট হাউজে পৌঁছলাম। নূরের ঘরে ঢুকেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম উল্লাসে। নূর আগেই আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ঘরেই লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চের সময় নূর জানালো পথে ওর কোন অসুবিধেই হয়নি। আরো জানালো ভাওয়ালপুর থেকে ভাওয়ালনগর দু'ভাবে যাওয়া সম্ভব। ট্রেনে করে গেলে লাগবে ঘন্টা তিনেক। ট্রেনের সময় বিকেল ৪টা। আর ট্যাক্সিতে গেলে সময় লাগবে বড়জোর ঘন্টা দু'য়েক। ঠিক হলো ট্যাক্সিতেই যাব। কারণ ভাওয়ালনগর থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেন ধরতে হবে আমাদের। প্রতিদিন দু'টোই ট্রেন যায় ভাওয়ালনগর থেকে ফোর্ট আব্বাস, একটা সকালে অপরটি সন্ধ্যায়। সাড়ে সাতটার ট্রেন মিস করলে পুরো রাতটা কাটাতে হবে ভাওয়ালনগরে। সেটা হবে আমাদের জন্য খুবই বিপদজনক কারণ সমস্ত ভাওয়ালনগরটাই একটা ক্যান্টনমেন্ট। লোকাল ট্রেনের সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোনরকম রিস্ক নেয়া চলবে না। ট্যাক্সিতে গেলে সাড়ে সাতটার অনেক আগেই পৌঁছে যাবো ভাওয়ালনগর। কিছু সময় বিশ্রাম করে বিকেল ৪টায় একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে রওনা হলাম ভাওয়ালনগরের উদ্দেশ্যে। সিন্ধী ড্রাইভার। ওকে বললাম, সাতটার মধ্যে ভাওয়ালনগর পৌঁছে দিতে পারলে বকশিশ মিলবে। তরুণ ড্রাইভার জবাবে বললো,

— কই বাতই নেহি হ্যায় সাব। আপকো সাতসে পেহলেই পৌঁহ্চা দেঙ্গে।

উল্কাবেগে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি। শেভ-ইম্পালা গাড়ি। সৌখিন ছোকরা ক্যাসেটে ফিল্মী গান লাগিয়ে দিল। আমরা চুপচাপ বসে গান শুনছিলাম আর ভাবছিলাম ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত। এক সময় ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ বিকট একটা শব্দে চমকে তিনজনেই জেগে উঠলাম। একটা ঝাকুনি দিয়ে ট্যাক্সি ততক্ষণে থেমে গেছে।

— কি হলো? ব্যাপার কি?

প্রায় একেইসাথে বলে উঠলাম তিনজনে।

— দেখতে হেঁ সাব।

দেখতে হেঁ সাব।

বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফিরে এসে বললো,

— গাড়িকা ক্র্যাঙ্কশাফ্‌ট টুট গিয়া।
বলে কী ব্যাটা!
— ফির আব হাম কেয়া করেঙ্গে? জিজ্ঞেস করল নূর।
— ঘাবড়াও মাত স্যার, পাঁচছে মিল রেহেতে হ্যায় কোই না কোই সোয়ারী জরুর মিল যায়েগা উসমে বেঠা দেঙ্গে আপলোগকো।
কি সর্বনাশ! তবে কি ঘাটে এসে তরী ডুবল? গাড়িটাকে সবাই মিলে ঠেলে রাস্তার সাইডে রাখা হল। অন্য কোন গাড়ি না আসা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। অপেক্ষা করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। দূরে ভাওয়ালনগরের বাতিগুলো এক সময় জ্বলে উঠল। ৭টা বেজে গেল কোন গাড়ির লক্ষণ নেই। অস্থির হয়ে উঠলাম সবাই। হতাশায় মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলাম প্রায়। হঠাৎ দূরে গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল; কিছু একটা আসছে ভাওয়ালপুরের দিক থেকেই। রাস্তা ব্লক করে দাড়ালাম চার জনেই। যাই হোক না কেন থামাতে হবে। কাছে আসতে দেখলাম একটা ল্যান্ডরোভার। আমরা হাত দিয়ে ইশারা করায় গাড়িটা থামল। **Roads & Highways** এর এক ইঞ্জিনিয়ার যাচ্ছেন ভাওয়ালনগর। ভদ্রলোককে সবকিছু বুঝিয়ে বললাম।

তিনজন আর্মি অফিসারের দুর্গতি দেখে ভদ্রলোক সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন,
— আপনাদের কষ্ট না হলে আমি আপনাদের নিয়ে যেতে পারি।
কষ্ট! হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে জিপে উঠে বসলাম। অধাঘন্টার মধ্যেই ভাওয়ালনগর পৌঁছে গেলাম। তখন রাত পৌনে আটটা। আমাদের ট্রেন নিশ্চয়ই এতক্ষনে ছেড়ে চলে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,
— কোথায় নামবেন?
ষ্টেশন এর কথা না বলে বললাম,
— শহরের যে কোন খানে নামিয়ে দিলেই চলবে।
Town Centre এ নামিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। সেখান থেকে একটা টাঙ্গা করে কাছেই ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি অসম্ভব ভীড়। এমনটি তো হবার কথা নয়। ট্রেন চলে যাবার পর ষ্টেশন থাকবে জনশূন্য তাহলে এত লোক কেন ষ্টেশনে? ট্রেন কি তাহলে এখনও আসেনি? হঠাৎ করে কিছুটা আশার আলো ঝলকে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম,
— ফোর্ট আব্বাসের ট্রেনের খবর কি?
দু'বাক্যে ষ্টেশন মাষ্টার বললেন,
— ট্রেন লেট, এখনও এসে পৌঁছেনি।
জানে পানি ফিরে এল। দৌড়ে গিয়ে মতি ও নূরকে খবরটা দিতেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওরা লাফ দিয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ল। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে টাঙ্গার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে প্লাটর্ফমে চলে এলাম। পথে একটি ভিক্ষুক দাড়িয়েছিল। আনন্দের আতিসয্যে একশ টাকার একটি পুরো নোটই তাকে দিয়ে দিলাম। সোয়া আটটায় আমাদের ট্রেন এল। ফাষ্টক্লাসের তিনটি টিকেট কাটা হল ফোর্ট আব্বাস পর্যন্ত। বর্ডার এলাকার ট্রেন। আমাদের মত ফৌজি ছাড়া ফার্ষ্টক্লাশের যাত্রি বিরল। অতি সহজেই একটা খালি কামরা পেয়ে উঠে বসলাম। ট্রেনে উঠেই বুফে কার থেকে ডিনার আনাবার বন্দোবস্ত করা হল। খাবার সার্ভ করে গেল বেয়ারা। দরজা বন্ধ করে খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নিলাম। ট্রেন ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে। খাওয়া শেষ করার পর পদযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। সবাই ডার্ক কালারের কাপড় পরে নিলাম। আমাদের কাছে তখন সর্বমোট প্রায় হাজার বিশেক টাকা। ওগুলো কাপড়ের বিভিন্ন চোরা পকেটে ঢোকানো হল। স্যুটকেস থেকে হ্যাভারস্যাক বের করে ওতে তিন জনের আর এক প্রস্থ করে কাপড় নেয়া হল। প্রয়োজনীয় সাথে নেবার সবকিছু রাখা হল হ্যাভারস্যাক এ। ম্যাপ বের করে নাইট মার্চ চার্ট আঁকা হল। পাকিস্তানের মটরাইজড ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের ডিফেন্সিভ এলাকার মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির একটি ট্যাংক রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারস এর পাশ ঘেষে যেতে হবে আমাদের। রাস্তায় পড়বে এ্যান্টিট্যাংক অবস্ট্যাকল মাইন ফিল্ড। এদের মাঝে গ্যাপ বের করে নিয়ে যাত্রাপথ

নির্ধারন করা হয়েছে। পথে দুই তরফের পেট্রোল পার্টির মোকাবেলায় পড়তে হতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়া হল যেকোন উপায়েই হউক **own troops and enemy Troops** -কে এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের। নেহায়েত বিপাকে পড়লেই সংঘর্ষের মাধ্যমে শত্রুকে পরাস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কোন অবস্থাতেই ধরা পড়া চলবে না। ধরা পড়ার আগেই আমরা আত্মহত্যা করব। কোন কারণে অবস্থার প্রেক্ষিতে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তিগত উদ্যোগে করনপুর পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। কম্পাসে রুট এবং বিয়ারিং সেট করা হল, পরা হল **Desert shoes.** হাতিয়ার এবং গুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিলাম। ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার, নাইট মার্চ চাটর, একটি টর্চ, একটি কম্বল এবং সাথে নেবার হ্যাভারস্যাকটি ছাড়া সবকিছুই সুবিধামত কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে হবে। নিজেদের **ID Card** ছাড়া অন্যান্য সব কাগজপত্র পুড়িয়ে টয়লেট দিয়ে ফেলে দেয়া হল ট্রেন থেকে। ক্যামেরা দু'টো হ্যাভারস্যাকে ভরে নিলাম। ছোট্ট কোরআন শরীফটাও নেওয়া হল হ্যাভারস্যাকে। অর্ডার অফ মার্চ – মতি আগে তারপর আমি, পেছনে নূর। হ্যাভারস্যাক পালাক্রমে বহন করা হবে। মার্চের সময় প্রতি এক ঘন্টা অন্তর দশ মিনিট বিরতি। বিরতিকালে কম্বলের নিচে ঢুকে টর্চের আলোয় ম্যাপ দেখে নেয়া হবে, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা? প্রয়োজনে কম্পাস বিয়্যারিং এ্যডজাষ্ট করা হবে। আমরা তিনজনই কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত। নাইট মার্চের সব কৌশলই আমাদের নখদর্পনে।

রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিটে আমাদের ট্রেন হারুনাবাদ ষ্টেশনে এসে পৌঁছল। ছোট্ট ষ্টেশন। প্ল্যাটর্ফমের যেখানে আমাদের বগিটা গিয়ে থামল সেখানে বেশ জমাট অন্ধকার। আমরা নেমে পড়লাম। অল্প কয়েকজন যাত্রী উঠা-নামা করল। আমরা আঁধারে চুপ করে দাড়িয়ে থাকলাম। অল্পক্ষণ পর হুইসেল দিয়ে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল। যে সমস্ত যাত্রি ট্রেন থেকে নেমেছিল তারা সবাই ষ্টেশনের চেকিং গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে। চুপচাপ দাড়িয়ে আমরা জায়গাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। অপর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোয় ষ্টেশন ঘরটার সামনে কিছুটা অংশই আলোকিত হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের বেশিরভাগ অংশই ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ষ্টেশনের বাইরে একটা মাঝারি আকারের উঠান, কয়েকটি চায়ের দোকান, তাদের সামনে কয়েকটি টাঙ্গা যাত্রিদের অপেক্ষা করছে। চার পাঁচশ গজ দূরে হাইওয়ে রেল লাইনের প্রায় সমান্তরালভাবেই উত্তর দক্ষিনে চলে গেছে। মাঝে মধ্যে দূরপাল্লার বড় বড় ট্রাকগুলো আওয়াজ তুলে ভীষণ বেগে আসা-যাওয়া করছে। রাস্তার ওপারেই হারুনাবাদ শহর। শহর বলতে একটি বর্ধিষ্ণু বাজার। বাজারের চারদিকে জনবসতি। আমরা হারুনাবাদ শহরের ডানদিক দিয়ে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজিয়ে রেখে যাত্রা শুরু করব। একেতো বর্ডার এলাকার মরু অঞ্চল, রাতও বেশ হয়েছে, লোকজন নেই খুব একটা, সমস্ত শহরটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে যাবার পর ষ্টেশনের সদর দরজার দিকে না গিয়ে প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এলাম। অতি সাবধানে হাইওয়ে ক্রস করে একটা বাবলা ঝোপের মধ্যে অবস্থান নিলাম। হারুনাবাদ শহরের বসতির শেষপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে মরুভূমি। উচু-নিচু বালির পাহাড়। মাঝে মধ্যে কাটার ঝোপঝাড়। যে জায়গায় পানির আধার রয়েছে সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গৃহস্থালি। তাকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট চাষাবাদের খামার। অরহর, কলাই, যব, ভুট্টার ক্ষেত। মোটামুটি এ ধরণের টেরেনই (**Terrain**) অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। যাত্রা শুরু করার আগে আমি ও মতি কম্বলের নিচে বসে কম্পাস সেটিং ও নাইট মার্চ চার্ট ঠিক করে ম্যাপের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের অবস্থানের অদূরেই একটি কারেজ থাকার কথা। কারেজ হল মরু অঞ্চলে গভীর কুয়োঁর সারি। এগুলো খুঁড়ে তাতে বৃষ্টির পানি জমিয়ে রাখা হয় প্রয়োজনমত ব্যবহার করার জন্য। আবাদি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে কারেজ থেকে। নূরকে পাঠানো হল কারেজটি খুঁজে বের করার জন্য। উদ্দেশ্য আমাদের সাথের মালপত্র সব কারেজের কুয়োতেই ডাম্প করব। সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ। অল্পক্ষণ পরেই নূর কারেজের সন্ধান বের করে ফিরে এল। আমরা

সবাই হ্যাভারস্যাকটা রেখে বাকি মালপত্র সব নিয়ে গিয়ে কারেজের একটি কুয়োতে ফেলে দিয়ে এলাম। এবার সর্বিকভাবে যাত্রা শুরু করতে আমরা প্রস্তুত।

বিসমিল্লাহ্ বলে আমরা পদযাত্রা শুরু করলাম শ্রীকরনপুরের উদ্দেশ্যে। ঘন্টায় গড়ে চার থেকে পাঁচ মাইল বেগে চলতে হবে। আকাশে বড় একটা চাঁদ। সপ্তঋষীর মন্ডল, দ্রুবতারা, ক্যাসোপিয়া, ওরিয়েন্ট বেল্ট সবগুলোই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কম্পাস ছাড়া তারকারাজির সাহায্যেও আমাদের পদযাত্রা চলতে পারে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কিভাবে তারকারাজির সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে সেটা আগেই ভালো করে রপ্ত করে নিয়েছি প্রত্যেকে। প্রথম ঘন্টা কেটে গেল নির্বিঘ্নে। পথে কোন লোকজনের সামনা-সামনি হতে হয়নি। বিরতি কাটিয়ে চলা শুরু হল আবার। মিনিট দশেক পর থমকে দাড়িয়ে পড়ে ইশারা করল মতি। এন্টি-ট্যাংক অবস্ট্যাকল সামনে। একটি খাল, খালে পানি। খালের দুই দিকেই ৬০μ এ্যাঙ্গেলের বেশি উচু **Any obstacle is always covered by fire** তাই ক্রসিং এর আগে প্রথমে রেকি করতে হবে। মতি ও আমি চললাম। একে অপরকে কভার করে চলেছি। কিছু হলে যাতে অবস্থার মোকাবেলা করা যায়। নূর অপেক্ষায় থাকল একটি বাবলা ঝোপের আড়ালে। রেকি করে দেখলাম। খালে বুক পর্যন্ত পানি। হেটেই ক্রস্ করা যাবে অসুবিধা নই। স্রোতও নেই তেমন। পাড়ে বসে ইনফ্রারেড বাইনোকুলার দিয়ে ক্রসিং এলাকাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। মতি ফিরে গিয়ে নূরকে সাথে করে নিয়ে এল। অল ক্লিয়ার এর আদেশের সাথে সাথে একে একে ট্যাকটিক্যাল ক্রসিং শুরু হল। সবার শেষে আমিও পার হয়ে গেলাম। ওপারে উঠে রুট অনুযায়ী আবার যাত্রা শুরু করলাম। গতি এবং সময়ের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে অবিরাম ছুটে চলেছি নিঃশব্দে। ইশারা সঙ্কেতে প্রয়োজনমত ভাবের আদান-প্রদান চলছিল। আর দশ মিনিট হাটলেই দ্বিতীয় বিরতি। মতি সঙ্কেত দিল। সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। দেখলাম চারটি উটের একটি ছোট কাফেলা। একটি বর্ডার পেট্রোল মরু অঞ্চলে এভাবেই একটি **BOP (Border Observation Post)** থেকে অন্য **BOP** -তে পেট্রোলিং করা হয়ে থাকে উটের পিঠে চড়ে। ক্রলিং করে কাছেই কাটা ঝোপের মাঝে আস্তে ঢুকে গিয়ে পজিশন নিয়ে নিথর হয়ে শুয়ে থাকলাম। পেট্রোলটি উত্তর দিকে চলে গেল। ওরা হদিসও পেলনা তাদের উটের প্রায় পায়ের নিচেই শুয়ে রয়েছে জলজ্যান্ত তিনজন লোক। আমরা উঠে আবার হাটা শুরু করলাম। দ্বিতীয় বিশ্রামের পর কিছুদূর যেতেই মাটি খোড়ার শব্দ দুর থেকে ভেসে এল। থমকে দাড়িয়ে পড়লাম আমরা। ম্যাপ অনুযায়ী এখানেতো কোন পক্ষেরই কোন ডিফেনসিভ পজিশন থাকার কথা নয়। তবে মাটি খুঁড়ছে কারা? মতিকে পাঠানো হল রেকি করতে। একটি নতুন ডিফেন্সিভ লাইন তৈরি করতে বাংকার খোঁদা হচ্ছে। তাই নির্ধারিত রুট থেকে একটু বেকিয়ে কিছুদূর যেয়ে পরে আবার নির্ধারিত রুটে ফিরে আসতে হবে আমাদের। সেভাবেই কম্পাস বিয়ারিং এবং নাইট মার্চ চার্ট সেট করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। ডিফেন্সিভ পজিশন বাইপাস করে এগিয়ে চললাম আমরা।

এখানে আর একটি নালা কেন? তবে কি আমরা ভুল পথে এগোচ্ছি? যাত্রা থামিয়ে ঝোপের আড়ালে তিনজনেই কম্বলের তলায় ঢুকে ম্যাপ দেখতে লাগলাম গভীর মনোযোগ দিয়ে। না আমরা ঠিক পথেই চলেছি। ওটা নতুন করে খোঁড়া হয়েছে। তবে সেটার অবস্থান ম্যাপের মার্কিং-এ নেই কেন? আমরা বর্ডার ক্রস করে ভারতীয় ডিফেন্সের সীমানায় ঢুকে পড়েছি। ঘড়িতে তখন আড়াইটা বাজে। হিসেবমত আমরা এখন ভারতীয় সীমার ভিতরে। এটা ভারতীয় ডিফেন্স এর অবস্ট্যাকল নতুন করা হয়েছে বিধায় ম্যাপের মার্কিং-এ নেই। একইভাবে সতর্কতার সাথে খালটা ক্রস্ করে পাড়ে উঠে এলাম। এখন থেকে বিপদের ঝুঁকি অনেক বেশি। চলতে হবে খুব সাবধানে। আর এক দেড় ঘন্টার মধ্যেই পৌছে যাবার কথা শ্রীকরনপুর শহরের সীমানায়। খালের পরই দেখলাম বাংকারে ভারতীয় সাজোয়া বাহিনীর ট্যাংকগুলো ডিপ্লয় (**Deploy**) করা আছে। বাংকারগুলো থেকে মাঝে মাঝে মানুষের কথোপকথোনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গভীর রাত; তাই সমস্ত এলাকা জুড়ে ছিল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। আমাদের এগিয়ে চলার জন্য এ ধরণের পরিবেশ অতি অনুকূল। চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি রেখে ক্ষিপ্র গতিতে ভারতীয় ডিফেন্স এর বুহ্য

ভেদ করে এগিয়ে চললাম আমরা। কেউ কিছু টের পেল না। বেশ কিছুদূর চলে এসেছি। হঠাৎ দেখি অল্প দূরত্বে কয়েকটি ট্যাংক। কতগুলো গাড়ি সেগুলোকে ঘিরে রয়েছে। বুঝলাম এটি হেডকোয়ার্টারস। ঐ অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে চুপিসারে এগিয়ে চললাম গন্তব্যস্থলের দিকে। ইতিমধ্যে দূরদিগন্তে শ্রীকরনপুরের আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছিল। আর মাত্র চার/পাচঁ মাইলের পরই পৌঁছে যাবো শ্রীকরনপুরে। আমাদের জোশ দ্বিগুন হয়ে গেল। পথের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে প্রায় দৌড়ে এগুতে থাকলাম সেই আলোকচ্ছটার দিকে। পৌনে চারটায় পৌঁছে গেলাম শ্রীকরনপুর শহরের সীমানায় একটি গ্রামে। গ্রামের প্রায় সবগুলি ঘর মাটি দিয়েই গড়া। প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গ্রামের ভেতর কুকুর ডাকছে। আমরা একটি পরিত্যাক্ত বাড়ির উঠোনে গিয়ে বসলাম। উঠোনটিও মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বসে বসে ভাবছি এখন আমাদের কি করা উচিত? ঠিক এ মুহূর্তে এমন অসময়ে জনবিরল শহরে আমাদের ঢোকা ঠিক হবে কিনা? অপরিচিত শহরে এমন অসময়ে তিনজন লোক ঘোরাঘুরি করাটা সন্দেহজনক হবে। তাই ঠিক করা হল সকাল হওয়ার পর আমরা শহরে ঢুকে জনগণের মধ্যে মিশে যাবো। তারপর ঠিক করা হবে কি হবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে ট্রেনের আগমনের আওয়াজ পেলাম। দেয়ালের বাইরে উকিঁ মেরে দেখলাম প্রায় ৬-৭শত গজ দূরে একটি ট্রেন ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে থামল। বুঝলাম এটা একটা ষ্টেশন। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ট্রেনে করে এই মুহূর্তেই পালাতে হবে বর্ডার এলাকা ছেড়ে। দৌড়ে ছুটলাম ষ্টেশনের দিকে। কাছে পৌঁছে দেখলাম লাল রঙ্গের একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। কোথাকার ট্রেন কোথায় যাবে কিছুই জানি না; শুধু বুঝলাম এটা যাত্রী বহনের ভারতীয় ট্রেন। ষ্টেশনে লোকজন একদম কম। দৌড়ে গিয়ে একটি খালি কামরায় উঠে গেলাম নির্দ্বিধায়। উঠেই দরজা-জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর ট্রেন সিটি বাজিয়ে ছেড়ে দিল। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাচঁলাম প্ল্যাটফর্মে উঠেই লক্ষ্য করেছি ষ্টেশনটির নাম শ্রীকরনপুর। শ্রীকরনপুর রাজস্থান প্রভিন্সের জেলা শ্রীগঙ্গানগরের অধীন একটি সাব ডিভিশন। আমাদের লক্ষ্য দিল্লী পৌঁছানো। ট্রেনতো যাচ্ছে দক্ষিনে কিন্তু আমাদের যেতে হবে উত্তর দিকে। কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি একটি ষ্টেশনে এসে দাড়াল। একটি জংশন ষ্টেশন। উল্টো দিক থেকে আর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আগমন ঘটল। আমরা আস্তে করে ট্রেন বদল করে অন্যটির একটি খালি কামরায় উঠে বসলাম। আমাদর ট্রেনটাই আগে ছাড়ল। চলেছি উত্তর দিকে। পথিমধ্যে আবার শ্রীকরনপুর পড়ল। করনপুর পেছনে পড়ে থাকল। আমাদের ট্রেন আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। শারিরীক ক্লান্তি এবং মানসিক উৎকন্ঠা সব মিলিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে জেগে উঠলাম। জানাল খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। ষ্টেশনের নাম শ্রীগঙ্গানগর। সবাই মহা খুশি। নেমে পড়লাম ষ্টেশনে। বর্ডার থেকে তখন আমরা অনেকে ভিতরে চলে এসেছি। আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে যেয়ে ডুকলাম। হাত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলিয়ে ভদ্র হয়ে নিলাম প্রথমে। তারপর বসলাম ঠিক করতে, কি করা যায়? ঠিক হল এখন থেকে আমরা তিনজনই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। স্টাডি ট্যুর-এ বেড়িয়েছি, পুরো রাজস্থান ঘুরে বেড়াচ্ছি। তিনজনেই হিন্দু নাম গ্রহণ করলাম। আমি হলাম শ্রী সৌমেন ব্যানার্জি। মতি শ্রী মনোজ বোস আর নূর শ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত করতে হবে। কোলকাতা থেকে আগত বাঙ্গালী ছাত্র তাই পাকিস্তানী টাকা ভাঙ্গানো বিপদজনক হবে। ঠিক হল আংটি দু'টো বিক্রি করার চেষ্টা করতে হবে। ষ্টেশন মাষ্টারের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম শহর ষ্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। দোকানপাট ৯টার আগে খুলবে না। অগত্যা ৯টা পর্যন্ত ওয়েটিং রুমেই অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক ৯টায় তিনজনই বেরিয়ে পড়লাম। আমার ও মতির গলায় ঝুলিয়ে নিলাম ক্যামেরা দু'টো, নূরের পিঠে হ্যাভ্যারস্যাক। চোখে রেবনের সানগ্লাস, টুরিষ্টের মতই লাগছিল তিনজনকে। শহরে পৌঁছে দেখলাম কয়েকটা রাস্তাকে কেন্দ্র করেই ডিষ্ট্রিক হেডকোয়ার্টারস গঙ্গানগর শহর। মফস্বল শহর তাই খুব একটা বড় নয়। শহরের প্রধান রাস্তাগুলির দুই দিকে সব দোকানপাট। একসাথে দুই তিনটি সোনার দোকান। সবচেয়ে বড়টিতে গিয়ে ঢুকলাম। দোকানের মালিক ধুতি নিমা পড়া তিলক কাটা মোটা গোছের একটি লোক

ধূপধুনো জ্বেলে গদিতে বসে পূঁজো করছিলেন। পুঁজা সেরে হরিণাম জপতে জপতে আমাদের কাছ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, “কি চাই?” জবাবে বললাম,

— আমরা ছাত্র। কোলকাতা নিবাসী। স্টাডি ট্যুরে এসে টাকা-পয়সার অভাব দেখা দিয়েছে; তাই আংটি দু’টো বিক্রি করতে চাই।

আংটি দু’টো হাতে নিয়ে পরখ করে দেখে মালিক বললো,

— চারশো টাকা পাবে।

বলে কি ব্যাটা! আমরা জানি পাকিস্তান থেকে ভারতে সোনার দাম বেশি। তাছাড়া ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যও অনেক বেশী। সেক্ষেত্রে মালিক আমাদের যে দাম দিতে চাচ্ছে তার দ্বিগুন দামই আমাদের পাওয়া উচিত। ব্যাটা বেনিয়া আমাদের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে ডাহা ঠকাবার চেষ্টা করছে। ভীষণ রাগ হল তার ফন্দি বুঝতে পেরে। আংটি দু’টো ফেরত নিয়ে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। অন্য দোকানে আর গেলাম না। বুঝতে পারলাম ওতে বিশেষ লাভ হবে না। ভীনদেশে অবস্থার সুযোগ নিয়ে সব বেনিয়াই ঠকাবার চেষ্টা করবে। ঠিক করলাম একটা ক্যামেরা বেচে দেব। একই রাস্তার উপর সবচেয়ে বড় ক্যামেরার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দোকানের মালিক ২৪-২৫ বয়সের এক তরুণ। জামা কাপড়ে বেশ ফিটফাট। হিন্দী-উর্দু মিশিয়ে তাকে আমাদের সমস্যা বুঝিয়ে বললাম,

— একটা ক্যামেরা বেচে দিতে চাই। তরুণ যুবক আমাদের অবস্থা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো।

ক্যামেরা দু’টো হাতে নিয়ে বললো,

— এতো অত্যন্ত দামী ক্যামেরা। বিদেশ থেকে ইম্পোর্টেড?

— হ্যাঁ ভাই বিদেশ থেকেই প্রবাসী আত্নীয়ের মাধ্যমে খুব শখ করে আনিয়েছিলাম। নেহায়েত বিপাকে পড়েই বিক্রি করতে হচ্ছে।

— কিন্তু এতো দামী ক্যামেরা এই ছোট শহরে ভালো দামে বিক্রি করতে পারবে না। তাছাড়া শখের জিনিষ কষ্ট করে আনিয়েছ বিক্রি করে দিলে আর কিনতেও পারবে না। তাই বলছি কি, তোমাদের কাছে আর অন্য কিছুই কি নেই?

— আছে ভাই। দু’টো স্বর্নের আংটি। বলে পকেট থেকে আংটি দু’টো বের করে ওর হাতে দিলাম এবং সোনার দোকানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওকে সব খুলে বললাম।

সব শুনে ও একটু হাসল। বললো,

বলেই যুবক দোকানের কর্মচারীটিকে ডেকে আমাদের চা এনে দিতে বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল; চায়ের কথা বলতেই আমরা বলে উঠলাম,

— চায়ের প্রয়োজন নেই ভাই। আমাদের আংটি দু’টো বিক্রি করে দিতে পারলেই আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

— সে আমি দেখছি। চা খাও। এতদূর থেকে তোমরা আমাদের রাজস্থন সফরে এসেছো। তোমাদের একটু আপ্যায়ন করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে?

যুবকের আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করলো। কর্মচারী ইতিমধ্যে চা-নাস্তার যোগাড় করতে বেরিয়ে গেছে। যুবকটিও আমাদের দোকানে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। অপরিচিত তিনজন লোকের কাছে পুরো দোকান ফেলে দিয়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না। অপরিচিত ভীনদেশে এমন একজন সাহায্যকারী পেয়ে ধন্য হলাম। কর্মচারী গরম গরম লুচি তরকারী ও চা এনে রাখল সামনে। খাবারের গন্ধ পেয়ে এতক্ষন কষ্ট করে ভুলে থাকা ক্ষুধা পেটে মোচড় দিয়ে উঠলো। দেরি না করে গোগ্রাসে লুচি তরকারী খেলাম। তারপর আস্তে আস্তে সুখ করে খেলাম গরম ধূমায়িত চা। নাস্তা পেটে পড়ায় শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। মিনিট বিশেক পর যুবক হাসিমুখে ফিরে এল।

— তোমাদের কাজ হয়ে গেছে এই নাও। বলে আটশত পঞ্চাশ টাকা আমার হাতে দিল। চা নাস্তা খেয়েছতো?

— হ্যাঁ খুব মজা করে খেলাম লুচি তরকারী আর চা। ভাই তোমার নামটা জানতে পারি কি?

— নিশ্চয়ই, রমেশ ত্রিপাঠি। আমরাও আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু নামের পরিচয় দিলাম।

— রমেশ ভাই তুমি যদি কখনও কোলকাতায় আস তবে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। বিদেশে তোমার কাছ থেকে পাওয়া আন্তরিকতা এবং সাহায্যের কথা চিরকাল মনে থাকবে।

তিন নম্বর পার্ক সার্কাস, একটা ভুঁয়া ঠিকানা দিয়ে রমেশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে ওর দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আজকের পৃথিবীতে ভাল লোক যে একদম নেই তা নয়। রমেশের মতো ভাল লোক কিছু রয়েছে বলেই পৃথিবীর চাকা এখনো ঘুরছে। রমেশের দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে বসলাম একটা বড় আকারের রেষ্টুরেন্টে। পেটে লুচি তরকারী এবং চা পড়ায় ক্ষুধা বেড়ে গিয়েছিল। পেটপূজা না সারা পর্যন্ত অন্য কিছুতেই মনযোগ দেয়া সম্ভব নয়। পেটভরে খাওয়া হল মুরগির রোস্ট, পরোটা, তরকারী এবং ঘন ডাল। হিন্দুদের অন্য ধাঁচের রান্না। Change of Test ভালোই লাগলো। আমাদের খাওয়ার নমুনা দেখে বাচ্চা বয়টা অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

পেট পুরে খাওয়ার পর নূর গেল খবরের কাগজ কিনতে। দু'তিনটা খবরের কাগজ নিয়ে সে ফিরে এল। খবরের কাগজ খুলতেই দেখা গেল বাংলাদেশের উপর বিস্তারিত সচিত্র সংবাদ। জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রবাসে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার সংবাদ, মুক্তি ফৌজের সংবাদ, সবকিছুই বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে। ভারতীয় সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতার কথাও লেখা হয়েছে। রনাঙ্গনের ছবিতে মেজর খালেদ মোশাররফের ছবি ছাপা হয়েছে। মুক্তি ফৌজের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। কাগজগুলো থেকে বুঝতে পারলাম আমরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতটুকু জানতাম ঘটনা প্রবাহ তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। সত্যিই যুদ্ধ চলছে বাংলার মাটিতে। স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদানের জন্য ঝুঁকি নিয়ে আমরা ভুল করিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রনাঙ্গনে যেয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হবে আমাদের। তিনজনে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম নিচু স্বরে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের চোখে ফাঁকি দিয়ে মুজিবনগর যাবার চেষ্টা করা হবে রিস্কি। নিয়ম অনুযায়ী বর্ডার ক্রস করার পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করাটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। স্বেচ্ছায় ধরা দিলে আমাদের উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেবে না ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনে। ধরা না দিলে আমাদের উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকবে। কিন্তু ধরা দেব কোথায়? গঙ্গানগরে ধরা দিলে অযথা সময় নষ্ট হবে। কারণ আমাদের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্তই আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে এখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশের অপেক্ষায় সময় নষ্ট হবে অযথা। তাছাড়া তিনজন কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হবে নিম্ন পর্যায়ে। তা সহ্য করার মত মানসিক এবং শারিরীক অবস্থা বর্তমানে আমাদের কারোই নেই। তার চেয়ে বরং দিল্লী পৌঁছে আত্মসমর্পন করাটাই হবে শ্রেয়। যা হবার সেখানেই হোক। ঠিক হল দিল্লী যেয়েই আত্মসমর্পন করা হবে Ministry of External Affairs -এ। কিন্তু বর্ডারে আত্মসমর্পন না করে দিল্লী পর্যন্ত পৌছানোর জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনে যাতে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি না হয়- কেন বর্ডারে আত্মসমর্পন না করে আমরা দিল্লী রওনা হলাম, তার যুক্তি বর্ণনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে একটি আবেদনপত্র লিখে ফেললাম তিনজনে মিলে। ঠিকানা লেখা হল মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার, প্রযত্নে Ministry of External Affairs, রাষ্ট্রপ্রতি ভবন, সাউথ ব্লক, নয়া দিল্লী। পোস্ট অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রারড মেইল-এ চিঠিটা পাঠিয়ে রশিদ নিয়ে ফিরে এলাম রেষ্টুরেন্টে। পোষ্ট মাষ্টার বলেছিলেন দু'এক দিনের মধ্যেই চিঠিটা পৌঁছে যাবে দিল্লীতে। চিঠিটার একটা কপি পাঠাতে হবে মুজিবনগর সরকারের কাছে। এ এলাকা থেকে মুজিবনগর সরকারের কাছে রেজিস্টারড পোষ্ট পাঠান যুক্তিসঙ্গত হবে না। ঠিক করলাম দিল্লী থেকে ওটা পোষ্ট করব। এরপর নূরকে পাঠানো হল ষ্টেশনে দিল্লী যাবার টিকিট করার জন্য। ফিরে এল নূর। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় কালকা মেইলে করে দিল্লী যাব আমরা। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি টিকেট কেটে নিয়ে এসেছে নূর। পয়সা কম থাকায় প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটা সম্ভব হয়নি। হাতে প্রচুর

সময়। দুপুরে আর একপ্রস্থ খাওয়া-দাওয়া করে শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখার জন্য বেরুলাম। ঘুরে ফিরে দেখছি আর ক্যামেরায় ছবি তুলছি স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার জন্য। ছোট্ট শহর ঘোরা শেষ হয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। ঠিক হল সময় কাটানোর জন্য **Matinee Show** সিনেমা দেখব। একটি হলে গিয়ে দেখলাম 'অঞ্জনা' চলছে। ববিতা-রাজেন্দ্রকুমার অভিনীত। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। মফস্বল শহরের সিনেমা হল। ব্যবস্থা মোটামুটি। ভরদুপুর রোদে উপরের টিনের চাল তেতে উঠেছে। ভীষণ গরম লাগছিল লোকের ভীড়ে। সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি। **House Full** কিন্তু বেশ মজাই লাগছিল বাদাম, চানাচুড় চিবুতে চিবুতে ছবি দেখতে। ছবি শেষ হল। হল থেকে বেরিয়ে এলাম বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আবার গিয়ে বসলাম সেই সকালের হোটেলে। আর একপ্রস্থ খাওয়া হল। ধীরে সুস্থে পৌনে সাতটায় ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। কালকা মেইল ট্রেন আসবে সাড়ে সাতটায় কিন্তু তখনও প্ল্যাটফর্ম একদম খালি। ব্যাপার কি? টিকেট কালেক্টরকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ট্রেন সাড়ে ছয়টায় ছেড়ে চলে গেছে। মানে? মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! নূর বোর্ড থেকে ট্রেনের সময় সাড়ে ছয়টার জায়গায় সাড়ে সাতটা পড়েছে। ভীষণ রাগ হল। মতি ও আমি নূরকে তার গাফিলতির জন্য বকাবকি করতে লাগলাম। আমাদের বকাবকি শুনে কালেক্টর সাহেব এগিয়ে এসে বললেন,

— যা হবার তা হয়ে গেছে। গোলমাল করে সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি পাকড়ো। ড্রাইভারকে বকশিশ দেবার কথা বললে ও তোমাদের ট্রেন পৌঁছানোর আগেই পরের ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে।

তার মধ্যস্থতায় একটি ট্যাক্সি ঠিক করে উঠে বসলাম। কালেক্টর সাহেব ড্রাইভারকে পাঞ্জাবীতে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শিখ ড্রাইভার তার হিন্দুস্থান ট্যাক্সি চালিয়ে দিল উল্কা বেগে। রাস্তার অবস্থা মোটামুটি। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে আমাদের ট্যাক্সি। ভাবলেশহীন অবস্থায় ষ্ট্যায়ারিং হাতে বসে আছেন সরদারজী। আমরাও চুপ করেই বসেছিলাম। মুখে কেউ কিছু না বললেও প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে বোধ হয় আর যাওয়া হল না। রাজস্থানের এই মরুভূমিতেই মোটর দুর্ঘটনায় অক্কা পেতে হবে। মনে মনে দোয়া-দুরুদ পড়তে লাগলাম। সরদাজীর চেষ্টা সার্থক হল, ট্রেনের আগেই সে আমাদের পৌঁছে দিল পরর্বতী ষ্টেশনে। ড্রাইভার পাঞ্জাবীতে বলল,

— দেখো সাবজি আছি পৌহছ-ই-গ্যায়ে।

সরদারজীর মুখে একটা গর্বের হাসি। আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়ার উপর মোটা বকশিশ দিতেই সরদারজীর হাসি আরো বড় আকার ধারন করল। মিনিট পনেরো পর ট্রেন এসে গেল। আমরা নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর নেমে গেল। মেইল ট্রেন ছুটে চললো। কামরায় আমরা মোট চারজন যাত্রী। দূরপাল্লার মেইল ট্রেন। বুফে কার আছে। বিছানা পত্রেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। পয়সা দিয়ে বিছানা আনিয়ে নিয়ে যার যার বার্থে শুয়ে পড়লাম। রাতে ছুটে চলেছে কালকা মেইল। পরদিন ভোরে দিল্লী পৌঁছবো আমরা। ট্রেনের শব্দ ও মৃদুমন্দ দোলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানান কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকদিন পর আরামের ঘুম হল। হঠাৎ করে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ খুলে দেখি আমাদের সহযাত্রী পাশের ভদ্রলোক আগেই ঘুম থেকে জেগে জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে বসে আছেন। শুয়ে শুয়েই দেখলাম বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের পূর্বাভাস দেখতে দেখতে চারিদিক ফর্সা হয়ে এল। পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্যের উদয় হল। উদীয়মান সূর্যের লালিমায় রক্তিম হয়ে উঠল পূর্ব আকাশ, সূর্যের আলোয় জেগে উঠল পৃথিবী। জানালা তুলে দিলাম আমি। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগলো চোখেমুখে। মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়লো -পাশের ভদ্রলোক সূর্যের দিকে চেয়ে নমষ্কার করছেন, আর বিড়বিড় করে কি সব বলছেন। বুঝলাম সূর্য দেবের ভক্তি করে মন্ত্র পাঠ করছেন ভদ্রলোক। আমি উঠে টয়েলেটে গিয়ে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়া সেরে হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে দেখি মতি ও নূর তখনও ঘুমুচ্ছে। ওদের ডেকে তুললাম। একে একে ওরাও প্রাতঃক্রিয়া সেরে আমার পাশে এসে বসল। কালকা মেইল ঘন ঘন হুঁইসেল দিতে দিতে মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল। ঘড়িতে তখন ৬:৩০ মিনিটের উপরে বাজে। বুঝলাম দিল্লীর কাছাকাছি এসে গেছি। ৭টায় পৌঁছানোর কথা। ঠিক সাতটার সময়

কালকা মেইল এসে থামল দিল্লী ষ্টেশনে। বিরাট বড় দিল্লী ষ্টেশন। অসম্ভব ভীড়। এত সকালেও লোকজনের অভাব নেই। ব্যস্তভাবে সবাই ছুটোছুটি করছে। একটির পর একটি গাড়ি দাড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে থেমে গেল। ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, এত সহজেই দিল্লী পৌঁছে গেলাম। ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরুতেই ট্যাক্সিওয়ালারা ঝেঁকে ধরল। একজন এসে বললো,

— বাঙ্গালীবাবু, ট্যাক্সি চাইয়ে?

বললাম,

— হ্যাঁ, নিয়ে চল মাঝারি দামের ভাল কোন হোটেলে। সিটি সেন্টারের কাছাকাছি হলে ভাল হয়।

— লে চল্‌তে হে, সাব আইয়ে।

বলে ও আমাদেরকে ওর ট্যাক্সির কাছে নিয়ে গেল। দরজা খুলে আমরা ভেতরে বসলাম। ২০-২৫ মিনিটের মধ্যেই চালক একটি হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল। হোটেল নটরাজ। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রিসেপশনে এগিয়ে গিয়ে দু'টো কামরা বুক করলাম। একটি সিঙ্গেল রুম আমার জন্য, আর একটি ডাবল রুম মতি ও নূরের জন্য। পাশাপাশি কামরাই পাওয়া গেল। পোর্টার আমাদের হ্যাভারস্যাক কাধে তুলে কামরায় পৌঁছে দিল। থ্রি-ফোর ষ্টার হোটেল। ভালোই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। চার্জও রিজেনেবল। প্রতিটি কামরার সাথে ছোট্ট একটা ব্যালকনি। ব্যালকনি থেকে দিল্লী শহরের অনেকদূর দেখা যায়। আমরা রুম পেয়েছিলাম চার তলায়। প্রতিটি রুমের সাথেই রয়েছে এটাচ্যাড বাথরুম। Hot shower নেয়ার পর ট্রেন সফরের ক্লান্তি, গ্লানি সব দূর হয়ে গেল। রুম সার্ভিস ডাকিয়ে নাস্তা করলাম তিনজন একত্রে। নাস্তা খেতে খেতে ঠিক করে নিলাম ২০ তারিখ সকালে নিজেদের সমর্পন করব Ministry of External Affairs -এ গিয়ে। ইতিমধ্যে আমাদের পোষ্ট করা চিঠিও পৌঁছে যাবে কর্তৃপক্ষের হাতে।

দিল্লীর অভিজ্ঞতা

দিল্লীতে আমাদের মিশ্র অভিজ্ঞতা হয়। উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমরা খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এবং ভবিষ্যত বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় নীল নক্‌শা আমাদের হতাশ করেছিল।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্ল্যান অনুযায়ী ২০শে এপ্রিল Ministry of External Affairs এ গিয়ে নিজেদের সারেন্ডার করলাম রাষ্ট্রপতি ভবনের সাউথ ব্লকে। সেখানে আমাদেরকে জেনারেল ওবান সিং (তদানিন্তন রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইং (RAW) প্রধান) এর হাতে আমাদের হস্তান্তর করা হলো। তখন থেকেই আমরা রইলাম তার নিয়ন্ত্রণে। ব্রিগেডিয়ার নারায়ণ নামের এক ভদ্রলোক হলেন আমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ৪ দিন ৪ রাত্রি আমাদের কঠিন সওয়াল সেশন চললো। সেশনগুলো পরিচালনা করেছিলেন বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা। আমরা যতটুকু সম্ভব সোজাসুজি এবং সত্য জবাবই দেবার চেষ্টা করছিলাম।

একদিন বিকেলে জনাব একে রায় দু'জন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক দু'জন ছিলেন জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন। জনাব শাহাবুদ্দিন ও জনাব আমজাদ হোসেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সচিব হিসেবে পাকিস্তান দিল্লী মিশনে কর্মরত ছিলেন। প্রবাসী সরকার ১৭ই এপ্রিল গঠিত হওয়ার খবর জেনে তারা দু'জনে দুতাবাস থেকে Defect করে ভারতীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থিনা করেন। ভারত সরকার তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে তাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদেরকেও আমাদের মত গোপন আরেকটি সেফ হাউজে রাখা হয়েছে। আমাদের মত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দু'জন তরুণ অফিসারও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। খুব খুশি হলাম ওদের পেয়ে। তারাও খুশি হলেন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। ওরা বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই বলেছিলেন। আমাদের মতো অভিজ্ঞ অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন, তারা সে কথাও উল্লেখ করলেন।

ইতিমধ্যে আমরা বিগ্রেডিয়ার নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মুজিবনগর সরকারের সাথে আমাদের বিষয়ে ভারত সরকার কোন যোগাযোগ করছে কিনা? জবাবে বিগ্রেডিয়ার জানিয়েছিলেন যোগাযোগ করা হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কয়েকজন নেতা আসছেন দিল্লীতে। তাদের কাছেই আমাদের হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হবে। এটা ছিল আমাদের জন্য একটি বিশেষ সুখবর। অবশেষে, একদিন প্রতিনিধি দল এসে পৌছাল। জনাব তাজুদ্দিন আহমদ (প্রধানমন্ত্রী), জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) এবং কর্নেল ওসমানী (মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ) এরাই প্রতিনিধি দলের মূল ব্যক্তি। বৈঠকের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন হঠাৎ করে বললেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের আরো সপ্তাহ দু'য়েক দিল্লীতেই থাকতে হবে। এ সময়ে ভারতীয় বিভিন্ন এজেন্সির বিশারদরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সর্ম্পকে ব্রিফিং দেবেন এবং স্পেশালাইজড অফিসার হিসেবে আমাদের যুদ্ধে যোগদানের পর যে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হবে সে বিষয়েও বিস্তারিত জানাবেন।

তার সিদ্ধান্ত শুনে কিছুটা অবাক হলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে না জেনে ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ব্রিফিং নিতে হবে কেন? তাহলে আমাদের সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের সহানুভূতি নিঃস্বার্থ নয়? বুঝতে পারলাম ভারত সরকারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকলো ব্যাপারটা। বেশ কিছু প্রশ্ন দেখা দিল মনে।

বাংলাদেশের সংগ্রাম কাদের সংগ্রাম? কাদের নিয়ন্ত্রনে সংগঠিত হচ্ছে এ যুদ্ধ? ভারত নেপথ্যে থেকে কি স্বার্থে কলকাঠি নাড়ছে? পৃথিবীর সব দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে সংগঠিত হয়েছে, জাতীয় সরকারের অধিনে। আমাদের বেলায় এর ব্যাতিক্রম কেন? কেন তড়িঘড়ি করে প্রবাসে দলীয় আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হল ভারত সরকারের প্রচ্ছন্ন অনুমোদনে? জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত আপামর জনগণের উপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার উদ্দ্যেশ্য কি? আইয়ূব বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে শুরু করে উনসত্তরের গণআন্দোলন সবকিছু সংগঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সবগুলো রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের একলা চল নীতি কি কারণে সমর্থন করছে ভারত সরকার?

পরদিন আমাদের স্থানান্তরিত করা হল দিল্লীর পালাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাছে গ্যারিসন এলাকার একটি সামরিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রে। সেখানে পরিচয় হল মেজর সুরজ সিং এর সাথে। পাকানো স্বাস্থের অধিকারী মেজর সুরজ সিং একজন বিচক্ষণ কমান্ডো এবং **Insurgency and counter insurgency expert;** ব্রিগেডিয়ার নারায়ণও তাই। এরা দু'জনেই আমাদের মূল শিক্ষক। আমাদের জন্য দু'সপ্তাহের একটি **crash course** এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে **Insurgency and counter insurgency, guerilla warfare, urban warfare, jungle warfare, shall arms, explosive, unarmed combat** সবকিছুই রয়েছে। **Specialized officer** হিসেবে আমরা তিনজনই এ সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত। তবুও যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দেবার আগে আমাদের জ্ঞানকে ঝালাই করে নেবার সুযোগ পেয়ে ভালোই হল। শুরু হল আমাদের প্রশিক্ষন। এ সমস্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি চললো স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত ব্রিফিং। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান আর্মির শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ প্রভৃতি সংগঠনের বাঙ্গালী সদস্যরা। তাদের কেন্দ্র করে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেশাধারী জনগণের বৃহদাংশ। ভারত সরকার বাংলাদেশের ঘটনাবলী অতি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষন করছে। বাংলাদেশ থেকে বর্ডার ক্রস করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে লক্ষ লক্ষ শরনার্থী। এভাবেই ভারত সরকার সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে, অনেকটা মানবিক কারণেই। স্বতঃর্স্ফুতভাবে গড়ে উঠা স্বাধীনতার সংগ্রামকে ফলপ্রসু করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের। আওয়ামী লীগকেই দিতে হবে সেই নেতৃত্ব। এর জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সরকার। ভারত আওয়ামী লীগ ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্বাস করে। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে সংগঠিত করে তুলতে হবে এ সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ ও সদ্য গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনের বাইরে অন্য কোন রাজনৈতিক দল ভিন্ন কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী গ্রুপ কিংবা ব্যক্তি কাউকেই কোন সাহায্য করবে না ভারত সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের একক কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিরোধিতা করতে পারে মূলতঃ দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি।

প্রথমত: পাকিস্তান সেনা বাহিনীর প্রাক্তন সব সদস্যরাই দীর্ঘ দিন যাবত রাষ্ট্রে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব করেছে। তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তাই এ সংগ্রামের কর্তৃত্ব দাবি করে তারা ক্ষমতালিপ্সু হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: হুমকি আসতে পারে চরমপন্থী নকশালীদের কাছ থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটেছে চরমপন্থীদের। তাছাড়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি প্রদেশে নকশালী তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। ভারতের পূর্বাঞ্চলের নকশালীরা বাংলাদেশের চরমপন্থীদের সাথে এক হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগে মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠতে পারে। এই মিলিত

শক্তি আবার একত্রিতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে নেবার চেষ্টাও করতে পারে ঐ সমস্ত অঞ্চলের চলমান বিচ্ছিন্নবাদী সংগ্রামে। এসমস্ত ক্ষমতালিপ্সু শক্তিসমূহকে সমূলে উৎপাটন করে যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ এখন থেকেই গ্রহণ করা উচিত বলে ভারত সরকার মনে করে। একইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে কোনক্রমেই ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে না দাড়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তের ফলে তার জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। এ ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীও একমত হয়েছেন। যৌথ উদ্যোগে একটি পরিকল্পনাও প্রনীত হয়েছে। ঠিক হয়েছে, আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হবে। এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হবে এক লক্ষ। বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্পে ওদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এ বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট, ডিপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সব কিছুই থাকবে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডের আওতার বাইরে। এ বাহিনী সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বারা। এদের সশস্ত্র করা এবং পরিচালনা করার দায়িত্ব নেবে ভারত সরকার। ভারত সরকারের তরফ থেকে এ বাহিনী গঠনের মূল দায়িত্বে থাকবেন জেনারেল ওবান সিং। এদের মূল কাজ হবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা। প্রশিক্ষণের পর এদের দলে দলে পাঠানো হবে বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে। ভেতরে গিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে তারা প্রস্তুত হয়ে থাকবে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি যে কোন চ্যালেঞ্জ এর মোকবিলা করার জন্য। এ বাহিনীর নাম রাখা হবে বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স)। যুদ্ধকালে এবং স্বাধীনতার পরে পর্যায়ক্রমে ঐ বাহিনীর নাম রাখা হয় মুজিব বাহিনী এবং কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী। বাংলাদেশ সরকার আমাদের তিনজনকে মনোনীত করেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহযোগিতায় এই বিএলএফ গঠন করার জন্য। আমাদের **totally non-political** মনে করে এবং মুজিবর রহমানের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা দেখেই বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমাদের পেশাগত যোগ্যতা, সাহস, অন্ধ দেশপ্রেম, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সিনসিয়ারিটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই কনভিন্স হয়েছিলেন দুই সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল। সুদূরপ্রসারী এ নীল নকশা এবং ভারত সরকারের মনোভাব জানতে পেরে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠল। গত কয়েকদিন যাবত মনে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছিল সেগুলোর অনেকগুলোরই জবাব পেয়ে গেলাম। জানবাজী রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, অকাতরে প্রাণ দিতে কুন্ঠিত হচ্ছেন না যারা, তাদের প্রতি কী অবিশ্বাস! ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করার কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র! শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের সাথে কী চরম বিশ্বাসঘাতকতা! চানক্যবুদ্ধির এ নীল নকশা ফাটল সৃষ্টি করবে জাতীয় ঐক্যে। জাতি হয়ে পড়বে বিভক্ত। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত হয়ে উঠবে দুর্বল। নস্যাৎ হয়ে যাবে জাতীয় সংগ্রামী চেতনা। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত দুর্বল বাংলাদেশ পরিণত হবে একটি করদ রাজ্যে। নাম সর্বস্য বাংলাদেশের খোলসে অর্থহীন হয়ে পড়বে স্বাধীনতা। আট কোটি বাংলাদেশীর মুক্তির আকাঙ্খা পথ হারাবে বিশ্বাসঘাতকতার চোরাবালিতে। একই সাথে র্নিমূল করা হবে ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্বার স্বাধীনতার সংগ্রামগুলোকেও।

মন বিদ্রোহ করে উঠল। এ চক্রান্তের অংশীদার হতে পারবো না। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এ নীল নকশার বিরুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে সহযোদ্ধাদের। ঐক্যমত্য সৃষ্টি করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে; অতি সংগোপনে। অন্যের দেয়া নামেমাত্র স্বাধীনতা নয়, প্রকৃত স্বাধীনতাই অর্জন করতে হবে। নিজেদের শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। শিক্ষা নিতে হবে গণচীন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস থেকে।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬শে মার্চের কালোরাত্রি, মুক্তিযুদ্ধের জন্য আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ সর্ম্পকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি সর্ম্পকে মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার বই

'সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, "২৫শে মার্চের রাতে সামরিক জান্তার পাশবিক ক্র্যাকডাউনের পর যেহেতু ঐ ধরনের কোন সামরিক অভিযানের মোকাবেলা করার কোনো প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের ছিল না সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাদের সবাই ভারতে পালিয়ে গিয়ে কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, 'অখন্ড ভারতের' স্বপ্নদ্রষ্টা পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর যোগ্য উত্তরাধিকারী দীর্ঘদিন যাবত এ ধরনের একটি সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। শ্রীমতি গান্ধী এই সুবর্ণ সুযোগের সময়মত যথাযথ সদব্যবহারই করলেন। ভারত যে শুধুমাত্র তাদের দীর্ঘদিনের প্রধান ও এক নম্বর শত্রু পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে দেশটিকে দুর্বল করতে সক্ষম হয় তাই নয়; এই মুক্তিযুদ্ধের আবরণে সাফল্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গ ও তার আশেপাশের প্রগতিশীল বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলোকেও নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়।"

<u>২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ এর বিভিষিকাময় কালোরাত্রির প্রত্যক্ষ সাক্ষী:</u>
খালাম্মা, নিম্মী এবং বাপ্পী ২৫-২৬শে মার্চের আর্মি অপারেশন এবং এর ভয়াবহ পরিণামের জীবন- সাক্ষী। তাদের বর্ণনা লোমহর্ষক এবং এক করুণ উপাখ্যান।

ফেব্রুয়ারীর শেষে মা (খালাম্মা) কোলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। উদ্দ্যেশ্য দেশের অবস্থা দেখে শুনে প্রয়োজন হলে আমাকে ও নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতায় ফিরে যাবেন। ২৫শে মার্চ রাত প্রায় ১০টা অব্দি তিনি শেখ সাহেবের বাসাতেই ছিলেন। ৩২নং ধানমন্ডি থেকে লালবাগের বাসায় ফেরেন রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। বাসায় ফেরার পর সবাই তাকে ধরে বসলাম নেতা কি বললেন? মা শুকনো বিচলিত কন্ঠে জবাব দিলেন,
-নেতাকে অনেক বোঝানোর পরও তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে রাজি হলেন না। পার্টির নেতা কর্মীরা, ছাত্রনেতারা, অন্যান্য অনেকেই আসন্ন সামরিক অভিযান সম্পর্কে শেখ মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, পাক বাহিনী যদি জনগণের উপর ঝাপিঁয়েই পড়ে তখন জনগণের পাশে থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন সেটাই তাদের প্রত্যাশা। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের এক কথা, তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অস্ত্রের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। পাক বাহিনী নিরীহ জনগণের উপর শ্বেত সন্ত্রাসের ষ্টিম রোলার চালিয়ে দেবে এ ধারণা সম্পর্কেও তার দ্বি-মত ছিল। তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেছিলেন, প্রয়োজনবোধে সামরিক জান্তা তাকে বন্দী করবে কারণ তাদের বিরোধ তার সাথে। কিন্তু অনেকেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে বর্তমানের দ্বন্দ্ব শুধু সামরিক জান্তা ও শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; আজকের দ্বন্দ্ব সামরিক জান্তা এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে। এ সত্যকে অস্বীকার করা হবে মারাত্মক ভুল। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ স্বাধীনতার জন্য উম্মুখ। যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা প্রস্তুত। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব হবে তাদেরকে সংগঠিত করে যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকা। সামরিক অভিযানের মোকাবেলায় প্রয়োজনবোধে অস্ত্রও হাতে তুলে নিতে হতে পারে। এর জন্য মানসিকভাবে নেতৃত্ব ও জনগণকে তৈরি থেকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতিও নেয়া উচিত। এতেই কমবে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি, জনগণ ছিনিয়ে নিতে পারবে তাদের ইপ্সিত স্বাধীনতা। কিন্তু শেখ মুজিব কোন যুক্তিই গ্রহণ করলেন না। তার শেষ কথা, '২৭শে মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।' এ কর্মসূচী ঘোষণা করে তিনি সবাইকে বিদায় করলেন। ঘোষণার সাথে এটাও তিনি বলেছিলেন,'পাক বাহিনীর আক্রমনের ভয় যারা করেন তারা গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিতে পারেন।' সেদিন রাতে যারা ৩২নং ধানমন্ডিতে সমবেত হয়েছিলেন তারা তার নেতিবাচক মনোভাবে হতাশ হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন তার ঘোষণা শোনার পর। মাও ফিরে এসেছিলেন চিন্তিত মন নিয়ে। যেখানে সবাই ধারণা করছে পাক বাহিনী সামরিক অভিযান চালাবে সেখানে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কি কোন কিছুই করার নেই? জনগণকে সে ধরণের শ্বেত সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করার কোন দায়িত্বই কি নেই জনাব শেখ মুজিব ও তার দলের? তাহলে সেই চরম পরিস্থিতির হাত থেকে সাধারণ নিরস্ত্র জনগণকে বাচাঁবে কোন নেতৃত্ব? শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগকেই তো নেতৃত্বের স্থানে মেনে নিয়েছে দেশবাসী। তাদের ডাকেই তো সাড়া দিয়ে সংগ্রামকে এ পর্যায়ে

নিয়ে এসেছে জনগণ অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। সংগ্রামের চরম পর্যায়ে কেন তবে নেতা শেখ মুজিব পিছিয়ে যাচ্ছেন জনগণকে আগে ঠেলে দিয়ে? এ সমস্ত প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে না পেয়ে মা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল; আতংকিত হয়ে উঠেছিল তার স্পর্শকাতর মন। সচেতন বিবেক তার কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না নেতার এ ধরণের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত। সব বৃত্তান্ত শুনে আমরা সবাই হতবাক! এটাই যদি শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে কি আর করার আছে? শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সময় অতিবাহিত করা ছাড়া কিছুই করার নেই। একমাত্র সময়ই বলতে পারবে শেখ মুজিবের চিন্তা-ভাবনা ও তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কতটুকু!

মার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ রাতটা সবাই জেগেই কাটাব ঠিক হল। বাবুন ও আমি খাবার পর কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বের হলাম অবস্থা বুঝে আসার জন্য। রাত প্রায় ১১.৩০ মিনিটের দিকে ফিরে এসে জানালাম নিউমার্কেট, ইউনিভার্সিটি এলাকায় আর্মি টহল দিচ্ছে। রেডিও ষ্টেশনেও কড়া আর্মি নিরাপত্তা বহাল করা হয়েছে। সমস্ত শহর ছেয়ে গেছে আর্মিতে। রাত বেশ গভীর। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ করে কিছু একটা এগিয়ে আসছে বলে মনে হল। শব্দটা ভালো করে শুনে আমি বললাম, শহরে ট্যাংক নামানো হয়েছে। ঐ বিকট ঘড়ঘড় শব্দটা ট্যাংক চলার শব্দ। শহরে এত রাতে ট্যাংক কেন! এক অজানা আশংকায় সবার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল। দেয়াল ঘড়িটাতে সময় এগিয়ে চলছে টিক্‌টিক্‌। রাত প্রায় বারোটা। আচমকা রাতের নিরবতা ভেঙ্গে গর্জে উঠলো কামান, মর্টার, ট্যাংক, মেশিনগান, রিকয়েলেস্ রাইফেল। কেপে উঠল গোটা ঢাকা শহর। জানালার কয়েকটি কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ভূ-কম্পনে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হুমড়ি খেয়ে পরলাম ঘরের মেঝেতে। আমি তড়িৎ গতিতে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। সবরকম অস্ত্র নিয়ে পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর। গোলাগুলির আওয়াজ আসছে সবদিক থেকেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম, সমস্ত আকাশ ফ্লেয়ার ও ট্রেসারের আলোতে উদ্ভাসিত। আগুনের ফুলকির মত ছুটে চলেছে অগুনিত ট্রেসার বুলেট। আজিমপুর, নিউমার্কেট, পিলখানা, ইউনিভার্সিটি এলাকায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আকাশে পেঁচিয়ে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী, অল্পক্ষণ পরে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে শোনা গেল মানুষের মরনকান্না, আহতের আর্তনাদ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মৃত্যু যন্ত্রনার হাহাকার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। শ্বেত সন্ত্রাসের পাশবিক তান্ডবলীলায় কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে পরে থাকলাম সবাই। এভাবেই কেটে গেল রাত। সকাল হল। পোড়া বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। রেডিও খুলতেই শোনা গেল বিশেষ জরুরী ঘোষণা, গতকাল মধ্যরাত থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছে। জনগণকে বাইরে বেরুতে মানা করা হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে না জড়ানোর জন্য হুশিঁয়ার করে দেয়া হচ্ছে সবাইকে। কারফিউ জারি করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে, কিছুই করার নেই। শেখ মুজিব ও তার দলের চিন্তা-ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল। আমরা সবাই নেতার কথাই ভাবছিলাম। ক্ষণিকের জন্য মনে ভেসে উঠেছিল তার চেহারাটা। নেতা কি অবস্থায় আছেন? আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দই বা কোথায়? কারফিউ চলছে। বেরোবার কোন উপায় নেই। বাসায় দরজা-জানালা বন্ধ করে পুরো ২৬শে মার্চ সবাই অন্তরীন হয়ে থাকলাম। সন্ধ্যার পর আবার গোলাগুলি, আর্তনাদ, মিলিটারি বহনকারী যানবাহন চলাচলের শব্দ, ভারী বুটের আওয়াজ রাস্তায়। নিশ্চুপ হয়ে আলো নিভিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দোয়া-কালাম পড়তে থাকলেন সবাই। অত্যন্ত অসহায় অবস্থা। যে কোন মুহুর্তে দরজা ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে জল্লাদ বাহিনী। শুরু হতে পারে লুটতরাজ, মারপিট, ধর্ষণ। বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে ছিলাম আমি, বাবুন, মুন্নি, নুন্নি এবং মাও। মেয়েদের সবাইকে ছাদে পানির ট্যাংকে লুকিয়ে রাখা হল। চরম যে কোন অঘটন ঘটার প্রতীক্ষায় অসহায় চেতনাহীন অবস্থায় বসে রইলেন মুরুব্বীরা। সময় কাটছিল না কিছুতেই। ভোর হল একসময়। সূর্যের আলোয় প্রাণ ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠলাম সবাই। রেডিও খুলতেই ঘোষণা শোনা গেল, সরকার কিছু সময়ের জন্য কারফিউ তুলে নিয়েছে সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে। ঘর থেকে সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ৫-৬ জন ইপিআর এবং বাঙ্গালী সৈনিকদের একটি ছোট দল

ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে দু'জন গুরুতরভাবে আহত। রক্তে ভেসে গেছে ওদের পরিধেয় কাপড়-চোপড়। কাছাকাছি পৌঁছে তাদের একজন আকুতি জানালো,

— ভাই একটু পানি দেন।

বললাম,

— নিশ্চয়ই। আসুন আমাদের বাসায়।

— না ভাই, আমাদের সময় নেই। অতি কষ্টে পালিয়ে বেচেছি। নদীর ওপারে না পৌঁছার আগে আমরা নিরাপদ নই। খান সেনারা আমাদের মত সবাইকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে রক্ষা নেই। কুকুরের মত গুলি করে মারবে।

আমি দৌড়ে গিয়ে বাবুনের সহায়তায় বালতি করে পানি এনে তাদের খাওয়ালাম। পানি খাবার পর ওরা কিছুটা প্রকৃতস্থ হল।

— আপনাদের এ অবস্থা কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

— ভাই হানাদার বাহিনী সব শেষ করে ফেলেছে। তারা মাঝরাতে অতর্কিতে হামলা করে পিলখানা, পুলিশ লাইন ও ক্যান্টনমেন্টের বাঙ্গালী ইউনিটগুলির উপর। ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে হাজার হাজার সৈনিক। যারা পেরেছে তারা পালিয়ে বেচেঁছে আমাদের মত। বস্তিগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটির হলগুলোকে গোলার ঘায়ে ধুলি্যসাৎ করে দেয়া হয়েছে। মারা গেছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। সমস্ত শহরে আর্মি টহল দিচ্ছে। কাউকে দেখে এতটুকু সন্দেহ হলেই গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। আপনাদের মত তরুণরাই ওদের টার্গেট। ভাই আপনারাও পালান। চলে যান শহর ছেড়ে গ্রামে। হানাদার বাহিনীর কবল থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আপনাদের মত তরুণ যুবকদের প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা চলি ভাই। বেচে থাকলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্।

বিদায় জানিয়ে একইভাবে দৌড়ে চলে গেল ওরা। জোয়ান ভাইদের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম সবাই। একি ব্যাপার! কি করে এতটা বর্বর আর হিংস্র হয়ে উঠতে পারল পাকিস্তানের শাসকরা! তাদের হঠকারী পদক্ষেপ পাকিস্তানের অখন্ডতার মূলেই কুঠারাঘাত হেনেছে। এরপর পূর্ব পাকিস্তান কোনক্রমেই আর পাকিস্তানের অংশ হিসাবে থাকতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করেই এই ন্যাক্কারজনক শ্বেত সন্ত্রাসের জবাব দিতে হবে। কারফিউ উঠিয়ে নেয়ার সুযোগে বাইরে বেরিয়ে অবস্থাটা সচক্ষে একটু দেখে আসার ইচ্ছে হল। বাসায় ফিরে প্রস্তাবটা দিতেই মা, বাবুন এবং নিম্মী সঙ্গে যেতে চাইলো। কোন যুক্তিই তারা শুনল না। একা আমাকে কিছুতেই ছাড়বেনা ওরা। অগত্যা চারজনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় অসম্ভব ভীড়। লোকজন, যানবাহন সবই ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। সবাই চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ বেরিয়েছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। বাসার কাছের বস্তি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সমস্ত বস্তি লোকশূন্য। নিউমার্কেটের পাশে, কাটাবন, নীলক্ষেত বস্তিরও একই অবস্থা। সমস্ত পিলখানা আর্মি ঘিরে রেখেছে। প্রতিটি রাস্তায় মেশিনগান ফিট করা খান সেনা বহনকারী ট্রাকগুলো টহল দিচ্ছে। রাস্তার স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি এলাকা একদম ফাঁকা। থমথম করছে। ইকবাল হল (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রস্থল), জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল মর্টার ও ট্যাংক ফায়ারে ইট ও কংক্রিটের ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। হলগুলোর মাঠে বুলড্রেজার দিয়ে গণকবর খুড়ে পুতে দেয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তিদের লাশগুলো। রোকেয়া হলের কাছে এ ধরণের একটি গণকবরে তাড়াহুড়া করে পুতে রাখা একটি লাশের দু'টো পা বেরিয়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। দেখে আতঁকে উঠলাম সবাই। মিলিটারি গাড়িগুলো থেকে খান সেনারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল আমাদের। হঠাৎ মার খেয়াল হল এভাবে ঘোরাফেরা করাটা মোটেও নিরাপদ নয়। বাসাবো, রামপুরা টিভি ষ্টেশন, কমলাপুর রেল ষ্টেশন, রেডিও ষ্টেশন ঘিরে রেখেছে শত শত আর্মি। কালো পোশাক পরিহিত মিলিশিয়া বাহিনীকেও নামানো হয়েছে। সব জায়গায় বস্তিগুলো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে দু'রাতের মধ্যেই। মালিবাগে তোদের বাসায় সবার খবর নিতে গেলাম। আমাদের দেখে চাচা অবাক হয়ে গেলেন। ভীষণ রেগে গিয়ে মাকে বললেন,

— কোন সাহসে আপনারা বেরিয়েছেন? এক্ষুণি ফিরে যান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসা ছেড়ে গ্রামে চলে যান নদী পার হয়ে। আমরাও সরে পড়ছি। ঢাকা শহর মোটেও নিরাপদ নয়।

যে স্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখার জন্ম দিয়েছিল

২৫-২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালের বিভিষিকাময় কালোরাত্রির কয়েকদিনের মধ্যে পাকিস্তান আর্মি ঢাকা শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। টিভি এবং বেতারে সরকারি প্রচারণা স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের কর্মস্থলে ফিরে যেতে নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু সমগ্র জাতি তখন যুদ্ধে নিয়োজিত।

মেজর জিয়ার তূর্যধ্বনি অগ্নিশিখার সৃষ্টি করেছিল সমগ্র জাতির মধ্যে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরা সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারাদেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুললো। শুধুমাত্র ঢাকা শহরই পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রনে রইলো। মুক্তিযোদ্ধারা জয় করে নিয়েছিলো দেশের অন্যান্য প্রায় সব অঞ্চল- চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর। পুরো দেশটাই তখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রনে। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং আপমর জনসাধারন যোগ দিলেন বিদ্রোহী সৈনিকদের সাথে।

পুরো পূর্ব পাকিস্তানে এভাবেই তখন পরিণত হয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্রে। বিভিন্ন জায়গায় প্রচন্ড লড়াই হয়। সদ্য গঠিত মুক্তিবাহিনী সব জায়গাতেই অসীম সাহসিকতার সাথে খান সেনাদের সাথে আগ্রাসনের বিরোধিতা করছিল বীরবিক্রমে এবং প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে। যতটুকু সম্বল ছিল তা দিয়েই সৈনিকরা ট্রেনিং দিচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। সবকিছুই ঘটছিল স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে। পাক বাহিনী দেশের শহরগুলো পুনরোদ্ধার করার জন্য বিপুল পরিমাণে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাচ্ছিল প্রতিটি জেলা এবং মহকুমায়। ফলে এপ্রিলের মাঝামাঝি খানসেনারা শহর বন্দরগুলো দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এর ফলে সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের পুর্নগঠিত করে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে হাজার হাজার শরনার্থী ভারতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের বেশিরভাগই ছিল ‘হিন্দু’ সম্প্রদায়ের লোকজন। ভারত সরকার পরোক্ষভাবে প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানায়। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের অনেকেই ভারত চলে যায় নিজেদের বাহিনী পুর্নগঠনের জন্য। কারণ সেই মুহূর্তে পাক বাহিনীর সুশিক্ষিত এবং উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তির মুখোমুখি মোকাবেলা করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কমান্ডাররা সিদ্ধান্ত নেন দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করে দেশ স্বাধীন করার।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬শে মার্চ কালোরাত্রির সাক্ষী হয়ে আছে সেই সময়ের দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলি।

ভয়াবহ সামরিক অভিযানের নিষ্ঠুর পাশবিকতার লোমহর্ষক কাহিনী প্রচার করেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকগন। তাদের বর্নিত ঘটনাবলী ছিল অতি করুণ এবং মর্মান্তিক।

২৫শে মার্চের কালোরাত্রির শ্বেত সন্ত্রাস এবং নৃশংস হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী ও চাক্ষুস বিবরণ আজঅব্দি অনেক ছাপা হয়েছে। ভুট্টোর আমলের সেনা প্রধান '১৯৭১ সালের জল্লাদ' জেনারেল টিক্কা খান প্রখ্যাত মিশরীয় সাংবাদিক জনাব হাইকেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার আমলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি যখন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে যাই তখন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি ছিল অতি দুর্বল। সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে অপারগ ছিল। তাদের সাথে জনগণ কোনরূপই সহাযোগিতা করছিল না। গোয়েন্দা বিভাগসমূহের বাঙ্গালী কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিকতায়ও যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করি। এর আগে এমন পরিস্থিতি কখনও হয়নি। সেনাবাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরাই ছিল আমাদের খবরা-খবরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। বেঈমান মুজিবের কারসাজিতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা সেনাবাহিনীকে রীতিমত বয়কট করেছে।" জনাব হাইকেলের মতে জেনারেল টিক্কা বুঝতে পারেননি তিনি একটি জাতীয় বিপ্লবের মোকাবেলা করছিলেন। তিনি জানতেন না এ বিপ্লবের শিকড় প্রথিত ছিল তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনায়। বাঙ্গালীর স্বাধীকারের দাবির পেছনে যুক্তিও ছিল প্রচুর। এরপর ঢাকা আলোচনা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল সে কথা বলতে গিয়ে জেনারেল টিক্কা খান জনাব হাইকেলকে বলেন, "ঢাকা আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রপতি আমাকে আদেশ দেন, ২৫শে মার্চ রাতে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বাঙ্গালী বিদ্রোহ দমন করে পূর্ব পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য।" জনাব হাইকেল এর বর্ণনায়, "২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটে পাক বাহিনী ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজে ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙ্গালীরা জেগে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, পুলিশের হেডকোয়টার্স মতিঝিল এবং ইপিআর এর সদর দফতর পিলখানায় মূল আঘাত হানা হয়। অবিশ্রান্তভাবে গোলাগুলি চলতে থাকে। মেশিনগান, রকেট, এমনকি ট্যাঙ্ক ফায়ারিং এর আওয়াজও শোনা যায়। সাথে মুমুর্ষ ব্যক্তিদের মরন চিৎকার। রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠে ফ্লেয়ার ফায়ারিং এ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলকে রিকয়েলেস রাইফেল এবং মর্টার ফায়ারে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। মারা যায় অসংখ্য ছাত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ হারায় অগনিত লোক।" তার প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাক বাহিনীর আক্রমণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, "মাঝরাতের পরপরই পাকিস্তান আর্মির সাঁজোয়া বাহিনীর একটি কলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে যায়। সেনাবাহিনী বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী দখল করে সেটাকে ফায়ার বেস করে ছাত্রাবাসগুলির উপর আক্রমণ চালায়। ঘুমন্ত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ইকবাল হলের দুইশতেরও বেশি ছাত্র প্রাণ হারায়। বিদ্রোহী ছাত্রদের একটি কেন্দ্র ছিল ইকবাল হল। দু'দিন যাবত অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে ছিল মাঠে, পথে, হলগুলির চত্বরে এবং কক্ষগুলিতে। দু'দিন পরই সৈনিকরা হলগুলির প্রাঙ্গনে গর্ত খুড়ে মৃতদেহগুলিকে মাটি চাপা দেয়। গণ কবরগুলি খুড়তে বড় বড় বুলডোজার ব্যবহার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় বস্তিগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।"

জনাব হেনড্রিক ভানডার হেইজডেন, আন্তর্জাতিক ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা সে সময় ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দি নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রতিবেদন ছাপান। সেটা ১৪ই জুলাই লন্ডনের দি টাইমস এ প্রকাশিত হয়। তার উপর ভিত্তি করে একই দিনে দি টাইমস-এ একটি সম্পাদকীয়ও ছাপা হয়। পাক বাহিনীর পাশবিক আচরনের বিবরণ তাতে বিস্তারিতভাবে লেখা

হয়। সেই প্রতিবেদন পড়ে বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে যান। বিশ্ব পরিসরে বাঙ্গালীদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে জনাব হেনড্রিকের প্রতিবেদন ও দি টাইমস এর সম্পাদকীয় বিশেষ অবদান রাখে। ২৭শে মার্চ সকাল ৯টার সময় কারফিউ উঠিয়ে নেয়া হয় দুপুর পর্যন্ত। হাজার হাজার ভীত-সন্ত্রস্ত নর-নারী প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করে। পথে পাক বাহিনীর সৈন্যরা তাদের উপরও গুলিবর্ষন করে। অনেক নিরীহ ব্যক্তি এতে প্রাণ হারায়। উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকেও পলায়মান নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলি চালানো হয়। এভাবে জনগণের মনে ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হয়। সেনা ছাউনিতে আচমকা আক্রমণের ফলে শত শত নিরস্ত্র পুলিশ এবং ইপিআরের সৈনিকরা প্রাণ হারান। যারা বেচে যান তারা অস্ত্রাগার লুট করে শহরের জায়গায় জায়গায় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু বিপুল আক্রমণের মুখে তাদের অসংগঠিত প্রতিরোধ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে পরেন গ্রামে-গঞ্জে। পাক বাহিনী নৃশংস হিংস্রতায় তাদের ধাওয়া করতে থাকে।

সেনাবাহিনীর জেনারেল ফজলে মুকিম খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতের নিষ্ঠুর আগ্রাসনের তারিফ করে বলেন, "প্রয়োজনের খাতিরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ দমন করার জন্য মর্টার, রিকয়েলেস রাইফেল, মেশিনগান, এমনকি ট্যাঙ্কও ব্যবহার করতে হয়েছিল। সে রাতে মারণাস্ত্রসমূহের শব্দ থেকে মনে হচ্ছিল সমস্ত ঢাকা শহরই একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।"

ঢাকায় অবস্থানরত সব বিদেশী সাংবাদিকদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সেনা নিবাসে। সেখান থেকে তাদের সোজা এয়ারপোর্ট নিয়ে গিয়ে বিশেষ প্লেনে তুলে দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। সে রাতে বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে সেনাবহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। সেনাবাহিনীর হাত থেকে মাত্র তিনজন বিদেশী সাংবাদিক রেহাই পান। এরা গোপনে ঢাকায় লুকিয়ে থেকে সেনাবাহিনীর চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা ছিলেন জনাব আরণল্ড জেইথলিন, জনাব মিসেল লরেন্ট এবং সাইমন ড্রিংগ। তাদের মাধ্যমেই পরে বিশ্ববাসী ২৫-২৬শে মার্চ রাত্রের ঘটনাবলী এবং সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড সম্পর্কে জানতে পারে। জনাব সাইমন ড্রিংগ ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ এক বিবরণীতে লেখেন, "পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য ঢাকাকে চরম খেসারত দিতে হয়েছিল।"

খালাম্মা, নিম্মী এবং বাপ্পির দুঃসাহসিক পলায়ন

কোলকাতা দূতাবাসের ডিফেক্শনের পর চৌধুরী পরিবারের জন্য ঢাকা কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের কোন জায়গাই নিরাপদ ছিল না।

কোলকাতার মিশনের ডিফেকশ্নের খবরও আমরা জানতে পারি। এ খবর জানার পর পরিবারের সবাই বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাবাও ডিফেক্ট করেছেন সবার সাথে। খবর পেলাম তার এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে পাকিস্তান সরকার। প্রতিশোধের আক্রোশে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে সামরিক জান্তা। সবাই একমত হলেন, আমাদের আর লালবাগে থাকা ঠিক হবে না। সরে পড়তে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি (বাপ্পি), মা ও নিম্মী বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম আমাদেরই এক ফুপুর বাড়ি। কোন জায়গায় বেশিদিন একনাগাড়ে থাকা ঠিক নয়। তাই আমরা পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম বাড়ি থেকে বাড়ি। এভাবে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম আনু মামার বাড়ি, শহিদ মামার শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয় অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার পেরু মামার বাড়িতে। সে বাড়িতেই ঘটল বিভ্রাট। একদিন গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার এলেন পেরু মামার বাসায় কোন এক কাজে। সেখানে ঘটনাক্রমে তিনি মাকে হঠাৎ করে দেখে ফেলেন। মিসেস চৌধুরীকে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না তার। সন্দেহপ্রবন হয়ে ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। তিনি জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে খবরটা পৌঁছে দেন। পরদিনই পেরু মামার বাড়ি ও লালবাগের বাসায় একই সাথে রেইড করা হল আমাদের খোঁজে। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবসাব বুঝে আমরা ভদ্রলোক চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেরু মামার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। এভাবে আমরা বেঁচে যাই সে যাত্রায়। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল পাকিস্তানী গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিশোধ হিংসায় হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের। বাংলাদেশে আর থাকা সম্ভব নয়। পালিয়ে যেতে হবে সীমান্ত পেরিয়ে।

ইতিমধ্যে স্বপন, বদি ওরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমিও যাব তাদের সাথে। মা বাধ সাধলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে যাবে সেতো গর্বের কথা। কিন্তু তার আগে আমাদের কোলকাতায় তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে। আমাদের পৌঁছে দিয়ে তুমি যুদ্ধে যাবে তার আগে নয়।' মার যুক্তিসঙ্গত অনুরোধ উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। মা ও সমর্থ বোনের পালিয়ে যাবার দায়িত্ব যার তার উপর বিশ্বাস করে দিয়ে দেয়া চলে না। আমাকেই নিতে হবে এ কঠিন দায়িত্ব । পালাবার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ঠিক করা হয় ঢাকা থেকে পালিয়ে যাব নানা বাড়ি নবীনগর। সেখান থেকে সুযোগ মত কস্‌বা সেক্টর দিয়ে আগরতলায় পাড়ি জমাতে হবে। নবীনগর থেকে কি করে বর্ডার ক্রস করতে হবে সেটা নবীনগর গিয়েই ঠিক করতে হবে অবস্থা বুঝে। আনু মামা, আলতু নানাকে সঙ্গে নিয়ে মা, নিম্মী ও আমি এক রাতে নরসিংদী হয়ে নবীনগর এসে পৌঁছালাম। ঢাকা থেকে নরসিংদীর গাড়িতে। সেখান থেকে লঞ্চে নবীনগর একদম বাড়ির ঘাটে। নবীনগর গ্রামে খান সেনারা তখনও হানা দেয়নি। কিন্তু তবুও দলে দলে হিন্দুরা সব বসতবাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল ভারতে। বর্ধিষ্ণু নবীনগর গ্রামে খাঁ বাড়ি বিশেষ পরিচিত। বড় আব্বা ও নানা দাপটশালী জমিদার হিসাবে এক কালে দশ গ্রামে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বড় আব্বাকে বৃটিশ সরকার খেতাবেও ভূষিত করেছিল। প্রাসাদপম জমিদার বাড়ির সামনে জোড়া দীঘি। নবীনগরের মুক্ত পরিবেশে পৌঁছে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাচঁলাম। আনু মামা দু'একদিন বিশ্রাম করে ঢাকায় ফিরে গেলেন। তার পুরো পরিবার তখনও রয়েছে সেখানে। খান সেনাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আমরা পালিয়ে আসতে পারায় বাড়ির সবাই মহাখুশি। নবীনগরের শান্ত পরিবেশ এবং প্রকৃতির নির্মল সংস্পর্শে কয়েক দিনেই ভুলে গেলাম ঢাকার দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা। ২৫-২৬শে মার্চ রাতের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বাড়ি বাড়ি লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার বিড়ম্বনা, ২৭শে মার্চ সকালের তিক্ততা সবকিছুই দুঃস্বপ্নের মত অতীত হয়ে গিয়েছিল আমাদের কাছে। সনাতন দা গ্রামের বাড়ির মুরুব্বীদের একজন। পুরনো বিশ্বাসভাজন আপনজন।

বংশানুক্রমে তারা খাঁ বাড়ির জমিদারী তদারক করে এসেছেন। তিনিই সব দায়িত্ব নিলেন আমাদের বর্ডার পার করে দেবার। সার্বিক দেখাশুনা ও পালাবার পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারিনী সবার অতি আদরের ছোট নানী বেগম আমির আলী খান ও কবির। ছোট নানীর বড় ছেলে, হবিগঞ্জের এসডিও (SDO) জনাব আকবর আলী খান (খসরু মামা) খান সেনাদের শ্বেত সন্ত্রাসের বিরোধিতায় ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সময় আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অবস্থান করছিলেন। ঠিক হল আগরতলাতে খসরু মামার কাছেই যাব আমরা। একই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছেলে মোমেন আমাদের গাইড হয়ে সঙ্গে যাবে। সনাতন দা যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী তরুণ যুবক মোমেন অসীম সাহসীও বটে। ইতিমধ্যেই সে কয়েকটি শরনার্থী দলকে আগরতলায় নিজ তদারকিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে খান সেনাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। কসবা সেক্টর দিয়ে আগরতলা পৌঁছানোর চোরা রাস্তাগুলো ওর নখদর্পণে। ঠিক হল নৌকাযোগে মেঘনা, তিতাস পাড়ি দিয়ে খরস্রোতা গোমতী নদী বেয়ে কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া GT Road পর্যন্ত গিয়ে তারপর পদযাত্রা। বর্ডার পার হওয়ার পর পথিমধ্যে পড়বে একটি বড়সড় বাজার। সেখান থেকে ভাড়াটে গাড়িতে আগরতলা। বড় একটা গয়না নৌকা ঠিক করলেন নানী ও সনাতন দা। মাঝি-মাল্লারা সবাই অত্যন্ত বিশ্বস্ত। দুর্যোগপূর্ণ এক ঝড়ের রাতে আল্লাহ্‌র নাম করে মোমেন, কবির ও আলতু নানাকে সঙ্গে করে নৌকায় উঠে পাড়ি জমালাম এক অজানা ঠিকানায়। দুর্যোগের রাতে খান সেনাদের চোখ অতি সহজেই ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলেই ঝড়ের রাতে নৌকা যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বদর বদর বলে মাঝি-মাল্লারা মেঘনার উত্তাল বুকে অন্ধকারে নৌকা ভাসিয়ে দিল। ভাল করে সাঁতার জানি না আমি ও নিম্মী দু'জনেই। ঝড়ো হাওয়ায় মেঘনা হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ। বিশাল ঢেউয়ের পাহাড় ভেঙ্গে নৌকা এগিয়ে চললো দুলতে দুলতে। ঢেউয়ের দোলা ও ঝড়ের তীব্রতার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চুপ করে বসে আল্লাহ্-রাসূলকে স্মরন করতে থাকলাম সবাই। এমনি করে সারারাত একটানা নৌকা বেয়ে ফজরের ওয়াক্তে এক জায়গায় নৌকা ভেড়ালো মাঝিরা। সেখানে নেমে পড়তে হল সবাইকে।

শুরু হল পদযাত্রা। ধানক্ষেত, পাটক্ষেতের আলের উপর দিয়ে, কাদা পলির উপর দিয়ে খালি পায়ে হেটে পাহাড়ী টিলাগুলো পার হচ্ছিলাম। পরনে সবার গ্রাম্য লেবাস। দুপুরের আগেই GT Road এর কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। একটি পাটক্ষেতের মধ্যে সবাইকে লুকিয়ে রেখে মোমেন আর আমি এগিয়ে গেলাম রাস্তাটা রেকি করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলাম আমরা। রাস্তা ক্লিয়ার। ক্ষিপ্র গতিতে রাস্তা পার হয়ে দূরে চলে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দূরের জঙ্গলে গা ঢাকা দেবার আগে খান সেনাদের দৃষ্টিতে পড়লে রক্ষে নেই। নিঃঘাত মৃত্যু। পরি কি মরি সবাই দৌড়ে ছুটে চলেছি রাস্তা ক্রস করার জন্য। আর একটু গেলেই উচুঁ রাস্তা। হঠাৎ মোমেন বলে উঠলো, 'সবাই শুয়ে পড়ুন, খান সেনাদের টহল গাড়ি আসছে।' তার নির্দেশে সবাই ধানক্ষেতের কাঁদা পানিতে অসাড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। চারদিকে যতটুকু দৃষ্টি যায় ছোট ছোট পাহাড়, টিলা, ধান আর পাটের ক্ষেত। লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। ধানক্ষেতের কাদা-পানিতে মুখগুজে পড়ে থেকে সবাই প্রমাদ গুনছিলাম, 'যদি টহলদার খান সেনারা দেখে ফেলে!' ভয়ে নিম্মীর দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আল্লাহ্‌ই বাঁচানে ওয়ালা। খান সেনাদের গাড়িটা অল্প কয়গজ দূর দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। ওরা ধানক্ষেতে পড়ে থাকা মানুষগুলি দেখতে পেল না। গাড়িটি অনেক দূরে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলে সবাই উঠে এক দৌড়ে রাস্তা ক্রস করে অপরদিকের পাটক্ষেতে গিয়ে বসে পড়লাম। একটু দম নেয়া দরকার। মা বেচারীর ডান পা'টা কিছুদিন আগে ভেঙ্গে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটির সিড়ি থেকে পিছলিয়ে গিয়ে। ভাঙ্গা পা'টা দুঁনিয়ে ফুলে উঠেছে। অসম্ভব সহ্য শক্তি মার। মুখ ফুটে কখনও নিজের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে না। তাই শুধু বলল, একটু দম নেয়া যাক। আমি ও নিম্মী মার পায়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম হাটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। বুঝতে পারলেও কিছুই করার নেই।
বাকিটা পথ হেটেই যেতে হবে তাঁকে। মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করেছি আমরা। এখন থেকে বাকি পথের সবটুকুই পাহাড়ী উচু-নিচু পিচ্ছিল পথ। সবাই কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু

মুখে কিছুই বললাম না। মাকে উৎসাহ দেবার জন্য হেসে বললাম, ‘মা তুমি দেখছি হাটাতে আমাদেরকেও হার মানিয়ে দিলে। কষ্ট হচ্ছেনা তো?’ কোন জবাব না দিয়ে মা উঠে দাড়াল। আবার শুরু হল হাটা। হাটতে হাটতে সন্ধ্যার সময় আমরা পৌঁছলাম সেই বাজারে। বর্ডার এলাকার বাজার। কিন্তু শরণার্থীদের ভীড়ে পুরো বাজারটাই গমগম করছে। চালের বস্তা ভর্তি অসংখ্য ট্রাক দাড়িয়ে আছে। মোমেন বলল, ‘আমরা পৌঁছে গেছি।’ ঐ চাল বাংলাদেশ থেকে স্মাগলড হয়ে চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়। কিছুদূর এগুতেই বাজারের অন্যপ্রান্তে একইভাবে দাড়িয়ে আছে পাট ভর্তি ট্রাকের সারি। ওগুলোও পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ থেকেই।

দীর্ঘপথ চলায় সবাই তখন পরিশ্রান্ত। একটা চায়ের দোকানে বসে পানি, কিছু চা-নাস্তা খেলাম সবাই। খাওয়া শেষে একটি পুরনো জিপ গাড়ি ভাড়া করে আগরতলার পথে রওনা হলাম। ছোট্ট জিপটাতে প্রায় ১২জন যাত্রী ঠাসাঠাসি করে ঢোকালো ড্রাইভার। কিছুই বলার নেই। এটাই রীতি। বাজার থেকে আগরতলার দূরত্ব প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল। পুরনো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আমলের জিপ। ১২-১৪ জন যাত্রীর ভারে আর্তনাদ করতে করতে কোনমতে এগিয়ে চললো আগরতলার পথে। কিছুদূর যাবার পর গাড়ি থামিয়ে বনেট খুলে পানি ঢেলে বুড়ো ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করতে হচ্ছিল বারবার। এভাবেই অতি কষ্টে রাত প্রায় ১২টায় আমরা এসে পৌঁছালাম আগরতলা শহরে।

শহর থেকে ৫-৬ মাইল দূরে এক পোড়া রাজবাড়িতে খসরু মামা ও আরো কয়েকজন পদস্থ বাঙ্গালী অফিসার সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। মোমেন জায়গাটা আগেই দেখে গেছে। জিপ থেকে নেমে রিক্সা করে চলে গেলাম সেই আস্তানায়। রাজবাড়িতে পৌঁছে খুজে বের করতে বেগ পেতে হলনা খসরু মামাকে। খসরু মামা আমাদের সবাইকে দেখে অবাক,
-হেনা বুজি আপনারা?
-হ্যাঁ পালিয়ে এলাম। মোমেনই নিয়ে এসেছে আমাদের। ঢাকায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তার স্বপ্ন এবং পরিকল্পনা।

মুজিব নগর হেডকোয়াটার্সে আমরা পৌছানোর পর কর্নেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে শুরু হয়েছিল; বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে এক বিশদ বিবরণ দিলেন। তিনি শুরু করলেন, "তোমাদের মনে রাখতে হবে ২৫শে মার্চের পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমনের পর ২৬শে মার্চ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙ্গালী সৈনিক, প্রাক্তন ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বীর জোয়ানরা। ২৬-২৭শে মার্চ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বীর জোয়ানদের সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এসে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্র, যুবক এবং আপামর জনসাধারণ। সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয় নিয়মিত পদ্ধতিতে। আর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে মে মাস পর্যন্ত। শত্রুকে ছাউনিতে যথাসম্ভব আটকে রাখা এবং যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ তাদের কব্জা করতে না দেয়ার জন্য নিয়মিত বাহিনীর পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হচ্ছিল। নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, যত বেশি বাধা সৃষ্টি করা যায় তা সৃষ্টি করা হবে। যে সমস্ত ন্যাচারাল অবস্ট্যাকল রয়েছে তা রক্ষা করতে হবে, সাথে সাথে শত্রুর প্রান্তভাগে এবং যোগাযোগের পথে আঘাত হানতে হবে। মূলতঃ এটাই ছিল নিয়মিত বাহিনীর রণকৌশল। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হওয়া সত্বেও নিয়মিত বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথেই এ পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রেজিমেন্টকে দু'টি ব্রিগেডের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়। সংখ্যায় কম থাকায় নিয়মিত বাহিনীর রণকৌশলে পরে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। কমান্ডাররা ছোট ছোট পেট্রোল বা ছোট ছোট কোম্পানী, প্লাটুনের অংশ দিয়ে শত্রুপক্ষের তুলনামূলক অধিক সংখ্যক সৈন্যকে এনগেজড করে রাখছিলেন। একই সাথে শত্রুর উপর আচমকা হামলাও চালানো হচ্ছিল। এভাবেই চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, যশোর, খুলনাতে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল। সে সময় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা বুঝতে পারছিলেন, কেবলমাত্র নিয়মিত পন্থায় যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। কারণ তখনকার পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছিল সর্বমোট ৫টি ব্যাটালিয়ন। তাদের সাথে ছিল ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, ছাত্র, যুবক ও জনতা। কমান্ডাররা ছাত্র যুবকদের অল্প কিছুদিনের ট্রেনিং দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে যোদ্ধার সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এ ধরণের শক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনীর ৩-৪টি ডিভিশনকে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাদের উপুর্যপরি আক্রমনের মুখে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিরোধ ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সে ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের এই বিশাল শক্তিকে ধ্বংস করে দেশকে স্বাধীন করা অসম্ভব হয়ে উঠে। তখনই কমান্ডাররা অনুভব করেন তাদের প্রস্তুত হতে হবে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের জন্য। এই পাঁচটি ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী। একমাত্র বিশাল গণবাহিনীই পারবে শত্রুপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিউট্রেলাইজড করতে। এ গণবাহিনী এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যেমন মানুষের পেটের অন্ত্রে একটি শক্তিশালী জীবানু অন্ত্রটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তেমনি ভেতর থেকে শক্তিশালী দক্ষ গেরিলা বাহিনী শত্রুর অন্ত্রকেও বিনষ্ট করে দেবে। এছাড়া দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কারণ শত্রুপক্ষের সংখ্যা বেশি। ওদের বিমান বাহিনী রয়েছে তাছাড়া সম্বলও তাদের অনেক বেশি।

কর্নেল ওসমানীর কথা শুনে মনে প্রশ্ন দেখা দিল? ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী যদি নিরীহ জনগণের উপর পৈশাচিক শ্বেত সন্ত্রাস না চালাত; একই সাথে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ এবং অন্যান্য সামরিক ইউনিটগুলোর বাঙ্গালী সদস্যদের উপর হামলা না চালাত; তবে কি স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটত? স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বাঙ্গালী বীর জোয়ানরা? এ ধাঁধাঁর জবাব ঐতিহাসিকরাই আগামীতে খুঁজে বের করবেন সে বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চললাম। কর্নেল ওসমানী বলে চলেছেন, "আমার বিশ্বাস ক্লাসিক্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার

করে দেশ মুক্ত করতে হলে বহুদিন যুদ্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ জনসম্পদ। সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

জনাব ওসমানীর কথায় টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ল। পৃথিবীর কোন জাতি তাদের মুক্তি অল্পত্যাগে পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যারা হয়তো বা পেয়েছেন তাদের সে স্বাধীনতা অর্থবহ হয়নি। প্রসুতির আতুঁর ঘর থেকেই বিভিন্ন চক্রান্তের স্বীকারে পরিণত হয়েছে তাদের সে স্বাধীনতা। ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও স্বাধীনতার সুফল জাতীয় মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নেতৃত্ব পৌঁছে দিতে পারেননি স্বাধীনতার সুফল জনগণের ঘরে ঘরে। অদৃশ্য কলকাঠির নড়াচাড়ায় যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে; সে সমস্ত দেশের পুতুল সরকারগুলোর কাছ থেকে জনগণ পেয়েছে শুধুই বঞ্চনা, প্রতারণা আর দারিদ্রের অভিশাপ।

আবার কর্নেল ওসমানীর বক্তব্য শুনতে মনযোগ দিলাম, "যুদ্ধকে স্বল্পস্থায়ী করার জন্য এপ্রিল মাসেই আমার মাথায় একটি প্ল্যান এসেছে। একাটি বড় গেরিলা বাহিনী গঠন করে ভেতর থেকে শত্রুর আঁতে আঘাত হানতে হবে এবং পাশাপাশি নিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট ইউনিট অর্থাৎ কোম্পানী বা প্লাটুন দিয়ে শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং বিচ্ছিন্ন হবার জন্য তাকে বাধ্য করতে হবে, যাতে করে কনসেনট্রেটেড অবস্থা থেকে তারা ডিসর্পাসড হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদের সংখ্যাগরিষ্টতা অকেজো হয়ে পড়বে। শত্রুপক্ষ ছোট ছোট গ্রুপে নিজেদের কমিট করতে বাধ্য হবে। তখন গেরিলা পদ্ধতিতে তার যোগাযোগের রাস্তা, বেতার সংযোগ, রি-ইনফোর্সমেন্টের পথ ধবংস করে তাকে ছোট ছোট পকেটে আইসোলেটেড করে চরম আঘাতে তাদের ধ্বংস করতে হবে। এজন্য আমার নিয়মিত বাহিনীরও প্রয়োজন রয়েছে। আমার এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিটেইলড প্ল্যান ইতিমধ্যেই অস্থায়ী সরকার এবং মিত্রদের কাছে পেশ করেছি। তাতে আমি উল্লেখ করেছি, কমপক্ষে দু'লাখের মত গেরিলা বাহিনী এবং ২৫ হাজারের মত নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে কমান্ডারদের অধিনে যে সমস্ত মুক্তিফৌজ রয়েছে তাদের ছাড়া এই নূন্যতম শক্তি আমাকে অবশ্যই গড়ে তোলার অনুমতি দিতে হবে।

বর্তমানে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে রয়েছে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগন তাদের আমি বলি নিয়মিত বাহিনী। সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র যুবকদের বলি অনিয়মিত বাহিনী। ভারতীয়রা তাদের বলেন **FF (Freedom Fighters).** আমার মতে পরীক্ষিত যোগ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সাথে নতুন রিক্রুটেড বীর জোয়ানদের ট্রেনিং দিয়ে তিনটি নিয়মিত ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড গঠন করার পরিকল্পনা নিতে হবে। নিয়মিত বাহিনীর বাকি সদস্যরা **Sector troops** হিসাবে স্থানীয় কমান্ডারদের অধিনে থাকবে। তাদের মূল দায়িত্ব হবে গেরিলাদের জন্য বেইস তৈরি করে তাদের ট্রেনিং দেয়া এবং দেশের ভেতর ছোট ছোট গ্রুপে তাদের **induct** করা। গেরিলাদের অপারেশন কোঅর্ডিনেট করার দায়িত্ব থাকবে সেক্টর কমান্ডারদের উপর। সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্যের জন্য গেরিলা অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের রনাঙ্গনকে তিনি ১১টি সেক্টরে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেক্টরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবেন একজন সেক্টর কমান্ডার। সেক্টরগুলোর হেডকায়ার্টারস স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ভেতর মুক্তাঞ্চলে। সেক্টরগুলোই হবে গেরিলা যুদ্ধের মূল ভিত্তি। কারণ, বাংলাদেশের মত এত বড় একটা থিয়েটার অর্থাৎ দেশব্যপী রণক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা ও ব্যাপক দূরত্ব। কেন্দ্রীভূতভাবে দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে যুক্ত সামরিক সদর দফতর, উপযুক্ত সামরিক অফিসার ও ষ্টাফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সম্পদ এবং সঙ্গতির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আমার থাকবে ১০জন অফিসার বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনীর হেডকোয়ার্টারস। এত বড় একটা বিরাট অঞ্চলব্যাপী সামগ্রিক যুদ্ধে একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন আদেশ, নির্দেশ প্রেরণ করা ও সে অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাস্তবও বটে। তাই আমি আমার কমান্ডারদের কাছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক বিবেচ্য বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন

এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের কার্যক্রমের কোন কোন পথ উন্মুক্ত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব সেক্টর কমান্ডারদের একটি জরুরী বৈঠক তলব করার চিন্তা-ভাবনা করছি। জাতীয় লক্ষ্য, আমাদের বাহিনীর করণীয়, বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সাংগঠনিক ও যুদ্ধ পরিচালনার নীতি নির্দেশ জারি করার দায়িত্ব হবে আমার হেডকোয়ার্টারসের। আমাদের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের নীতি নির্ধারণ ও স্থানীয়ভাবে তাদের দৈনন্দিন যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। সেক্টর কমান্ডারদের সাথে লিয়াঁজো অফিসার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ইচ্ছা রয়েছে আমার। এছাড়া আমার কমান্ডারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা এবং যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে যাতায়াতও করবো প্রয়োজনে।" কর্নেল ওসমানীর যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ আমরা তিনজনই মনযোগ দিয়ে শুনলাম। তার বক্তব্যে সামরিক প্রস্তুতির বিশদ বিবরণ থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের মূল বিষয় তথা রাজনৈতিক দিকটির সম্পর্কে তেমন কিছুই বললেন না তিনি।

যে কোন জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সফল করে তোলার জন্য রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্বের ভূমিকা মূখ্য। জনগণকে সাথে নিয়েই সংগঠিত করা হয় গেরিলা যুদ্ধ। জনগণকে গেরিলা যুদ্ধে আকৃষ্ট করতে হয় রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। কারণ রাজনৈতিক নীতি আদর্শের মাধ্যমেই জনগণ দেখতে পায় তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন এবং বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি। তাই অতি প্রয়োজনের খাতিরেই জনগণের মুক্তি ও তাদের আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করে জাতীয় পরিসরে রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য গঠন করতে হয় সর্বদলীয় জাতীয় সরকার। এ সরকার সাধারণতঃ গঠিত হয় পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে। এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত জনযুদ্ধের প্রক্রিয়া। সমসাময়িক পৃথিবীতে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে পরীক্ষিত এ প্রক্রিয়ার বিপক্ষে একদলীয় একটি অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের নিয়ন্ত্রনে দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সফলভাবে এগিয়ে নেয়া কি করে সম্ভব? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম হয়েছে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আদর্শ এবং নীতিমালায় সর্বস্তরের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন নেই। আওয়ামী লীগ মূলতঃ বাংলাদেশের উঠতি বুর্জুয়া এবং পাতি বুর্জুয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দল। সেক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণকে সশস্ত্র সংগ্রামে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের একক সরকার নেতৃত্ব দেবে কোন যুক্তিতে? '৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে ভোট নিয়েছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে, ধর্মীয় আদর্শের আওতায় পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে সে দাবিতে। সেখানে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের কোন অঙ্গীকার ছিল না। কর্নেল ওসমানীর বক্তব্য থেকে একটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার সংগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আহ্বানে শুরু হয়নি। স্বাধীনতার প্রথম ডাক দিয়েছিলেন অখ্যাত এক তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান আর তার ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ। তাদের অংশগ্রহণে বাঙ্গালী বীর সৈনিক ও নওজোয়ানরা সংগঠিত করেছিলেন প্রতিরোধ মুক্তি সংগ্রাম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আনসার, মুজাহিদ, ইপিআর এবং পুলিশ বাহিনীর দেশপ্রেমিক যোদ্ধারাই অগ্রণী হয়ে স্বীয় উদ্যোগে গঠন করে তুলেছিলেন মুক্তিফৌজ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়া তো দূরের কথা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও শেখ মুজিব কখনোই চিন্তা করেননি সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। তাই ছিলনা তাদের কোন পূর্বপ্রস্তুতি। তাদের পার্টি মেনিফেষ্টো, নির্বাচনী প্রচারণা এবং পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া শাহীর সাথে তাদের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রম থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। এ সত্যকে অস্বীকার করে আজ কোন অধিকারে প্রবাসে দলীয় অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সকল কৃতিত্বের একচ্ছত্র দাবিদার হয়ে উঠলেন তারা? "মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে

ছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। অনেকেরই বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগ একাই মুক্তিযুদ্ধ করবে। অন্য কোন দল বা গোষ্ঠি করুক তা হবে না।" (দৈনিক ইনকিলাবের সাথে জনাব শান্তিময় রায়ের সাক্ষাৎকার)।

এ ধরণের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের অধিনেই দেশ স্বাধীন করে গণমুক্তির স্বপ্ন দেখছেন কর্নেল ওসমানী। পরিকল্পনা করেছেন গেরিলা যুদ্ধ করার। অবশ্য তাঁর কথার ফাকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পক্ষপাতী তিনি ও তার সরকার নন। তার মানেই বা কি? তবে কি পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্য কোন ষড়যন্ত্র চলছে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার এবং ভারতীয় সরকারের বোঝাপড়ার মাধ্যমে? তড়িঘড়ি করে অস্থায়ী দলীয় সরকার কায়েম করার মত তাড়াহুড়া করে স্বাভাবিক পরিণতির পরিবর্তে অস্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশকে তথাকথিত স্বাধীনতা প্রদানের ফন্দি আটা হচ্ছে কি সবার অলক্ষ্যে? ভারতীয় নীল নকশা যা আমরা দিল্লীতে অনুভব করে এসেছি তার সাথে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র খুজে পেলাম। তবে কি কর্নেল ওসমানীও ভারতীয় নীল নকশা বাস্তবায়নেরই একজন? এ কথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। কর্নেল ওসমানীকে আমরা চিনি একজন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা একজন বাঙ্গালী সৈনিক হিসেবে। অবসর গ্রহণের পর হালে রাজনীতিতে যোগদান করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এমপি হয়েছেন তিনি। কিন্তু তাই বলে কোন লোকের চরিত্রতো রাতারাতি সম্পূর্নভাবে বদলে যায় না। তার বেলাই বা সেটা কি করে সম্ভব? একবার ভাবলাম আমাদের দিল্লীর অভিজ্ঞতা তাকে সম্পূর্ণ খুলে বলে আমাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করি। আবার ভাবলাম আগে তার কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে তিনি এসবের সাথে কতটুকু জড়িত। সেটা না বুঝে সবকিছু খুলে বললে হিতে বিপরীতও হতে পারে। আমরা তিনজনই মহা বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে উভয় সংকটে পড়লাম।

আলোচনাকালে কর্নেল ওসমানী হঠাৎ করেই বলে উঠলেন, **"I have decided to send you and Moti as Guerilla Advisor to the sector commanders and Noor shall be at the HQ as my ADC & Personal Staff Officer (PSO)."** তার কথা শুনে চমকে উঠলাম। কি অবাক কান্ড! তাহলে কর্নেল ওসমানী আমাদেরকে নিয়ে ভারতীয় সরকার এবং প্রবাসী সরকার কি ভাবছে সে সম্পর্কে কি কিছুই জানেন না? মনে খট্‌কা লাগলো। মনে করলাম আমাদের ব্যাপারে হয়তো বা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্বয়ং তাজুদ্দিন ও ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধিরা। জনাব তাজুদ্দিন তখন পর্যন্ত কর্নেল ওসমানীকে তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছুই জানাননি। আশ্চর্য! মুক্তিফৌজের কমান্ডার-ইন্‌চীফ এর কাছে বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) নামের স্পেশাল পলিটিক্যাল ফোর্স গঠনের ব্যাপারে সবকিছুই গোপন রেখেছেন অস্থায়ী সরকার প্রধান জনাব তাজুদ্দিন আহ্‌মদ। তার মানে এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীকেও বিশ্বাস করেনি ভারত এবং আওয়ামী লীগ সরকার।

মনে আশার সঞ্চার হল। কর্নেল ওসমানী নীল নকশার প্রণেতাদের একজন নয়। নিশ্চিন্ত হলাম। তাকে বিশ্বাস করে সবকিছুই বলা যায়। বেচারা কর্নেল ওসামানী! তাকে **Side track** করে ইতিমধ্যেই অন্য খেলা শুরু হয়ে গেছে অথচ তিনি তার কিছুই জানেন না। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আমি বললাম,

— স্যার আপনি আমাদের গেরিলা অ্যাডভাইজার হিসাবে নিয়োগ করতে চাচ্ছেন এতে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্যার, জনাব প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের নিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করছেন। আপনি কি **BLF** গঠন করার ব্যাপারে কিছুই জানেন না?

— **What is BLF? Can you frankly tell me what is going on?** জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

— নিশ্চয়ই বলবো স্যার। আপনাকে বিশ্বাস করে সবকিছুই খুলে বলবো। মুক্তিযুদ্ধের কর্ণধার হিসেবে আপনার উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। জাতির সাথে আপনি কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না সেটা আমাদের বধ্যমূল ধারণা। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যে কোন চক্রান্তকে নস্যাত করে দেবার মত দৃঢ়তাও আপনার রয়েছে, সে ব্যাপারেও আমরা তিনজনই একমত। আমাদের অনুরোধ সবকিছু শুনে আপনি উত্তেজিত না হয়ে অত্যন্ত ধীরসস্থিভাবে চিন্তা করবেন ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে। যে কোন অসতর্ক পদক্ষেপের চরম

মূল্য দিতে হতে পারে আমাদের সবার।

— **I promise you. It will be just between me and you three. Now, let me hear everything that you want to tell in details.**

তার অভয় অঙ্গীকারে আন্তরিকতার আবেদন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। আমি বলতে লাগলাম,

— স্যার, দিল্লীতে আমাদের সময় কেটেছে জেনারেল ওবান সিং ও তার সহকর্মীদের সাথে। গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রশিক্ষন ছাড়াও রাজনৈতিক মটিভেশন দেয়া হয়েছে আমাদের। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহ্মদ বর্তমান অবস্থায় গঠিত মুক্তিবাহিনীর বেশিরভাগ কর্মকর্তা এবং সদস্যদের পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তাদের সার্বিক আনুগত্য সর্ম্পকেও তারা সন্দিহান। প্রবাসী আওয়ামী সরকার ও তাদের দল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কার্যকরী **effective** নেতৃত্ব সফলতার সাথে কতটুকু দিতে পারবে সে সর্ম্পকেও ভারত সরকার সুনিশ্চিত নয়। রাজনৈতিক দল হিসাবে চারিত্রিক দুর্বলতা আওয়ামী লীগের রয়েছে প্রচুর, আদর্শগতভাবে রক্তক্ষয়ী একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার মত মানসিকতা ও প্রস্তুতি কিংবা চরম ত্যাগ স্বীকার করার মত চারিত্রিক গুনাবলীও নেই দলের বেশিরভাগ সদস্যদের মধ্যে। সেক্ষেত্রে এ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লে নেতৃত্ব চলে যেতে পারে আওয়ামী লীগের হাত থেকে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে মূলতঃ দু'টি শক্তি। চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বূদ্ধ বিপ্লবীরা অথবা প্রাক্তন সেনা বাহিনী, আনসার, ইপিআর, মুজাহিদ এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তি বাহিনীর মধ্যে এদের অবস্থান অতি সুদৃঢ়। দীর্ঘকালীন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে তাদের শক্তি বেড়ে যাবে। পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্বার স্বাধীনতা সংগ্রামগুলোও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে তারা বিশেষভাবে চিন্তিত। যেহেতু ভারত সরকার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বাইরে অন্য কাউকেই বিশ্বাস করছে না, সে জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে একমাত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রনেই পরিচালিত করতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তোর উভয় অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য বিশেষভাবে গঠন করা হবে একটি সম্পূর্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। বাহিনীর নাম হবে **BLF (Bangladesh Liberation Force)** এ বাহিনীর সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা এবং কেন্দ্রীয় যুব এবং ছাত্র নেতারাই বিভিন্ন অঞ্চল এবং যুব শিবির এবং শরনার্থী শিবির থেকে রিক্রুটমেন্টে সহযোগিতা করবেন এই **BLF** গঠনের ব্যাপারে। রিক্রুটেড সদস্যদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিশেষ সদস্যরা। ট্রেনিং শেষে ওদের ভরনপোষণ এবং **deployment** করা প্রভৃতি বিষয়ে সবকিছুই করবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এ বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ এবং আমরা তিনজন ছাড়া কেউ কিছু জানতে পারবে না। আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে ভারতীয় সেনা বাহিনী ও প্রধানমন্ত্রীর মাঝে লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে। এ বাহিনীর মূল কাজ হবে স্বাধীনতা উত্তরকালে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রনে থেকে আওয়ামী লীগ এবং তদীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা। পরে প্রয়োজনে এ বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হতে পারে মুজিব বাহিনী। কোন সন্দেহ অথবা ভুল বোঝাবুঝির উদ্রেক যাতে না হয় তার জন্য যুক্তি হিসাবে প্রচার চালানো হবে, এ বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ এক প্রয়োজনে। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাকুঠির থেকে মুক্ত করে আনার জন্য এদের দায়িত্ব দেয়া হবে। রিক্রুটমেন্টে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সরকার ইতিমধ্যেই চারজন যুব ও ছাত্রনেতাকে সিলেক্ট করে নিয়েছে। তারা হলেন জনাব শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং জনাব তোফায়েল আহ্মদ (পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের কাছে 'চার খলিফা' বলে পরিচিতি লাভ করেন)। **RAW (Research and**

Analysis Wing) ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সীর প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সার্বিক তত্বাবধানে দেরাদুনের অদূরে চাকুরাউল-এ এদের ভারতীয় সেনা বাহিনীর বিশেষ সদস্যরা ট্রেনিং দেবে। ট্রেনিং পর্যায়ে এবং পরবর্তিকালে ওদের রি-অর্গানাইজ করার দায়িত্বে ভারতীয়দের সাথে আমাদেরও থাকতে হবে। মানে পর্যায়ক্রমে আমরাও হয়ে পড়বো মুজিব বাহিনীর সদস্য।

আমাদের কথা শুনে কর্নেল ওসমানী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। হতবাক হয়ে বললেন,

— How strange! এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। I must find out from the Prime Minister how much does he know?
— অবশ্যই তা আপনাকে জানতে হবে তবে সেটা করতে হবে বিশেষ সতকর্তার সাথে। অত্যন্ত সেনসেটিভ ব্যাপার। তাই বুঝে শুনে কথা বলতে হবে আপনাকে। জনাব তাজুদ্দিনের সাথে আপনার আলাপের পরই না হয় আমরা সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।

সেদিনের মত আমাদের একান্ত বৈঠক শেষ হল। কর্নেল ওসমানী শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন। আমরা তার ঘরের অপরপ্রান্তে মেঝেতে বিছানা পেতে তিনজনই শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই কর্নেল ওসামানী জনাব তাজুদ্দিনের কাছে গিয়ে গত রাতের আলোচনা সম্পর্কে আলাপ করে ফিরে এসে জানালেন,

— প্রধানমন্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।
— এ কি করে সম্ভব! দিল্লীতে আমাদের বলা হয়েছে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সবকিছুই জানেন।
— No, Boys. He is as much as in dark as I am. And I don't think he is lieing. এ ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে তিনি যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করবেন। of course not exposing anyone. তোমরাও যদি আরো কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পার তবে আমাকে জানাবে। Prime Minister wants to know everything about this nefarious plan. তোমাদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পর্কে ভেবেচিন্তে আমাকে জানিও তোমরা কি করবে? বললেন তিনি।

এখানে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে, BLF পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী গঠন এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research & Analytical Wing) সর্ম্পকে জেনারেল অরোরার মন্তব্য তুলে ধরা হল:-
মুজিব বাহিনী এমন এক বাহিনী যা মুক্তি বাহিনী থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। আমি এই বাহিনী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। একদল ছাত্র যারা নির্বাচনের সময় মুজিবের সাথে ঘনির্ষ্ঠভাবে কাজ করেছে তারা অর্থাৎ আওয়ামী লীগের এই তরুণ অংশ আমাদের ইনটেলিজেন্সকে জানায় তারাই মুজিবের প্রকৃত সমর্থক। তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠালে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে ভালো যুদ্ধ করতে পারবে। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। তবে মুক্তি বাহিনীর সাথে যখন তাদের গোলমাল হয় তখন প্রবাসী সরকার (তাজুদ্দিনের সরকার) এ বাহিনী সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চায়। আমি আমাদের চীফ অফ ষ্টাফ জেনারেল মানিক শ'-কে এ ব্যাপারে জানাতে বলি। তিনিই আমাকে জানান যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এই বাহিনী গড়ে তুলেছে। এই বাহিনী নিয়ে সমস্যা যখন বাড়তে থাকে তখন দূর্গা প্রসাদ ধর (ইন্দিরা গানদ্ধীর তৎকালীন মূখ্যসচিব) আমাকে জানালেন, "মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা বাংলাদেশ সরকারকে না জানানোর কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নেই। ব্যাপারটা পরিস্থিতির জন্যই বর্তমানে গোপন রাখা হয়েছে মাত্র।" (বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতিচারন শিরোনামে নিখিল চক্রবর্তীকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার)

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ থেকে বুঝা যায় প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনকে সত্যিই ভারত সরকার এবং "র" এই বাহিনী গঠনের ব্যাপারে অন্ধকারেই রেখেছিল নিজেদের স্বার্থে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

জাতির সাথে বেঈমানি করে “র” এর হাতে বড়ে হতে মন আমাদের বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত কর্নেল ওসমানীকে জানিয়ে দিলাম। ভারতীয় নীল নকশার সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়তে চাই না আমরা। রাজনৈতিক একটি দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গঠিত ঠেঙ্গারে বাহিনীর নেতা হওয়ার খায়েশ নেই আমাদের তিনজনের একজনেরও। আমরা এতদূর থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই যুদ্ধ করব আমরা। কর্নেল ওসমানীর সাজেশান অনুযায়ী গেরিলা অ্যাডভাইজার হয়ে সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য করে মুক্তিফৌজ (অনিয়মিত বাহিনী) গঠন করার দায়িত্ব নিয়ে তখনই কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানালাম আমরা। কর্নেল ওসমানী আমাদের জবাবে খুশি হলেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কি বলা যায়? তারা যদি জানতে পারে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছি তবে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠবে। অনেক চিন্তাভাবনা করে কর্নেল ওসমানী ঠিক করলেন, যদি প্রশ্ন উঠে তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তিনি বলবেন, **BLF** কিংবা মুজিব বাহিনীর মত রাজনৈতিক একটি বাহিনী তৈরি করার দায়িত্ব সার্বিকভাবেই থাকা উচিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন পরীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাতে। প্রধানমন্ত্রী এবং তার মতে আমাদের তিনজনের একজনেরও সে ধরণের রাজনৈতিক ওরিয়েন্টেশন অথবা কমিটমেন্ট কোনটাই নেই। **Therefore we are not fit for such as important assignment. Some more politically conscious persons have to be found out to lead such a highly politisized force.** সময় মত তাদের এ যুক্তি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন। ফলে “চার খলিফা”কেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় **BLF** তথা মুজিব বাহিনী গড়ার। আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রাহুগ্রাস থেকে। আমাকে গেরিলা অ্যাডভাইজার টু দ্যা সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ৮নং এবং ৯নং সেক্টরে পোষ্টিং অর্ডার ইস্যু করে দেন কর্নেল ওসমানী। মতিকেও একই দায়িত্ব দেয়া হল ১০ এবং ১১ নং সেক্টরে। নূরের সব যুক্তিকে খন্ডন করে প্রায় জোর করেই তাকে কর্নেল ওসমানী পার্সোনাল ষ্টাফ অফিসার হিসেবে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন কলহকে কেন্দ্র করে বহুমূখী চক্রান্তের সূচনা ঘটে।

কোলকাতায় অবস্থিত প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধ

৫৮ নং বালিগঞ্জ, কোলকাতা

মুজিব নগর সরকারের পিঠস্থান। লোকাকির্ণ ছোট্ট একটা জায়গা। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল অসম্ভব।

বালিগঞ্জের বাড়িটা নেহায়েতই ছোট। সবসময় অসংখ্য লোকজন ভীড় করে থাকে। নিরাপত্তা রক্ষা করা দুঃস্কর, কথাটা অতি সত্য। সর্বক্ষণ অগুনিত লোক মাছির মত ভনভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক কামরা ছেড়ে অন্য কামরায়, কেউবা এমপি, কেউবা জাদরেল আমলা, কেউবা নেতাদের বিশেষ পরিচিত এবং আস্থাভাজন চামচা। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নেতা, পাতি-নেতার ভীড়। গায়ে মানে না সকলেই আপনে মোড়ল। যার যার হাতে প্রত্যেকেই সাড়ে তিন হাত। গেটে প্রহরীরা কিছু জিজ্ঞাসা করলেই লংকাকান্ড বেধে যায়। সবাই যারা আসছেন তাদের ভাবসাব হচ্ছে, 'আমরা কি হনুরে'। সবার পরিধানে নতুন নতুন কাপড়-চোপড়। হাল ফ্যাশনের অন্ত নেই। দিব্যি হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখা হলে দাত বের করে নিজের পরিচয় দিয়ে খাজুরে আলাপ জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ঢালাওভাবে ভাত, গোস্ত আর ডাল রান্না হচ্ছে কিচেনে। যে আসছেন সেই খাচ্ছেন নির্দ্বিধায়। কেউ কাউকে কিছু বলছেন না। ভুড়ি ভোজনের পর বিভিন্ন ঘরে চেয়ারের উপর, বসার বেঞ্চে এমনকি টেবিলের উপরও সটান হয়ে শুয়ে পড়ে দিবা নিদ্রা কিংবা রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করছেন না এ সমস্ত ভিআইপি ব্যক্তিদের দল। প্রত্যেকের হাতে একটা নতুন ব্রিফকেস কিংবা ছোট এট্যাচী। কোন কোন নেতার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। তারা যা কিছুই করছেন এ সমস্ত জিনিসগুলোও থাকছে তাদের সাথে সাথে। এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবার সময়ও সেগুলো সাথে নেয়া হচ্ছে, পাছে হারিয়ে যায়। ব্যাপার কি? এ সমস্ত ব্রিফকেস, এট্যাচী এবং ঝোলায় কি এমন দুর্লভ জিনিষ রয়েছে ভেবেই পাচ্ছিলাম না। রহস্যটা মতিই উৎঘাটন করল কিছুদিন পর। ও জানালো,

— স্যার, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ও সাব-ডিভিশন থেকে মুক্তিফৌজের সাথে বর্ডার ক্রস করে আসার সময় ব্যাংক ট্রেজারীগুলো সব উজাড় করে নিয়ে এসেছেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। যার ভাগ্যে যতটুকু পরেছে সেগুলো রাখা আছে এ সমস্ত ব্রিফকেসে, এট্যাচীতে এবং ঝোলায়। তাই এগুলোকে এভাবে হেফাজত করা হচ্ছে।
— বলো কি?
— বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখেন? বলল মতি।

একদিন কোন এক অজানা মহারথী তার মাথার নিচে ব্রিফকেসটা রেখে খাবার পর সুখনিদ্রা দিচ্ছিলেন। ঘুমের ঘোরে ব্রিফকেসটা মাথার নিচ থেকে সরে গিয়েছিল। আশেপাশে কাউকে না দেখে মতি সেটা চট করে তুলে নিয়ে খুলে ফেলল। ভদ্রলোকের ব্রিফকেসে তালা ছিল না। খুলতেই মতি ও আমার চোখ চড়কগাছ! একি! থরে থরে সাজানো পাকিস্তানী পাচঁশত টাকার নোটের বান্ডিলে ব্রিফকেসটা বোঝাই। ব্রিফকেসটা নিয়ে আমরা চুপিসারে কেটে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠে ভদ্রলোক তার ব্রিফকেসের হদিস না পেয়ে সারা বাড়ি মাথায় তুলে হায় হায় করতে লাগলেন। আরদালীকে পাঠিয়ে ভদ্রলোককে ডেকে পাঠালাম। তিনি এলেন। জিজ্ঞেস করলাম,

— কি ব্যাপার? এতো হৈ চৈ করছেন কেন?
— আমার ব্রিফকেস চুরি হয়ে গেছে। তিনি কাদো কাদো হয়ে বললেন।
— কি ছিল তাতে?

— আমার কিছু কাপড় ও প্রয়োজনীয় জরুরী কিছু কাগজপত্র ছিল।

টাকা সম্পর্কে সবটাই গোপন করলেন ভদ্রলোক। ইতিমধ্যে নূর উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কর্নেল ওসমানীকে সবকিছু খুলে বলেছে। সব শুনে কর্নেল ওসমানী আমরা যে ঘরে বসেছিলাম সেখানে আসেন। তিনি ভদ্রলোককে অনেকভাবে জেরা করেন। ভদ্রলোক টাকার কথা সম্পূর্ন চেপে গিয়ে ঝোলাতে শুধু কিছু কাপড় ও জরুরী কাগজপত্র ছিল সে কথাই কর্নেল ওসমানীকে জানান। সব শুনে কর্নেল ওসামানী নূরকে আদেশ করেন ব্রিফকেসটি ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দিতে। ইতিমধ্যেই ব্রিফকেস থেকে প্রায় ১২ লাখ টাকা আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কাপড়-চোপড় ও কিছু কাগজপত্রসহ ব্রিফকেসটি ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তিনি তাড়াতাড়ি ব্রিফকেস খুলে দেখেন টাকা ছাড়া অন্য সবকিছুই ঠিক আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা বেগতিক বুঝে ব্রিফকেস বন্ধ করে নিয়ে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সুর সুর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর সেই ভদ্রলোককে আর কখনও দেখিনি পুরো ৯ মাস সংগ্রামকালে। উদ্ধারকৃত টাকাটা প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে জমা করে দেয়া হয়। এ ঘটনার অবতারনা এখানে এজন্য করলাম, তখন তথাকথিত মুজিবনগর সরকারের কার্যালয় দেখে বোঝা কষ্ট হত যে একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম চলছে বাংলাদেশে। আর সে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন প্রবাসী বালিগঞ্জস্থ লোকজন। যে সমস্ত লোকজন তখন অকারণে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভীড় করে সর্বদা ঘুর ঘুর করতেন তাদের হাবভাব দেখে মনে হত সবাই যেন বরযাত্রী হয়ে এসেছেন কোন দূরদেশ থেকে! কোন ভাবনা নেই, কোন চিন্তা নেই! নির্বিঘ্নে হেসে খেলে সময় কাটিয়ে আনন্দেই আবার ফিরে যাবেন তারা।

৮নং এবং ৯নং সেক্টরে যোগদান

স্বয়ং কর্নেল ওসমানীই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ৮নং এবং ৯নং সেক্টরের অধিনায়কদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে।

থিয়েটার রোড থেকে কর্নেল ওসমানী একদিন আমাকে নিয়ে চললেন ৮নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারস বনগাঁয়, সাথে নূর। শহর থেকে প্রায় ৯০-৯৫ মাইল দূরে যশোর বর্ডারের গা ঘেসে বনগাঁ। ওখানে পৌঁছে কর্নেল ওসমানী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ৮নং সেক্টর কমান্ডার মেজর ওসমান এবং ৯নং সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন জলিলের সাথে। তাদের বিস্তারিত ব্রিফিং দিলেন তিনি। সেখানে পরিচয় হল বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন হাফিজ, লেফটেন্যান্ট হালিম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, পুলিশের এসডিপিও মাহবুব, সিএসপি কামাল সিদ্দিকী এবং তৌফিক এলাহী চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট মাহবুবের সাথে। ওরা সবাই আমাকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। দুপুরের খাওয়ার পর কর্নেল ওসমানী নূরকে নিয়ে ফিরে গেলেন। যাবার আগে জানিয়ে গেলেন শীঘ্রই তিনি সেক্টর কমান্ডারদের একটি গুরত্বপূর্ন কনফারেন্স ডাকবেন কোলকাতায়। সে কনফারেন্সে মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান স্তর এবং ভবিষ্যত রনকৌশল ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হবে। থিয়েটার রোড ছেড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পৌঁছে ভীষণ ভালো লাগছিল। মতিও আমি চলে আসার পরপরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সেক্টরগুলোর দায়িত্ব নিয়ে চলে যায়।

শুরু হল নতুন কর্মজীবন। খুলনা, যশোরের ছিন্নমূল ও বিক্ষিপ্ত অনেক ইপিআর, কিছুসংখ্যক নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে মেজর ওসমানের অধিনে শুরু হয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। তার সাথে যোগ দেয় স্থানীয় ছাত্র-জনতা। নড়াইলের তরুণ এসডিও জনাব কামাল সিদ্দিকী, মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক এলাহী চৌধুরী এবং মাগুরার এসডিও ওয়ালীউর রহমানও প্রতিরোধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেজর ওসমান তার অধিনস্থ সমস্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের ৭টি কোম্পানীতে বিভক্ত করে সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের নিয়োগ করেন।

১) প্রথম কোম্পানী উত্তরে মহেশকুন্ড বিওপি এলাকায় লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীরের অধিনে।

২) দ্বিতীয় কোম্পানী তার দক্ষিনে ইছাখালী বিওপি এলাকায়। কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন আজম চৌধুরী।

৩) তৃতীয় কোম্পানী আরো দক্ষিনে জীবননগর বিওপি এলাকায়। নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান।

৪) চতুর্থ কোম্পানী কাশিমপুর-মুকুন্দপুর-বয়ড়া এলাকায় ক্যাপ্টেন খন্দোকার নাজমুল হুদার অধিনে।

৫) পঞ্চম কোম্পানী বেনাপোল কাস্টমস্ চেকপোষ্ট এলাকায় লেফটেন্যান্ট আবদুল হালিমের অধিনে। এ কোম্পানী পরবর্তী পর্যায়ে ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী সিএসপির অধিনে দেওয়া হয়।

৬) ষষ্ঠ কোম্পানী আরও দক্ষিনে বকশা-কাকডাঙ্গা-বেনাপোল থানার এলাকায় ক্যাপ্টেন শফিকউল্লার অধিনে।

৭) সপ্তম কোম্পানী ভোমরা এলাকার গোজভাঙ্গায় ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনের অধিনে।

মে মাসের শেষে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনকে হেডকোয়ার্টারসে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব নেয়ার জন্য চলে যেতে হয় মুজিবনগর তথা ৮নং থিয়েটার রোডে। তখন ঐ সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের এসডিপিও মাহবুবউদ্দিনকে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিন এমপি, ক্যাপ্টেন ওয়াহাব এবং লেফটেন্যান্ট এনামুল হক ৮নং সেক্টরে যোগদান করেন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিনকে সেক্টর হেডকোয়ার্টারস এ ষ্টাফ অফিসার হিসাবে নিয়োজিত করা হয়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাক বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ করতে করতে বর্ডার পেরিয়ে ৮নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেন ফার্ষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অকুতোভয় সেনারা। বেনাপোল বর্ডার পর্যন্ত মাত্র ১৮৮ জন সৈনিককে জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল হাফিজ। পুরো রেজিমেন্টের বাকি সবাই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। বেনাপোল পৌঁছে সেক্টর হেডকোয়ার্টারস এর কাছেই সে তার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। বনগাঁ বিওপির বিপরীতে মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা সমুন্নত রাখার পবিত্র দায়িত্ব যথাযথ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে ফার্ষ্ট ইস্ট বেঙ্গলের বীর জোয়ানরা শেষদিন পর্যন্ত পালন করেছিলেন। ক্যাপ্টেন হাফিজ আমার বিশেষ বন্ধু বিধায় ওর সাথেই আমার থাকার বন্দোবস্ত করি।

বরিশাল ও খুলনায় একইভাবে ২৫শে মার্চ রাতের পর থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন জলিল। তিনি ছিলেন আর্মড কোরের একজন সৈনিক এবং পরে মেধাবলে অফিসার হয়েছিলেন তিনি। পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রাগার লুন্ঠন করেই তিনি শুরু করেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। তার সাথে যোগ দেন লেঃ মেহেদী, লেঃ জিয়া এবং লেঃ নাসের। এছাড়াও তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর, লেঃ খুরশীদ প্রমুখ। লেফটেন্যান্ট খুরশীদ তথাকথিত আগরতলা মামলার একজন আসামীও ছিলেন। এরপর এমএ বেগ নামে একজন যুবক এসে নবম সেক্টরে যোগ দেয়। তিনি পাকিস্তান সেনা বাহিনীর একজন দক্ষ প্যারাস্যুট জাম্পার ও ফ্রগম্যান হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক বিধায় পরে তাকে নৌবাহিনীতে শীপম্যান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ৯নং সেক্টরকে গঠন করা হয় খুলনার কিছু অংশ, ফরিদপুরের কিছু অংশ এবং পুরো বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন জলিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমার্ধে বরিশাল, পটুয়াখালীতে ক্যাপ্টেন মেহেদী, খুলনার সুন্দরবন এলাকায় লেঃ জিয়া এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্যাপ্টেন হুদা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। জুলাই মাসে ৯নং সেক্টরকে পুনর্গঠিত করা হয়। বরিশাল জেলার দায়িত্ব দেয়া হয় পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরকে। পটুয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হয় ক্যাপ্টেন মেহেদীকে। সুন্দরবন ও খুলনার দায়িত্ব দেয়া হয় লেঃ জিয়াকে। পিরোজপুর, বাগেরহাট এলাকা দেয়া হয় সুবেদার তাজুল ইসলামকে। ক্যাপ্টেন হুদাকে দেয়া হয় সীমান্তবর্তী এলাকা। সেক্টর হেডকোয়ার্টারস প্রথম স্থাপন করা হয় হাসনাবাদে। পরে সরিয়ে নেয়া হয় টাকীতে। সেক্টর হেডকোয়ার্টারসে থাকতেন ক্যাপ্টেন জলিল, এডজ্যুটেন্ট এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও মফিজ। এদের সাথে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে ছিল ক্যাপ্টেন আরিফিন। সেক্টরের প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল তকিপুর। ইনচার্জ ছিলেন সুবেদার গোলাম আজম। ৯নং সেক্টরের নৌবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন চীফ পেটি অফিসার এম ইউ আলম। সুন্দরবনে লেঃ জিয়ার অধিনে ছিলেন ফুল মিয়া ও মধু। প্রথম পর্যায়ে টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ এবং শমসের নগরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হল। এরপর হিঙ্গলগঞ্জের ক্যাম্প উক্‌শা পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। এরপর বরিশাল, খুলনা অঞ্চলে ক্রমে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

ক্যাপ্টেন জলিলকে শাসানো হয়

সীমিত গোলাবারুদ ও অস্ত্র নিয়ে মোকাবেলা করতে ভিষণ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছিল ক্যাপ্টেন জলিল এবং অন্যান্য অধিনায়কদের। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ক্যাপ্টেন জলিল কোন সোর্স এর মাধ্যমে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং ভারতীয় বিএসএফ এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তাদের মাধ্যমে তিনি কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হন। ইষ্টার্ণ কমান্ড হেডকোয়াটার্স তাকে কিছু হাতিয়ার ও গোলাবারুদ দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলো বরিশাল নিয়ে যাবার পথে পথিমধ্যে খানসেনাদের এক আচমকা অ্যামবুশ আক্রান্ত হয়ে কোনরকমে প্রাণে বেচে ফিরে আসেন।

প্রবাসী সরকার এবং কর্নেল ওসমানী তার এই ধরনের উদ্যোগে ক্ষেপে উঠেন। বিশেষ করে কর্নেল ওসমানী তার প্রতি ভিষণভাবে রাগান্বিত হন এবং তাকে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে অপসারনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অন্যান্য কমান্ডাররা এবং আমি ও নূর কোন রকমে কর্নেল ওসমানীকে বোঝাতে সক্ষম হই যুদ্ধের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন জলিলের মতো একজন বীর এবং জনপ্রিয় কমান্ডারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হবে। আমাদের সবার আকুতি এবং অনুরোধে কর্নেল ওসমানী তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন জলিলকে ঐ ধরনের উদ্যোগ ও গাফিলতির জন্য হুশিঁয়ার করে তাকে শাসিয়েছিলেন কড়াভাবে। কিন্তু আর্শ্চয্যের বিষয় হলো প্রবাসী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একাংশ ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে নাখোশ হয়েছিলেন।

অন্যান্য অভিজ্ঞতা

আমি সালাম জানাই ঐ সমস্ত যুবকদের চেতনা এবং দেশপ্রেমকে যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাতির মেরুদন্ড হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিমধ্যে ঝড়ের বেগে আমার কাজ এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণনগর থেকে তকীপুর, সমস্ত সেক্টর আমি ঝটিকা সফর করে বেড়াচ্ছি। আমার মূল দায়িত্ব যুবশিবির ও শরনার্থী শিবির থেকে গেরিলাদের রিক্রুট করে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। সাথে সাথে সেক্টর ট্রুপসদের প্রশিক্ষন ও অপারেশনে সাব সেক্টর কমান্ডারদের সাহায্য করা। এরই ফাকে ১ম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে পুনর্গঠিত করার কাজেও ক্যাপ্টেন হাফিজকে সাহায্য করছিলাম যতটুকু সম্ভব। রাতদিন পরিশ্রম করে জুন মাসের মধ্যেই প্রায় হাজার দশেক গেরিলা রিক্রুট করে ফেলেছিলাম। তাদেরকে ২০০ থেকে ৫০০ এর একটি ব্যাচে বিহারের চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের ট্রেনিং এ পাঠানো হচ্ছিল। একই সাথে যুব শিবির এবং সাব সেক্টরগুলোতেও আমরা কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। সেক্টরের নিয়মিত বাহিনীর অভিজ্ঞ সৈনিকরা গেরিলাদের হালকা অস্ত্র, গ্রেনেড, ডেমোলিশন, রেইড, অ্যামবুশ, আনআর্মড কাম্বেট, ম্যাপ রিডিং, আরবান এবং জঙ্গল ওয়ারফেয়ার, অবস্ট্যাকলস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষন দিচ্ছিলেন। লাইভ ফায়ারিং এর বন্দোবস্তও করা হয়েছিল টেম্পোরারী রেঞ্জ তৈরি করে। একই সাথে চলছিল মটিভেশন ক্লাশ।

এখানে রিক্রুটিং এর কাজে নিয়োজিত থাকাকালে একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। যুদ্ধকালে প্রায় এক লাখের মত মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেয়। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা একভাগও শরনার্থী শিবিরের লোক ছিল না। শরনার্থী শিবিরের আশ্রয় গ্রহণকারী বেশিরভাগ লোকই ছিলেন হিন্দু। তাদের মধ্যে খুব কম লোকের মাঝেই ট্রেনিং গ্রহণ করে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহ দেখা যেত। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে শরনার্থী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা পরিবারের সব সদস্য নিয়েই সেখানে থাকত। জীবন বাচাঁনোর জন্য দু'বেলা দু'মুঠো আহারের নিশ্চয়তাও শিবিরে তাদের ছিল। বাংলাদেশ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার মত তাদের খুব বেশি কেউই ছিল না। শিবিরে তাদের জীবনের নিরাপত্তাও ছিল। তাদেরকে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা কারা করছে, কিভাবে করছে, এ নিয়ে তাদের তেমন কোন মাথাব্যাথা ছিল না। মনে মনে হয়তো বা তারা চাইত কষ্টের কাজটুকু অন্যে করুক, তারা একদিন ধীরে সুস্থে ফিরতে পারলেই হয়। শরনার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেরই আবার পশ্চিমবঙ্গে আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন শহর গ্রামে পার্টিশনের সময় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার চাপ এড়াতে বয়স্করা যুবকদের বর্ডার থেকে দূরে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দিত। ওরা সেখানে কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে জীবন চালাত। শরনার্থীদের মধ্যে এবং নিছক প্রাণের ভয়ে যারা দেশত্যাগ করেছিল তাদের মধ্যে সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিই লক্ষ্য করা গেছে। যুদ্ধে তাদের বিশেষ কোন অবদান ছিল না। কিছু থাকলে তা ছিল পরিস্থিতি সাপেক্ষে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নয়। অনেক ক্ষেত্রে শরনার্থী শিবিরগুলোতে খুঁজেও সমর্থ লোক পেতাম না। পাওয়া যেত শুধু বুড়ো মানুষ, শিশু ও মহিলাদের।

এরই বিপরীত অবস্থা ছিল যুব শিবিরগুলোতে। হাজার হাজার তরুণ, যুবক, ছাত্র/ছাত্রী, সমাজের অন্যান্য পেশাজীবি, সমর্থ ছেলেদের ভীড়ে প্রতিটি যুব শিবিরই ভরে থাকত সবসময়। বাসস্থানের সংকুলানের অভাবে অনেককে ফিরিয়েও দেয়া হত বাধ্য হয়ে। তারা তাদের আত্মীয়-পরিজনদের বাংলাদেশে ফেলে রেখে ছুটে আসত সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে হাতিয়ার নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তারা অতি কষ্টকর পরিবেশে যুব শিবিরে দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে অনেকক্ষেত্রে অভূক্ত থেকে উদ্‌গ্রীব

হয়ে অপেক্ষা করত কবে তাদের রিক্রুট করে ট্রেনিং এ পাঠানো হবে। শতকষ্টে ও তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি। প্রত্যেকের মধ্যে দেখেছি প্রতিশোধের স্পৃহা এবং দেশকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার। আজ একটি কথা স্পষ্ট করে স্বীকার করছি, শরনার্থী শিবিরে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে যারা নিরাপদ জীবন-যাপন করেছিল তাদের তুলনায় হাজার রকমের ভয়ভীতি, অজানা আশংকা ও সমূহ বিপদের মোকাবেলা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী যারা দেশেই থেকে গিয়েছিল, স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদানের মূল্য কোন অংশে কম নয়। তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে চরম আহুতি।

তাদের আত্মত্যাগের স্পৃহা, আবেগ এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয় ছিল জাতির গর্বের বিষয়। তাদের ঐ ধরনের চারিত্রিক মনোবল দেখে আমার আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোন অপশক্তি, কোন ষড়যন্ত্রই দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। আল্লাহ কখনোই তাদের এই ধরনের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ব্যর্থ হতে দেবেন না। জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের নজীর বিশ্বে খুব কম জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায়। গণচীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইন্দোচায়না, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপের এ ধরনের গর্বের দাবি করতে পারে না। এ সমস্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে বৃহত্তর কোন সংঘর্ষের সুযোগ কিংবা যুদ্ধকালিন এবং এর পরবর্তী অবস্থাতে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রস্তুতির পর। এ সত্য খন্ডাবার কোনো সুযোগ নাই। অন্য কেউ নয় শুধুমাত্র তারাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যদি কোন গোষ্ঠি, পার্টি এককভাবে নিজেদের স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মনে করে তবে সেটা হবে সত্যের বরখেলাপ এবং এক অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। সার্বিকভাবে স্বাধীনতার কৃতিত্ব দেশের জনগণের এবং বিশেষভাবে নিঃস্বার্থ, ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের।

বিনা মেঘে বজ্রপাত

কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঠিক অধিনায়কদের মহাসম্মেলনের প্রাক্কালে।

ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় ক্যাপ্টেন জলিলের ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়ার্টারসের কর্মকর্তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। ভারতীয় সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী সরকার এবং মুক্তি বাহিনীর সদর দপ্তরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রন করছিল তা নয়, তারা ক্ষমতাধর কমান্ডারদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা তাজুদ্দিনের প্রবাসী সরকারের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকেও দুর্বল করে চাপের মুখে রাখছিল যাতে তিনি তাদের নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকতে বাধ্য হন। অপরদিকে মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযোদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব ওসমানীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কর্নেল ওসমানীর ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হচ্ছিল একইভাবে। কর্নেল ওসমানীকে সাইড ট্র্যাক করে প্রবাসী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের কার্যকলাপে কর্নেল ওসমানী অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করছিলেন। তার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার। ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী মানবিক কারণে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে সেটার জন্য বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামটা পূর্ব বাংলার ৮ কোটি বাঙ্গালীর নিজস্ব সংগ্রাম। এ সংগ্রাম তাদেরই সংগঠিত করতে হবে। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাদেরকেই অর্জন করতে হবে জাতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সব দায়িত্বও থাকতে হবে মুক্তিফৌজ কমান্ড ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীন। জনাব ওসমানী নীতির এ প্রশ্নে কখনোই আপোষ করেননি। এ বিষয় নিয়ে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বের সাথে অনেক বির্তক হয়েছে তার। কিন্তু তার এ নীতির প্রতি সমর্থন দেননি আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতৃত্ব ও গণপরিষদ সদস্যরা।

ইতিমধ্যেই ৮ই জুলাই কোলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলন ডাকা হয় কর্নেল ওসামানীর নির্দেশে। কিন্তু সম্মেলনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই একদিন ঘটল এক ঘটনা। ক্যাবিনেট মিটিং এ কর্নেল ওসমানী প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনকে পরিষ্কার ভাষায় হুশিয়াঁরী দিয়ে বললেন,

— ভারতের গোয়েন্দা ও সেনা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ যদি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকেন তবে শুধুমাত্র শিখন্ডী কমান্ডার ইন চীফ হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেব।

তিনি মিটিং এ জনাব তাজুদ্দিনকে প্রশ্ন করেন,

— বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামটা কাদের সংগ্রাম? এটা যদি ভারতের সংগ্রাম হয়ে থাকে তবে আমরা সবাই কি তাদের হাতে ক্রিয়ানক হয়ে ইসলামাবাদ থেকে দিল্লীতে তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী স্থানান্তরের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছি?

ঐ বক্তব্যের পর তিনি একটি পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। কথাটা মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত থিয়েটার রোড হেডকোয়ার্টারসে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা ইয়াং অফিসার যারা সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাদের মাঝে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হল। আমাদের হাবভাব দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে থিয়েটার রোড ছেড়ে সংসদ সদস্যদের দল, মন্ত্রীবর্গ সবাই কেটে পড়লেন। আমরা সোজা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে অনুরোধ জানালাম, যে করেই হোক কর্নেল ওসমানীকে আপনার আশ্বাস দিতে হবে যাতে তাকে বাইপাস করে ভারতীয়রা কোন কিছু না করে। আপনি যদি এ আশ্বাস তাকে দিতে পারেন তবে আমরা তাকে তার পদত্যাগ পত্র ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ জানাব এবং যে করেই হোক তাকে রাজি করাব। এটা যদি আপনি করতে ব্যর্থ হন তবে দু'দিন পর সেক্টর কমান্ডারদের যে মিটিং এখানে হবে তার পরিণতি কি হবে সেটা আপনি নিশ্চয়ই ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছেন। আপনাকে শুধু এতটুকুই বলছি,

আমাদের মুক্তি বাহিনীর একজন সৈনিক বেঁচে থাকতে কর্নেল ওসমানীর গায়ে এতটুকু আচড় কেউ দিতে পারবে না। আমরা কেউ তার এতটুকু অপমানও বরদাস্ত করব না।

তাছাড়া তার বক্তব্যে যুক্তি রয়েছে। আগে আপনি বলেছেন বিএলএফ-মুজিব বাহিনী গঠনের ব্যাপারে আপনি কিছুই জানতেন না। এ খবর আপনি জানতে পেরে নাকি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার অ্যাডভাইজারদের সাথে এর প্রতিবিধান করার চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হয়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেহায়েত অপারগ হয়েই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আপনাদের এ ধরণের অপারগতার সুযোগে তারা তাদের নীল নকশার জাল বিস্তার করে চলেছে। তাদের জালে আটকে পড়ে থাকা নির্জীব বাংলাদেশ আমাদের কাম্য নয়। পরনির্ভরশীল পঙ্গু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য হাজার হাজার বাঙ্গালী রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে না বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে। আমরা তথা আপমর জনসাধারণ বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যদি ১২ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর রক্তক্ষরণের ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের শক্তির বলে তাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করে থাকতে পারেন তবে আমরাই বা পারব না কেন আমাদের নিজ শক্তিতে স্বাধীনতার সূর্যকে হানাদার বাহিনীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে? পৃথিবীর অনেক জাতি তাদের মুক্তি সংগ্রামে মিত্র দেশের সহযোগিতা গ্রহণ করেছে সংগ্রামকালে কিন্তু তাই বলে তারা নিজেদের সত্বাকে তো বিকিয়ে দেয়নি। আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সব কিছু দেখে বুঝে শুনে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সততা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে চলেন তবে আপনি আপনার যাত্রা পথে নিঃসঙ্গ হবেন না। আমরা সবাই থাকব আপনার সাথে।

প্রধানমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন তিনি কিছু একটা করবেন। কর্নেল ওসমানীকে passify করার দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাইরে এসে শুনলাম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, তাজুদ্দিন এবং প্রবাসী সরকারের সাথে কর্নেল ওসমানীর মতানৈক্য ঘটায় তিনি নাকি কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে হুকুম দিয়েছেন সমস্ত আওয়ামী লীগ সরকারকে অ্যারেষ্ট করতে। প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই নাকি অ্যারেষ্ট করে রাখা হয়েছে থিয়েটার রোডেই! বাকিরা পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। গুজবটা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। ভাবলাম, গুজবটা ছড়িয়ে আওয়ামী লীগাররা তাদের দুর্বলতাটাকেই প্রকাশ করে দিলেন তাদের অজান্তে।

অধিনায়কদের মহাসম্মেলন

৮ই জুলাই মহাসম্মেলনের দিন ধার্য্য করা ছিল। অধিনায়কদের অনেকেই কোলকাতায় পৌঁছে গেছেন। আমরা তখনও চেষ্টা করছিলাম যাতে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে কনফারেন্সের দিন ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডাররাও ইতিমধ্যে কোলকাতায় এসে উপস্থিত হচ্ছেন। কর্নেল ওসমানীকে আমরা একনাগাড়ে বুঝিয়ে চলেছি। অনুরোধ করে চলেছি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে। ভীষণ একরোখা মানুষ কর্নেল ওসমানী। যারা তার সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তারা সবাই সেটা জানেন। অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধী এবং অভিমানী তিনি। নীতির প্রশ্নে জীবনে কেউই তাকে আপোষ করাতে সক্ষম হয়নি। নূর ও আমাকে তিনি ভীষণভাবে স্নেহ করতেন। বকাও খেয়েছি অনেক। কোন সময় অযৌক্তিকভাবেও বটে। তবুও তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তার যে আন্তরিক ভালোবাসা আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেটা এক অমূল্য অনুভূতি। একান্ত নিভৃতে শ্রদ্ধার সাথে তাকে ও তার স্মৃতিগুলো আমি স্মরন করে যাব সারাজীবন। চাকুরিতে থাকাকালীন এবং চাকুরিচ্যুত অবস্থায় আমরা নিজেদের মাঝে অনেক মতামত বিনিময় করেছি নির্দ্বিধায়। এমনকি অনেক ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কেও তার পিতৃসুলভ আচরণ ও উপদেশাবলীর কথা আজও মনে হলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

যাক সে কথা। বাইরের ওসমানীর চেয়ে তার অন্তরের কিছুটা জানতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। আমাদের আকুতি-মিনতির জবাবে তিনি কিছুই বলছেন না; এমন একটা অনিশ্চিতয়তার মাঝেই শুরু হল সম্মেলন ১১ই জুলাই ১৯৭১-এ। অধিবেশনের আগে যখন এ সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তখনই মে মাসের শেষ দিকে একদিন বয়রা সেক্টর এর একটি অপারেশনে আমি প্রথমবারের মত গুলিবিদ্ধ হই। ইনজ্যুরিটা বিশেষ সিরিয়াস ছিল না। ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলটা ভেঙ্গে গিয়েছিল গুলি লেগে। আল্লাহর অসীম কৃপায় প্রাণে বেঁচে যাই। ক্ষত নিয়েই আমার দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হাতের ব্যান্ডেজ নিয়েই সেক্টরে সেক্টরে ঘুরে ফিরেছি। ফলে ঠিকমত ঔষধ এবং কেয়ার না নেয়ায় ক্ষতে একটা খারাপ ধরণের ইনফেকশান দেখা দেয়। ফলে হেডকোয়ার্টারসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আমি রক্ষা করতে পারিনি। অবশ্য নূরের মাধ্যমে মাঝেমধ্যে খবরা-খবর যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করেছি। সেক্টর থেকে যোগাযোগের ব্যবস্থাও ছিল খুবই সীমিত। সম্মেলনে সব সেক্টর থেকে কমান্ডাররা এসেছিলেন। সম্মেলনের দিন সকালে নূর এসে বলল, কর্নেল ওসমানী কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করবেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে তিনি তার পদত্যাগের ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন জবাব পাননি। সেক্ষেত্রে তার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়াটা হবে অসম্মানজনক। তাছাড়া সম্মেলনে সবাই তাকে পদত্যাগের কারণও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পদত্যাগের সঠিক কারণ এই মুহূর্তে সবাইকে জানানোটা সমীচীন মনে করছেন না কর্নেল ওসমানী। নূর এ খবরটা আমাকে জানিয়ে অনুরোধ করল সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে। মুজিবনগর সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখে কর্নেল ওসমানী তার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন আভাস পেলাম।

থিয়েটার রোডেই কনফারেন্স শুরু হল। সবাই উপস্থিত। জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে হাজির হলেন। বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সেনা প্রধান হিসাবে ওসমানী অনুপস্থিত। তিনি জানিয়েছেন বিশেষ কারণবশতঃ তার পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কর্নেল ওসমানীর উপস্থিতি সেখানে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তিনি নেই দেখে

সবার কাছে ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক মনে হল। যাই হোক জনাব তাজুদ্দিন লম্বা-চওড়া ভাষণ শুরু করলেন। তার ভাষণে তিনি সবাইকে জানালেন,

-সেক্টর কমান্ডারদের অনাস্থাবশতঃ কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন।

উপস্থিত সবাই প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কথাটা এতই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে, কমান্ডারদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কর্নেল ওসমানীর উপর কমান্ডারদের আস্থা নেই এ কথা প্রধানমন্ত্রী কি করে জানলেন সে বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার কোন জবাব দিতে পারলেন না। বাক-বিতন্ডার মাঝে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে কনফারেন্স হল ত্যাগ করে চলে যেতে হল। সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা। কর্নেল ওসমানী সবার কাছে বিশেষ করে বাঙ্গালী বীর যোদ্ধাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তার উপর অনাস্থা এনেছেন কারা সে রহস্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত কোন কনফারেন্স হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল প্রধানমন্ত্রীর অবর্তমানেই। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে আমি ও নূর মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ এবং উইং কমান্ডার বাশারকে একান্তভাবে কর্নেল ওসমানীর পদত্যাগের আসল কারণ খুলে বললাম। আমরা এটাও তাদের বুঝিয়ে বললাম কর্নেল ওসমানীর এ ধরণের ষ্ট্যান্ড এ অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নীল নকশা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা অতি কৌশলে কমান্ডার ইন চীফের পদ থেকে তাকে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা আটছে তার পদত্যাগের সুযোগ গ্রহণ করে। তাদের এ পরিকল্পনার পেছনে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন কমান্ডারও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা তাদের আমাদের দিল্লীর অভিজ্ঞতা এবং বিএলএফ-মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার নীল নকশার কথাও খুলে বললাম। সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে তাদের অনুরোধ করলাম, যে করেই হোক কর্নেল ওসমানীকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাখতে হবে। তাকে সম্মুখে রাখতে না পারলে নীল নকশার মোকাবেলা করতে আমরা সবাই ব্যর্থ হব। আর তাতে জাতীয় স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের সাথে তারা একমত হলেন। ঠিক হল উপস্থিত সবার তরফ থেকে তারা কর্নেল ওসমানীর সাথে দেখা করে তাকে তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানাবেন। একইসাথে তাকে আশ্বাসও দেয়া হবে তিনি যাতে স্বসম্মানে তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করা হবে সমগ্র মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে। কর্নেল ওসমানীর সাথে গোপন বৈঠক হল। আমরা যা বলেছিলাম তার পুনরাবৃত্তিই তিনি করলেন তাদের কাছে। সবাই তার পদত্যাগ করার পেছনের যুক্তি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। সব বুঝে তারা তাকে অনুরোধ জানালেন জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সব ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্য তার নেতৃত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজন। একমাত্র তিনিই মুক্তি বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। তাদের দেয়া **Assurance** এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করবেন বলে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তার সাথে আলাপের পর আমরা গেলাম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম ও অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিনের কাছে। আমাদের দেখে দু'জনই বেশ কিছুটা অস্বস্থিবোধ করছিলেন। সকালের মিটিং-এর অবস্থা বুঝে জনাব তাজুদ্দিন ইতিমধ্যেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সরাসরিভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হল,

— আপনি কোন যুক্তির ভিত্তিতে সকালে আপনার বক্তব্যে বললেন সেক্টর কমান্ডারদের অনাস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল ওসমানী পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

জবাবে কিছুটা বিব্রত হয়ে তাজুদ্দিন সাহেব বললেন,

— তার কাছে খবর রয়েছে যে বেশ কিছু কমান্ডার জনাব ওসমানীর উপর অনাস্থা পোষণ করছেন।

— মহামান্য প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, শুধুমাত্র কমান্ডারদের তরফ থেকেই নয়, সমগ্র মুক্তি ফৌজের তরফ থেকে আমাদের পূর্ণ আস্থাই যে রয়েছে কর্নেল ওসমানীর উপর মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তা নয় তিনি আমাদের অতি শ্রদ্ধার পাত্রও বটে। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে যদি কমান্ডার ইন চীফ বানাবার চিন্তা-ভাবনা

করে থাকেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারেন। প্রবাসী সরকারের হয়তো বা ক্ষমতা থাকতে পারে, সরকার ইচ্ছামত একজন সর্বাধিনায়কও নিয়োগ করতে পারে কিন্তু তার পরিণতি কি হবে সেটাও একটু ভেবে দেখবেন। মেজর জিয়াই প্রধানমন্ত্রীর কথার জবাব দিলেন।

জনাব নজরুল ইসলাম ও তাজুদ্দিন দু'জনই মেজর জিয়ার কথা শুনে ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষন ভেবে তাজুদ্দিন সাহেব বললেন,

— ওসমানী সাহেব স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। তিনি সেটা প্রত্যাহার করলে সরকার তার পূনর্নিয়োগ সর্ম্পকে পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

— তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন সেটা ঠিক। কিন্তু সম্মেলনে আপনি যে কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা সত্য নয়। কি কারণে তিনি পদত্যাগপত্র সরকারকে স্বেচ্ছায় দিয়েছেন সেটা আমরা অবশ্যই শুনব তার কাছ থেকেই। আমাদের অনুরোধ কাল সম্মেলনে আপনি বলবেন, আপনার কাছে যে খবর এসেছিল কিছু কমান্ডারের অনাস্থার ব্যাপারে সেটা তদন্তে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয় আপনি আরও বলবেন উপস্থিত সব কমান্ডার এবং সমগ্র মুক্তি ফৌজের দাবি একমাত্র কর্নেল ওসমানীই থাকবেন কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে। অন্য কেউ নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সবার তরফ থেকে আপনি স্বয়ং তাকে তার ইস্তফা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং একমাত্র সে ক্ষেত্রেই তিনি তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করবেন।

কথার ধরণ থেকে বুদ্ধিমান জনাব তাজুদ্দিন আহ্মদ বুঝে নিলেন মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডাররা ইতিমধ্যে অনেক কিছুই জেনে গেছেন। পর্দার অন্তরালে পাশা খেলার চালগুলো সম্পর্কেও হয়তোবা অনেকেই অবগত হয়ে পড়েছেন। তাই কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে না পড়ার জন্য মেজর জিয়ার অনুরোধ মেনে নিতে রাজি হলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন। পুরো মিটিং এ নির্বাক নিরব সাক্ষী হয়ে নিশ্চুপ বসে ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম। মিটিং এর বিস্তারিত বিবরণ নূরের মাধ্যমে জানানো হল কর্নেল ওসমানীকে। পরদিন কথামত কাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তার অনুরোধে কর্নেল ওসমানী তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে সম্মেলনের নেতৃত্ব দেবার স্বীকৃতি জানালে করতালির মাধ্যমে উপস্থিত সবাই কর্নেল ওসমানীর সিদ্ধান্তকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে সম্মেলন শুরু হল। চানক্য বুদ্ধির দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে কর্নেল ওসমানীকে কমান্ডার ইন চীফ পদে বহাল রাখতে পেরে আমরা তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পেরেছিলাম বলে নিজেদের আত্মপ্রত্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের এই বিজয় থেকে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, জানবাজ মুক্তিসেনারা অন্যায় ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কিছুই মুখ বুজে সহ্য করবেন না। এ সম্মেলনে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন সমস্যা এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কর্নেল ওসমানীর মনোভাব আমাদের আগেই জনা ছিল, সে আলোকেই আলোচনা পরিচালিত হয়। ঐ বৈঠকে লেঃ কর্নেল এম এ রব বাংলাদেশ মুক্তি ফৌজের চীফ অফ ষ্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দোকার ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ নিযুক্ত হন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেসব নেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে :-

১) বিভিন্ন সেক্টরের সীমানা নির্ধারন।

২) মুক্তিযুদ্ধের কৌশল পদ্ধতির সারসংক্ষেপ এবং বর্ণনা।

(ক) নির্ধারিত এলাকায় নির্দিষ্ট দায়িত্বে পাঁচ অথবা দশজনকে নিয়ে গঠিত ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা দলগুলোকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হবে।

(খ) গেরিলাদের শ্রেণী বিভক্তি :-

এ্যাকশন গ্রুপ :

এ গ্রুপের সদস্যরা শত্রুর বিরুদ্ধে সরাসরি তবে গেরিলা হামলা চালাবে। তারা শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ হাতিয়ার বহন করবে।

গোয়েন্দা সেনা :

এই গ্রুপের গেরিলারা হেডকোয়ার্টারসের অধিনে প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এরা সাধারণত সম্মুখ সংঘর্ষে জড়িত হবে না। এদের মূল দায়িত্ব হবে খবরা-খবর সংগ্রহ করা। এদের কাছে শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগের বেশী অস্ত্র থাকবে না।

গেরিলা ঘাটি :

প্রতিটি গেরিলা ঘাটি সেক্টর ট্রুপস এর দ্বারা রক্ষিত হবে। প্রতিটি ঘাটিতে গেরিলাদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ঘাটিতে একটি করে মেডিকেল টিম থাকবে প্রয়োজনে গেরিলাদের চিকিৎসার জন্য। প্রত্যেক ঘাটিতে গেরিলাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য একজন রাজনৈতিক নেতা থাকবেন। তার দায়িত্ব হবে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তানীদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়া এবং একই সঙ্গে বাঙ্গালীরা যেন মানসিক সাহস ও শক্তি হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। শত্রুর বিরুদ্ধে বড় ধরণের আক্রমন পরিচালনার উদ্দ্যেশ্যে আরো বেশি সংখ্যক গেরিলা কিংবা নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকদের সংকুলানের জন্য প্রতিটি ঘাটিকে তৈরি রাখাও এদের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বাস্তবে পরবর্তিকালে এই রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য মুজিবনগর সরকার থেকে কোন প্রতিনিধিই আসেনি। সেক্টর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদেরকেই নিজেদের উদ্যোগে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

৩) নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের অবিলম্বে ব্যাটালিয়ন ফোর্স এবং সেক্টর ট্রুপস এ সংগঠিত করতে হবে।

৪) যুদ্ধ পরিকল্পনার পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:-

(ক) প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য বিপুল সংখ্যক গেরিলাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে হবে।

(খ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে দেয়া হবে না। বিদ্যুতের খুঁটি, সাবস্টেশন প্রভৃতি ধ্বংস করে বিদ্যুৎ সরবরাহ অচল করে দিতে হবে।

(গ) কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।
কোন কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্য রফতানি করতে দেয়া হবে না। এ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত গুদামে থাকবে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে।

(ঘ) শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম, রসদপত্র আনা নেয়ার জন্য ব্যবহারযোগ্য যানবাহন, রেলপথ, নৌযান, রাস্তা, পুল প্রভৃতি পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে হবে।

(ঙ) রণকৌশলগত পরিকল্পনা এভাবে করতে হবে যাতে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

(চ) শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করার পর তাদের বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলোর উপর গেরিলারা মরণপন আঘাত হানবে।

এ সম্মেলনে বাংলাদেশকে নিম্মোক্ত এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয় :-

১নং সেক্টর : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশ বিশেষ মুহুরী নদীর পূর্ব এলাকা নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সমগ্র সেক্টরকে ৫টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। মেজর জিয়া সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন। (পরে জিয়া জেড ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন রফিক ১নং সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত হন।) এ সেক্টরের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২১'শত। এর মধ্যে ১৫'শত ইপিআর, ২'শ পুলিশ, ৩'শ সামরিক বাহিনী এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১'শ। এখানে গেরিলাদের সংখ্যা ছিল প্রায়

২০ হাজার। এদের মধ্যে ৮ হাজারকে এ্যাকশন গ্রুপ হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শতকরা ৩৫ ভাগ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেয়া হয় এই সেক্টরকে।

২নং সেক্টর : কুমিল্লা, ফরিদপুর জেলা, নোয়াখালী ও ঢাকার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর খালেদ মোশাররফ। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সমগ্র সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ হাজার। গেরিলা ছিল ৩০ হাজার। (মেজর খালেদ মোশাররফ ফোর্স কমান্ডার হিসেবে গুরুতরভাবে আহত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন হায়দার সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।)

৩নং সেক্টর : মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরটিকে ১০টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। গেরিলাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর শফিউল্লাহ। (এস' ফোর্স গঠনের পর মেজর শফিউল্লাহর জায়গায় মেজর নূরুজ্জামানকে ৩নং সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।)

৪নং সেক্টর : উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিনে হবিগঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ৪নং সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। গেরিলা ছিল প্রায় ১২ হাজার।

৫নং সেক্টর : সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেক্টর। কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর মীর শওকত আলী। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮'শ, গেরিলা ছিল প্রায় ৫ হাজার। সেক্টরটিকে ৬টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

৬ নং সেক্টর : এই সেক্টর রংপুর এবং দিনাজপুর নিয়ে গঠিত হয়। উইং কমান্ডার এম কে বাশার নিযুক্ত হন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে। সাব-সেক্টর ৫টি। নিয়মিত বাহিনী সংখ্যা প্রায় ১২'শ। গেরিলা ছিল প্রায় ৬ হাজার।

৭নং সেক্টর : রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয় এ সেক্টর। সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর নাজমুল হক। (যুদ্ধকালীন সময় এক মটর দুর্ঘটনায় তিনি শহীদ হলে তার স্থলে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর এম হাসান।) সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৮টি। সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। গেরিলা প্রায় ৮ হাজার।

৮নং সেক্টর : কুষ্টিয়া, যশোর এবং খুলনার অংশ বিশেষ নিয়ে এ সেক্টর গঠন করা হয়। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ ওসমান চৌধুরী। পরবর্তিকালে মেজর ওসমানকে হেডকোয়ার্টারসএ বদলি করে নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর মেজর মঞ্জুর ৮ নং সেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার। গেরিলা প্রায় ৮ হাজার। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৭টি।

৯নং সেক্টর : বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনার অংশ বিশেষ, ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল। সাব-সেক্টরের সংখ্যা ৮টি। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫'শ। গেরিলা প্রায় ১৫ হাজার।

১০নং সেক্টর : এ সেক্টরের কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিলনা। নৌ কমান্ডোরাই এ সেক্টরের অধিনে ছিল। শত্রুপক্ষেও টার্গেট ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন মত বিভিন্ন

সেক্টরে গ্রুপ গঠন করে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বে পাঠানো হবে সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হয়। তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয় সেক্টর কমান্ডারদের। দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর নৌ কমান্ডোরা সব আবার তাদের মূল আস্তানা ১০নং সেক্টরে ফিরে আসবে ঠিক করা হয়।

১১নং সেক্টর : এ সেক্টর ছিল বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং তুরা ও গারো অঞ্চল নিয়ে। কমান্ডার নিযুক্ত হন মেজর তাহের। (১৫ই নভেম্বর এক অভিযানে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে একটি পা হারান।) সাব-সেক্টর ছিল ৮টি। গেরিলা সংখ্যা ২৫ হাজার।

এ সম্মেলনে সেক্টরসমূহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পর মুক্তি ফৌজের সৈনিকদেরকেও নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে পূনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়:-

নিয়মিত বাহিনী : ২৫শে মার্চ রাতের শ্বেত সন্ত্রাসের পর ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ কোর এবং অন্যান্য সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের নামকরণ করা হয় নিয়মিত বাহিনী।

বিশেষ ফোর্স : আর্মি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে তিনটি ব্রিগেড গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখনকার ৫টি ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্র করেই নিয়মিত বাহিনীর পূনর্গঠনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এইসব ব্যাটালিয়নের জনশক্তি ছিল খুবই কম। প্রত্যেক সেক্টর থেকে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করে এদের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে নতুন আরও ব্যাটালিয়ন দাড় করানোর সিদ্ধান্ত হয়।

এগুলোকে পরে ব্রিগেড গ্রুপে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এদের দ্বারা গঠিত তিনটি ব্রিগেড গ্রুপই পরে জেড' ফোর্স, এস' ফোর্স এবং কে' ফোর্স নামে পরিচিত হয়।

সেক্টর ট্রুপস্ : উপরোক্ত ব্যাটালিয়নগুলোতে যেসব ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ও সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব হবে না তাদেরকে সেক্টর ট্রুপস হিসাবে যুদ্ধ করার জন্য ইউনিট এবং সাব-ইউনিটে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন ধারনের জন্য নগন্য সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের তরফ থেকে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বেশিরভাগই ঐ অর্থ গ্রহণ না করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনিয়মিত বাহিনী অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স (এফ এফ) : গেরিলা হিসেবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাদের ট্রেনিং দেয়া হত তাদের বলা হত অনিয়মিত বাহিনী, গণবাহিনী, অথবা ফ্রিডম ফাইটার্স। প্রথম পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার অভাব ছিল। সঠিক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কঠোর সংগ্রামী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তাদের সুশৃঙ্খল গেরিলা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গণবাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিংকালে সামান্য পকেট খরচা এবং বাংলাদেশের ভেতরে পাঠাবার সময় প্রথমবার তাদের কিছু রাহা খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এরপর তাদের বিশাল জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার প্রশিক্ষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাকে, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, লেঃ মতি ও লেঃ নূরকে আগের দায়িত্বেই বহাল রাখা হয়।

কনফারেন্সে কমান্ডারদের নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং সদস্য সংখ্যা হিসাব করে তাদের জন্য কাপড়-চোপড়, রেশন, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, ওয়্যারলেস সেট, টেলিফোন, অতি আবশ্যকীয় রসদপত্রের তালিকা তৈরি করে মুজিবনগর সরকারের কাছে পেশ করতে বলা হয়। অস্থায়ী সরকার চাহিদা অনুযায়ী ভারত সরকারের কাছ থেকে জিনিসগুলো সংগ্রহ করবে সেই কথাই জানানো হয়েছিল মিটিং-এ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এছাড়া সেক্টর এবং সাব-সেক্টরগুলোতেও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্তও গৃহিত হয়। কনফারেন্সে কর্নেল ওসমানী সবাইকে জানালেন ইতিমধ্যে পাকিস্তান থেকেও বাঙ্গালী সামরিক বাহিনীর অফিসাররা পালিয়ে আসার চেষ্টা এবং উদ্যোগ নিচ্ছে। এপ্রিল মাসে তিনজনের সর্বপ্রথম দলটির মাঝে রয়েছি আমি, লেঃ মতি ও লেঃ নূর। আমাদের কাছ থেকে জানা তথ্যের ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছিলেন অনেক বাঙ্গালী অফিসারই স্বাধীনতা যুদ্ধ যোগ দেবার জন্য পালিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছে কিন্তু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে এসে তারপর যুদ্ধে যোগ দেয়ার কাজটি খুবই বিপদজনক; বিশেষ করে পাকিস্তানে পরিবার-পরিজন নিয়ে যারা বসবাস করছে তাদের জন্য তো বটেই। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের মনোভাব কি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে না পারায় অনেকেই পালিয়ে ভারতে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। তাদের এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করার আহ্‌বান জানানো হয়েছে বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। পাকিস্তান থেকে অফিসাররা চলে আসছে জানতে পেরে সকলেই খুশি হলেন। আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হল।

অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে পরে আমাদের হয়েছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা। কখনোই আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং রসদপত্র পাইনি। যা পেয়েছি তার পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই সামান্য। নিঃসন্দেহে এ সমস্যার কারণে আমাদের যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় শত্রুর হাতে মার খেতে হয়েছিল অনেকক্ষেত্রে। পরবর্তিকালে কমান্ডাররা ক্রমান্বয়ে নিজেরাই সব ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ন হবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যান। শত্রুপক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রই ছিল আমাদের হাতিয়ারের মূল উৎস। এতে করে আমাদের পাঁচমিশালী হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। ফলে গোলাবারুদ নিয়ে আমাদের নিদারুণ সংকটে পড়তে হত। যানবাহনের সমস্যা ছিল অতি প্রকট। আমরা সম্পূর্নভাবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা এবং মুক্তাঞ্চল থেকে কব্জা করা গাড়িগুলোর উপরই নির্ভরশীল ছিলাম। এদের রক্ষনা-বেক্ষনের দায়িত্বও নিতে হয় কমান্ডারদেরকেই। আমাদের চিকিৎসার সমস্যাও ছিল প্রকট। ভারতীয় হাসপাতালগুলো প্রায় সময় ভরে থাকত শরনার্থীতে।

যুদ্ধকালীন সময় সবচেয়ে বড় ফিল্ড হাসপাতালটি স্থাপিত হয়েছিল ২নং সেক্টরের বিশ্রামগঞ্জে। বৃটেন থেকে আগত ডাঃ জাফরুল্লাহ, ডাঃ মোমেন এবং তাদের আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের উদ্যোগে এবং প্রবাসী বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী হিতৈশীদের সাহায্যে এই বেসরকারি ফিল্ড হাসপাতাল অতি কষ্টে স্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধে তারা অমূল্য অবদান রাখেন। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে খুব কম সংখ্যক চিকিৎসকই যুদ্ধে যোগদান করে। তাই তাদের ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে। তাদের নিঃস্বার্থ প্রাণঢালা সেবার কথা মুক্তিযোদ্ধারা কখনোই ভুলতে পারবেন না।

এ ধরণের আরো অনেক সমস্যা ও সমাধানের উপায় কনফারেন্সে যদিও বা আলোচিত হয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সব চাহিদাই পূরণ করা হবে বলে মুজিবনগর সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধকালীন সময় মুক্তিযোদ্ধারা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিছুই পায়নি। ঠিক সময়মত পাওয়া যায়নি অতি প্রয়োজনীয় যুদ্ধসম্ভার। বর্ষাকালে জরুরী ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আচ্ছাদন নির্মানের কথা থাকলেও সে আচ্ছাদন তৈরি করতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার। মুক্তিযোদ্ধারা হাড়কাপুনী শীতে রাত কাটিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে। তাবু এবং শীতবস্ত্রের পর্যাপ্ত কোন বন্দোবস্তই করা সম্ভব হয়নি সরকারের পক্ষে। কম্বলের উষ্ণতা

থেকে বঞ্চিত থেকেছেন আহত মুক্তিযোদ্ধারা। অধিকাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন আধপেটা খেয়ে, খালিগায়ে, খালিপায়ে। সব কষ্ট, সব অসুবিধা তারা হাসিমুখে মোকাবেলা করেছিলেন একটি স্বপ্নের নেশায়। সে স্বপ্ন স্বাধীন শোষণমুক্ত বাংলাদেশ।

জুলাই মাসে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী এবং মেজর মঞ্জুর-তার পরিবার এবং দু'জন সৈনিক দেহরক্ষী। তারা শিয়ালকোট সেক্টর দিয়ে পালিয়ে আসেন। তাদের পর আরো যারা পালিয়ে আসেন তারা হল ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম, ক্যাপ্টেন পাশা, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার রশিদ খান, লেঃ বজলুল হুদা, ক্যাপ্টেন রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন ফারুক রহমান, ক্যাপ্টেন রশিদ, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর প্রমুখ। কনফারেন্সের সুযোগে অনেকের সাথেই আমাদের মত বিনিময় হয় ভারতীয় নীল নকশার প্রভাব ও পরিণতি নিয়ে। যাদের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম শুধু তাদের সাথেই গোপনে আলোচনা করা হয়েছিল এই অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি। মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন জলিল এবং উইং কমান্ডার বাশার এর অন্যতম। পরবর্তী পর্যায়ে মেজর মঞ্জুর, ক্যাপ্টেন তাহের, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন রশিদ, ক্যাপ্টেন মহসীন, ল্যাটেনেন্ট হুদা, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর ছাড়াও যাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল তাদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পর্দার অন্তরালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন মহল, অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় প্রশাসনের চক্রান্ত ও স্বার্থ নিয়ে আলোচনার ফলে কতগুলো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঐক্যমত্যের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত সরকারের নীতি এবং মুজিবনগর সরকারের অযোগ্যতাকে নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা ঠিক হবে না। আমাদের বিভিন্ন মহলের উদ্দেশ্য এবং তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের চক্রান্তের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে। একইসাথে মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্গঠন করে তাদেরকে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে চক্রান্তের বিভিন্ন দিক। তাদের মটিভেট করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে সব চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীন করতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। শুধুমাত্র ইসলামাবাদ থেকে দিল্লীতে রাজধানী বদলের জন্য যুদ্ধ করছি না আমরা, প্রয়োজনে পাক বাহিনীর সাথে সাথে অবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। আট কোটি বাঙ্গালীর জন্য হাসিল করতে হবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে একটি যথার্থ স্বাধীন বাংলাদেশ। কোন করদ রাজ্য কিংবা নামেমাত্র স্বাধীনতা নয়, চাই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং জাতীয় মুক্তি। প্রত্যেক কমান্ডারকে তার কর্মদক্ষতা, শৌর্য্য-বীর্য, সাংগঠনিক দক্ষতা, আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম, রণযোগ্যতা, সাহস ও নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তাঙ্গনের জনগণের হৃদয়ে নেতৃত্বের স্থান করে নিতে হবে যাতে করে যুদ্ধত্তোর পর্বে প্রয়োজনে যে কোন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে তৈরি করে তুলতে হবে জনগণের Natural Leader হিসেবে। এভাবেই সম্ভব হবে নিজেদের শক্তির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। এভাবে নিজেদের তৈরি করতে পারলে ভবিষ্যতে যে কোন হুমকির মোকাবেলায় জনগণকে সাথে নিয়ে পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হবেন যে কোন ক্রান্তিলগ্নে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

ভৌগলিক সীমানা বিকৃত করার চক্রান্ত

বর্তমান বাংলাদেশ আদি বঙ্গের একটি অংশমাত্র। ১৯৭১ সালে জাতীয় পতাকার মাঝখানে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র বসিয়ে দেয়ার বিষয়টি ছিল চক্রান্তমূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এবং সচেতন জনতার বিরোধিতার চাপে মুজিবনগর সরকার মানচিত্র সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আদি বঙ্গের পরিসীমা নির্ধারিত ছিল এভাবে:-

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, নেপাল, সিকিম এবং ভূটান। উত্তরপূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার গড়ে উঠা ব-দ্বীপ অঞ্চল, উত্তর পশ্চিমে দাড় গঙ্গা, উত্তরে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ভাগিরথী নদীর অববাহিকার সমতলভূমি, পূর্বদিকে বার্মার পর্বতমালা, পশ্চিম বঙ্গের সর্বাঞ্চল, বীরভূম, মালভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর, ময়ুরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। এই সমগ্র জায়গা নিয়েই ছিল প্রাচীনকালের বঙ্গ অথবা বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য জনপদগুলো ছিল গৌড়, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাড়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বাঙ্গাল, হরিকল প্রভৃতি জনপদ গড়ে তুলেছিল বঙ্গবাসী বা বাংলাদেশীরা। কোল, ভীল, সাবর, পুলিন্দ, হড়ী, ডোম, চন্ডাল, সাওঁতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, বাগদী, বাউড়ী, পোদ, মালপাহাড়ী প্রমুখ অন্তজ এদের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গবাসী অথবা বাঙ্গালী জাতিগোষ্ঠি। কালের আবর্তে বিদেশী আগ্রাসী শক্তিসমূহ এদেশকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশকে বিভক্ত করেছে তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্য ভৌগোলিক দ্বিধা-বিভক্তির ফলে জাতি হয়ে পরেছে বিভক্ত। কিন্তু ভৌগোলিক সীমানা অপরিবর্তনীয় নয়। আমাদের পূর্ব পুরুষরা গড়ে তুলেছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট জনপদ, শহর, নগর, বন্দর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ও জনপদ। তারা সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন উন্নতমানের সংস্কৃতি এবং বিষ্ময়কর ঐতিহ্যবাহী শিল্প ব্যবস্থা। এর সবকিছুই আমাদের জাতীয় গৌরব। কায়েমী স্বার্থবাদীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন আমাদের আবাসভূমি সীমানা সর্ম্পকে ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে জটিলতা এবং উৎভ্রান্তি সৃষ্টি করতে যাতে করে তাদের কায়েমী স্বার্থ টিকে থাকে তা একদিন নস্যাৎ হয়ে যাবে। কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে জনগণকে সর্বকালের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। জাতি একদিন ঐতিহাসিক সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং ইনশাল্লাহ এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন তারা তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায় এবং বঞ্চনার হিসাব-নিকাশ করে তাদের ঐতিহাসিক পাওনা আবার আদায় করে নেবে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ই কাদের সিদ্দিকীকে আলোচ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলে।

আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। পুরোপুরিভাবে সুস্থ না হলেও সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আমি সেক্টরে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই।

কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠার পর সেপ্টেম্বরে ফিরে গেলাম সেক্টরে। বা হাতে তখনও প্লাষ্টার। যুদ্ধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাংলাদেশে। মুক্তিফৌজ এবং গেরিলাদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে হানাদার বাহিনী দিশেহারা। তাদের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তীব্র গেরিলা অভিযানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে খানসেনারা তখন বড়বড় শহরে Defensive Position -এ বাধ্য হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। শহরগুলো ছাড়া সারা বাংলাদেশ তখন বিশাল এক মুক্তাঙ্গন। গেরিলারা প্রায় পুরো দেশই তাদের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত করেছেন। তাদের সফল তৎপরতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই সময়সাপেক্ষে একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মুক্তিফৌজের সাহস, উদ্দম এবং সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। প্রধান প্রধান শহরগুলো এমনকি ঢাকা শহরেও প্রকাশ্য দিবালোকে অসীম সাহসিকতার সাথে একটার পর একটা সফল অভিযান করে চলেছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা। নাস্তনাবুদ বেসামাল খানসেনারা 'মুক্তি'-দের সর্বদা তটস্থ অবস্থায় থাকছে। বিশেষ করে রাতের আধাঁর ওদের জন্য হয়ে উঠেছে নাভিশ্বাসের কারণ। জানবাজ মুক্তিযোদ্ধাদের অভূতপূর্ব সাফল্যের খবরগুলো বিদেশী প্রচার মাধ্যগুলোতে শিরোনামে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। আমাদের Moral ভীষণ High. ইতিমধ্যে বিএলএফ এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্যরা দেশের ভিতরে বিভিন্ন Strategic Point -এ অবস্থান নিয়েছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের তুলনায় অনেক উচুঁমানের। এ সত্বেও খান সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংঘাতে তেমন একটা অংশগ্রহণ করছে না তারা। পক্ষান্তরে অনেক জায়গায় জনগণের উপর অন্যায়-জুলুম, চাঁদাবাজী এবং লুটপাট করছিল তারা। সে সমস্ত খবর পাচ্ছিলাম আমরা। তাদের ঐ ধরণের কার্যকলাপে বাধা দেবার কালে অনেক জায়গায় মুক্তিফৌজের যোদ্ধাদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হচ্ছিল।

এই সময় হঠাৎ করে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো কাদের সিদ্দিকী নামক এক বিএলএফ সদস্য সম্পর্কে ফলাও করে প্রচারণা শুরু করে এমনভাবে যেন শুধুমাত্র কাদের সিদ্দিকীই মুক্তিযুদ্ধ করছে। এ ধরণের প্রচারণায় আমরা কিছুটা বিস্মিত হলাম। পাকিস্তান আমলে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই সৈনিক নায়েক কাদের সিদ্দিকীকে Disciplinary Charge এ শাস্তিমূলকভাবে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তার তেমন কোন বিশেষ ভূমিকার কথাও শোনা যায়নি। সেক্ষেত্রে তাকে নিয়ে এতটা হৈ চৈ কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। একইভাবে মাঝে মেজর খালেদ মোশাররফকেও ফোকাস এ আনার চেষ্টা চলেছিল কিছুদিন। পক্ষান্তরে মেজর জিয়া তার প্রাপ্য মর্যাদা কখনোই পাননি প্রবাসী ও ভারত সরকারের কাছ থেকে। দুই সরকার তার প্রতি ছিল সন্দিহান এবং বিদ্বেষপ্রবণ। কালুরঘাট থেকে দেশবাসীর প্রতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বাধীনতার যে উদাত্ত আহবান তিনি জানিয়েছিলেন তাকে মেনে নিতে পারেনি আওয়ামী সরকার।

মন্ত্রিসভা এবং সচিবালয় গঠন করা হলো

তরুণ আমলারা মুজিবনগর সচিবালয়ে যোগদানে অসম্মতি জানায়।

জুলাই আগষ্ট মাসে প্রবাসী সরকার সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক ধাচেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সমস্ত আমলারা সীমান্ত পেরিয়ে কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল এ সমস্ত আমলাতান্ত্রিক সংগঠন। সেক্টর এবং সাব সেক্টরগুলোর মতো এ সমস্ত সংগঠনেও ভারতীয় প্রতিপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল। কিছু তরুণ দেশপ্রেমিক আমলা এ ধরনের উদ্যোগের অসাড়তা উপলব্দি করে ঐ সমস্ত মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয়ে যোগদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। পরিবর্তে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগদান করে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। জনাব তৌফিক এলাহি চৌধুরি এবং জনাব কামাল সিদ্দিকী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খন্দোকার মোশতাক আহ্‌মদ তার মন্ত্রণালয় স্থাপন করলেন সার্কাস এ্যাভেনিউতে। পুরো মিশনটাই তখন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান দপ্তর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন জনাব মাহবুবুল আলম চাষী। খন্দোকার মোশতাক আহ্‌মদের একান্ত সচিব জনাব কামাল সিদ্দিকী। এ ছাড়া সার্কাস এ্যাভেনিউতে জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং জনাব মওদুদ আহ্‌মদ বর্হিবিশ্বের সাথে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটি তথ্য সেল খুলেছিলেন। সেটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসাজসে পরিচালিত হত। আইনজীবি হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জনাব মওদুদ আহ্‌মদ আওয়ামী লীগের পক্ষে কৌসুলী হয়ে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন তবুও প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে তিনি তার উদ্যোগের কোন স্বীকৃতি পাননি। এ ব্যাপারে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে জনাব মওদুদ আহ্‌মদ প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহ্‌মদকে একটি নিবেদন পত্রও লিখেছিলেন। তিনি চাইছিলেন স্বীয় উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তিনি যা কিছুই করছিলেন প্রবাসী সরকার তার স্বীকৃতি দিয়ে তাকেও কোন একটা বড়সড় পদে বহাল করুক। কিন্তু তার সে আশা পূরণ করেনি মুজিবনগর সরকার অজানা কোন কারণবশতঃ।

তাজুদ্দিন আহমদ এবং খন্দোকার মোশতাক আহমদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

শুরু থেকেই নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য হতে থাকে। ভারত সরকার যে কোন কারণেই হোক খন্দোকার মোশতাক আহমদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।

ইতিমধ্যে থিয়েটার রোডের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে। নীতিগত অনেক বিষয়েই জনাব তাজুদ্দিন ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাঝে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় সরকারও জনাব মোশতাকের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। বাজারে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহ্‌মদ গোপনে সিআইএ এর মাধ্যমে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। অস্থায়ী সরকারের অলক্ষ্যে আমেরিকার মধ্যস্থতায় তিনি নাকি পাকিস্তান সরকার ও শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তান সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান খুজে পাবার চেষ্টায় আছেন। তার এই উদ্যোগের পেছনে আওয়ামী লীগের দক্ষিনপন্থী বেশ একটা বড় প্রভাবশালী অংশের সমর্থনও নাকি রয়েছে। এ ধরণের গুজব ছড়িয়ে পড়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তার এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল। নেতাদের অনেকেই তখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ করে সহসা বা কোনদিনই দেশ স্বাধীন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ পোষণ করতেন।

তাদের মনোভাব ছিল এরূপ:- যা হবার তাতো হয়েই গেছে। আখের যতটুকু গোছাবার তাও বেশ গুছিয়ে ফেলা হয়েছে সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরতে না পারলে, গোছান সম্পদ ভোগ করা যাবে না। তাই ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সুযোগটা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

তারা কোলকাতায় বেশ আরাম-আয়েশেই সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের অসৎ উপায়ে লুটপাট করার কথা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল। এতে তাদের সম্মানেরই শুধু হানি হচ্ছিল তা নয় তাদের অনেকের প্রতিই বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা যেখানে অনাহারে, অস্ত্রহীন-বস্ত্রহীন অবস্থায় দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবনবাজী রেখে রণাঙ্গনে লড়ছেন তখন এ সমস্ত অসৎ রাজনীতিবিদ ও লুটেরার দল লুটপাটের বেশুমার টাকায় বিলাসী জীবন যাপন করে বাঙ্গালীদের বদনাম করছিলেন অতি র্নিলজ্জভাবে। এ অপমান মুক্তিযোদ্ধারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিতে চাচ্ছেন আওয়ামী লীগের অনেক সদস্যই। তারা বাংলাদেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দোদুল্যমনতায় ভুগছেন। অনেকেই আবার ভারতীয় নীল নকশার কথা আচঁ করতে পেরে শংকিত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাদের ফিরে যাবার পথে মূল বাধা হয়ে দাড়িয়েছে ইন্দিরা সরকার। ভারত সরকার কিছুতেই চাচ্ছে না বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার ইয়াহিয়া সরকারের সাথে কোনরূপ রাজনৈতিক আপোষের চেষ্টা করুক। তাদের চাপের মুখে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে জনাব তাজুদ্দিন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে বাধ্য হন, "ইয়াহিয়া সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রবাসী সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।" মুক্তিযোদ্ধারাও সংগ্রামের এই পর্যায়ে কোনরকম আপোষের বিরোধিতা করছিলেন। তারা চাইছিলেন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে। এভাবেই সার্বিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছিল। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক আহ্‌মদ আমেরিকা যাচ্ছেন লন্ডন হয়ে এক সফরে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে জাতিসংঘ প্রধান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়কদের সাথে তিনি মত বিনিময় করে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি

তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করবেন তিনি এ সফরকালে। অতএব তার এই সফর হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাবার সব প্রস্তুতিই প্রায় শেষ। কামাল সিদ্দিকীও যাচ্ছে সফরসঙ্গী হয়ে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আকস্মিকভাবেই সফর স্থগিত করে দেয় প্রবাসী সরকার। শুধু তাই নয়, মোশতাক আহ্মদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তার স্থলে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানানো হয়। জনাব মাহ্বুব আলম চাষীকেও সরিয়ে দেয়া হয় পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব থেকে। এই ধরণের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে সবকিছুই চেপে যায় তাজুদ্দিন সরকার। কিন্তু পরে সব গোপনীয়তাই ফাঁস হয়ে যায়।

জানা যায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নাকি জানতে পারে যে, জনাব মোশতাক আহ্মদ গোপনে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। তার লন্ডন সফরের উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতায় শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়া সরকারের সাথে একটা চূড়ান্ত ফায়সলা করে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছা। এই চক্রান্তের খবর পেয়েই জনাব তাজুদ্দিন ভারত সরকারের নির্দেশেই ঐ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। আরো তথ্য জানা যায়- খন্দোকার মোশতাক আহ্মদ, ইয়াহিয়া সরকার এবং মার্কিন সরকারের ত্রি-পাক্ষিক ঐ সমঝোতা-আলোচনার প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের সমর্থন ছিল।

ভারতীয় নীলনকশা এবং মুজিবনগর সরকার

চরম দূর্নীতি

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একটি বড় অংশ এবং তাদের তল্পিবাহকরা মুক্তিযুদ্ধের সুযোগে চরম দূর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র বগুড়ার ষ্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপর। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন রাজনৈতিক নেতারা এবং আমলাদের একটা অংশ। কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিদেশের মাটিতে বসে ছিনিমিনি খেলার ন্যাক্কারজনক ইতিহাসের কোন জবাব আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসে কিংবা স্বাধীনতার পর জনগণের কাছে দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। মনগড়া হিসাবের ফিরিস্তি দিয়ে লুটপাটের কলঙ্ক মোছা যায় না। সংগ্রামকালের লুটপাটের সম্পদে রাতারাতি রাজনৈতিক নেতারা, তাদের পরিবার-পরিজনরা এবং চিহ্নিত কিছু আমলা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিলেন। বাড়ি, গাড়ী, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন ঐ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিরা। সেই সমস্ত রহস্য সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে জনগণের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সংগ্রামকালের এক পর্যায়ে ক্ষুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধ এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বপ্রথম এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। এ ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর সাথে কথাও হয়েছিল। তাকে বোঝানো হয়েছিল এ সমস্ত অসৎ নেতৃত্বের অধিনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হওয়ায় বিশ্ব পরিসরে সংগ্রামের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয় তাদের পার্থিব লোভ-লালসা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ জাতিকেই ব্ল্যাকমেইল করা সম্ভব হবে অতি সহজেই। সব শুনে তিনি বলেছিলেন, "অভিযোগ যুক্তি সম্পন্ন কিন্তু তবুও বিদেশের মাটিতে নিজেদের মাঝে কাটাকাটি শুরু করলে মূল উদ্দ্যেশ্য থেকে আমরা দূরে সরে যাব। অবশ্যই এ সমস্ত অসৎ ব্যক্তিদের শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু সেটা দেয়া হবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে গণআদালতে।" তার কথা মেনে নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে গণআদালত তো দূরের কথা কোন কোর্ট-আদালতেও ঐ সমস্ত অপরাধিদের বিচার হয়নি। কারণ এ সমস্ত অসৎ কার্যক্রমের সাথে প্রশাসনের প্রায় সব রুই-কাতলাই জড়িত ছিলেন। রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে উঠে তখন অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অবস্থাও হয়েছিল ঠিক তাই। লুটপাট, চুরি-চামারির বিচারের পরিবর্তে এ সমস্ত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের মাত্রা গিয়েছিল অনেক বেড়ে। কর্নেল ওসমানীর কথা শুধু কথা হয়েই থেকে যায়। স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই কোন ব্যাপারেই ন্যায়সঙ্গত কোন বিচার পায়নি জাতি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে, শুধু পেয়েছে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন, প্রতারণা ও বঞ্চনা।

লুটপাট সমিতির কার্যকলাপে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথা সমস্ত বাঙ্গালী জাতির ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছিল তার কয়েকটি বিবরণ নিচে দেয়া হল:-

লুটপাট সমিতির সদস্যরা তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক ষ্ট্রিটের হোটেল, বার এবং রেস্তোরাগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য 'জয় বাংলার শেঠ' বলে পরিচিত। যেখানেই তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিংবা

হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্র্যান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফক্স, মলিন রুা, হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেষ্টুরেন্টগুলো জয়বাংলার শেঠদের ভীড়ে জমে উঠে। দামি পানীয় ও খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আমেজে রঙ্গীন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয়-বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশি হন। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্র্যান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কব্জা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় চার কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যানরা কাচুমাচু হয়ে তাকে জবাব দেয় সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙ্গালী শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসালো খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল-তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন, কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগ পর্যন্ত তিনি ও তার সঙ্গীগণ ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবেন বারে। তার হুকুম শুনে বারম্যান ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন,

-রোজ আপনাদের বারের সেল কত টাকা?

ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তেরর কথা জানিয়ে বলেন পুরোদিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন। পুরো টাকার মদ ওরা খেয়ে শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন। ম্যানেজার তার কথা শুনে 'থ হয়ে গিয়ে মাতালের প্রলাপ মনে করে কোন রকমে সেখান থেকে কেটে পড়েন।

আর একদিন আর একজন জয়বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমবারের মত জুতো পরার দিনটি উৎযাপন করার জন্য ব্লু ফক্স রেষ্টুরেন্টে প্রায় ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এছাড়া অনেক শেঠরা দিল্লী এবং বোম্বেতে গিয়ে বাড়িঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতেও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কির্তিকলাপের ওপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর। অনেকে তার এ ঔদ্ধত্বে ক্ষেপেও গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস্ উপহার দিয়েছিলেন।

দরগা রোডের বিশু বাবুর বাড়িতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকার প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশু বাবুর বাড়িতে এবং ৩নং সোহরাওর্য়াদী এ্যাভেনিউ এর তিন তলার ছাদের দু'টো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থসচিব জনাব সামসুজ্জামান এবং তার পরিবার ও রাফি আক্তার ডলি। এ টাকার কোন হিসাব ছিল না। কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়াড়ীদের সাহায্যে এগুলোর এক্সচেঞ্জ করা হত। এ কাজের দালালী করেও অনেকে কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হলেও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সংবরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তসত্বা স্ত্রীকে বেয়োনেটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলংকার খুলে নিয়েছিলেন; এমন ঘটনাও ঘটেছে। এ ধরণের কিছু ব্যক্তি নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেছেন আজ অব্দি। কিন্তু তারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কলংক। তাদের অপকর্মের জন্য সাধারণভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কলংকের ভাগী হতে হয়েছে।

যুব শিবির, শরনার্থী শিবিরগুলোতে বরাদ্দকৃত রিলিফ সামগ্রী নিয়েও কেলেংকারী হয়েছে অনেক। ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল প্রায় ১ কোটি শরনার্থী। তাদের জন্য সারাবিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযত্নে প্রচুর এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকুইবা দেয়া হয়েছিল শরনার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে! এ সমস্ত রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের। বগুড়ার ষ্টেট ব্যাংক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাবনার ট্রেজারি থেকে। সে টাকারও কোন সুষ্ঠ হিসাব পাওয়া যায়নি।

কোলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্রগুলো

মুক্তিযুদ্ধ কিংবা বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন খবর কিংবা তথ্য জানার জন্য ঐ সমস্ত প্রাণ কেন্দ্রগুলোই ছিল মূল উৎস।

ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ জনাব আর আই চৌধুরির সরকারি বাসভবন হলেও তখন ঐ বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন প্রায় সমাজের ভিআইপি এবং ভিভিআইপি-দের প্রায় ১৭টি পরিবার। তাই সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ সেই সময় হয়ে উঠেছিল দেশের এলিট শ্রেণীর আশ্রয়স্থল। এদের মধ্যে ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, নামিদামী শীর্ষস্থানীয় আমলা, ব্যবসায়ী, পুলিশ, আর্মি এবং প্রচার মাধ্যমের লোকজন। উল্লেখযোগ্য হলেন বেগম সাজেদা চৌধুরি এবং তার স্বামী জনাব গোলাম আকবর চৌধুরি এবং পরিবার, জনাব মুস্তাকিম চৌধুরি এবং তার স্ত্রী এ্যানাখালা এবং পরিবার, রাফি আকতার ডলি, জনাব আসাদুজ্জামান এবং পরিবার, জনাব আলি আকবর খান, জনাব কামাল সিদ্দীকি, জনাব খসরুজ্জামান এবং তার স্ত্রী লুসি খালা, জনাব মামুনুর রশিদ এবং তার স্ত্রী রাকা, জনাব আব্দুল খালেক এবং তার পরিবার, জনাব ওয়ালীউর রহমান এবং ব্রজেন দাস। এদের অবস্থানের ফলেই এই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল খবরা-খবরের বিশেষ প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছিল থিয়েটার রোড ছাড়াও ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউ এর বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দূতাবাস, প্রিন্সেপ ষ্ট্রিটের বামপন্থীদের আড্ডা, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, সিইইনসির হেডকোয়াটার্স, বাংলাদেশ থেকে আগত তরুণদের আড্ডা শিয়ালদাহ এবং বাংলাদেশ বেতার।

এ সমস্ত জায়গাগুলো রাতদিন চব্বিশ ঘন্টাই লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকতো এবং সব ধরনের খবরা-খবর এবং গুজব নিয়ে সবাই মেতে থাকতো। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামকালে কোথায় কি ঘটেছে, গুজব কি রটেছে তার সবকিছুই জানা সম্ভব হতো ঐ সমস্ত জায়গাগুলো থেকে।

অন্যরা কি করছিল?

অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের কর্মকান্ড ছিল খুবই সীমিত। অস্থায়ী সরকার এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তারা ছিল অবাঞ্ছিত।

মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশ থেকে আসামে পালিয়ে আসার পর থেকেই ভারতীয় সরকারের প্রটেকটিভ কাষ্টডিতে আটক হয়ে থাকেন। মজলুম নেতাকে নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিল ভারত সরকার। প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে তিনি যাতে কোন প্রকার নেতৃত্ব দিতে না পারেন তার জন্য অতি সতর্কতার সাথে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারত সরকার এবং আওয়ামী লীগ কখনো মাওলানাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার সাথে তার দলীয় নেতা ও কর্মীদেরকেও কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে দেয়া হয়নি পুরো নয়টি মাস। ভাসানী, ন্যাপের কর্মী ও যুবনেতারা অল্পদিনেই বুঝতে পেরেছিলেন আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার এবং ভারতীয় সরকারের কাছে তারা খুব একটা গ্রহণযোগ্য নন। মাওলানা ভাসানী এবং প্রগতিশীল যুব নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নেতাদের দলীয় সরকারের পরিবর্তে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাদের সে আবেদনে আওয়ামী লীগ কিংবা ভারতীয় সরকার কেউই সাড়া দেয়নি বরং আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজনমত মাওলানাকে ব্যবহার করার চেষ্টাই করেছে। কিন্তু মাওলানা ভাসানী সে ফাদে পা দেননি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জনাব মশিউর রহমান যাদুমিয়া একবার কোলকাতায় এসেছিলেন। কোলকাতায় তিনি তার দলীয় প্রধান মাওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হন। তবে তিনি তার দলীয় যুব ও ছাত্রনেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মত বিনিময়কালে তিনি বুঝতে পারেন ভারতের মাটিতে বসে তিনি কিংবা তার দলীয় কর্মীরা স্বাধীনতার যুদ্ধে তেমন বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারবেন না। তারা ভারত সরকারের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্যও পাবেন না, তাই তিনি দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেরূপ নির্দেশ কর্মীদের দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। কোলকাতায় অবস্থানকালে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ সর্বক্ষণ তাকে নজরে রাখে। আওয়ামী সরকারও তার আগমনকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তার চলে যাবার পর মেনন, জাফর, রনোরা সম্মিলিতভাবে স্বীয় উদ্যোগে তাদের কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। বামপন্থী দলগুলোর বেশিরভাগ নেতারা বিশেষ করে চীনপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। তারা এ সংগ্রামকে 'কুকুরে কুকুরে লড়াই' বলে ভুলভাবে আক্ষায়িত করে জাতীয় সংগ্রামকে উপেক্ষা করে শ্রেণী সংগ্রামের লাইন চলিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নেতা তাদের ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তিকালে স্বাধীনতার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার ভুল মূল্যায়নের জন্য প্রগতিশীল এবং বামপন্থীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন। তাদের এই দুর্বলতা এবং ভূল পরবর্তিকালে অনেকেই স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আজো অনেক পিছিয়ে আছে। তার জন্য আমাদের প্রগতিশীল ও বামপন্থী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী। ভারতের মস্কোপন্থীরা যেভাবে ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে আসছিল ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের তথাকথিত মস্কোপন্থীরা সংগ্রামের সময় পুরোপুরিভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করেছিল। প্রভুদের ইঙ্গিতে তাদের নিয়ে বিশ্ববাসীকে দেখাবার জন্য তথাকথিত পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ৮ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করেছিল প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার।

অস্থায়ী সরকার জোনাল এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়

এমএনএ, এমপিএ এবং আমলারা সুরক্ষিত স্বর্গ কোলকাতা ছাড়তে নারাজ হলেন। তাই পরিকল্পনাও গেল ভেস্তে।

প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু মিটিং এবং আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এবং মুজিবনগরে অবস্থিত আমলাদের নিতে হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা মুক্ত এলাকায় এমএনএ, এমপিএ এবং কোলকাতাবাসী আমলাদের অধিকাংশই যেতে রাজি হননি। ফলে তাদের সব দায়িত্বই বহন করতে হয়েছিল সেক্টর এবং সাব-সেক্টর কমান্ডারদের। মাঝেমধ্যে কোলকাতার মুজিবনগর থেকে নামি-দামী নেতারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আসতেন মুক্তিযোদ্ধাদের মটিভেশন লেকচার দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ ধরণের মিশনে এসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হত। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেস করতে পারতেন না তারা। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বলতেন, "গালভরা কথার ফুলঝুড়ি শোনানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা যুদ্ধ করছি জানবাজী রেখে। আমাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদপত্রের কি ব্যবস্থা করে এসেছেন সেটাই আমরা জানতে চাই। আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। সমস্যার সমাধান যদি করতে না পারেন তবে অন্ততঃপক্ষে আমাদের সাথে থেকে সে সমস্ত সমস্যার ভাগীদার তো হতে পারেন। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে শুধু ছবি তোলার জন্য আর বক্তৃতা দেয়ার জন্য এসে আমাদের সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারাও এ বৃথা কষ্ট না করে মুজিবনগরে বসে থাকুন। দেশ স্বাধীন হলে দেখা হবে।"
মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরণের বক্তব্য শুনে মুজিবনগরের আওয়ামী সরকার এবং ভারত সরকার একইভাবে শংকিত হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডারদের আনুগত্য সর্ম্পকে সন্দিহান হয়ে উঠে তারা।

ভবিতব্য সত্যি হলো

বিবিসির একটি সাংবাদিকের দল মাসিমপুর সামরিক হাসপাতালে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

জুলাই মাসের শেষার্ধে লাঠিটিলার যুদ্ধে আমি দ্বিতীয়বারের মত আহত হই মর্টারের গোলা ও মেশিনগানের গুলিতে। চিকিৎসার জন্য আমাকে শীলচরের মাসিমপুর সিএমএইচ এ নিয়ে যাওয়া হয়। আহত অবস্থাতেও আমাকে হাসপাতাল কক্ষ থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। আমার ঘরটাতেই স্থাপন করি ছোট খাট একটি **op's room।** এ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন ব্রিগেডিয়ার ভট্‌কে, কর্নেল বাগচী, মেজর দাসগুপ্ত ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী। আমি যখন আহত অবস্থায় হাসপাতালে তখন বিবিসি লন্ডন থেকে সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল এলেন আমাদের সিলেট সেক্টরে। তারা আমার সাথে আলাপ করতে চান। আমার আপত্তি নেই জেনে তারা এলেন আমার হাসপাতালের রুমে। ঘরে আমি তখন শয্যাশায়ী। পরিচয়পর্ব শেষে তাদের একজন চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

— এতো দেখছি একটা ছোটখাটো **op's room.** অসুস্থ অবস্থায় এ সমস্ত ম্যাপ, ওয়্যারলেস সেট প্রভৃতি নিয়ে আপনি কি করেন?

— আমি আহত হয়ে কিছুদিনের জন্য এখানে শয্যাশায়ী হয়ে আছি বলে যুদ্ধতো বন্ধ হয়ে যায়নি। যুদ্ধ চলছে এবং চলবে। সেক্ষেত্রে সাধ্যমত যতটুকু সম্ভব দায়িত্ব বিছানায় শুয়েও আমি পালন করে যাবার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন করলেন আর একজন,

— শুনেছি আপনি আরো দু'জন অফিসারের সাথে পাকিস্তান থেকে সর্বপ্রথম পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছেন। আপনার আপন-পরিজনদের সবাইতো বাংলাদেশে রয়েছেন। তাদের উপর পাক বাহিনীর তরফ থেকে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

— আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয় সংগ্রাম। এ সংগ্রামে অবদান রাখার পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্যই আমরা পালিয়ে এসেছি। আজ বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবার থেকেই সদস্যরা এসে যোগদান করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। দেশকে শত্রুর কবল থেকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তারা। তাদের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিবার-পরিজনদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার আত্মীয়-স্বজনদের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটবে। অতএব, এ নিয়ে আমার চিন্তা করার কিছু নেই। আপনজনদের শত্রুর পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে দেশকে স্বাধীন করতে হবে তাইতো আমরা মরণপন যুদ্ধ করে যাচ্ছি দেশকে শত্রুমুক্ত করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আজাদী লাভ করার লক্ষ্যে। স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। দেশকে স্বাধীন করে ছাড়বোই ইনশাল্লাহ্‌।

আমার জবাব শুনে তাদের একজন মন্তব্য করেছিলেন,

— আপনাদের মত সন্তান যে দেশ জন্ম দিয়েছে তার স্বাধীনতা পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারবে না।

ভদ্রলোকের কথাগুলো আজও মনে আশার আলো যোগায়, ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠি। ১২ কোটি জাগ্রত বাংলাদেশী দাসত্বের সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে চুর্নবিচুর্ন করে দেবে নিশ্চয়ই। স্বাধীন মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাড়াবেই একদিন। আমার সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারটি পরে বিবিসি থেকে প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রচারণা থেকেই আমার আত্মীয়-স্বজনরা সর্বপ্রথম জানতে পারেন, আমি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।

অবিস্মরণীয় বিবাহ

বিবাহ পূর্ব নির্ধারিত বিষয় হলেও আমাদের বিয়েটা ছিল অস্বাভাবিক এবং ঐতিহাসিক।

বেশ কিছুদিন যাবত কোলকাতার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। আমার আহত হওয়ার খবরটা নিম্মীকে জানাইনি ইচ্ছে করেই। বেচারী অযথা চিন্তিত হয়ে পড়বে খবরটা শুনে। কিন্তু আমি না জানালেও থিয়েটার রোড থেকে খবরটা অতি সহজেই ওর কানে পৌঁছাতে পারে। শুয়ে শুয়ে এ সমস্তই ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ আগে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বাবু ও আতিক এসেছিল। ওদের সাথে অপারেশনাল এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কিছু বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তারা ইনসট্রাকশনস্ নিয়ে ফিরে গেছে। একান্ত অবসর খুব কমই পাওয়া যায়। কেউ না কেউ আসছেই। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সমস্যা। বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই আমার সময় কেটে যায়। ডাক্তার-নার্সরা অনেক সময় লোকজনদের আসা-যাওয়ার ভীড় দেখে আমাকে এসে উপদেশ দেন বিশ্রাম নেবার জন্য। হাসিমুখে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান দেয়া ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব হয় না। মিসেস ভট্টকে প্রতিদিন খাবার পাঠাচ্ছেন হাসপাতালে। তার স্নেহের ঋনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন। হঠাৎ একাকীত্ব যেন আমায় পেয়ে বসল। মনটাও কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। নিম্মীকেই বিশেষ করে মনে পড়ছিল। স্মৃতিমধুর অতীত মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। কিছুক্ষণের জন্য তলিয়ে গিয়েছিলাম অতীত স্মৃতিমন্থনে। হঠাৎ দেখলাম দরজায় তিনজন এসে দাড়িয়েছে। মাহবুব ও ফারুক দু'জনেই আমার প্রিয় গেরিলা কমান্ডার। কিন্তু তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখে চমকে উঠলাম! নিজের চোখকেই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না! কাছে আসতেই পরিষ্কার হয়ে গেল সব। বাপ্পিই বটে!

— একি! তুই এখানে? আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।
— থাক থাক উঠতে হবে না।

বলে বাপ্পি এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। উষ্ণ আবেগে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। ইতিমধ্যে মাহবুব বাপ্পিকে শয্যার পাশে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বসতে বলল।

— কিরে বাপ্পি! তুই এখানে এলি কি করে? পথ চিনলি কি করে? জানলিই বা কি করে আমি এখানে আছি?
— আগে বল আহত হবার কথা তুই আমাদের কেন জানাসনি? পাল্টা প্রশ্ন বাপ্পির।
— কেন জানাইনি সেটা সত্যিই কি বুঝতে পারছিস না?
— আমরা উদ্বিগ্ন হতাম ঠিকই বিশেষ করে নিম্মী। কিন্তু তবুও খবরটা তোর জানানো উচিত ছিল। তার যুক্তি মেনে নিলাম। ঝগড়া করে লাভ নেই, আমার ভুল হয়েছে মেনে নিলাম।
— কিন্তু তুই হঠাৎ করে এখানে কেন?
— তোর আহত হবার খবর নূর ভাই এবং সালাহ্উদ্দিন ভাই নিজেরা বাসায় এসে আমাদের জানান। খবরটা জানিয়ে ওরা অবশ্য নিম্মীকে বোঝাতে চেষ্টার কোন ক্রুটি করেননি যে তুই ভালোই আছিস। ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু তাদের সে সান্ত্বনা বাণী নিম্মী পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিল না কোন মতেই। তার একই সন্দেহ ওঁরা তার কাছে আসল অবস্থা লুকোচ্ছেন। নিম্মীর সে কি কান্না! সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিল। ওর অবস্থা দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। ওকে বললাম, 'ঠিক আছে আমি নিজেই যাচ্ছি শীলচরে ডালিমের অবস্থা দেখে আসতে।' কিন্তু বাধ সাধলেন বাবা-মা। তারা বললেন, 'ক্যানাডা যাবার সবকিছুই ঠিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শীলচর যাবার প্রশ্নই উঠে না।'
— ওহ! তুই আর নিম্মী ক্যানাডা যাচ্ছিস বুঝি? কিছুটা অবাক হলাম আমি।
— হ্যাঁ। আমাদের দু'জনের মতের বিরুদ্ধেই বাবা আমাদের গামু কাক্কুর কাছে পাঠাবার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। মা দিব্যি দিয়েছেন আমরা না গেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

এ অবস্থায় আমাদের কি আর করার আছে বল? কিন্তু নিম্মী কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। এর জন্য ওর উপর বাবা-মা ভীষণ খ্যাপা। মারধরও তাকে খেতে হচ্ছে বেধুম। ওর এক কথা, তোকে এ অবস্থায় রেখে সে কোলকাতার বাইরে এক পাও নড়বে না। প্রয়োজনে সেও আত্মহত্যাই করবে তবুও ক্যানাডা যাবে না কিছুতেই। এ বিষয় নিয়ে বাড়িতে এখন অশান্তির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সবদিক সামলাতে পারছি না কিছুতেই। বিশেষ করে নিম্মীর যে অবস্থা, কোন একটা অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। অবস্থা দেখে আমিও বাবাকে মুখের উপর বলে ফেললাম, 'ডালিমকে না দেখে ক্যানাডায় আমিও যাব না।' আমার দৃঢ়তায় অবশেষে বাবা-মা রাজি হলেন আমাকে আসতে দিতে। আমার আসার অনুমতি পাওয়াতে নিম্মী বেচারীও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। ওকে কথা দিয়ে এসেছি তোর যথাযথ ব্যবস্থা করেই আমি ফিরব। প্রয়োজন হলে কোলকাতায়ও নিয়ে যাব তোকে। তারপর ট্রেনে করে শীলচর। শীলচর ষ্টেশনে নেমে মুক্তিযোদ্ধাদের সদর দফতর খুজে পেতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি আমার। ওখান থেকে মাহবুব ও ফারুককে সঙ্গে দিয়ে দেয়া হল। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এখানে। মজার কথা কি জানিস! শীলচর পৌঁছে সবচেয়ে অবাক হয়ে গেয়েছিলাম এটা দেখে যে বাপ্পি নামটার মাধ্যমে আমি এখানে বহুলভাবে পরিচিত।

— হ্যাঁ। মাহবুব, ফারুক দু'জনেই আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। ওরা ছাড়াও আরও অনেকেই তোদের ব্যাপারে সবকিছুই জানে। কথার ফাঁকে নার্স চা-নাস্তা রেখে গিয়েছিল।

বাপ্পিকে বললাম,

— আমার বা দিকের এত বড় ব্যান্ডেজ দেখে ঘাবড়াসনে। ব্যান্ডেজের তুলনায় ক্ষত অনেক ছোট। কাধে মাত্র তিনটি এলএমজি বুলেট আর তালুতে মর্টার শেলের সিপ্রন্টার লেগেছে এই যা। ডাক্তাররা বলেছেন, নন ষ্টপ ব্লিডিং এর মধ্যেও ৯০ মাইল গাড়িতে করে হাসপাতালে জীবিত অবস্থায় যখন পৌঁছতে পেরিছি তখন এ যাত্রায় মরার ফাঁরা কেটে গেছে। এখনতো বহাল তবিয়তেই রয়েছি। দেখতে পাচ্ছিস না কেমন op's room সাজিয়ে বসেছি? কোন অসুবিধে নেই।

বাপ্পির ছলছল চোখ দেখে অনেকটা বাধ্য হয়েই ওকে আশ্বস্ত করার জন্য কথাগুলো বলতে হল আমার। আমার কথায় বাপ্পির উদ্বিগ্নতা কতটুকু এল ঠিক বুঝতে পারলাম না। অল্পক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল,

— এখানে হাসপাতালে তোর পড়ে থাকা চলবে না। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তোকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

— ঠিক বলেছেন বাপ্পি ভাই। ডাক্তাররাও তাই বলছেন। কোলকাতায় গিয়ে স্পেশালিষ্ট এর আন্ডারে চিকিৎসা করানো উচিত বলে তারাও মনে করছেন। কিন্তু হক ভাই কিছুতেই সেক্টর ছেড়ে যেতে রাজি নন। তিনি চলে গেলে আমাদের এখানে অনেক অসুবিধা হবে এটা ঠিক। কিন্তু কোলকাতায় গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করিয়ে সম্পুর্ন সুস্থ হয়ে তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন সেটাই আমরা সবাই চাই। তিনি সম্পুর্ন সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তার সাময়িক অনুপস্থিতির ঘাটতি অনায়াসে পুষিয়ে নিতে পারব সুদে-আসলে। মাহবুব বাপ্পির কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল।

— হক ভাইকে যে করেই হোক আপনাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। এখানে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তার অবস্থার চরম অবনতিও ঘটতে পারে। এর জন্য কিছু সময়ের জন্য তাকে কোলকাতায় অবশ্যই যেতে হবে। ফারুকও তার যুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে বলল।

বাপ্পির জেদ ও সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের যুক্তির কাছে আমার কোন কথাই টিকল না। সবার কাছে বিদায় নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বাপ্পি আমাকে নিয়ে কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হল। বাই রোড আমরা গৌহাটি এলাম। সঙ্গে এল আমার প্রিয় গেরিলা কমান্ডাররা। গৌহাটি থেকে প্লেনে কোলকাতায়। সবাইকে ছেড়ে আসতে ভীষণ খারাপ লাগছিল। ওরা সবাই অশ্রুসিক্ত আবেগে

বিদায় দিয়েছিল আমাদের। কথা দিয়েছিলাম, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা সেরে ফিরে আসব।”

কোলকাতায় ফিরে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন তখন হেডকোয়াটার্সে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু স্বাস্থ্যগত কারণে সেক্টর থেকে হেডকোয়াটার্সে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি নাকি সেক্টরে অসম্ভবভাবে স্নায়ু দুর্বলতা এবং মানসিক রোগে ভুগছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা কিছুতেই নাকি তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মেজর মঈনুল ইসলামকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা ও ভুল নেতৃত্বের জন্য কমান্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে হেডকোয়াটার্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি কিছুদিন যাবত হেডকোয়াটার্সেই অবস্থান করছেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে কোলকাতায় বেশকিছু পরিবারের সাথে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে মিত্রী মাসী, ডঃ গনী এবং তার পরিবার, অরুপ দা ও পারুমিতা বৌদি, জনাব আইয়ূব ও তার স্ত্রী গৌরিদী, প্রিতিশ নন্দী ও তার স্ত্রী রীনা, ইন্দু প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছিলাম। তারা সবাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিভিন্নভাবে প্রচুর অবদান রেখেছিলেন। যুদ্ধের বিবরণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে শুনতে তারা সর্বদাই বিশেষভাবে উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের সবার মধ্যেই ধরা পড়ত প্রকটভাবে। কিন্তু যখনই তাদের বলেছি, “স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে স্বাধীনতার জন্য আমরাতো সংগ্রাম করে যাচ্ছি, কিন্তু পশ্চিম বাংলার আপনারা নিশ্চুপ হয়ে কেন্দ্রিয় শোষণ এবং জাতীয় নির্যাতন সহ্য করছেন কেন? পুরো বাঙ্গালী জাতির মুক্তির জন্য আপনাদের কি কিছুই করার নেই?” এ ধরণের আলোচনায় সর্বদাই তারা পাশ কাটিয়ে যেতেন অথবা থাকতেন চুপ করে। কখনও যুক্তি দেবার চেষ্টা করতেন বাংলাদেশের সাথে তাদের অবস্থাকে তুলনা করা ঠিক নয়। বেশ অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়ে যেতেন তারা এ ধরণের বিতর্কে। তাই আমরাও এ সমস্ত ব্যাপারে তেমন বিশেষ উচ্চবাচ্য করতাম না। সময় সময় আমরা এ ধরণের কথাও তাদের বলেছি, “বাংলাদেশের সংগ্রামের ছত্রছায়ায় কংগ্রেস সরকার সিআরপি এবং বিএসএফ বাহিনীর মাধ্যমে অসংখ্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, যুবক মেরে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার অঞ্চলে।” এ ধরণের বক্তব্যকে অস্বীকার করতে পারতেন না তারা। কিন্তু সব সত্যকেই কেমন জানি নেতিবাচকভাবে মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতেন। তাদের এই চুপ করে থাকার রহস্য আজও মাঝেমধ্যে আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

থিয়েটার রোডেই আমার থাকার ব্যবস্থা হল। তখনকার দিনে প্রখ্যাত বোন স্পেশালিষ্ট ডঃ মুরালী মুখার্জীর সাথে আমার চিকিৎসার ব্যাপারে পারুমিতা বৌদি ইতিমধ্যেই আলাপ করেছেন। আমার ক্ষত পরীক্ষা করে তিনি বললেন, “গান পাউডার এবং বুলেট ইনজ্যুরির ফলে খারাপ ধরণের ইনফেকশন দেখা দিয়েছে। ইনফেকশনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে গ্যাংরিনে টার্ন নিতে পারে। প্রথমে চেষ্টা করতে হবে ইনফেকশন বন্ধ করার।” ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু কিছুই করার নেই। বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে। তিনি ঔষধ, ইনজেকশন লিখে দিলেন এক সপ্তাহের জন্য। বৌদি আমাকে মনোবল জোগানোর জন্য বললেন, “কোন চিন্তা করবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।” বেশিরভাগ সময় আমাকে শুয়েই থাকতে হয়। বাপ্পির সাথে নিম্মী এসে আমাকে দেখে গেছে। রোজ তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। সুযোগমত ও টেলিফোন করে আমাকে। বাপ্পির মাধ্যমে ভালোমন্দ খাবার পাঠায় প্রায়ই।
একদিন বাপ্পি এল। ভীষণ গম্ভীর ভাব। বুঝলাম বাসায় কিছু একটা ঘটেছে। ঠিক তাই। ক্যানাডা যাওয়া নিয়ে ঝড় বয়ে গেছে বাসায়। কথা কাটাকাটি তারপর বেধম প্রহার। বাপ্পি বলল, “বাসার অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। এর একটা আশু সমাধান প্রয়োজন। তা না হলে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে নিম্মী। তার মত কোমল প্রকৃতির মেয়েও ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ওকে কিছুতেই ক্যানাডায় পাঠাতে পারবে না বাবা-মা। মানসিক চাপে ক্রমান্বয়ে তার

শারীরিক অবনতিও ঘটছে। রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে। এ অবস্থায় সব চাপ সহ্য করা কতদিন সম্ভব হবে তার পক্ষে?" সব শুনে ভীষণ চিন্তায় পড়লাম। কি করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। নূর এবং সালাহ্উদ্দিনের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম ওদের সাথে। তারা বলল, "সব দিক রক্ষা করার জন্য আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া দরকার। একমাত্র বিয়ে হলেই নিম্মীর ক্যানাডা যাওয়া বন্ধ হতে পারে। একমাত্র তখনই ওর পক্ষে আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দেয়া সম্ভব।" কিন্তু এ অবস্থায় বিয়ের জন্য তার বাবা-মা রাজি হবেন কি? নূর ও সালাহ্উদ্দিন একদিন আমার তরফ থেকে প্রস্তাব নিয়ে গেল নিম্মীদের বাসায়। প্রস্তাবে ওর বাবা-মা রাজি হলেন না। ওদের যুক্তি যেখানে সবকিছুই আজ অনিশ্চিত সেখানে কি করে তারা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে রাজি হন? হতাশ হয়ে ফিরে এল নূর এবং সালাহ্উদ্দিন। ওদের কোন যুক্তিই তাঁরা গ্রহণ করলেন না। অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পর। নিম্মী আমাকে পরিস্কার লিখে জানাল, "যেভাবেই হোক না কেন তাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তা না হলে সে আত্মহত্যা করবে কিন্তু তবুও ক্যানাডায় আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে সে কিছুতেই যাবে না।" কি অসম্ভব দৃঢ়তা! দুঃশ্চিন্তায় অধীর হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলাম বিয়েই করব। নূর, সালাহউদ্দিন ওরাও আমার সিদ্ধান্তে একমত হল। এ ব্যাপারে গৌরিদী, গনী নানা, মিসেস জামানের সাথে আলাপ করে তাদের পরামর্শ চাইলাম। তারাও অভিমত প্রকাশ করলেন, "বিয়েই একমাত্র পথ।" নিম্মীকে পত্র মারফত জানিয়ে দিলাম, "আমরা কিছু একটা করছি। কিন্তু তাকে সুস্থ এবং স্থির থাকতে হবে।"

বিয়ে তো হবে। কিন্তু নিম্মীকে কি করে ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউ থেকে বের করে আনা যায়। বাড়িটা তখন একটি বিশেষ নিরাপত্তাধীন দুর্গই বটে। সমস্ত VIP-V.VIP'রা বাস করছেন সেখানে। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রায় ৩০-৪০ জন পুলিশ সার্বক্ষণিকভাবে পাহারায় মোতায়েন রয়েছে। তার উপর নিম্মীর উপর রয়েছে কড়া নজর। বাড়ির বাইরে যাওয়া ওর জন্য নিষিদ্ধ। সর্বোপরি সে শারীরিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবাই মিলে তাকে বের করে আনার একটা পরিকল্পনা আঁটা হল।

মিসেস জামান, নায়লা, লুবনা ও গৌরিদী যাবেন নিম্মীদের বাসায়। নায়লা, লুবনা নিম্মীর বন্ধু বিধায় মিসেস জামানের সাথেও নিম্মীদের পূর্ব পরিচিতি আছে। নায়লা, লুবনা এবং মিসেস জামান বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দল গঠনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে কাজ করছিলেন সেটা তখন প্রায় সর্ব মহলেই জানা। নিম্মী খ্যাতিমান ক্ল্যাসিকাল নৃত্য শিল্পী তাই সেও যাতে দলে যোগদান করে সেই অনুরোধ জানাবার উছিলায় যাবেন তারা। ঠিক হল কথার ফাকে নায়লা ও লুবনা নিম্মীকে যে করেই হোক কোনমতে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসবে। বাইরে নূরেরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এরপর গাড়ি করে সোজা মৈত্রী মাসীর বাড়ি। বিয়ে সেখানেই হবে। গনী নানা বিয়ের কাজী, রেজিষ্ট্রার এসব কিছুর দায়িত্ব নিবেন। সালাহ্উদ্দিনকে আনুসাঙ্গিক অন্যসব ব্যবস্থার ভার দেয়া হল। পরিকল্পনার ব্যাপারে অবগত থাকলেন থিয়েটার রোড হেডকোয়ার্টার্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, ক্যাপ্টেন চৌধুরী। এছাড়া অন্য কাউকে কিছু বলা হল না। বিয়ের দিন ধার্য্য হল ১৬ই আগষ্ট সকাল দশটার দিকে। নায়লারা গিয়ে উপস্থিত হল ৩নং সোহরাওয়ার্দী এ্যাভেনিউতে। প্ল্যানমত আলাপের এক ফাকে নায়লা এবং লুবনা বসার ঘর থেকে গিয়ে হাজির হল নিম্মীর ঘরে। সেখানে পৌঁছে নিম্মীকে লায়লা বলল, "এক্ষুণি চলো আমাদের সাথে। আজ তোমার বিয়ে।" প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল নিম্মী। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝে নিল সবকিছু। অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে এক কাপড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাড়াল নিম্মী। যে কোন কুমারী মেয়ের পক্ষে এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটি অসম্ভব দুরহ্ কাজ। নিম্মীর ভালোবাসার একনিষ্ঠতা এবং গভীরতাই সেদিন শক্তি যুগিয়েছিল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে। শারীরিক অসুস্থতা এবং স্নায়ু দুর্বলতার জন্যে বেচারী হাটতেও পারছিল না ঠিকমত। নায়লা ও লুবনা ওকে দু'দিক থেকে ধরে প্রায় বহন করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে

কোনমতে অতি কষ্টে নামিয়ে নিয়ে এল গেটের বাইরে। সেখান থেকে সোজা মৈত্রী মাসীর বাসায় নূর নিয়ে এল সবাইকে। ওখানে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। সব বন্দোবস্ত প্ল্যানমত ইতিমধ্যে করা হয়েছে। সালাহ্উদ্দিন নিম্মীর জন্য বিশ-পচিঁশ টাকা দামের দু'টো শাড়ি এবং আমার জন্য দশ টাকা দামের একটা পাঞ্জাবী কিনে নিয়ে এসেছে। সেগুলো পড়েই আমাদের বিয়ে হল। সালাহ্উদ্দিন হল নিম্মীর উকিল বাপ। সাক্ষী হয়ে রইলেন গনী নানা, গৌরিদী, নূর এবং মিসেস জামান। বিয়ের পর উপস্থিত মুরুব্বীরা এবং মৈত্রী মাসী আমাদের আর্শীবাদ করলেন। বিয়ের দলিল রেজিষ্ট্রি করতে দু-তিন দিন সময় লাগবে। এ সময়টা লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের। কারণ নিম্মীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে বিয়ে করার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তার মোকাবেলা করার জন্য বিয়ের দলিলটা অপরিহার্য। গৌরিদীই ঠিক করে ফেললেন তার পরিচিত এক ধনী ব্যবসায়ীর পার্ক ষ্টিট্রের একটা গেষ্ট হাউস। ছোট্ট কিন্তু সাজানো গেষ্ট হাউস। সেখানেই হবে আমাদের বাসর এবং মধুচন্দ্রিমা। আমাদের গোপন আস্তানার খবর বিয়েতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কাউকে জানানো হবে না। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের চলে যেতে হল গেষ্ট হাউসে। নায়লা, গৌরিদী, নূর এবং সালাহ্উদ্দিন আমাদের পৌঁছে দিল। রজনীগন্ধা ও বেলী ফুল দিয়ে নায়লা, লুবনারা সুন্দর করে রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে দিয়েছিল আমাদের বাসর ঘর। ওরা চলে যাবার পর হঠাৎ করে আমরা দু'জন ভীষণ একলা হয়ে গেলাম। সারাদিনের ঘটনাবলী এত দ্রুত ঘটেছে যার ফলে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই আমরা পাইনি এতক্ষণ। একটা ঘোরের মাঝেই কেটে গেছে পুরো দিনটা। ফ্ল্যাটের নির্জন পরিবেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেদে উঠল নিম্মী। অতি স্বাভাবিক কারণেই ভেঙ্গে পড়ল সে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, “সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ধৈর্য্য ধরতে হবে। সময় সব সমস্যার সমাধান করে দেবে ইনশাল্লাহ্।” বেচারী ভীষণভাবে কাদঁতে কাদঁতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতীত ও ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক সময়। পরদিন সকালেই নূর এসে জানাল, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। নিম্মীর বাবা অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন, “আমি তার মেয়েকে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে গেছি বাসা থেকে।” প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সালাহ্উদ্দিনকে ডেকে হুকুম দিয়েছেন যে করেই হোক আমার এবং নিম্মীর খোঁজ করে তাকে বের করতেই হবে কোথায় আছি আমরা। প্রয়োজনে অপহরণকারী আর্মি অফিসারের কাছ থেকে নিম্মীকে উদ্ধার করার জন্য ভারতীয় পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তাও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বিয়ের দলিল রেজিষ্ট্রি হয়ে হাতে না আসা পর্যন্ত কিছুই কাউকে বলার উপায় নেই। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন কর্নেল ওসমানীও। ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করে অন্যায়ভাবে জোর করে ভদ্রলোকের মেয়েকে যে অপহরণ করতে পারে তার কঠোর সাজা হওয়া উচিত। একই সাথে তিনি ভীষণভাবে দুঃখিতও হয়েছেন। নূরকে বলেছেন, “ডালিমের মত যোগ্য অফিসার কি করে এ ধরণের কাজ করতে পারে সেটা তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না।” নূর আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল, “স্যার আপনারা ঘরের বাহিরে যাবেন না দলিল হাতে না পাওয়া পর্যন্ত। গনী নানা চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলিল রেজিষ্ট্রি করার। দলিলটা হয়ে গেলেই সবাইকে বুঝিয়ে ব্যাপারটার আপোষ মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়া হবে।” একবার স্থির করেছিলাম বাপ্পিকে একটা ফোন করে সব কিছু জানিয়ে ওকে বলি আমরা ভালোই আছি। কিন্তু নূরের কথায় সেটা করা সম্ভব হল না। ১৯ তারিখে আমাদের হাতে দলিল পৌঁছে গেল। সেদিনই সমস্ত ব্যাপারটা সালাহউদ্দিন, নূর এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, কর্নেল ওসমানী এবং তাজুদ্দিনকে বুঝিয়ে বললেন। সমস্ত কিছু বিস্তারিত জানবার পর জনাব তাজুদ্দিনকে সবাই অনুরোধ জানালেন ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে দেবার জন্য। জনাব তাজুদ্দিন সেদিনই নিম্মীর বাবাকে এবং আমাদের ডেকে পাঠালেন থিয়েটার রোডে। নিম্মীর বাবার পৌঁছার আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম। জনাব ওসমানী এবং জনাব তাজুদ্দিনকে সালাম করলাম দু'জনে, তারা আর্শীবাদ করলেন। জনাব তাজুদ্দিন বললেন যা হবার তা হয়ে গেছে। জনাব চৌধুরীকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি এলে তার কাছে মাফ চাইতে হবে আমাদের দু'জনকেই। এতেই কাজ হবে। কারণ জনাব চৌধুরী শক্ত অফিসার হলেও মনটা তার শিশুর মতই সরল এবং কোমল।

অল্পক্ষণ পর জনাব চৌধুরী ও বাপ্পি এসে পৌঁছালো। নূর তাদের অর্ভ্যথনা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে এল। সেখানে কর্নেল ওসমানীও উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরকেও হাজির করানো হল আসামীর মত। ঘরে ঢুকতেই জনাব তাজুদ্দিন গর্জে উঠলেন, "কি করেছ তোমরা? এত বড় দুঃসাহস হল কি করে? আমি মর্মাহত হয়েছি তোমাদের ছেলেমানুষী কার্যকলাপে। বিয়ে-শাদী বাচ্চাদের পুতুল খেলা নয়। মুরুব্বীদের আর্শীবাদ ছাড়া কেউ কোনদিন সুখী হতে পারে না। জলদি তোমরা বাবার কাছে মাফ চাও।" এরপর নিম্মীর বাবাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "চৌধুরী সাহেব ওরা আপনারই সন্তান। ভুল করে ফেলেছে না বুঝে। ওদের আপনি ক্ষমা করে আর্শীবাদ করুন।" প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতেই আমরা বাবার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। নিম্মী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওতেই মোক্ষম কাজ হল। মোমের মত গলে গেলেন চাচা মানে নিম্মীর বাবা। নিম্মীকে জড়িয়ে ধরে তিনিও কাঁদতে লাগলেন। আমাকেও টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। নূর, সালাহ্উদ্দিন ওরা সব তৈরিই ছিল। মিষ্টির প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল ব্যায়ারা। এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হল থিয়েটার রোডে। চাচার কাছ থেকে জানতে পারলাম খালাম্মা মানে নিম্মীর মা ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছেন নিম্মীর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে বিয়ে করায়। তিনি ভীষণ জেদি এবং তীব্র অভিমানী। তার রাগ না কমলে বাড়িতে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। এতে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা। ঠিক হল আরো কিছুদিন আমাদের গেষ্ট হাউজেই থাকতে হবে। বাপ্পিকে সমস্ত ঘটনা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল বলে সে ভীষণভাবে অভিমান করেছিল আমাদের উপর। অতি কষ্টে তার মান ভাঙ্গাতে হয়েছিল আমাদের দু'জনকে। বাবা চলে যাবার পর জনাব তাজুদ্দিন বলেছিলেন, "দু'জনে দু'জনকে পছন্দ করে দুঃসাহসিকভাবে বিয়ে করেছ; এখন থেকে তোমরা দু'জনেই হবে দু'জনের অবলম্বন। দুঃখ কর না সময়মতো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বিয়েও হয়েছিল ঠিক তোমাদের মত করেই সবার অমতে। আমি আর্শীবাদ করছি তোমরা চিরসুখী হও।"

তাকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে আসতেই নূর, সালাহউদ্দিনরা সব আমাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় পুরো থিয়েটার রোড মাতিয়ে তুলল। কর্নেল ওসমানীও এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে। সবাই সেদিন একসাথে রাতের খাওয়া খেলাম। বিশেষ খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেদিন। বিদেশের মাটিতে জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপর্ণ সন্ধিক্ষণে সেদিন জনাব তাজুদ্দিন, কর্নেল ওসমানী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার, ক্যাপ্টেন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিন, লেফটেন্যান্ট নূর, মৈত্রী মাসী, গৌরিদী, গনী নানা, মিসেস জামান, নায়লা, লুবনা, জনাব আইয়ুব, প্রীতিশ নন্দী, রীণা, ইন্দু, ডঃ মুখার্জী, অরুপদা এবং ওদের মত অন্য সবার কাছ থেকে যে উষ্ণ আন্তরিকতা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং সহযোগিতা পেয়েছিলাম সেটা জীবনে কখনোই ভোলা যাবে না। আমরা দু'জনেই তাদের কাছে চিরঋনী হয়ে থাকব সারাজীবন।

এ ক'দিনের টেনশনে ঠিকমত ঔষধপত্র খাওয়া হয়নি ফলে চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়েছে। তার পরিণামে হাতের ব্যাথা হঠাৎ করে বেড়ে গেল। ব্যান্ডেজের নিচ থেকে পচাঁ দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। তাড়াতাড়ি ডঃ মুখার্জীর ওখানে আমাকে আবার নিয়ে যাওয়া হল। ব্যান্ডেজ খুলে হাতের ক্ষতের অবস্থা দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি বললেন, "ঠিকমত চিকিৎসা না হওয়ায় এবং ঔষধপত্র না খাওয়ায় হাতে গ্যাংরিন শুরু হয়েছে। এ পচঁনকে রোধ করতে হলে অবিলম্বে অপারেশন করতে হবে। তা না হলে পুরো হাতটাকেই কেটে ফেলতে হতে পারে।" ডাক্তারের কথা শুনে সবাই ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন।

আমিও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। আমি হাসপাতালে ভর্তি হলে নিম্মী একা একা ফ্ল্যাটে কি করে থাকবে! আবার সাহায্যের মুক্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন ডঃ গনী, "নিম্মী আমার মেয়ে। ও আমার বাসায় থাকবে। তুমি এ নিয়ে চিন্তা কর না। আজই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও।" গনী নানার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। পারুমিতা বৌদি আমার ভর্তির সব ব্যবস্থা করে দিলেন পিজি হাসপাতালে। আমার অপারেশন করলেন ডঃ মুখার্জী। গ্যাংরিন রোধ

করার জন্য বা হাতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু অংশ কেটে ফেলে দিতে হয়েছে তবু আল্লাহ্‌র রহমতে বা হাতটা বাচাঁনো সম্ভব হয়েছে। ডঃ মুখার্জী অপারেশন শেষে মন্তব্য করেছিলেন আর কয়েকটা দিন দেরি হলে পুরো বা হাতটাই কেটে ফেলতে হত। পরিবারের সবচেয়ে আদরের নিম্মীকে দেখে কষ্ট হয়। আমি বুঝতে পারি ভেতরে ভেতরে তার অন্তরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বাড়িঘর, একান্ত আপনজন সবাই থাকতেও আজ ও ভীষণ একা। একটু আশ্রয়ের জন্য আজ তাকে এখানে-ওখানে থাকতে হচ্ছে রিফিউজির মত। তার উপর আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে ও বিশেষভাবে চিন্তিত। বাপ্পির কাছ থেকে জানতে পারলাম আমাদের চিন্তায় চাচা ভেঙ্গে পড়েছেন; তিনি আমাদের এই মুহূর্তেই বাসায় নিয়ে যেতে চান কিন্তু খালাম্মার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তার কাছে কথাটা কিছুতেই উঠাতে পারছেন না জনাব চৌধুরী। অত্যন্ত স্নেহবৎসল খালাম্মা। তিনি নিম্মীর উপর যে অভিমান করেছেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ নিম্মী তার খুব আদরের আর সেই নিম্মীই এ ধরণের একটা কাজ করে বসবে সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না খালাম্মা। তার বিশ্বাসের অবমাননা করেছে নিম্মী এটাই তার ক্ষোভের প্রধান কারণ। সবকিছু মিলিয়ে বাসায় একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সবটুকু চাপ পড়ছে নিম্মীর মনের উপর। বেচারী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত; কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই পাছে আমি মনে কষ্ট পাই এ কারণে। শুধু আমার জন্যই বেচারী জান আমার মুখ বুজে সবকিছুই মেনে নিয়ে স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওর ত্যাগ, সহনশীলতা এবং ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, ওর এই অসহায় অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হচ্ছিল নিজেকে। মনেমনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক না কেন তাকে এই করুণ অবস্থা থেকে উদ্ধার আমাকেই করতে হবে। সপ্তাহখানেক হাসপাতালে থাকতে হল। হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর একদিন নিম্মীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম নিম্মীদের বাসায়। চাচা, বাপ্পি, মানু আমাদের আনন্দে জড়িয়ে ধরল। আমি বাপ্পিকে জিজ্ঞেস করলাম, "খালাম্মা কোথায়?" বাপ্পি জানাল আজকাল তিনি বেশিরভাগ সময় তার নিজের ঘরেই কাটান, বের হন না খুব একটা। কারো সাথেই তেমন কোন কথাবার্তা বলেন না প্রয়োজন ছাড়া। সবশুনে আমি সোজা চলে গেলাম তার ঘরে। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে দাড়ালেন। কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে একহাতেই জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরে বললাম,

— খালাম্মা আমাদের মাফ করেন। মাফ আপনাকে করতেই হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কিংর্কতব্যবিমুঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন,

— আরে পাগল ছেলে কি করছ! হাতে ব্যথা পাবে যে!

— আমি আপনাকে নামাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের ক্ষমা না করছেন। দৃঢ়তার সাথেই বললাম আমি।

উষ্ণতায় জমা বরফ গলে গেল নিমিষে। মাতৃস্নেহের আকুলতায় তিনি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা।

ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

— নিম্মী কোথায়? বললাম,

কোথায়? বললাম,

— বসার ঘরে।

— আমাকে নিয়ে চলো।

বললেন আমার অতিপ্রিয় খালাম্মা। তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এলাম ড্রইং রুমে। আমাদের দেখে সবাই অবাক। কি করে অসম্ভবকে সম্ভব করলাম সেটাই সবার চোখে প্রশ্ন হয়ে ফুটে উঠেছিল। নিম্মী প্রায় পাগলের মত দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। আদরের নিম্মীকে বুকে ধরে আবেগের আতিশয্যে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না খালাম্মা। সব বাধ ভেঙ্গে গেল। মান অভিমান রাগ সব ভেসে গেল অশ্রুর বন্যায়। দু'জনেরই সেকি কান্না! আমরা সব

নিশ্চুপ দাড়িয়ে থেকে মা ও মেয়ের অভুতপূর্ব মিলন দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। সেদিনই গনী নানার বাড়ি থেকে চলে আসতে হল আমাদের।

ছোট ভাই স্বপন এবং বাল্যবন্ধু কাজি কামালুদ্দিনের সাক্ষাত পেলাম

একদিন সকালে ধর্মনগর থেকে ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম আমায় জানালো,"স্বপন ও বদি অফিসার্স কোর্সে যোগদানের জন্য তারা মুর্তী যাবার পথে ধর্মনগর পৌঁছেছে। ওরা আমার খোঁজ করছে।" আমি ওদের পাঠিয়ে দিতে বললাম।

হঠাৎ একদিন ধর্মনগর থেকে বন্ধু ক্যাপ্টেন আনাম আমাকে জানাল আমার ছোটভাই স্বপন এবং একান্ত বন্ধু কাজি কামালুদ্দিন মুর্তীর পথে এসে পৌঁছে আমার খোঁজ করছে। তাকে অনুরোধ জানালাম ওদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা এসে পৌঁছল। স্বপনকে এভাবে কাছে পাবো সেটা ভাবতেও পারিনি। ওদের কাছে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। আত্মীয়-পরিজনদের সব খবরা-খবরই পেলাম তাদের কাছ থেকে। শুনলাম ঢাকা শহরে ওদের দুঃসাহসিক গেরিলা অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই স্বপন, বদি, কাজি, জুয়েল, রুমী, আলম, আজাদ, সাচো বর্ডার পেরিয়ে ২নং সেক্টরের মেলাঘর ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়ে গেরিলা তৎপরতায় কাঁপিয়ে তোলে ঢাকা শহর। পর্যায়ক্রমে তাদের সাথে যোগ দেয় চুল্লু, ফাজলে, মোক্তার, হ্যারিস, তৈয়ব আলী, উলফাৎ, সামাদ, ফতেহ আলী, মেওয়া, জিয়া, ভুলু, সাইদ এবং আরো অনেকেই। ওদের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঢাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করার যাতে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাদের ঐ ধরণের গেরিলা তৎপরতায় এটাও প্রমাণিত হবে যে, পুরো বাংলাদেশ খানসেনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে যে সরকারি প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেটাও সত্যি নয়। জুরাইন, গুলবাগ পাওয়ার-ষ্টেশন, সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার-ষ্টেশন, ধোলাইখাল, যাত্রাবাড়ি, গ্রীন রোড, ইন্টারকন, ফার্মগেট, ধানমন্ডির ২নং সড়ক প্রভৃতি জায়গায় একটার পর একটা দুঃসাহসিক সফল অভিযান চালিয়ে খানসেনাদের নাস্তুনাবুদ করে তুলেছিল ওরা। ওদের প্রতিটি মাথার জন্য ২০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল পাকিস্তানের সামরিক সরকার। এতে কোন ফল হয়নি। খানসেনাদের সব সতর্কতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে জানবাজ মুক্তি পাগল দামাল ছেলেগুলো অসীম সাহসিকতার সাথে করে যাচ্ছিল একেকটা দুঃসাহসিক অভিযান। খানসেনাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল বিচ্ছুরা (খান সেনারা গেরিলাদের 'বিচ্ছু' কিংবা 'মুক্তি' বলে সম্বোধন করত)। ওদের তৎপরতায় আশার আলো দেখতে পেয়েছিল ঢাকাবাসী। ওদের জন্য দোয়া করতো সবাই। অনেকে নানাভাবে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও।

কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে 'মীরজাফর' থেকেছে সর্ব যুগেই। তাদের বেঈমানীর ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন মোড়ে। তেমনই এক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বপন-বদি-কাজিদের ভাগ্যে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কোন অংশেই কম নয়। ২৯শে আগষ্ট ১৯৭১ সাল। ঐ দিন সকালে ধানমন্ডির ২৮নং রোডের একটি বাসায় ওদের এক ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী ফরিদের সাথে দেখা করতে যায় বদি পূর্ব কথামত। ফরিদ বর্তমান আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব জিল্লুর রহমানের শ্যালক তথা আইভি রহমানের ভাই। তারই বিশ্বাসঘাতকতায় দুপুর ১২টার দিকে ফরিদদের বাসা থেকে হঠাৎ রেইড করে বদিকে ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় খান সেনারা। ফরিদদের বাসায় পৌঁছানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে বদি। এ থেকে বোঝা যায় আগাম খবর পেয়েই খানসেনারা বদিকে ধরার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। তারপর শুরু হয় **Chain Reaction.** সামাদ ধরা পরে বিকেল চারটার দিকে। আজাদের বাড়ি রেইড করা হয় রাত ১২টায়। ঐ বাসায় সে রাতে ছিল জুয়েল, বাশার, কাজি, আজাদ, আজাদের খালাতো ভাই, দুলাভাই এবং আরো কয়েকজন আত্মীয়। সবাইকেই ধরে নিয়ে যায় পাক-আর্মি। রেইড চলাকালে আচমকা

তদারককারী এক ক্যাপ্টেনের উপর ঝাঁপিয়ে পরে তার হাতের ষ্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পেরেছিল একমাত্র কাজি। আলমদের বাসাতেও রেইড করা হয় রাত ১২টার পর। সেখানে ধরা পরে আলমের ফুপা আব্দুর রাজ্জাক এবং তার ছেলে মিজানুর রহমান। আলম বাসায় না থাকায় ধরা পরার হাত থেকে সে যাত্রায় বেঁচে যায়। আজাদদের বাসা আলমদের বাসার কাছাকাছি। রাত প্রায় দেড়টার সময় সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় কাজি গিয়ে পৌঁছে আলমদের বাসায়। ভাগ্যক্রমে খানসেনারা ততক্ষণে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। কাজিকে সম্পুর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল আলমদের বাসার সবাই। আলমের ছোটবোন তাড়াতাড়ি একটা লুঙ্গি কাজির হাতে দিয়ে তক্ষুণি দূরে পালিয়ে যেতে অনুরোধ জানায়। খান সেনারা এখানেও এসেছিল জানতে পেরে কাজি কাপড়টা পরে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। হাটখোলায় শাহাদাত চৌধুরী মানে সাচোদের বাড়ি থেকে ধরা পড়েন সেজো দুলাভাই বেলায়েত চৌধুরী রাত দু'টো পর। চুল্লুর বড়ভাই জনাব এম সাদেক সিএসপি একজন পদস্থ সরকারি অফিসার। রাত ১২:৩০-১টার দিকে তার সরকারি বাসভবন এ্যালিফেন্ট রোডের ১নং টেনামেন্ট হাউজ থেকে চুল্লুকে ধরে নিয়ে যায় পাক-আর্মি। মধ্যরাতে রেইড করা হয় রুমীদের বাড়ি। বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় রুমী, রুমীর বাবা জনাব শরিফ, ছোট ভাই জামী, মাসুম এবং হাফিজকে। আমাদের বাসায় ক্যাপ্টেন কাইয়ূমের নেতৃত্বে রেইড করা হয় ১:৩০-২টার দিকে। চুল্লুদের বাসায় যে রেইডিং পার্টি গিয়েছিল তারাই চুল্লুকে চোখ বাধা অবস্থায় সাথে করে আমাদের বাসায় নিয়ে আসে। চোখ বাধা অবস্থায় চুল্লু প্রথমে বুঝতে পারেনি তাকে কোথায় আনা হয়েছে। আচমকা একজন খানসেনা বলে উঠল, "স্বপন ভাগ গিয়া।" আব্বার গলাও শুনতে পায় চুল্লু। মেয়েদের কান্না থেকে বুঝতে পারে আমার বোনেরা (মহুয়া, কেয়া, সঙ্গীতা) কান্নাকাটি করছে। দৈবক্রমে স্বপন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় আব্বা জনাব শামছুল হক, মোস্তাফিজ মামা, বাড়ির কাজের ছেলে সামু এবং হাশেমকে। আলতাফ মাহমুদের বাসায় আর্মি যায় ভোর ৪-৫টার দিকে। সামাদকে সঙ্গে নিয়ে আর্মি গিয়েছিল ঐ বাড়িতে। আলভী ঐ রাত্রে সেই বাড়িতেই ছিল। নাম লুকিয়ে উর্দূতে নিজের নাম আব্দুল বারাক বলায় আলভী ধরা খাওয়া থেকে বেঁচে যায়। খান সেনারা ধরে নিয়ে যায় আলতাফ মাহমুদ, তার চার শ্যালক, রসুল এবং নাসেরকে।

এভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঢাকায় গেরিলাদের সবচেয়ে কার্যকরী এবং সফল দলটি বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পালাবার পর কাজি ও স্বপনের দেখা হয় তাদের বেইস ক্যাম্প ধোলাইখালে। সেখান থেকে মেলাঘর। সেখানে তাদের দু'জনকেই সিলেক্ট করা হয় **Officer's Training Course** এর জন্য। কিন্তু দু'জনেরই কোন ইচ্ছে ছিল না **Officer's Course** এ যোগ দেবার। তারা অনেক অনুরোধ জানিয়েছিল মেজর খালেদ মোশাররফ এবং ক্যাপ্টেন হায়দারকে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আবার ঢাকায় পাঠাবার জন্য। তারা চাইছিল ফিরে গিয়ে বন্দী সাথীদের মুক্ত করতে। জীবন গেলেও ক্ষতি নেই তবু একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় তারা। নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ছিল তাদের। যদি মেজর খালেদ এবং ক্যাপ্টেন শিশুর পরিবারদেরকে পাক বাহিনীর সুরক্ষিত দুর্গ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এ বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পেরে থাকে তারা তবে তাদের পক্ষে বদি-জুয়েল-রুমীদেরকে ছাড়িয়ে আনাটা অসম্ভব হবে কেন? তাদের আবেগ, অনুভূতি, সহমর্মিতা মেজর খালেদের মনকে স্পর্শ করলেও ঠিক সেইক্ষণে তাদের ফেরত পাঠানো কোনক্রমেই ফলপ্রসু হবে না ভেবেই তাদেরকে **Officer's Course** এ পাঠাবার সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন মেজর খালেদ একজন অভিজ্ঞ কমান্ডার হিসেবে। আমার কাছে পৌঁছেও তারা একই প্রস্তাব দেয়। কিন্তু আমিও মেজর খালেদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে তাদের **Officer's Course** -এ যোগদান করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মতপ্রকাশ করি। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুর্তীতে চলে যায় **Course**-এ জয়েন করার জন্য।

ভারতীয় নীল নকশা এবং মুজিব নগর সরকার

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন ক্ষমতার লড়াই এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয় সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থা "র" - "ডিভাইড এন্ড রুল" নীতি প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বাধিনায়ক দু'জনকেই হেয় করে তোলা হয়।

তাজুদ্দিনের হঠাৎ করে প্রবাসী সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা আওয়ামী লীগের অনেকেই পছন্দ করেনি। তাদের মধ্যে ছিলেন যুব ও ছাত্রনেতাদের অনেকেই। অনেক সাংসদ এবং আওয়ামী লীগের নেতারাও এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, শাহ্জাহান সিরাজ, নুরে আলম সিদ্দিকী এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ যুব ও ছাত্রনেতারা সবাই প্রকাশ্যে তাজুদ্দিনের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তাদের পরোক্ষভাবে মদদ যোগাচ্ছিলেন জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আবদুল আজিজ, মনসুর আলী, জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখ। জনাব তাজুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীত্বের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জেনারেল অরোরার মন্তব্য, "আওয়ামী লীগের যুবনেতারা তাকে পছন্দ করত না।" (বাংলাদেশের যুদ্ধের স্মৃতিচারন শিরোনামে নিখিল চক্রবর্ত্তীকে দেয়া জেনারেল অরোরার সাক্ষাৎকার।)

সাধারণভাবে যুবনেতাদের অনেকেই সেদিন ভেবেছিলেন শেখ মুজিব আর জীবিত নেই। মুজিবর রহমানের অবর্তমানে তাজুদ্দিন তাদের প্রভাবকে তেমন একটা মেনে চলবেন না। শেখ মুজিব কাছে থাকলে এ সমস্ত যুব এবং ছাত্রনেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের কর্তৃত্ব অতি সহজেই স্থাপন করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তাজুদ্দিন তাদের সাথে অন্য সুরে কথা বলছেন। তাদের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে সংগ্রামের সব নেতৃত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তাদের সংগ্রামী ভূমিকাকেও ছোট করে দেখছেন জনাব তাজুদ্দিন। সরকার পরিচালনায় যুব ও ছাত্রনেতাদের মতামত তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছেন। তাজুদ্দিনের ধৃষ্টতার শেষ নেই। তিনি সরকার প্রধান থাকার কারণে তাদের সুযোগ-সুবিধাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আত্মীয়-স্বজনকেও যথাযথ মর্যাদা দান না করে তাদের উপেক্ষা করেছেন। তাদের উপেক্ষা করা, পরোক্ষভাবে শেখ মুজিবকেই উপেক্ষা করার সমতুল্য। অতএব, যে কোন মূল্যে তাজুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারন করতে হবে। মেতে উঠলেন তারা এক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মনি ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে কয়েকজন যুব ও ছাত্রনেতা দিল্লী গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাকে জানান যে তারা শেখ মুজিবর রহমানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। পাক বাহিনীর হাতে শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পেছনে জনাব তাজুদ্দিনের হাত রয়েছে। গ্রেফতারের আগে শেখ মুজিব তাদের সে কথা জানিয়ে তাদেরকে ভারত সরকারের সহায়তায় স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়ে যান। জনাব তাজুদ্দিনের উপর বাংলাদেশ থেকে আগত বেশিরভাগ আওয়ামী লীগ জাতীয় এবং প্রাদেশিক সাংসদদের সমর্থনও নেই। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীত্ব করার কোন অধিকার নেই তাজুদ্দিন সাহেবের। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে তারা মুজিবর রহমানের ভগ্নিপতি জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের একটি চিঠি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদান করেন এবং শেখ মুজিবের জেষ্ঠ পুত্র শেখ কামালকে তার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তারা শ্রীমতি গান্ধীকে এ কথা বলেও হুঁশিয়ার করে দেন যে তাজুদ্দিন যদি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকেন তবে ভারতের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারণ জনাব তাজুদ্দিন শেখ মুজিবের নীতি আদর্শ কিছুতেই বাস্তবায়িত করবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'পক্ষের স্বার্থে তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ থেকে আগত মুজিব ভক্ত এবং তাদের অনুগত তরুণদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার জন্য তারা শ্রীমতি গান্ধীর কাছে আবেদন জানান। তারা বলেন, শুধুমাত্র এ ধরণের শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমেই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ এবং বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মধ্যে অর্থবহ সম্পর্ক বজিয়ে রাখা সম্ভব। তা না হলে অচিরেই ভারত বিদ্বেষীদের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হবে আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের এ অনুরোধ সাগ্রহে

গ্রহণ করেন শ্রীমতি গান্ধী। সুদূর প্রসারী নীল নকশার কথা চিন্তা করেই Devide and Rule নীতির প্রয়োগের জন্য বিএলএফ পরবর্তিতে নাম বদলিয়ে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করে সেকেন্ড ফ্রন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল বিএলএফ ওরফে মুজিব বাহিনী।

এ তথ্যগুলোও জনাব ওসমানীকে জানাই আমরা। তিনি সেগুলো জনাব তাজুদ্দিনকে জানান। প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন নাকি এ সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে দিল্লীতে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং এর প্রতিবিধানের দাবি জানান। কিন্তু জনাব হাকসার, ডিপিধর, 'র' এর রমানাথ রাও এবং জেনারেল ওবান সিং এ ব্যাপারে তাজুদ্দিনকে এড়িয়ে গিয়ে নিরব থাকেন। ফিরে এসে কর্নেল ওসমানীকে সে কথাই বলেছিলেন জনাব তাজুদ্দিন। আমরা পরে কর্নেল ওসমানীর কাছ থেকে তার ব্যাখ্যা জানতে পারি। পরবর্তী পর্যায়ে মুজিব বাহিনীকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ফোর্সেস হেডকোয়টার্স এর নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কর্নেল ওসমানী। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসু হয়নি। নিতান্ত অপারগ হয়েই কর্নেল ওসমানীকে বিএলএফ তথা মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করার ভারতীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় ক্যাপ্টেন জলিলের ফোর্ট উইলিয়ামের পূর্বাঞ্চলীয় হেডকোয়াটার্সের কর্মকর্তাদের সাথে গোপন যোগাযোগ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠল। ভারতীয় সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী সরকার এবং মুক্তি বাহিনীর সদর দপ্তরের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তা নয়, তারা ক্ষমতাধর কমান্ডারদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা তাজুদ্দিনের প্রবাসী সরকারের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকেও দুর্বল করে চাপের মুখে রাখছিল যাতে তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে বাধ্য হন। অপরদিকে মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযোদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব ওসমানীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কর্নেল ওসমানীর ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হচ্ছিল একইভাবে। কর্নেল ওসমানীকে সাইড ট্র্যাক করে প্রবাসী সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের এ ধরণের কার্যকলাপে কর্নেল ওসমানী অতি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করছিলেন। তার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার।

ভারত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী মানবিক কারণে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে সেটার জন্য বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামটা পূর্ব বাংলার ৮ কোটি বাঙ্গালীর নিজস্ব সংগ্রাম। এ সংগ্রাম তাদেরই সংগঠিত করতে হবে। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাদেরকেই অর্জন করতে হবে জাতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রামের নেতৃত্ব ও সব দায়িত্বও থাকতে হবে মুক্তিফৌজ কমান্ড ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধিনে। জনাব ওসমানী নীতির এ প্রশ্নে কখনোই আপোষ করেননি। এ বিষয় নিয়ে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বের সাথে অনেক বির্তক হয়েছে তার। কিন্তু তার এ নীতির প্রতি সমর্থন দেননি আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ নেতৃত্ব ও গণপরিষদ সদস্যরা। তারা তখন নিজ নিজ ক্ষমতার বলয় তৈরি করতে ব্যস্ত। তাদের প্রায় সবার মাঝেই এক ধরণের উদ্ভট চিন্তা কাজ করছিল। শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নয় অনেক আমলা এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের মাঝেও সেই একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। তাদের ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধ যে কারণেই হোক শুরু হয়ে গেছে। প্রতিরোধ সংগ্রামকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব অঞ্চল থেকে কোটি কোটি টাকা ও সম্পদ লুন্ঠন করে নিয়ে হিজরত করে চলে আসা হয়েছে নিরাপদ আশ্রয় ভারতে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বলতে লজ্জা লাগলেও বলতে হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা অনেক বুদ্ধিজীবি ও হোমরা-চোমরা পদস্থ ব্যক্তিরাও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি সংগ্রামকে দেখতেন অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে। তারা মনে করতেন বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা কখনই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে দেশ স্বাধীন করতে সক্ষম হবে না। পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করতে সরাসরি ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস-ক্ষেপ অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয়। রক্তক্ষয়ী দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা তাদের অনেকেরই ছিল না। যুদ্ধের ঝুঁকি এবং কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা ছিলেন নারাজ। এতে করেই তাড়াতাড়ি 'হজ্ব' শেষ করে প্রবাসী

জীবনের কষ্ট থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে লুটপাটের কালো টাকার আয়েশী জীবন খুব তাড়াতাড়ি আবার শুরু করতে পারা যাবে একমাত্র ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই। ভারতে হজ্ব করার স্ট্যাম্প যখন একবার নিতে সক্ষম হয়েছেন তারা তখন দেশে ফেরার পর তাদের রাজ কায়েম করার পথে বাধা কোথায়? তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশটাকে স্বাধীন করে দেবার জন্য তাদের একাংশ গোড়া থেকেই ভারত সরকারের বিভিন্ন মহলে জোর লবিং শুরু করে দিয়েছিলেন।

সমস্ত প্রবাসী সরকারের মধ্যে শুধুমাত্র দু'জন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ধরণের উদ্যোগের বিরোধিতা দৃঢ়তার সাথে করে গিয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন কর্নেল ওসমানী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ। এই দুইজন ছাড়া সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রায় সবাই এবং আমলাদের উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতিত্ব করছিলেন। পরবর্তিকালে সিজরিয়ন অপারেশন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের Premature birth এর জন্য মূলতঃ এরাও দায়ী ছিলেন অনেকাংশে। কিন্তু বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা, আমলাতন্ত্রের তরুণ সদস্যরা এভাবে অপরের কৃপায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার উদ্যোগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ নিয়ে প্রবীণদের সাথে তরুণদের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃই বেড়ে উঠছিল প্রতিদিন।

ভারত সরকারের স্বীকৃতি এবং সামরিক হস্তক্ষেপ

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পরই ভারত বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টিও ছিল সুচিন্তিত।

এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগের অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। ভারত সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং বাংলাদেশ সমস্যার একটা আশু সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। মুক্তি সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে অবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে সেটাই ছিল তাদের মূল আশংকা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনাব তাজুদ্দিন প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকারকে বোঝালেন- দু'পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনতিবিলম্বে ভারতীয় সামরিক অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলতে হবে। ভারত সরকার তাজুদ্দিন সরকারের আবেদনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও হঠাৎ করে তখনি এককভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজি হল না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঠিক করলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পরাশক্তিধর দেশগুলোর মনোভাব জানার পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে এক ঝটিকা সফরে বেরিয়ে পড়লেন। সবখানেই তিনি নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ সমস্যা এবং ভারতের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বর্বর শ্বেতসন্ত্রাসের ফলে আগত শরণার্থীদের মানবিক কারণে ভারতের মাটিতে আশ্রয় দেয়ার জন্য নেতারা ভারত সরকারের প্রশংসা করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতারা বাংলাদেশ সমস্যাকে পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীন সমস্যা হিসাবেই আখ্যায়িত করেন এবং পরিষ্কারভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে দেন- এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরিভাবে ভারতীয় যেকোন সামরিক পদক্ষেপ তাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে। শরণার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং ভারতের উপর যে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কমানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্থিক এবং সামগ্রিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সব নেতারাই।

রিলিফের সামগ্রী নিয়েও পরে ঘটেছে অনেক কেলেংকারী। বিপুল পরিমাণের রিলিফ-সামগ্রীর কতটুকু পেয়েছিল শরণার্থীরা তার জবাব একমাত্র দিতে পারে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের কর্ণধাররাই। আমার জানামতে প্রাপ্ত রিলিফ-সামগ্রীর একটা ক্ষুদ্র অংশই ভারত এবং প্রবাসী সরকারের উদ্যোগে বিতরণ করা হয়েছিল শরণার্থীদের মাঝে। রিলিফ-সামগ্রীর সিংহভাগই বেমালুম হজম করে নিয়েছিল ভারত সরকার।

বিদেশ সফর থেকে শ্রীমতি গান্ধী বুঝতে পারেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক অভিযান চালালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো তাকে সমর্থন করবে না। পক্ষান্তরে এশীয় পরাশক্তি গণচীন হয়তো বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যেতে পারে পাকিস্তানের পক্ষে এ ধরণের সংঘাতে। সে ক্ষেত্রে ভারতের একক আগ্রাসন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব প্রস্তাবিত 'নিরাপত্তা এবং বন্ধুত্ব' চুক্তি সই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শ্রীমতি গান্ধী ও তার সরকার। ঐ চুক্তি সাক্ষরের ফলে ভারতীয় জনগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছে জানি না তবে পাকিস্তানকে দুর্বল ও দ্বিখন্ডিত করতে এবং সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করে সেখানে একটা পুতুল সরকার স্থাপন করার ভারতীয় স্বপ্নের বাস্তাবায়নে ঐ চুক্তি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ভারত সরকার। প্রতিদানে ভারতের সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ২৫বছর মেয়াদের এক চুক্তি সই করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। রহস্যজনক কোন কারণবশতঃ আজ পর্যন্ত সেই চুক্তির বিষয়বস্তু গোপন রাখা হয়েছে দেশের জনগণের কাছ থেকে। মুজিবনগর সরকার এবং আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ সাংসদ ঐ চুক্তিকে

সমর্থন করে। বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র দু'জন। কর্নেল ওসমানী এবং খন্দোকার মোশতাক আহমদ।

মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগই এ ধরণের চুক্তির ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সব বিরোধিতা উপেক্ষা করে তাজুদ্দিন সরকার এক অসম চুক্তির নাগপাশে আবদ্ধ করলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে। ভারতের সাথে দীর্ঘ ২৫ বৎসরের এ অসমচুক্তি জাতীয় ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এ চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর বাংলাদেশে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ তথা পাক-ভারত যুদ্ধ প্রায় অবধারিত হয়ে ওঠে। মুক্তি বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ বরাবরই মুক্তি সংগ্রামে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। এতে দু'টো বিশেষ উপকার হত। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে গড়ে উঠতো নিবেদিত প্রাণ-ত্যাগী-পরিক্ষীত নেতৃত্ব এবং একইভাবে সুযোগ পাওয়া যেত নিখাদ সোনার মত বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলার। কিন্তু নীল নকশার প্রণয়নকারীরা বাঙ্গালী জাতিকে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অতি চতুরতার সাথে। খাল কেটে কুমির আনার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করে ফেললো মুজিবনগর সরকার। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তাদের ভবিষ্যত সংগ্রাম হবে দুমুখী। একদিকে তাদের যুদ্ধ করতে হবে হানাদার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্যদিকে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে 'মিত্র বাহিনীর' আধিপত্যবাদী চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতা হেফাজত রাখার জন্য।

চুক্তি ও স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোলকাতাভিত্তিক আওয়ামী সরকার ও তাদের দোসররা সবাই দিন গুনতে লাগল কবে ভারতীয় বাহিনী আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেবে আর তারা ফিরে গিয়ে রাজত্ব করবে, উপভোগ করবে অসৎ উপায়ে লুটপাট করে অর্জিত ধনসম্পদ। ভারতীয় সরকারের স্বীকৃতি পাবার জন্য শুধু দাসখতই লিখে দেয়া হয়েছিল তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রও প্রণীত হবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূল চার নীতি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) এর উপর ভিত্তি করে; সেই অঙ্গীকারও করেছিল মুজিবনগর সরকার।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কর্নেল ওসমানী এবং মুক্তিযোদ্ধারা প্রবাসী সরকারকে রাজি করাতে পারেনি যে, আমাদের নিজেদের ত্যাগের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমাদের সংগ্রাম নিজেদেরকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিজয় অব্দি। এর ফলেই অস্বাভাবিকভাবে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে একটি অপরিপক্ক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করলো প্রবাসী সরকার। মৈত্রি চুক্তি সই হবার পর এবং প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার পর আওয়ামী লীগ প্রবাসী সরকার ও নেতারা দিন গুনতে লাগলেন ভারতীয় আগ্রাসী আক্রমনের।

তথাকথিত মিত্রবাহিনীর কালো ছায়ার আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যায় মুক্তিফৌজ এবং জনগণের বীরগাঁথা, আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতা

যৌথ কমান্ড স্থাপিত হলো কিন্তু মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীকে সব ব্যাপারেই পাশ কাটিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করা হয়।

নভেম্বর মাসে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে। বর্ডারে সম্মুখ সংঘর্ষের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেছে। গঠন করা হয়েছে মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড। যৌথ কমান্ড গঠিত হবার পর ভারতীয় কমান্ডারদের প্রচন্ড প্রভাবে কর্নেল ওসমানী এবং তার হেডকোয়াটার্স প্রকৃত অর্থে অকেজো হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা এককভাবে ভারতীয় বাহিনীর ইর্ষ্টান কমান্ডই প্রণয়ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে কর্নেল ওসমানীকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যুদ্ধের আভাস পেয়ে জনাব ভুট্টোকে তার বিশেষ দূত হিসেবে চীনে পাঠালেন ভারতীয় যেকোন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য। কিন্তু পিকিংএ গণচীনের নেতৃবৃন্দ জনাব ভুট্টোকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, "পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপকে গণচীন পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার হীন চক্রান্ত হিসাবেই দেখবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সাথে যেকোন সামরিক সংঘাতে নীতিগতভাবে তারা পাকিস্তানের পক্ষেই থাকবে।" একইসাথে জনাব ভুট্টোর মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী বর্তমান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য। তাদের Considered Opinion ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায়ে রাখা সম্ভব। বল প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব হবে না। চীনা নেতৃবৃন্দের উক্তি থেকে দু'টো বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে।

প্রথমত: গণচীন একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার নিরসনের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠিকে বাঙ্গালীদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান পেশ করার যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ দেন।

দ্বিতীয়ত: পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কোন সমাধান করতে ব্যর্থ হলে সেই সুযোগে উপমহাদেশে ভারতীয় সমপ্রসারনবাদের নগ্ন থাবা বিস্তার করার চক্রান্তের ব্যাপারেও তারা বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দেন। কিন্তু দেশে ফিরে জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার কাছে চীনা নেতৃবৃন্দের বন্ধুসুলভ এবং যুক্তিসম্পন্ন অভিমতের অপব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, "ভারতের সাথে সামরিক সংঘর্ষে চীন পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে গণচীন প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে দ্বিধাবোধ করবে না এ ধরণের আভাসই নাকি তিনি পেয়েছিলেন চীনা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে একান্ত বৈঠকে।

পক্ষান্তরে ভারতীয় সরকার বুঝতে পেরেছিল গণচীন বাংলাদেশের ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। তাছাড়া সদ্য সমাপ্ত রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারত যুদ্ধে গণচীনের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পরার সম্ভাবনা খুবই কম বলেও ধারণা পোষণ করছিল ভারত সরকার। এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। এ অবস্থায় ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে সেখানে তাদের পছন্দের সরকার কায়েম করতে পারা যাবে সহজেই। এ ধরণের বিশ্লেষনের পরই যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত সরকার।

যুদ্ধের জন্য অতি প্রয়োজনীয় আনুসাঙ্গিক সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই সামরিক আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত সরকার।

এবারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট অতীতের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমান অবস্থায় বিশ্ব জনমত সামরিক জান্তার শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশীদের স্বাধীনতার পক্ষে। মানবাধিকার এবং শরনার্থীর প্রশ্নে সারা বিশ্বের সহানুভূতিও ভারতের পক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা গণচীন যদি **Geo-Strategic** কারণে কোন পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা করে তবে তাদের পরম শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিক্রিয়ায় 'মৈত্রী চুক্তির' আচ্ছাদনে নিশ্চুপ বসে না থেকে ভারতের পক্ষ নেবে নিশ্চিতভাবে ফলে বেধে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বর্তমানে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার দায়-দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে চাইবে কিনা যুক্তরাষ্ট্র অথবা গণচীন সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা পূর্ব পাকিস্তানের ৮কোটি জনগণ আজ পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। মুক্তি বাহিনীর দেশব্যাপী প্রচন্ড তৎপরতায় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাক বাহিনীর অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত এবং যেকোন যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাক্টর সৈনিকদের মনোবলও সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। খান সেনারা সার্বিকভাবে শুধু দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই নয়; তাদের **Strategic Locations, Line Of Communication, Defensive Positions, Supply Points, Re-Enforcement Capabilities, Battle Tactics, Logistic Support Line** এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়ে সব খবরা-খবরই এখন রয়েছে ভারতীয় বাহিনীর নখদর্পনে। এসব খবর সংগ্রহ করা হয়েছে মুক্তি বাহিনীর ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং সেক্টরগুলোর নিজস্ব গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারনের বিরোধিতার মুখে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমাদের জবরদখল আজ অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে। শত্রুপক্ষের অবস্থা বর্তমানে **Totally Untenable.** প্রয়োজন শুধু সুযোগমত আক্রমণের ধাক্কা তাহলেই কেল্লা ফতে হবে। সুযোগ এসে গেল। ৩রা ডিসেম্বর বিকেল ৫:৪৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে **Pakistan Air Force Pre-Emptive Stick** করে বসলো ভারতের বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রাটেজিক টার্গেটগুলোর উপর। একইসাথে আঘাত হানা হল শীণগর, অভিন্তিপুর, পাঠানকোট, উত্তরলাই, যোধপুর, আম্বালা এবং আগ্রা বিমান ঘাটির উপর।

ঠিক সেই সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায় এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিমান হামলার খবর তাকে দেয়ামাত্র তিনি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ জনসভাতেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক পাল্টা আক্রমণের ঘোষণা দিলেন। কোলকাতা থেকে সেদিন সন্ধ্যায় দিল্লী ফেরার আগেই ইর্ষ্টান কমান্ডের এঙঈ **GOC (General Officer Commanding) Genarel Arora** -কে দিল্লীর সেনাসদর থেকে হুকুম দেয়া হল পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হামলা চালাবার জন্য। জেনারেল অরোরার অধিনে দেয়া হল ৩টি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্মি কোর। ২য়, ৩৩শ এবং ৪র্থ কোর। এছাড়াও দেয়া হল 'কম্যুনিকেশন জোন হেডকোয়ার্টার্স' আরো একটি ভ্রাম্যমান আর্মি ইউনিট। এছাড়া ২য় কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত একটি মিডিয়াম আর্মাড রেজিমেন্ট এবং একটি লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট। এই কোরের কমান্ডার ছিলেন **Lt. Gen T.N.Raina** হেডকোয়ার্টার্স কৃষ্ণনগর। এই কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত আরো একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট ও একটি ইঞ্জিনিয়ারস এর ব্রিজিং ইউনিট।

৩৩ কোরের কমান্ডার ছিলেন **Lt. Gen M.L.Thapa.** হেডকোয়ার্টার্স শিলিগুরী। এই কোরের অধিনে দেয়া হয়েছিল অতিরিক্ত একটি লাইট আর্মাড রেজিমেন্ট, একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং একটি ইঞ্জিনিয়ারস এর ব্রিজিং ইউনিট।
১০১ কম্যুনিকেশন জোনের কমান্ডার ছিলেন প্রথমদিকে **Lt.Gen.Gill** পরে **Lt.Gen.Nagra** -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। হেডকোয়ার্টার্স গৌহাটি। এই ফর্মেশনের ৪র্থ কোরের হেডকোয়ার্টার্স ছিল আগরতলায়। কোর কমান্ডার ছিলেন **Lt.Gen. Sagat Singh.** এই কোরের অধিনে অতিরিক্তভাবে দেয়া হয় একটি মিডিয়াম আর্টিলারী রেজিমেন্ট এবং দু'টো লাইট আর্মাড

রেজিমেন্ট। সব মিলিয়ে পূর্ব রনাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষেরও বেশি। তার সাথে ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণের রণসম্ভার। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত প্রায় ১ লক্ষ খানসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ ধরণের বিশাল বাহিনী মোতায়ন করার প্রয়োজন ছিল না। এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল গণচীনের তরফ থেকে যদি কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয় তার মোকাবেলা করার লক্ষ্যেই।

যাই হোক, প্রয়োজনীয় **Air** ও **Naval Cover** এবং প্রায় দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিশাল ভারতীয় বাহিনী একই সময়ে সব সেক্টর থেকে আক্রমণ চালালো। সব সেক্টরেই ভারতীয় বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার জন্য রাস্তা করে ব্রিজহেড তৈরী করে দিচ্ছিল মুক্তিবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধারাই। ঐ সমস্ত ব্রিজহেড তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল বলেই অতি সহজেই শত্রুপক্ষের ডিফেন্স ভেদ করে ঢাকা অভিমুখে তরিৎ গতিতে এগিয়ে যেতে পেরেছিল ভারতীয় মিত্র বাহিনী। যুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কর্নেল ওসমানীকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে চলেছিল ভারতীয় সেনাকমান্ড। ভারতীয় সেনা বাহিনীর স্ট্রাটেজি ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুপক্ষের ডিফেন্স লাইন ভেদ করে তাদের **Withdrawal** এর পথ **Cut Off** করে তাদেরকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে পরাজিত করে ঢাকা অবরোধ করা এবং পাক বাহিনীকে সারেন্ডার করতে বাধ্য করা। বাংলাদেশে অবস্থিত পাক বাহিনী তাদের চেয়ে সংখ্যায় ৬-৭গুন বড় ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিফৌজের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে মাত্র ১২ দিনের যুদ্ধে অতি করুণ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের জনগণের অসহযোগিতা এবং মুক্তি বাহিনীর দুঃসাহসিক গেরিলা তৎপরতা পাক বাহিনীর যুদ্ধস্পৃহা এবং মনোবল একদম নষ্ট করে দিয়েছিল। অন্য সব কারণের মধ্যে এটাই ছিল প্রধান কারণ যার জন্য পাকবাহিনীকে অতি অল্পসময়ের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এভাবেই ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের ফলে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে মুক্তিফৌজের কমান্ডার-ইন-চীফ এবং যৌথ কমান্ডের প্রধান কর্নেল ওসমানীর আমন্ত্রণে মিত্র বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরা স্বাধীন বাংলাদেশে আসবেন এবং যৌথ কমান্ডের তরফ থেকে **Instrument Of Surrender** এ যৌথ কমান্ডের শীর্ষ ব্যক্তি কর্নেল ওসমানীই সাক্ষর করবেন সেটাই ছিল সমগ্র জাতির প্রত্যাশা। কিন্তু ঘটনা ঘটে ঠিক তার বিপরীত। **Instrument Of Surrender** এ যৌথ কমান্ডের তরফ থেকে সাক্ষর দান করার সৌভাগ্য লাভ করলেন জেনারেল অরোরা। শুধু তাই নয় অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলনে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানীকে ১৬ই ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক **Surrender Ceremony** -তে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হল। কেন তাকে তার ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করে সেদিন জেনারেল অরোরাকে সমগ্র জাতি এবং বিশ্ব পরিসরে বিজয়ী শক্তির একচ্ছত্র অধিকর্তা হিসেবে জাহির করা হল সে রহস্যের উদ্ঘাটন আজঅব্দি হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিশদ বিশ্লেষণের দাবিদার। এ থেকে জানা যাবে ভারতীয় নীল নকশা এবং প্রবাসী সরকারের নতজানু নীতির অনেক কিছুই।

কর্নেল ওসমানী চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনিই অভিনন্দন জানাবেন মিত্র বাহিনীর জুনিয়র পার্টনার জেনারেল অরোরাকে। এতে করে বিশ্ব পরিসরে এটাই প্রমাণিত হবে মূলতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচেষ্টাতেই স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ, ভারতীয় বাহিনী সহায়ক শক্তি হিসেবে সাহায্য করেছে মাত্র। কিন্তু ভারতীয় সরকার তার সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। উল্টো ভারত সরকার দাবি জানায় **Instrument Of Surrender**-এ সাক্ষর করবে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক। উদ্দেশ্য পরিষ্কার- বিশ্ববাসী জানুক পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের বিজয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের দান। দুর্বল চিত্তের নতজানু প্রবাসী সরকার ভারতের সেই অযৌক্তিক দাবি মেনে নেয়। কিন্তু প্রচন্ড আত্মসম্মানবোধের অধিকারী আপোষহীন বঙ্গবীর কর্নেল ওসমানী নীতির প্রশ্নে অটল থেকে এ অন্যায়ের প্রতিবাদে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা শহরে দেশবাসী দেখেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে বিজয়ীর বেশে। তাদের ঘিরে ছিল বিএলএফ, মুজিব বাহিনী এবং রাতারাতি গজিয়ে উঠা **"Sixteen Division"** এর সদস্যরা। কারণ সত্যিকারের মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ঢাকা কিংবা দেশের বড়বড় শহরগুলোতে ঢুকতে দেয়া হয়নি নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ভারতীয় বাহিনীর প্রাধান্য জাহির করার জন্যই এ আদেশ জারি করা হয়েছিল। প্রকৃত মুক্তিফৌজের যোদ্ধারা ঢাকা এবং অন্যান্য শহরগুলোতে আসার অনুমতি পান ১৬ই ডিসেম্বরের অনেক পরে। এ ধরণের চক্রান্তের ফলে বিশাল ভারতীয় সেনা বাহিনীর আগমনে বাধাগ্রস্থ হয়ে শুকিয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের নিজস্ব ধারা। কালো ছায়ার আধাঁরে ঢাকা পরে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ। হারিয়ে গেল অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত তাদের জয়গাথাঁ। আচম্‌কা হোচট খেয়ে মুখথুবড়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন হয়ে উঠল সুদূরপরাহত। ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে জাতি স্বাধীনতার সঠিক মূল্য অনুধাবন করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হল। এজন্যই আজঅব্দি ক্ষমতাবলয়ে যারা অবস্থান করছেন সে সমস্ত বুদ্ধিজীবি, সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে অতি কম দামে স্বাধীনতা এবং জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেবার ন্যাক্কারজনক প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে যদি তার নিজস্ব ধারায় বয়ে যেতে দেয়া হত তবে দখলদার বাহিনীর পাশবিক নৃশংসতার শিকার হতে হত আরো অনেককেই, রক্তাহুতি দিতে হত প্রতিটি পরিবারকে। এভাবে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই হয়ে উঠতো এক অমূল্যধন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কষ্টার্জিত সেই পবিত্র স্বাধীনতাকে যেকোন ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে দিত পরীক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা এবং ত্যাগী-সচেতন জনতা। দুর্ভাগ্য তৎকালীন দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় খাঁদহীন বলিষ্ঠ জাতীয় চরিত্র গঠন করার নূন্যতম সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের অধিনে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকারের **LFO (Legal Frame Work)** এর আওতায় পাকিস্তানের অখন্ডতা বজিয়ে রাখার ওয়াদা করে নির্বাচন করেন শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার প্রধান হবার জন্যই জনগণ তাকে সে নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজশে ২৫-২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাঙ্গালী জাতির উপর শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে অস্ত্রের জোরে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়ে পড়ে অর্থহীন। বাংলাদেশের আপামর জনগণ পাকিস্তানী আচমকা হামলা ও শ্বেত সন্ত্রাসের বিরোধিতায় এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই ১৯৭০ সালের নির্বাচন তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা যখন মরণপন করে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন শেখ মুজিবর রহমান বন্দী হয়ে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। সশস্ত্র সংগ্রামের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না বলেই তাদের দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যেতে হয়। এরপর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিজয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র জাতির অবদান। সেক্ষেত্রে এই জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের একমাত্র দাবিদার হয়ে কোন যৌক্তিকতায় আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দলীয়ভাবে কব্জা করে নিল তার জবাব অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে দেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে লন্ডনে জনাব এ কে খন্দোকার ও মাঈদুল হাসানের মধ্যে প্রায় চার ঘন্টা দীর্ঘ এক আলাপ হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত সম্পর্কের মূল্যায়নের জন্য সেই আলোচনার সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। যুদ্ধকালে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিফৌজের ডেপুটি চীফ অফ ষ্টাফ এবং জনাব মাঈদুল হাসান ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে একজন পরামর্শদাতা। তাদের

কথোপকথন থেকে বোঝা যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্নেল ওসমানীকে বাইপাস করে মূলতঃ যোগাযোগ রক্ষা করতেন জনাব তাজুদ্দিন এবং খন্দোকার সাহেবের সাথে। যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে বেশিরভাগ আলোচনাও হত গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার সাহেবের সাথেই। জেনারেল অরোরা, ব্রিগেডিয়ার জ্যাকব, ব্রিগেডিয়ার গুপ্তই ছিলেন মূলতঃ তাদের **counter part.**

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে বীর বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন তার যথার্থ মূল্য ভারত কখনোই দিতে চায়নি। এ নিয়ে মুক্তি ফৌজের কমান্ডারদের সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্ব শুরু হয় প্রথম থেকেই। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনার জন্য মুজিবনগরে (৮নং থিয়েটার রোড) কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে একটি হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করা হলেও জনাব ওসমানীর কর্মক্ষমতা ছিল সীমিত। জুলাই মাস অব্দি মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডাররা হেডকোয়ার্টার্স এর কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্যই পাননি সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য। বিভিন্ন সেক্টরে কমান্ডাররা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে এভিএম খন্দোকার বলেন, "আমি যখন কোলকাতায় গিয়ে পৌছলাম তখন দেখলাম যে, হেডকোয়াটার্সের সাথে সেক্টর কিংবা সাব-সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই এবং এ পর্যায়ে ভারত আমাদের সংগ্রামে তেমন কোন সাহায্যই দেয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে কোন সঠিক নীতিও গড়ে তুলতে পারেনি তারা। তবে তারা তখন চাচ্ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইস্যুটা জিইয়ে থাক। ভারতীয় নীতি নির্ধারকরা চাচ্ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা এবং গতি-প্রকৃতি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের বুঝে নিয়ে তারা তাদের নীতি চুড়ান্ত করবেন। চুড়ান্ত নীতি নির্ধারন করার সময় পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তারা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং সেনা বাহিনীর এ ধরণের মানসিকতার ফলে ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর মধ্যে বৈরীভাব এবং রেষারেষি পরবর্তিকালে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গড়ে উঠা বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মধ্যে যে ভারত বিরোধী মনোভাব দেখা যায় সেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই **crystallize** করে।" এ প্রসঙ্গে জনাব খন্দোকার আরও বলেন, "মুক্তিফৌজ এবং ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে বিরোধ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্ন থেকেই দাঁনা বেধে উঠেছিল বিভিন্ন কারণে। ঐ সেন্টিমেন্ট, আবেগ-অনুভূতি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন **Disappointment** এর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ আরো বেড়েছে।" মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকার বলেছেন, "মে, জুন, জুলাই, আগষ্ট পর্যন্ত ভারতের **Involvement** ছিল অতি সামান্য। যা ছিল তা মোটামুটিভাবে মুক্তি বাহিনীর জন্য কিছু যৎসামান্য হালকা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ, কিছু লজিস্টিক সাপোর্ট এর বেশি কিছুই নয়। মুক্তিফৌজ কমান্ডারদের মূলতঃ শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সম্ভারের উপর নির্ভর করেই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম।"

মুক্তিফৌজ সেক্টর কমান্ডারদের জুলাই মাসের কনফারেন্সের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা হিসেবে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠানো হবে। এ প্রসঙ্গে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দোকারের বক্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "সেক্টর কমান্ডারদের মিটিং এর পর একদিন জেনারেল অরোরা এলেন। মিটিং হল। কর্নেল ওসমানীর সাথে সেই মিটিং এ আমিও উপস্থিত ছিলাম। মিটিং এ আলোচনার মূল বিষয় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে। কতজনকে ট্রেনিং দেওয়া হবে, কোথায় কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হবে, কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া হবে, কি করে রিক্রুটমেন্ট করা হবে, কতদিন ট্রেনিং দেওয়া হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। জেনারেল অরোরা প্রস্তাব দিলেন পাঁচ হাজার গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করলেই হবে। শুনে কর্নেল ওসমানী এবং আমি দু'জনেই অবাক হয়ে গেলাম। আমি বলেই ফেললাম এত অল্প সংখ্যক গেরিলা দিয়ে কি হবে? জবাবে জেনারেল অরোরা বললেন, **"These are the people who will go inside, bleed the enemy and all those things."** কর্নেল ওসমানী জেনারেল অরোরাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন তার দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা দরকার। সেক্টর

কমান্ডারদের সদ্য সমাপ্ত কনফারেন্সে সেটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাই হোক ট্রেনিং শুরু হল। ট্রেনিং শেষ করে গেরিলারা ফিরে আসল। কিন্তু তারপর একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিল। এ সমস্যাটার জন্য পুরোপুরি দায়ী ভারত সরকার।

ট্রেনিং এর পর ভারতীয় আর্মি সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের অধিনে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এতে ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের বিভিন্ন সেক্টর থেকে রিক্রুট করা হয়েছিল। ট্রেনিং-এর পর তারা নিজ নিজ সেক্টরে ফিরে গিয়ে তাদের প্রিয় সেক্টর কমান্ডারদের অধিনে যুদ্ধ করবে এটাই ছিল তাদের আশা। ভারতীয় সেনা কমান্ডারদের অধিনে যুদ্ধ করতে তারা রাজি হল না। ভারতীয় বাহিনী ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলাদের তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দেশের ভেতরে তাদের কমান্ডের আওতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেটা আমাদের হেডকোয়ার্টার্সকেও জানতে দেয়া হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কিছু জায়গায় জোর করে ইন্ডিয়ান কমান্ডাররা গেরিলাদের পাঠায় মূলতঃ লুটপাট করে নিয়ে আসার জন্য। যুক্তি হিসেবে তাদের বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধ চালাতে হাতিয়ার এর সাথে টাকা-পয়সারও প্রয়োজন রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা এ ধরণের অমানবিক অপারেশন এবং ইন্ডিয়ান আর্মির অধিনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে তাদের নিজ নিজ সেক্টরে পালিয়ে যায়। এর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া **even at a later date was very bad** মুক্তিযোদ্ধারা **did not like the way Indian Army wanted them to be used.** অল্প সময়ের মধ্যেই সব সেক্টরে এ সম্পর্কে তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর মাঝে অবিশ্বাসের জন্ম হয়। এ খবর জানাজানি হয়ে যাবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের সেক্টর কমান্ডারদের দাবি অনুযায়ী আমাদের হেডকোয়ার্টার্স থেকে চাপ দেয়া হল, "আমাদের এই ট্রেইন্ড গেরিলাদের বাংলাদেশী কমান্ডারদের হাতে না দিলে **This will be a disaster and catastrophe.** বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত গেরিলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশী সেক্টর কমান্ডারদের হাতে দিতেই হবে।" এ সম্পর্কে ভারতীয় মিলিটারী হাইকমান্ডের প্রথম থেকেই প্রচুর **reluctance** থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বে নেহায়েত নিরুপায় হয়েই আমাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য মুক্তিফৌজদের কাউন্টার ফোর্স হিসেবে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ('র') এবং সেনা বাহিনীর মিলিত চেষ্টায় গঠিত হয়েছিল বিএলএফ। সে এক অন্য অধ্যায়।

ভারতীয় নেতৃত্বের এ ধরণের মনোভাবের দু'টো কারণ হতে পারে। প্রথমত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফিল্ড কমান্ডারস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেনি। তাই তারা সবসময় মনে করত এদের উপর নির্ভর করা যায় না। দ্বিতীয়ত: তাদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত তাদের সরাসরি যুদ্ধের বিজয় ফল হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করবে বাংলাদেশ। তাই পাক বাহিনীকে দুর্বল করার জন্য গেরিলা বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে তাদের শুধু ব্যবহার করতে হবে সীমিত লক্ষ্যে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের বৃহৎ অংশ এবং সদস্যরা চেয়েছিলেন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম পরিচালনা করে নিজেদের প্রচেষ্টায় তারা স্বাধীন করবেন তাদের মাতৃভূমি। কিন্তু তেমনটি হয়নি। আমার মনে হয় এখানেই মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সেনা বাহিনীর মধ্যে একটা **Credibility Gap** হয়ে গেছে। আমাদের সামরিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, 'আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করব। বন্ধুরাষ্ট্র ভারত মুক্তিকামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করলে আমরা অবশ্যই সে সাহায্যকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু **necessarily this is our struggle and we have to fight it ourselves.** তাছাড়া শুধু ভারত কেন? পৃথিবীর যে কোন দেশ আমাদের সংগ্রামে সাহায্য করতে চাইলে আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব। মোটকথা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে ভারত ও আমাদের মধ্যে **approach of mutual confidence** ছিল না বা কখনো গড়ে উঠেনি **because of their overall policy.** একথাও সত্য যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক সেক্টরে ইন্ডিয়ান কমান্ডারদের কার্যকলাপে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টিও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সত্যিকথা বলতে গেলে

৯ই আগষ্ট রুশ-ভারত চুক্তি সই হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের চেষ্টায়। ৯ই আগষ্টের পরই ভারত সরাসরিভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করে এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে ইন্ডিয়ান আর্মি really really started taking closer interest.”

মাঈদুল হাসান এ পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন, “ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া বাংলাদেশ বোধ হয় স্বাধীনতা পেত না, কি বলেন?” খন্দোকার সাহেব মাঈদুল হাসান সাহেবের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, “যদিও মুজিবনগরের অনেকে এমনকি আমাদের মন্ত্রীসভার অনেকেই হতাশা বোধ করতেন, সংসদ সদস্যদের অনেকেই ইয়াহিয়া খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নিয়ে ফিরে যাবার চিন্তা-ভাবনাও করছিলেন। মুক্তি বাহিনীর তৎপরতায় আস্থাহীন হয়ে হতাশা বোধ করতেন। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কথা শুনলেই আতঁকে উঠতেন। ভাবতেন কি হচ্ছে! দেশে বোধ হয় আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এ ধরণের পরিস্থিতিতেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম, মুক্তিফৌজের গেরিলা তৎপরতা বেড়ে গেলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবে বলে যুক্তির অবতারণা করে যারা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের গতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের সে যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পক্ষান্তরে আমরা যদি আমাদের সংগ্রামের তীব্রতা প্রথম থেকেই বাড়াতে সক্ষম হতাম তবে আমাদের প্রচন্ড গেরিলা তৎপরতার মুখে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মসর্মপন করতে হত মুক্তি ফৌজের কাছে। কারণ They had no chance to fight. Their moral was completely shattered and the losses would have been unacceptable to them. (সংবাদ ২৬শে মার্চ ১৯৯০)।

জনাব মাঈদুল হাসান জবাবে বলেছিলেন, “আপনার চিন্তা-ভাবনায় যুক্তি থাকলেও ভারতীয়রা ভেবেছিলেন অন্যরকম। তারা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে ছোট করে দেখাতে এবং বিশ্ব পরিসরে পাক-ভারত যুদ্ধের ফল হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে। এতে ভারত এক ঢিলে দুই পাখি বধ করতে সক্ষম হয়।
প্রথমত: ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়ে নিজেকে উপমহাদেশের প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় ভারত।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখার যৌক্তিকতা অর্জন করে।

আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো হল; আদর্শিক দেউলিয়াপনা, কোন্দল এবং ভাংগন

ক্ষমতায় বসানো হলো আওয়ামী লীগকে

যদিও দেশ স্বাধীনতা লাভ করে ১৬ই ডিসেম্বরর ১৯৭১ কিন্তু সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রবাসী সরকার এবং মন্ত্রিসভার আগমন ঘটে ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এ।

ঢাকায় এসেই তাজুদ্দিন সরকার ঘোষণা করে, "তাদের সরকার বিপ্লবী সরকার। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য।" যদিও ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজতন্ত্রের কোন অঙ্গীকার ছিল না। সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খলে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই নিজেদের বন্দী করতে আগ্রহী ছিল না। তাদের সর্বকালের দাবি ছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার। জনাব প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তৎকালীন প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলো। ১৯৭২ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল অন্যান্যদের সাথে প্রশ্ন তোলে। তারা বলে, "আওয়ামী লীগ সরকার বিপ্লবী সরকার হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি বিপ্লবই হয়ে থাকে তবে সে বিপ্লব শুধু আওয়ামী লীগই করেনি, করেছে এ দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ। আর তাই সকল দলের প্রতিনিধি নিয়েই গঠন করতে হবে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সরকার।" তাদের এ দাবি যুক্তিসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ভারতীয় সাহায্যে প্রবাসকালের একলা চলো নীতিই ধরে রাখে। মস্কোপন্থী মোজাফফর ও মনিসিং গং ক্ষমতার অংশ না পেয়েও যুদ্ধকালীন সময় থেকেই তাদের বিদেশী মুরুব্বীদের ইচ্ছানুসারে আওয়ামী লীগ সরকারের লেজুড়বৃত্তি করতে থাকে নির্লজ্জভাবে। ভারতীয় রাজনীতিতে সিপিআই যেভাবে কংগ্রেসের লেজুড়ে পরিণত হয় ঠিক সে অবস্থাই হয়েছিল মোজাফফর ন্যাপ এবং মনিসিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টির বাংলাদেশের রাজনীতিতে।

কিন্তু সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ (মোজাফফর ন্যাপের প্রেসিডেন্ট) আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করেও অবস্থার চাপে ১০ই মে চট্টগ্রামে জাতীয় সরকার কায়েমের দাবি তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের তাত্ত্বিক দেউলিয়াপনা

জনাব তাজুদ্দিন আহমদ এবং মুজিববাদীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই।

শ্রেণীগতভাবে আওয়ামী লীগ ছিল বুর্জুয়া এবং পাতি বুর্জুয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারি দল। কিন্তু এই দলে জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল এবং সমাজতন্ত্রীরাও ছিল।এ কারণে বিপরীতমুখী চিন্তা-ভাবনা দলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অসন্তুষ্টি এবং সংঘর্ষের সৃষ্টি করে।

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ প্রচার করেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা খাঁটি সমাজতন্ত্রই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য কিছু নয়। তার এসব বক্তব্য ও প্রচারণাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের ক্ষমতার অর্ন্ত-দ্বন্দ্বগুলো ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবেলার জন্য ১৯৭২ সালের ১০ইমে চট্টগ্রামে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের লেজুড় দল ন্যাপের সভাপতি জনাব মোজাফফর আহমদ সর্বদলীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানাতে বাধ্য হন।

আগেই বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অনাস্থা ও যুদ্ধত্তোর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ উপদেষ্টা ভারতের অন্যতম কূটনীতিবিদ জনাব ডিপি ধরের পরামর্শে এবং বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতায় মুক্তি বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছিল বিএলএফ পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী।

বাংলাদেশের চারজন ছাত্রনেতা ভারতীয় সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই চতুরঙ্গ তোফায়েল, রাজ্জাক, শেখ মনি ও আব্দুর রাজ্জাক পরবর্তিকালে বাংলাদেশের 'চার খলিফা' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাদেরই একজন জনাব তোফায়েলকে দিয়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ এ ঘোষণা করা হল, "মুজিববাদ কায়েম করব। মুজিববাদের চার স্তম্ভঃ **গণতন্ত্র**, **সমাজতন্ত্র**, **জাতীয়তাবাদ** এবং **ধর্মনিরপেক্ষতা।**" তিনি মুজিববাদের একটি ব্যাখ্যাও দিলেন। তিনি বললেন, "মহান মার্কিন নেতা আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার জনগণকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কিন্তু সমাজতন্ত্র দিতে পারেননি। কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের স্থপতি কিন্তু তার দর্শনে ছিল না গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা। মুজিববাদে রয়েছে দু'টোই গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সুতরাং মুজিববাদ বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক দর্শন।" তিনি আরো বলেন, "পুজিঁবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে মুজিববাদ কায়েম করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা হবে।" তিনি বাংলাদেশের জনগণকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে 'জাতীয় বিপ্লব' আখ্যা দিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। জনাব তাজুদ্দিনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্যই জনাব তোফায়েলের মাধ্যমে মুজিববাদ নামক এক উদ্ভট এবং অদ্ভূত রাজনৈতিক দর্শনের উপস্থাপনা করা হয়। ৩রা জানুয়ারী ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার এক ঘোষণার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে বলে খবর প্রচার করে।

যুব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে ফিরেই মুজিব পরিবারের অনুকম্পা ও সহানুভূতি লাভের আশায় জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সম্পর্কে কদর্য্য প্রচারণা নতুন করে শুরু করেন। তারা বলেন, "শেখ মুজিবের প্রতি তাজুদ্দিনের কোন আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি একাই হতে চান।" তারা আরো বলেন, "শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষক সেটাও জনাব তাজুদ্দিন স্বীকার করেন না। তাছাড়া শেখ মুজিবকে উপেক্ষা করার আর একটি নজির এই যে, তিনি তাকে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী না করে ক্ষমতার অভিলাষে নিজেকেই প্রধানমন্ত্রী বানান এবং শেখ

মুজিবকে শুধুমাত্র সাংবিধানিক ক্ষমতাহীন রাষ্ট্রপতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য সৎ হলে তিনি শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে নিজে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রবাসী সরকার পরিচালনা করতে পারতেন।”

এমনিভাবে তাজুদ্দিনের প্রতি শেখ মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের মন বিষিয়ে তুলেছিলেন তারা। শেখ মনির এতে মুখ্য ভূমিকা ছিল। শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফেরার পর উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় হয়ে উঠেন। শেখ মুজিব যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের নয় মাস নির্বাসিত ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে সেই অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তারা। তার সামনে কেঁদে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার নাটক করে এদের অনেকেই বলেছিলেন, “আপনার ভাবমূর্তি ও নেতৃত্ব রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাজুদ্দিনের বিরাগভাজন হয়েছি আমরা। তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাবার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। শেখ কামালকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি। শুধু আমাদের বিরোধিতায়ই সেটা সম্ভব হয়নি। আমরা জোর করে তাকে মুজিবনগর হেডকোয়াটার্স এ কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসাবে রেখেছিলাম।” আরো অনেক কিছু বলে তার কান ভারী করতে সক্ষম হয়েছিলেন কুচক্রী ক্ষমতালিপ্সু যুব নেতৃবৃন্দ। শেখ মুজিব তাদের কথার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ পেলেন না। কেননা, তার পরিবারের সদস্যগণ আরো রূঢ় ভাষায় তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে তাদের মনের খেদ প্রকাশ করেন শেখ মুজিবের কাছে। এর ফলেই দেশে ফেরার মাত্র একদিন পরই ১১ই জানুয়ারী ১৯৭২ শেখ মুজিব তার দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত সহকর্মী জনাব তাজুদ্দিনকে অপসারন করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। জনাব তাজুদ্দিনকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে বাদ না দিলেও তাকে সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলতে লাগলেন শেখ মুজিব। প্রশাসনিক ব্যাপারে আবার তিনি যুব নেতৃবৃন্দের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। ফলে যুব নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিসরে সর্বময় ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হল। কিন্তু শেখ মুজিবের এ ধরণের আচরণে মনোক্ষুন্ন হলেন দলের বর্ষিয়ান নেতারা।

ছাত্রলীগের বিভক্তি আওয়ামী লীগেও টানাপোড়নের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জাতি হয় বিভক্ত।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের জন্য এ ধরনের বিরোধ ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর।

১৯৭২ সালের প্রায় গোড়া থেকেই মুজিববাদ নিয়ে ছাত্রলীগের মাঝে দেখা দেয় সংকট। সৃষ্টি করে অনৈক্য। '৭২ সালের ১২ই মে ছাত্রলীগের চার নেতা খোলাখুলিভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরেন। জনাব রব ও শাহজাহান সিরাজ বললেন, "মুজিববাদে তারা বিশ্বাসী নন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই আসিবে জনমুক্তি।" অপরদিকে আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী ঘোষণা দিলেন, "যে কোন মূল্যে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সংকট দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে মুজিববাদী ও মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে যখন দুই গ্রুপই আলাদাভাবে মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। শেখ মুজিব অবশ্য মাখনদের সম্মেলনই নিজে উদ্বোধন করেন।

ছাত্রলীগের ভাঙ্গনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক লীগেও কোন্দল ঘনীভূত হয়। ফলে শ্রমিক লীগও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মুজিববাদ বিরোধী ছাত্রলীগ এবং তাদের সমর্থক শ্রমিক লীগ তৎকালীন গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠনের আহ্বান জানান। তখন থেকেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে মুজিববাদ অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। আসম রব ১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ এক ভাষণে বলেন, "জীবনে সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য জাতি যখন আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক সে মুহূর্তে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি আমলা, শিল্পপতি, আওয়ামী লীগসহ কিছু রাজনৈতিক লোকজন জাতীয় বিপ্লবের নামে আমাদের এই প্রস্তুতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে এবং গণবিরোধী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে। ৮ই মার্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি আরো বলেন, "পতাকা বদল হলেই জনগণের মুক্তি আসে না, তার জন্য দরকার সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী।" এর জবাবে '৭২ সালের ৫ই মে ছাত্রলীগ (মুজিববাদী) নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, "মুজিববাদের প্রতি হুমকি বিপ্লবীদের সমাজতন্ত্রের প্রতিই হুমকি স্বরূপ।" ২৩শে মে '৭২ তৎকালীন আওয়ামী সেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান এবং পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রাজ্জাক দিন তারিখ দিয়ে ঘোষণা করেন, "৭ই জুন থেকে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।" ১৩ই জুন গৃহিত এক প্রস্তাবে মাখন সিদ্দিকী গ্রুপ দাবি করে, "**মুজিববাদের চার নীতির উপর ভিত্তি করে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে।**" ৬ই জুলাই তোফায়েল আহমদ কুমিল্লার এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, "যারা বিদেশী মতবাদ প্রচার করছেন তারা দেশের জনগণের বন্ধু নয়, তারা জাতীয় শত্রু। মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সব সমস্যার সমাধান এবং মুজিববাদ দেশে সমৃদ্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।" একই জনসভায় জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, "আমরা বিশ্বকে দেখিয়ে দেবো কিভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে।" ১৬ই জুলাই নেতা জিল্লুর রহমান বললেন, "মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। মুজিববাদ বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকঙ্খার প্রতীক। এর বাস্তবায়নের মধ্যেই মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি নিহিত।" একই দিনে ঢাকায় মাখন সিদ্দিকী গ্রুপ ছাত্রলীগের এক সভায় গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয়, "মাওবাদী বিভ্রান্ত নেতৃত্ব, সিআইএ-র এজেন্ট দল ও ছাত্রলীগ নামধারী বহিস্কৃত নেতৃত্ব, পলাতক আলবদর, আলশামস, রাজাকার, শান্তি কমিটির মেম্বার, মুসলিম লীগারস, জামায়াত, নেজাম, জমিয়তে ওলামা, পিডিপি সহ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বানচাল করতে চায়।"

২৪শে জুলাই '৭২ ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দী উভয় গ্রুপের মধ্যে বায়তুল মোকাররমে গোলাগুলি হল। ২১শে জুলাই ছাত্রলীগ মুজিববাদী অংশের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে শেখ মুজিবের

উপস্থিতিতেই মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করা হয়। একই দিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্রলীগ রব গ্রুপের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। সেই সম্মেলনে জনাব আসম রব ঘোষণা করেন, "কার্ল মার্কসের পর সমাজতন্ত্রের কোন নতুন সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার রূপরেখাই চূড়ান্ত এবং আমাদের এই বাংলাদেশে সেই সমাজতন্ত্রই কায়েম করা হবে।" জনাব রব দৃঢ়ভাবে বললেন, "মুজিববাদের ককটেল কোন সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা নয়।" ২৪শে জুলাই ৭২ মুজিববাদী ছাত্রলীগের একটি মিছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পল্টন ময়দানে রব গ্রুপ ছাত্রলীগের একটি সভার উপর চড়াও হয়। তাদের হামলায় জনাব রবসহ শতাধিক ছাত্র আহত হন। পরে আহতদের একজন ছাত্র হাসপাতালে মারা যায়।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার পড়াশুনার জন্য একশতটি বৃত্তি দেয়। মেধা অনুসারে একশত জন ছাত্র নির্বাচিত হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। ৮ই জুলাই নির্বাচিত তালিকা থেকে হঠাৎ করে অন্যায়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৪১ জনকে বাদ দিয়ে নতুন করে তাদের জায়গায় অন্য ৪১ জনকে নির্বাচিত করা হয়। মুজিববাদে বিশ্বাসী ছিল না বলেই প্রথম নির্বাচিত ৪১ জনকে বাদ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়েও মুজিববাদকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। নেতাদের বিবৃতি বক্তব্যে এ বিরোধ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৭২ সালের ১৮ই জুলাই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী চট্টগ্রামে ঘোষণা করলেন, "গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শেই দেশ পরিচালিত হবে।" তার একদিন আগে ঠাকুরগাঁয়ে এক জনসভায় লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী বললেন, "মুজিববাদের চার নীতি দ্বারাই দেশ চালিত হবে।" তার কয়েকদিন পর ৩১শে জুলাই আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটিতে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে মুজিববাদ কায়েমের শপথ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১২ই আগষ্ট অর্থমন্ত্রী ও প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ ভাওয়ালের এক জনসভায় বললেন, "সমাজতন্ত্রের প্রতি বাধা আসলে গণতন্ত্র ত্যাগ করব।" ২০শে আগষ্ট আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রাজ্জাক বললেন, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ধার করা আদর্শ এবং মাওবাদী চক্রান্ত।" রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, "গণতন্ত্র কায়েম হবে!" মন্ত্রী বলেন, "সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনে গণতন্ত্র ত্যাগ করব!!" শীর্ষ নেতা শেখ মুজিব বলেন, "দু'টাকে মিলিয়ে মুজিববাদ কায়েম করা হবে!!!" এভাবেই দেশে সৃষ্টি করা হল আদর্শগত বিভ্রান্তিকর এক চরম অবস্থা। আর এ বিভ্রান্তির ফলে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগই নয় সমস্ত জাতি হল দ্বিধা-বিভক্ত।

জনগণ পরিণত হয় শত্রুতে

পাকিস্তান এখন নেই। কিন্তু শত্রুর প্রয়োজন। শত্রু হল জনগণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় অস্থানীয়দের স্থলে বাংলাদেশী বুর্জুয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ দেখা শুরু করলেন। ঠিক যেভাবে পাকিস্তানীরা দেখতো তাদের আপন স্বার্থ। পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। তা যাক, কিন্তু শত্রুতো থাকতে হবে। শত্রু এখন কে? শত্রু এখন জনগণ। জনসাধারনের পক্ষের শক্তিকে উৎখাত করার তৎপরতা চালানো হল সরাসরিভাবে। তেমনি চললো তাদেরকে নিজেদের লেজুড়ে পরিণত করার চক্রান্ত। জনগণ যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে। তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং নিজেদের বাচাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। তাই তাদেরকে শুধু ধোকা দেবার জন্যই সমাজতন্ত্রকে আওয়ামী লীগ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল নিজেদের স্বার্থেই।

বাংলাদেশ নামে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু শাসক বুর্জুয়াদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটল না। তাদের চরিত্রে রয়ে গেল মুৎসুদ্দী ধামাধরার প্রবণতা। আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। কোন অবস্থাতেই ভবিষ্যতে মার্কিন সাহায্য বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না এই সাহসী সরকারি ঘোষণা মুজিবনগরে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই বলতে বাধ্য হলেন যে তিনি মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবেন। যুদ্ধের সময় ভারত বিরোধী ছিলেন যেসব বিত্তবানেরা তাদের বেশিরভাগই ভারতপ্রেমিক হয়ে দাড়ালেন রাতারাতি। প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হল ভারতীয় মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী গোষ্ঠির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অল্প সময়ে চোরাকারবারের মাধ্যমে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার। যে আওয়ামী লীগ চিরকাল ছিল মার্কিন ঘেষা, আমেরিকার প্রশ্নে যেখানে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে, সেই আওয়ামী লীগ এর এতটুকু কষ্ট হল না সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরাগী হয়ে পড়ে ভারতের সাথে চুক্তির দাসখত লিখে দিতে। মুলকথা মুরুব্বী চাই। 'স্বাধীন হয়েও স্বাধীন নয়, স্থানীয় বটে তবে জাতীয় নয়' প্রকৃতির আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করেছিল জাতীয় অর্থনীতিকে তাদের দলীয় নিয়ন্ত্রণে নেবার জন্যই। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে পাকিস্তানী বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিদের পরিত্যক্ত ব্যবসা কেন্দ্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের পার্টির সদস্য ও সহযোগীদের পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। ব্যবসা-বানিজ্যের লাইসেন্স পারমিটও দেয়া হয় অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞ পার্টি টাউটদের। অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দলীয় সদস্যদের নব্য পুঁজিপতি হবার সুযোগ করে দেয়া হল সেই আদিম পদ্ধতিতে। এভাবেই একাত্তরের আগের অধ্যায়ে পাকিস্তানীরা লুট করেছে বাংলাদেশকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজতন্ত্রের ধুর্মজাল সৃষ্টি করে শুরু হল বাঙ্গালী নব্য পুজিঁপতিদের লুন্ঠন। গরীব দেশবাসী আরো গরীব হল। জাতীয় অথনৈতিক মেরুদন্ড গেল ভেঙ্গে। রুশ-ভারতের চাপে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হিসেবে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের অসাড়তাই প্রমাণ করেছিল আওয়ামী লীগ।

সোভিয়েত নৌ বাহিনীর বহর চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে নেয়

যুদ্ধের সময় তাজুদ্দিন পুরোপুরিভাবে রুশ-ভারতের প্রভাবাধীন ছিল, পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিব ও সেই বলয়েরই প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে পূর্বের সুইজ্যারল্যান্ড বানাবার ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ভারতের একটি করদ রাজ্যেই পরিণত করলেন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে। তিনি চালনা এবং চট্টগ্রামের বন্দর পরিষ্কারের অজুহাতে সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনীকেও আমন্ত্রন জানান। সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনী বন্দর ও সমুদ্র সীমার বিশাল অংশ তাদের দখলে নিয়ে নেয় এবং ঐ অঞ্চল অন্যদের এমনকি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্যও "নিষিদ্ধ এলাকা" বলে ঘোষণা দেয়। সোভিয়েত এবং ভারতীয় নৌ বহর দীর্ঘ দুই বৎসরকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করে। ক্রমান্বয়ে খবর বের হতে থাকে এই দুই নৌ বাহিনীর সদস্যরা বন্দরের খাড়ি পরিষ্কারের নামে সন্দেহজনক বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশকে ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।

বিরোধী পক্ষের উপর নির্যাতন শুরু হল

বিরোধী পক্ষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে গর্বের সাথে শেখ মুজিব বললেন, "রাষ্ট্রে বিরোধী দুঃস্কৃতিকারীদের হুশিঁয়ার করে দিচ্ছি, প্রয়োজনে আমি লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিব।" সরকার ও সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন বাহিনীগুলোর প্রতিই ছিল তার এই ইঙ্গিত।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের উপর বর্বর নির্যাতন শুরু হয়। এ নির্যাতনে শুধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন বাহিনীই অংশগ্রহণ করেনি, তাতে অংশ নেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিভিন্ন লাঠিয়াল ও বেআইনী সশস্ত্র পেটোয়া বাহিনী। রাজনৈতিক নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ তোলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, কাজী জাফর আহমদ, ছাত্রলীগের রব-সিরাজ গ্রুপ। তারা আওয়ামী সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাড়াবার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান। তারা বিবৃতি সমাবেশের মাধ্যমে বলেন, ''বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ শক্তিকে শেষ করে দেবার জন্য মাত্র ৯মাস আগে নির্যাতন এবং পুলিশ ও সেনা বাহিনীর বেপরোয়া গুলি চালানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতেন যারা; ক্ষমতায় আসীন হয়ে গত মাসেই প্রায় ডজনখানেক জায়গায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে ও মিছিলে গুলি চালিয়েছেন তারা। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন দল দখলদার বাহিনীর দালালদের সহায়তায় প্রশাসন যন্ত্রকে প্রভাবিত করে ছাত্র, বিরোধী দলীয় কর্মী ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করে তাদের গ্রেফতার করছেন। রাজনৈতিক নেতারা রাজধানী থেকে সরকারি ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কর্মী, ছাত্র, যুবকদের শায়েস্তা করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে তাদের অযথা হয়রানি করছেন।''

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ''বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ির দোর গোড়ায় মুজিববাদের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। আঞ্চলিক, জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ের নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের বাশের লাঠির মাধ্যমে জঙ্গি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।'' এরপর ট্রেনিং শুরু হয়। ইতিমধ্যে আওয়ামী-লীগের নেতা জনাব আব্দুল মান্নান এক লক্ষ লোকের এক সমাবেশের আয়োজন করেন ১লা মে ১৯৭২-এ এবং ঐ সমাবেশে তিনি ঘোষণা দেন, ''আগামী ৯ই জুন থেকে তার অনুসারীরা জাতীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে।'' তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান যাতে করে তার বাহিনীর সদস্যদের এ্যারেষ্ট, সার্চ, ইন্টারোগেশন এবং শাস্তি দেবার ক্ষমতা দেয়া হয়। এভাবে মুজিব ভক্তরা সবাই আইনকে নিজেদের হাতে নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। এক সভায় স্বয়ং শেখ মুজিবর রহমান অতি দম্ভের সাথে তার সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমি আমার লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দেব।'' ইঙ্গিতটি ছিল আওয়ামী লীগের বেসরকারি বাহিনীগুলোর প্রতি। শ্রমিকলীগের নেতার ঐ অভিযান শুরু হওয়ার ৭দিনের মাথায় খুলনায় পুলিশ ও লালবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ঐ ধরণের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিসি'তির আরো অবনতি ঘটে। ঐ সমস্ত ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের বাহিনীর হাতে নাজেহাল হতে থাকে সাধারণ নিরীহ মানুষ।

অবস্থার এতই অবনতি ঘটে যে, আওয়ামী লীগের 'বি' টিম হিসেবে পরিচিত মোজাফফর ন্যাপও ঐ ধরণের ঔদ্ধত্ত বন্ধ করার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। জনাব মোজাফফর আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন, "স্বেচ্ছাসেবক এবং একটি রাজনৈতিক দলের অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের দায়রার বাইরে গিয়ে

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো ঐ ধরণের বর্বরতা করে চলেছে অবিরাম। তারা ইচ্ছানুযায়ী কারফিউ জারি করে স্থানীয় প্রশাসনকে অবজ্ঞা করে লোকজনকে ধরে তথাকথিত আদালতে তাদের বিচারের নামে অমানুষিক জুলুম করছে। প্রশাসন এবং পুলিশ রহস্যজনকভাবে ঐ ধরণের কার্যকলাপের ব্যাপারে নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে।” তিনি জনগণের প্রতি আবেদন জানান যাতে করে ঐক্যবদ্ধভাবে তারা ঐ সমস্ত অন্যায় ও অসহনীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলেন।

মেজর জলিল (বীর উত্তম) বন্দী হলেন

মেজর জলিল ছিলেন একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটে তিনি বাধা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান আর্মির সারেন্ডারের পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে হাতিয়ার, গোলাবারুদ, যুদ্ধ সরঞ্জাম, কলকারখানার মেশিনপত্র সবকিছুই লুট করে ভারতে পাচাঁর করতে থাকে। মেজর জলিল এ সমস্ত লুটপাটের বিরোধিতা করেন। তার সাহসিকতা অন্যান্য সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদেরও "মিত্র বাহিনীর" লুটপাটে বাধা প্রদানে উৎসাহিত করে তোলে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার ঐ ধরণের কর্মকান্ডের জন্য সরকার তাকে বন্দী করে। ষড়যন্ত্রের জাল ফেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সমগ্র জাতি সরকারের ঐ ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১১ই মার্চ বরিশালে মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের এক বিশাল সমাবেশে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়েছিল সেনা বাহিনীর তরফ থেকেও। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করে, "তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এবং আর্মি রুলস এর অধিনেই তার বিচার করা হবে।" সরকারের ঐ ঘোষণার পর বিক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায়। আর্মি, মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণ ক্ষেপে উঠে। প্রচন্ড গণচাপের মুখে সরকার বাধ্য হয় মেজর জলিলকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে।

১লা জানুয়ারী ১৯৭৩, ঢাকার রাজপথ আবার রক্তে রঞ্জিত হলো

প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয়।

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মস্কোপন্থী বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন "ভিয়েতনাম দিবস" পালনের ডাক দেয়। এ উপলক্ষে ঐ দিন ছাত্র ইউনিয়ন এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি প্রেসক্লাবের বিপরীত দিকে অবস্থিত তৎকালীন মার্কিন তথ্য সার্ভিস ইউএসআইএস (ইউসিস) দফতরের সামনে এসে ভীষণ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাদুঁনে গ্যাস বা লাঠিচার্জ ছাড়াই নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানিতে ছাত্র মিছিলের উপর বর্বরোচিতভাবে গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ দর্শনের (অনার্স) ছাত্র মতিউল ইসলাম ও মীর্জা কাদেরুল ইসলাম নামক অপর আর একজন ছাত্র। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজপথে পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে আসে পরের দিনের সংবাদপত্রগুলিতে। নূরুল আমিন, আইয়ূব খান, মোনেম খান, ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান আমলে তাদের নির্যাতনমূলক গণবিরোধী স্বৈরশাসনের জন্য ধিকৃত হয়েছিল জনগণের কাছে। একই ন্যাক্কারজনক বর্বরতার জন্য এদেশের মানুষ ধিক্কার দিল আওয়ামী লীগ সরকারকে।

স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের পরই আওয়ামী লীগ সরকারের এহেন প্রকাশ্যে ছাত্র হত্যা হতবাক করে দিয়েছিল দেশবাসীকে। উৎকন্ঠায় আতংকিত হয়ে পড়ে তারা। প্রেসক্লাবের বারান্দায় দাড়িয়ে থাকা সাংবাদিকরা স্তব্ধ হয়ে অবলোকন করেন পুলিশের বর্বরোচিত প্রাণহানিকর আচরণ। সেদিন পুলিশী নির্যাতনের হাত থেকে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফাররাও রেহাই পাননি। মুজিব সরকারের পুলিশ বাহিনী উপস্থিত প্রেস ফটোগ্রাফারদের হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে নির্মমভাবে। সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান এই পুলিশী সন্ত্রাসের ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেবারই প্রয়োজন বোধ করেননি সেদিন। গুলি চালনার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে পুরো শহরে। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট, যানবাহন সব কিছুই বন্ধ হয়ে যায় সারা শহরে। স্বতঃস্ফুর্তভাবে হাজার হাজার লোক ছুটে আসে ইট দিয়ে ঘেরা রক্তে রঞ্জিত রাজপথের অংশ দেখার জন্য। শহরের অলিতে-গলিতে মানুষ পুলিশের পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মৌন মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পরদিন ২রা জানুয়ারী এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন প্রফেসর মোজফফর আহমদ ঘোষণা করলেন, "আওয়ামী লীগের ছাত্র হত্যা ইয়াহিয়া-মোনেম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপেরই নামান্তর। আমরা দেশবাসীর দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আশু পদত্যাগ দাবি করছি।" তিনি আরো বলেন, "নূরুল আমিন সরকারের ভাগ্যে যে পরিণতি ঘটেছিল, শেখ মুজিবের ভাগ্যেও সেই একই পরিণতি অনিবার্য।"

শেখ মুজিবকে দেয়া "বঙ্গবন্ধু" খেতাব উঠিয়ে নেয়া হয় এবং একই সাথে তার "ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ" ও বাতিল করা হয়।

৩রা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, "দরকার হলে আরো রক্ত দেব। তবুও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবই।" ঐ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন।

রাজনীতির পরিহাস, ১৯৭২ সালের ৬ই মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত **"বঙ্গবন্ধু"** উপাধিও প্রত্যাহার করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন, "সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।" তিনি বাড়িতে, অফিস-আদালতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলারও আহ্বান জানান।

১৯৭৩ সালের নির্বাচন

৭ই মার্চ ১৯৭৩, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক পাতানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক গণকন্ঠের প্রতিবেদনে সন্ত্রাস, গুন্ডামি, নির্যাতন, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, পোলিং এজেন্ট প্রহৃত, খুন প্রভৃতির খবর ছাপা হয়। ৮ই মার্চের দৈনিক সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কয়েকটি খবরের শিরোনাম ছিল :

“সিলেট-১ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স ছিনতাই”,
“পটুয়াখালীতে ব্যালট পেপার ছিনতাই”,
“চট্টগ্রামে ৩১টি ব্যালট পেপারসহ ২ব্যক্তি গ্রেফতার”,
“ধামরাইতে রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাস”,
“ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে”,
“নির্বাচন দারুন অবাধ হয়েছে”,
“একজন একাধিকবার অবাধে ভোট দিতে পেরেছে”,
“জাসদের দু’জন কর্মী হাইজ্যাক”,
“ঢাকার একটি কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও গুলি”,
“পটিয়ায় ভোট সন্ত্রাসী-মাস্তানরাই দিয়েছে”,
“কুমিল্লা শহরে ব্যাপক সন্ত্রাস”,
“নির্বাচন প্রহসনে পরিণত”,
“কালিগঞ্জে সন্ত্রাস”,
“রাজশাহী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস”,
“ভোট নাট্যের দু’’ দৃশ্য” প্রভৃতি।

৯ই মার্চ ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, “কমপক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসকদল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার, ভুয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ, বিদেশী সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারি গাড়ি ও রেডক্রসের গাড়ির অপব্যবহার প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের জোর পূর্বক পরাজিত করেছে।”

৯ই মার্চ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাসদ সভাপতি মেজর (অবঃ) জলিল বলেন, “**প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যেভাবে নির্বাচনের সময় প্রচলিত কোন ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন এতে আমি তাকে জাতির পিতা বলতে ঘৃনাবোধ করি।**”

তিনি আরো বলেন, “নির্বাচনের দিন গণভবনেই নির্বাচনী কন্ট্রোলরুম স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গননায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ বেতার টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনকভাবে দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দসই ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।” জাসদ সভাপতি আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের তাবেদার বলে অভিহিত করে তাদের নির্বাচনী বিজয়কে হিটলার, মুসোলিনী, চিয়াংকাই সেকের বিজয়ের সঙ্গে তুলনা করেন।

৯ই জুলাই প্রেসক্লাবে ভাসানী ন্যাপের তৎকালীন সহ-সভাপতি ডাঃ আলিম আল রাজি বলেন, “ক্ষমতাসীন সরকার এক দলীয় স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত নির্বাচনে ক্ষমতার প্রকাশ্য অপব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগ করে ভুয়া ভোটদান, বিপুল অর্থ ব্যায়, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে।” বিরোধী দলগুলো যাতে জনগণের কাছে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে না পারে সেজন্য ক্ষমতাসীন দল তাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, নীলবাহিনীর হাতে বিপুল অস্ত্র দিয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে ভোটাদানে বিরতই শুধু করেনি; হয়রানির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি সকল প্রচার মাধ্যম সরকারি দলের দলীয় স্বার্থে যদেচ্ছা ব্যবহারের উল্লেখ করে প্রচার মাধ্যমকে এক “ব্যাবিলিয়ন ক্যাপটিভ প্রেস” বলে অভিহিত করেন। জানুয়ারীতে প্রকাশ্যে রাজপথে দু’জন ছাত্র হত্যার কথা উল্লেখ করে ডাঃ রাজি বলেন, “ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন মুজিব সরকার যেভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, দু’শ বছরের ইতিহাসে তার নজির নেই।” তিনি হুশিঁয়ারীও উচ্চারণ করে বলেন, “বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত অন্ধকার।” নীল নকশার আওতায় সুপরিকল্পিত উপায়ে জনগণের সকল মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র ছিনিয়ে নেবার উক্ত প্রচেষ্টা পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সত্য হয়ে উঠে।

একতরফা পাতানো খেলার নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১টিতে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামের একটি কেন্দ্র থেকে প্রথমে ন্যাপের মোশতাক আহমদ চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও পরে তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। সবকয়টি বিরোধী দল এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। মোশতাক আহমদ চৌধুরী এই নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রীট আবেদন করেন। সম্পূর্ণ আইন বিভাগ তখন পুরোপুরিভাবে দলীয় স্বার্থের অনুগত বিধায় মোশতাক চৌধুরীর রীটের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সুবিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১০ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় লীগের প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান নির্বাচন প্রচারাভিযানের সময়, নির্বাচনের দিন ও ফলাফল ঘোষণার পর তার নির্বাচনী এলাকা ধামরাইতে সংগঠিত আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ নেতা কর্মী ও রক্ষীবাহিনীর সার্বিক সন্ত্রাসকে “দুঃস্বপ্নের কালোরাত্রি” বলে আখ্যায়িত করেন।

১১ই মার্চ যুবলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, “৭ই মার্চের নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, তারা রাজাকার, আল বদর, স্বাধীনতার শত্রু। এইসব বিদেশী চরদের মুজিববাদের নিড়ানী দিয়ে উৎখাত করা হবে।” পরদিন বায়তুল মোকাররমে শেখ ফজলুল হক মনি মুজিববাদ বিরোধীদের উৎখাত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনার কথা ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল ৩০ হাজারেরও বেশি লোককে। দেশপ্রেমিক বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, শ্রমিক নেতা, ছাত্রসমাজ, আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবর্গও এই শ্বেতসন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাননি। জাতীয় পরিসরে যেখানেই কেউ স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করেছেন অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে নতুবা তাকে হতে হয়েছে অকথ্য নির্যাতনের শিকার।

যারাই প্রতিবাদ করেছিল, মৃত্যু অথবা অমানুষিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল তাদের।

১৯৭৩ সালের মধ্যেই যারা স্বৈরাচার এবং আওয়ামী অপশাসনের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিল তাদের কে মৃত্যু কিংবা অকথ্য নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়।

১৯৭৩ সালে ঐ সময়ের উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক সাংবাদিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক ইত্তেফাকে বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে অসীম সাহসের পরিচয় দেন।

'আজ আর একচেঞ্জ অব হার্ট নয়, চাই চেক অব হার্ট' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেন, "মানুষের হৃদয়ের চার চেম্বারের মতই আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতির সকল ক্ষেত্রেই চারটি করিয়া চেম্বার আছে। প্রথমত: আমাদের সংবিধান দাড়াইয়া আছে চারটি স্বতন্ত্র মজবুত মূল নৈতিক খুঁটির উপর। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ (জাতীয়তা তন্ত্রই বেশি শুদ্ধ হইত) ও ধর্মনিরপেক্ষতা (এখানেও তন্ত্রযোগ করিলে ভাল হইত)। এই চারটি নৈতিক খুটিকে "স্বতন্ত্র" বলিলাম এই দন্ডে যে, সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, ওই চারটি খুঁটি এক ঘরের খুঁটি হইতে পারে না। খুঁটিগুলির উচ্চতা সমান নয় বলিয়াই তারা এক ঘরের খুঁটি হইতে পারে না। নীতি ও পন্থা হিসাবে এই চার বস্তুর মিল নাই একথাই বোধ করি সমালোচকরা বলিতে চান। তার মানে হৃদপিন্ডের চারটি চেম্বারের মধ্যে যেমন সহযোজক দরজা (কানেকটিং ভালব) আছে, আমাদের চার নীতির মধ্যে তেমন কোন কানেকটিং ভালব নাই। তারপর সংবিধানের বেলাতেও আমরা প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে টানিয়া বুনিয়া চারি চক্রে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং যথাসম্ভব সফলও হইয়াছি। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ ও জুডিশিয়ারী এই তিনটি ইন্সটিটিউশনকে 'নির্বাহী বিভাগ', 'আইন বিভাগ' ও 'বিচার বিভাগ' নামে সংবিধানে গুঞ্জায়েস করিয়াছি সত্য; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে যা অত্যাবশ্যক অথচ সংবিধানের কর্মবিভাগ বা দেশরক্ষা বিভাগে যার বিধান করা সম্ভব ছিল না; সেই রূপ একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করিয়া আমরা রাষ্ট্রকে চারটি শক্তি স্তম্ভের উপর দাড় করাইয়াছি। এই চারটি শক্তি স্তম্ভের সাথে পাঠকগণ চারটি মূলনীতি স্তম্ভের সাথে তালগোল পাকাইয়া ফেলিবেন না।"

তার ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধে শিল্পকারখানা সর্ম্পকে জনাব আবুল মনসুর আহমদ লেখেন, "হৃদয়ের চার চেম্বারের অনুকরণে আমরা শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, পার্টি জীবনে ও সামাজিক জীবনে চার-বর্ণের প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। অর্থনৈতিক জীবনেও উহার সম্প্রসারন করিয়াছি। 'মিনস অফ প্রডাকশন' অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাকে সংবিধানেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যথা: রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা। এই তিন শ্রেণীর মালিকানা ছাড়া আর সব সম্পত্তি যা প্রডাকটিভ নয়, সেগুলি অটোম্যেটিক্যালী ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া গোটা সম্পত্তি জগতকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হৃদয়ের চার চেম্বারের সামাঞ্জস্য বিধান করিয়াছি। যাতে মিল কারখানাদির 'মিনস্ অফ প্রডাকশনকে' হরতাল স্ট্রাইকারদের দ্বারা আনপ্রডাকটিভ করিয়া অন্য প্রকার মালিকানার সৃষ্টি করিতে কেউ না পারে এবং ঐ পন্থায় চার প্রকার মূলনীতিতে যাতে কেউ ব্যত্যয় ঘটাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আমরা হরতাল-স্ট্রাইককে ন্যাশনালাইজ করিয়া ফেলিয়াছি। সরকারি দল ছাড়া অপর সকলের হরতাল স্ট্রাইক নিষিদ্ধ করিয়াছি।"

প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক প্রশ্নে একই প্রবন্ধে জনাব আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "হৃদয়ের চার চেম্বারের প্রতি আমাদের এই সামগ্রিক ও সার্বজনীন আকর্ষণ দেখিয়া বিদেশী বন্ধুরা বিস্মিত

হইতে পারেন। কিন্তু তাদের সেই বিস্ময় সেই মুহূর্তেই কাটিয়া যাইবে যখন তারা জানতে পারিবেন যে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতার নেতৃত্ব কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়ের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের নেতা প্রেমিক; তিনি দেশবাসীকে ভালোবাসেন; দেশবাসী তাকে ভালোবাসে। এ দেশে নেতা আর জনতার মধ্যে ভালোবাসা-বাসি ছাড়া আর কোন বৈষয়িক স্বার্থের সম্পর্ক নাই। পুরোটাই হৃদয়ের ব্যাপার। তাই হৃদয়ের চার চেম্বারের সাথে মিল রাখিয়াই আমাদের সামগ্রিক জীবনকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। হৃদয়ের অনুকরণেই আমাদের রাষ্ট্রীয় আর্থিক জীবনকে উপরের তলা নীচের তলা এই দুই তলা বিশিষ্ট করিয়াছি। হৃদয়ের অনুকরণেই আমরা উভয় তলাতেই অর্থাৎ অবিকল ভেনট্রিকস উভয়টাতেই লেফট রাইট রাখিয়াছি। সাধারণত: নেতার ভালোবাসা-বাসির ব্যাপারই হৃদয়ের চার চেম্বারের প্রতি আমাদের আসক্ত করিয়াছে ঠিকই। কিন্তু চারের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আমাদের আরও কারণ আছে। আমাদের রাষ্ট্র সেক্যিউলার হইলেও আমরা নিজেরা আজও ধর্মবিরোধী হই নাই। ধর্মনিরপেক্ষ হইয়াছি মাত্র। আমাদের মধ্যে বিপুল মেজরিটি লোকই মুসলমান। আমরা মুসলমানেরা এখনও ধর্ম ছাড়ি নাই। তাই চারের মায়াও ছাড়িতে পারি নাই। আমাদের চার কিতাব, চার কলেমা, চার ফেরেশতা, চার মাযহাব, চার খলিফা, চার ইমাম এ অবস্থায় রাষ্ট্রের চার মূলনীতি, সমাজের চার মালিকানা নীতি, পলিটিকস এ চার পার্টি নীতি। এসবে আমাদের আকর্ষণ সহজাত। শুধু মুসলমানরা হইবে কেন? আমাদের দেশের হিন্দুদের ধর্মেও চারের প্রাধান্য রহিয়াছে। তাদের চার বেদ, চার বর্ন, চার যুগ এমনই চার যোগও আছে। এইভাবে আমরা চারের গোলকধাধাঁয় ঢুকিয়াছি। সরকারি দফতরে চার তাসের কর্মচারী বহাল হওয়ায় বাজারে আমরা চার কায়দায় ব্যবসা চালু করিয়াছি। কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও চোরাচালানী আমরা ছাড়তে পারি না এই চারের মায়াতেই।

হার্টের চার চেম্বারের সবচেয়ে বড় ত্রুটি দেখা দিয়াছে 'জাতির পিতা' ও তার সন্তানদের সর্ম্পকের মধ্যে। জাতির পিতা তার সন্তানদের ভালোবাসেন, সন্তানরাও পিতাকে ভালোবাসে। সবাই পিতাকে অন্তর দিয়া ভালোবাসে বলিয়াই তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিণামে খুন-খারাবী। জাতির পিতা খুন-খারাবী বন্ধ করিতে সন্তানদের প্রথমে অনুরোধ পরে নির্দেশ অবশেষে ধমক দিয়েছেন। কিন্তু সন্তানেরা পিতার কথা শুনিতেছে না। পিতা ও কঠোর হইয়া সন্তানদের শাস্তি দিতে পারিতেছেন না। এটা ঘটিতেছে হৃদয়ের জন্যই। বিশেষত: হৃদয়ের চারটি চেম্বারের দোষেই। জাতির পিতা সকলের কল্যাণের জন্য যতই চেঞ্জ অফ হার্টের কথা বলিতেছেন সন্তানেরা ততই স্টেনগানের সাহায্যে এক্সচেঞ্জ অফ হার্ট করিতেছে। এটা অধিক দিন চলিতে দিলে সকলেরই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে।" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর জনাব মনসুরের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল থেকে নানারকমের কটুক্তি শুরু হয়।

’৭১ এর চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, আওয়ামী কুশাসন এবং প্রতিরোধ

সংসদে সংবিধান গৃহিত হয়

১০ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয় ঐ সংসদের সব সাংসদরাই ছিলেন পাকিস্তানের সংবিধান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এলএফও-এর আওতায় নির্বাচিত।

মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সংবিধান গঠনের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, “বর্তমান সংসদ গঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালের LFO (Legal Frame Work) এর অধিনে সংগঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের LFO মোতাবেক নির্বাচিত জাতীয় সংসদের দায়িত্ব ছিল পাকিস-ানের সংবিধান প্রণয়ন করা। আওয়ামী লীগ দল হিসাবে ছয় দফার ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে ভোট গ্রহণ করেছিল। ছয় দফার দাবি ছিল পাকিস্তানের ভৌগলিক অখন্ডতা বজিয়ে রেখে প্রদেশ ভিত্তিক পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন কায়েম করা। অতএব স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন বৈধ অধিকার তাদের নেই। তিনি সর্বদলীয় জাতীয় কনভেনশন গঠন করে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানান। তিনি বলেন, জাতীয় কনভেনশনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিই থাকবে না তাতে বিভিন্ন সংগঠন যাদের সদস্যরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতিনিধিদেরও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এ ধরণের জাতীয় কনভেনশনের দ্বারা প্রণীত সংবিধান পরে গণভোটের মাধ্যমে গৃহিত হবে।”

আওয়াশী লীগ সরকার ঐ প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ১২ই অক্টোবরের সংসদ অধিবেশনে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন প্রণীত সংবিধান গৃহিত হয়। যদিও সংবিধানে সরাসরিভাবে মুজিববাদের উল্লেখ ছিল না তবুও মুজিববাদের মূলনীতির উপর তথা ভারতীয় সংবিধানের নীতিমালার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান বা শাসনতন্ত্র।

সরকার ঘোষণা করলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা হবে কিন্তু সংবিধানের ৪২নং ধারার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানা বজিয়ে রাখা হলো। ৩৫, ৩৭, ৩৯ নং ধারার মাধ্যমে অতি চতুরতার সাথে মানুষের মানবিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেয়া হলো। আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তিকে অতি নির্দয়ভাবে উৎপাটন করার জন্য সংবিধানে ৬৩(৩) ধারা সংযোজিত করে। ‘জননিরাপত্তার’ নামে আইয়ূব শাহীর বর্বরোচিত আচরণের মতই মুজিবের নেতৃত্বে বিনা বিচারে আটক এবং মিল কারখানায়, অফিস-আদালতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার বিধানও সংবিধানে রাখা হয়।

শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করে

সর্বশেষে শেখ মুজিব তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য গণতন্ত্রকে হত্যা করে জাতির উপর বাকশালী একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগের (বাকশাল) একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বীজ নিহিত ছিল ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ রক্ষীবাহিনী আদেশ জারি করার মধ্যে।

জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে বিনা ওয়ারেন্টে ধরপাকড় এবং তল্লাশীর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল ঐ আদেশের মাধ্যমে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির মুখে ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্ট জাষ্টিস আবু সাইদ চৌধুরীকে বিদায় নিতে হয়। ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৪ সংসদ অধিবেশন বসে। আব্দুল মালেক উকিলকে স্পীকার হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। ২৪শে জানুয়ারী ১৯৭৪ 'হ্যা' ভোটের মাধ্যমে জাতীয় রক্ষীবাহিনী আইন পাশ করা হয়।

১৩রা জানুয়ারী ১৯৭৫ সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। একই দিন বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং সংবিধানের কতিপয় ধারা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৬ই জানুয়ারী '৭৫ এক ঘোষণায় বলা হয় যে, সরকারি কর্মচারীরা সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের সদস্য হতে পারবে না। এছাড়া ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দেয়ালের সব পোষ্টার মুছে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর ২০শে জানুয়ারী বসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংগঠিত সেই কলঙ্কিত অধিবেশন। ২৫শে জানুয়ারী সংসদে কোন রকমের বির্তক ছাড়া গণতন্ত্রকে পুরোপুরি সমাহিত করে পাশ করানো হয় চতুর্থ সংশোধনী। মাত্র এক বেলার সেই অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন জনাব আব্দুল মালেক উকিল।

চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য হবেন তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করলেন কি করলেন না সে সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ঐ অধিবেশনে 'জরুরী ক্ষমতা বিল' কোন আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়ে যায়। ২৫শে জানুয়ারী দুপুর ১:১৫ মিনিটে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারিকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়, ''এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই আইন প্রবর্তনের ফলে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এমনিভাবে যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধিনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধিনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে যে ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কিংবা সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রধানমন্ত্রী ও আবশ্যক মনে করলে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে এবং কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারবেন তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন তাহলে ভোট দান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তার নির্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে

পারবেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংশোধিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। সংশোধনীতে কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।" জাতীয় দলের ঘোষণায় বলা হয়, "কোন ব্যক্তি জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ভিন্ন ধারার কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"

ঐ সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন। কেউ বিরোধিতা করেননি। সংসদের ২ঘন্টা ৫মিনিট স্থায়ী ঐ অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। বিলের বিরোধিতা করে তিনজন বিরোধী ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। এরা হলেন জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ময়নুদ্দিন আহমেদ ও স্বতন্ত্র সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আতাউর রহমান খান আগেই সংসদ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। বিলটি উত্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগের দলীয় চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ না দেবার আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার সুযোগ দানের জন্য স্পীকার জনাব মালেক উকিলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্পীকার তা নাকচ করে দেন। পরে কন্ঠভোটে চীফ হুইপের প্রস্তাব গৃহিত হয়। তারপর আইনমন্ত্রী মনরঞ্জন ধর সংসদে 'জরুরী ক্ষমতা বিল ১৯৭৫' পেশ করেন। চীফ হুইপ এ ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগ না করার আবেদন জানালে বিষয়টি কন্ঠভোটে পাশ হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রানিধানযোগ্য। যদিও বিলটি সংসদে বিনা বাধায় পাশ হয়; তবে গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কত্বের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যেও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭৫ রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান এক আদেশবলে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা 'বাকশাল' গঠন করেন এবং নিজেকে দলীয় চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। ঘোষণার ৩নং আদেশে বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি অন্য কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের দলীয় সকল সদস্য, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী সবাই 'বাংলাদেশ-কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের' সদস্য বলে গন্য হবেন।"

এ আদেশ অমান্য করে বাকশালে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বঙ্গবীর জনাব ওসমানী ও ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন তাদের সাংসদ পদে ইস্তফা দেন।

বাকশালীরা

বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এবং জনাব মঈনুল হোসেন যখন বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেন তখন সুযোগ সন্ধানীদের অনেকেই বাকশাল এ যোগদান করার জন্য লাইন দিয়েছিল।

বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ ও মোজাফফর ন্যাপ শেখ মুজিবের এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নকে অভিনন্দন জানান। তথাকথিত জাতীয় দল গঠিত হওয়ার ফলে দেশের সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ এবং মনি সিং এর কম্যুনিষ্ট পার্টি সামগ্রিকভাবে বাকশালে যোগদান করেন। সংসদের বিরোধী দলের ৮জন সদস্যের মধ্যে ৪জন বাকশালে যোগদান করেন। প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খানও বাকশালে যোগদান করে সুবিধাবাদী চরিত্র ও রাজনীতির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ২রা জুন '৭৫ বাকশালে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ৯জন সম্পাদক আবেদন পেশ করেন। তারা হলেন বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ওবায়েদুল হক, জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমান, মর্নিং নিউজের সম্পাদক জনাব শামছুল হুদা, বাসস এর প্রধান সম্পাদক জাওয়াদুল করিম, বাংলাদেশ টাইমস ও বাংলার বাণীর নির্বাহী সম্পাদক শহীদুল হক, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং বিপিআই সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান। ৬ই জুন '৭৫ বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামো ও গঠনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। তাতে দলের মহাসচিব মনোনীত হন মনসুর আলী। সচিব হন জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি, এবং আব্দুর রাজ্জাক। ঐ দিন বাকশালের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য হিসাবে ১১৫জনের নাম ঘোষণা করা হয়। তাতে উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনী প্রধানরা, বিডিআর এর মহাপরিচালক, রক্ষীবাহিনীর পরিচালক, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব প্রমুখকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

দলের কার্যনির্বাহী পরিষদে থাকেন: (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) মনসুর আলী (৪) খন্দোকার মোশতাক আহমেদ (৫) আবু হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (৬) আব্দুল মালেক উকিল (৭) অধ্যাপক ইফসুফ আলী (৮) মনরঞ্জন ধর (৯) মহিউদ্দিন আহমেদ (১০) গাজী গোলাম মোস্তফা (১১) জিল্লুর রহমান (১২) শেখ ফজলুল হক মনি (১৩) আব্দুর রাজ্জাক।

কেন্দ্রিয় কমিটিতে থাকেন: (১) শেখ মুজিবর রহমান (২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) মনসুর আলী (৪) আব্দুল মালেক উকিল (৫) খন্দোকার মোশতাক আহমেদ (৬) কামরুজ্জামান (৭) মাহমুদ উল্লাহ (৮) আব্দুস সামাদ আজাদ (৯) ইউসুফ আলী (১০) ফনিভূষণ মজুমদার (১১) ডঃ কামাল হোসেন (১২) সোহরাব হোসেন (১৩) আব্দুল মান্নান (১৪) আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (১৫) মনোরঞ্জন ধর (১৬) আব্দুল মতিন (১৭) আসাদুজ্জামান (১৮) কোরবান আলী (১৯) ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (২০) ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী (২১) তোফায়েল আহমেদ (২২) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (২৩) আব্দুল মোমেন তালুকদার (২৪) দেওয়ান ফরিদ গাজী (২৫) অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী (২৬) তাহের উদ্দিন ঠাকুর (২৭) মোসলেম উদ্দিন খান (২৮) মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (২৯) একেএম ওবায়দুর রহমান (৩০) ডঃ ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল (৩১) রিয়াজুদ্দিন আহমদ (৩২) এম বায়তুল্লাহ (৩৩) রুহুল কুদ্দুস সচিব (৩৪) জিল্লুর রহমান (৩৫) মহিউদ্দিন আহমদ এমপি (৩৬) শেখ ফজলুল হক মনি (৩৭) আব্দুর রাজ্জাক (৩৮) শেখ শহীদুল ইসলাম (৩৯) আনোয়ার চৌধুরী (৪০) সাজেদা চৌধুরী (৪১) তসলিমা আবেদ (৪২) আব্দুর রহিম (৪৩) ওবায়দুল আউয়াল (৪৪) লুৎফর রহমান (৪৫) একে মুজিবর রহমান (৪৬) ডঃ মফিজ চৌধুরী (৪৭) ডঃ আলাউদ্দিন (৪৮) ডঃ আহসানুল হক (৪৯)

রওশন আলী (৫০) আজিজুর রহমান আক্কাস (৫১) শেখ আবদুল আজিজ (৫২) সালাহউদ্দিন ইউসূফ (৫৩) মাইকেল সুশীল অধিকারি (৫৪) কাজী আব্দুল হাশেম (৫৫) মোল্লা জালাল উদ্দিন (৫৬) শামসুদ্দিন মোল্লা (৫৭) গৌর চন্দ্র বালা (৫৮) কাজী গোলাম মোস-ফা (৫৯) শামসুল হক (৬০) শামসুজ্জোহা (৬১) রফিকুদ্দিন ভূইয়া (৬২) সৈয়দ আহমদ (৬৩) শামসুর রহমান খান (৬৪) নূরুল হক (৬৫) এম এ ওহাব (৬৬) ক্যাপ্টেন সুজ্জাত আলী (৬৭) এম আর সিদ্দিক (৬৮) এমএ ওহাব (৬৯) চিত্তরঞ্জন সুতার (৭০) সৈয়দা রাজিয়া বানু (৭১) আতাউর রহমান খান (৭২) খন্দোকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (৭৩) সংগ্রু সাইন (৭৪) অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (৭৫) আতাউর রহমান (৭৬) পীর হাবিবুর রহমান (৭৭) সৈয়দ আলতাফ হোসেন (৭৮) মোহাম্মদ ফরহাদ (৭৯) মতিয়া চৌধুরী (৮০) হাজী দানেশ (৮১) তৌফিক ইমাম সচিব (৮২) নূরুল ইসলাম (৮৩) ফয়েজ উদ্দিন সচিব (৮৪) মাহবুবুর রহমান সচিব (৮৫) আব্দুল খালেক (৮৬) মুজিবুল হক সচিব (৮৭) আব্দুর রহিম সচিব (৮৮) মঈনুল ইসলাম সচিব (৮৯) সহিদুজ্জামান সচিব (৯০) আনিসুজ্জামান সচিব (৯১) ডঃ এ সাত্তার সচিব (৯২) এম এ সামাদ সচিব (৯৩) আবু তাহের সচিব (৯৪) আল হোসাইনী সচিব (৯৫) ডঃ তাজুল হোসেন সচিব (৯৬) মতিউর রহমান টিসিবি চেয়ারম্যান (৯৭) মেজর জেনারেল কেএম সফিউল্লাহ (৯৮) এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দোকার (৯৯) কমোডর এমএইচ খান (১০০) মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান (১০১) একে নজিরউদ্দিন (১০২) ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী (১০৩) ডঃ মাযহারুল ইসলাম (১০৪) ডঃ এনামুল হক (১০৫) এটিএম সৈয়দ হোসেন (১০৬) নূরুল ইসলাম আইজি পুলিশ (১০৭) ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম (১০৮) ডঃ নূরুল ইসলাম (পিজি হাসপাতাল) (১০৯) ওবায়দুল হক (সম্পাদক অবজারভার) (১১০) আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক) (১১১) মিজানুর রহমান (বিপিআই) (১১২) মনোয়ারুল ইসলাম (১১৩) ব্রিগেডিয়ার এএমএম নূরুজ্জামান (রক্ষীবাহিনী প্রধান) (১১৪) কামরুজ্জামান শিক্ষক সমিতি (১১৫) ডঃ মাজহার আলী কাদরী।

একই ঘোষণায় বাকশালের পাচঁটি অঙ্গ সংগঠনও গঠন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে:
জাতীয় কৃষকলীগ,
জাতীয় শ্রমিক লীগ,
জাতীয় মহিলা লীগ,
জাতীয় যুবলীগ ও
জাতীয় ছাত্রলীগ। এগুলোর সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে ফনিভূষণ মজুমদার, অধ্যাপক ইউসূফ আলী, সাজেদা চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ ও শেখ শহীদুল ইসলাম। এসমস্ত সংগঠনের কেন্দ্রিয় কমিটিগুলোতে মোজাফফর ন্যাপ ও মনি সিংএর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের গ্রহণ করা হয়। বাকশালের এ সূত্র ধরেই ১৬ই জুন 'সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ' জারি করা হয়। তার বলে পার্টি নিয়ন্ত্রণাধীন শুধুমাত্র চারটি দৈনিক ও কয়েকটি সাপ্তাহিক বাদে সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। গণতন্ত্রের হত্যাযজ্ঞ শেষে দেশ জুড়ে চলে তান্ডব উৎসব। রুদ্ধশ্বাস মানুষ জীবনের নিরাপত্তা হারিয়ে জন্মভূমিতেই বন্দী হয়ে পড়েন স্বৈরশাসনের নিষ্পেষনে।

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার সীমাহীন হয়ে পড়ে

শেখ মুজিব কর্তৃক বাকশাল কায়েম হবার পর রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার সব সীমা ছাড়িয়ে যায়।

জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে বিভিন্ন স্থানে। শহরবাসীরা ঐসব হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। ৮ই জুন মাইজদীতে জনতার সাথে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে। ৯ই জুন ঐ হামলা ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয়। এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক উস্কানি ছিল না। ঐ দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনার তদন্ত করার জন্য মাইজদী যেতে বাধ্য হন। তারপর ১০ই জুন '৭৩ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল ঘোষণা করেন, "মাইজদীর ঘটনার জন্য দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।" কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে খবর কোথাও ছাপা হয়নি। আজঅব্দি জানতে পারেননি এদেশের নির্যাতিত জনগণ সেখানে কি ঘটেছিল।

১০ই জুন বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির এক সভায় দলীয় প্রধান জনাব মনি সিং উচ্চকন্ঠে বলেন, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীনের নেতৃত্ব এবং তাদের দেশীয় সহযোগী ভাসানী ন্যাপ উগ্রপন্থী জাসদ, মুসলিম লীগ ও জামায়াতপন্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।" এরপর ১৯৭৩ সালের ১৯ই জুন ঢাকার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণায় নির্দেশ জারি করেন, "শহরে বিনা অনুমতিতে মাইক ব্যবহার করা যাবে না।" মাইক ব্যবহারের উপর এই নিষেধাজ্ঞা ছিল সুষ্পষ্টভাবে বিরোধী দলের জনসভার উপর। মোজাফফর ন্যাপ বা সিপিবি-এর কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং ২৪শে জুন মোজাফফর ন্যাপের সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, "তার দল বাস্তব অবস্থাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে সস্থা জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।" ঐ জনসভাতেও তিনি মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীকে সাম্রাজ্যবাদের চর বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে মজুতদারী, চোরাচালানী, দুর্নীতিতে ছেয়ে যায় দেশ। রক্ষীবাহিনীর হামলা ও হত্যা বাড়তে থাকে। ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুন পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে দেখা গেল যে, '৭২ সালের তুলনায় দ্রব্যমূল্য চারশ গুন বেড়েছে।

এই সময় ২৯শে জুন চট্টগ্রামে ঘটে এক চমকপ্রদ ঘটনা। চট্টগামের ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর বাসের উপর রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত হয় একজন কর্মচারী। গুরুতর আহত হয় দু'জন শ্রমিক। ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর একটি বাস কর্মচারীদের রিফাইনারীতে নিয়ে যাবার পথে রক্ষীবাহিনীর একটি ট্রাককে ওভারটেক করে। এ কারণে রক্ষীবাহিনীর ক্রুদ্ধ সদস্যরা একটি রেল ক্রসিংয়ের মুখে ঐ গাড়ি ঘেরাও করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এমনি সামান্য ছুতোঁতেই রক্ষীবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে স্বাধীন এ দেশের সাধারণ মানুষকে।

এই সময় দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক নির্মল সেন (অনিকেত) মার্চের নির্বাচনের ক'দিন পরে লিখেছিলেন, "আমি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই" শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ। লেখায় তিনি এক সপ্তাহের একটি ঠিকুজি তুলে ধরেন ১৩টি হত্যাকান্ডের। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন যে, এ খবর সব খবর নয়। সব খবর সংবাদপত্রে পৌঁছে না। সব খবর পৌঁছে না থানায়। দূর-দূরান্ত থেকে কে দেয় কার খবর? আর দিতে গেলে জীবনের যে ঝুঁকি আছে সে ঝুঁকি নিতেই বা কতজন রাজি? এই নির্বিচার হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে নির্মল সেন জানতে চেয়েছিলেন -

(১) ১৯৭২ সাল হতে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কয়টি হত্যাকান্ডের কিনারা হয়েছে?

(২) কয়জন হত্যাকারী গ্রেফতার হয়েছে?

(৩) ক'টি গাড়ি হাইজ্যাক হয়েছে? সে হাইজ্যাকার কারা? কি তাদের পরিচয়? কি তাদের ঠিকানা?

(৪) কারা গ্রেফতার হয়েছে?

(৫) পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, অভিযুক্তদের ধরা হলে ফোনের জন্য তাদের মুক্তি দিতে হয়। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য? এই ফোন কারা করে থাকেন?

তিনি বলেন, "খুঁজে দেখতে হবে এই হত্যাকারীরা কাদের প্রশ্রয়ে বেড়ে উঠছে। নইলে দিনের পর দিন হত্যা, রাহাজানীর খবর বের হয়? অথচ একটি অপরাধীরও শাস্তি হয় না। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে কি করে?" এ প্রশ্ন শুধু নির্মল সেনেরই ছিল না এ প্রশ্ন ছিল দেশের জনগণেরও। আওয়ামী লীগ সরকার এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব দিতে পারেনি।

চট্টগ্রামের রিফাইনারী কর্মচারীদের উপর গুলিবর্ষণের অকারণ হত্যার জন্য রক্ষীবাহিনীর কেউ সাজা পায়নি। উপরন্তু ১৯৭৩ সালের ২৭শে জুলাই প্রেসিডেন্টের অগণতান্ত্রিক ৫০নং ধারা অনুযায়ী রক্ষীবাহিনীকে দেয়া হল নতুন ক্ষমতা। তাতে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি লিডার ও তার উপরস্থ সকল অফিসারকে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া অপরাধ করেছে সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও তল্লাশীর ক্ষমতা দেয়া হয়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২১শে অক্টোবর অভিযোগ করে যে, রক্ষীবাহিনী তাদের রাজবাড়ি জেলা শাখার সম্পাদককে গ্রেফতার করে পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে। ২৪শে অক্টোবর তারা অভিযোগ করেন যে, বাগমারার জাসদ নেতাকে রক্ষীবাহিনী খুন করেছে। একই অভিযোগ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ঐক্যজোটের মোজাফফর ন্যাপ, ১৬ই অক্টোবর পাবনার ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকে রক্ষীবাহিনীর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করে জেলা ন্যাপ কমিটি একটি বিবৃতি দেন। ২রা নভেম্বর মোজাফফর ন্যাপের সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করেন যে, তার কর্মীদের উপর রক্ষীবাহিনীর হামলা, হত্যা, নির্যাতন চলছে। তিনি বলেন, "১লা নভেম্বর সুনামগঞ্জ মহকুমার ন্যাপ প্রধান বঙ্কু দাসকে রক্ষীবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পীরগাছার ন্যাপ কর্মীদের নির্বিচারে মারধর করা হয়েছে। ৩০শে অক্টোবর নাটোরে ন্যাপ কর্মীকে রক্ষীবাহিনী অপহরণ করেছে।" সেই সঙ্গে পংকজ ভট্টাচার্য্য অনুনয় করেন যে, এদের উপর হামলা হলে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে।

'৭৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মালেক উকিল জানান, "গ্রামরক্ষী দল গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে শর্টগান দেয়া হবে। কাজের মেয়াদ শেষ হলে এসব অস্ত্র থানায় জমা দেয়া হবে।" তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেন, "এ ব্যাপারে মহকুমা হাকিমের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং এম পির সাথে আলোচনা করে গ্রামরক্ষী দল গঠনের জন্য ওসির প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

এরপর ২৯শে নভেম্বর সরকারের অস্ত্র সংক্রান্ত এক ঘোষণায় বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মন্ত্রীগণ, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা লাইসেন্স ছাড়াই নিষিদ্ধ (প্রোহিবেটেড বোরের) অস্ত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন।" এর বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াও এই সিদ্ধান্ত থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটেছিল।

'৭৩ সালের প্রারম্ভ থেকেই গ্রামে গ্রামে চলে রক্ষীবাহিনীর বর্বর, নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অভিযান। মুজিব আমলের স্বৈরাচার ও বিরোধী নির্যাতনের একটি দলিল আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্ট নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী শ্রীমতি অরুণা সেনের বিবৃতি। অরুনা সেন, রানী সিংহ ও হনুফা বেগমকে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রাম থেকে রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেনি। তাদেরকে কোন আদালতেও হাজির করেননি। ঢাকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয় এবং পরে সুপ্রীম কোর্টে তাদের পক্ষে রীট আবেদন করার পর কোর্টের নির্দেশে তাদেরকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার শুনানির সময় সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণযোগ্য অভিযোগ আনতে অক্ষম হওয়ায় সুপ্রীম কোর্ট অবিলম্বে তাদের তিনজনকেই বিনা শর্তে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন। অরুণা

সেন ও অন্যান্যদের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ ও ব্যারিষ্টার জমিরুদ্দিন সরকার।

মুক্তি পাবার পর আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যায়-নির্যাতনের স্বরুপ প্রকাশের জন্য শ্রীমতি অরুণা সেনের সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "গত ১৭ই আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের ওপর হামলা করে। ঐদিন ছিল দূর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরে আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে ধরে বেদম মারপিট করে। লক্ষণ নামের একটি কলেজের ছাত্র ও আমাকে ধরে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন ও পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? বলে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ি ফেরে, দেখি বেদম মারের ফলে সে গুরুতররূপে আহত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চার/পাঁচ দিন পর আবার তারা আমাদের গ্রামের উপর হামলা চালায়। অনেক বাড়ি তল্লাশী করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামের দু'জন যুবককে তারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গিয়ে তাদের খোঁজ করলে বলে দেওয়া হয় তারা সেখানে নেই। তাদেরকে খুন করে গুম করে ফেলা হয়েছে বলেই মনে হয়। এরপর মাঝে মাঝেই তারা গ্রামে এসে যুবক ছেলেদের খোঁজ করত।
গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ রাতে রক্ষীবাহিনী এসে সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম, গ্রামের উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ সক্ষম দেহী পুরুষ এমনকি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ সবকিছুর তদারকি করছে। আমার সামনে রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট শুরু করে। শুনলাম এদের ধরতে গিয়ে বাড়ির মেয়ে-ছেলেদেরও তারা মারধর করে এবং অনেকক্ষেত্রে অশালীন আচরণ করেছে। এরপর আমাকে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার হুকুম করল পানিতে নেমে দাড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে গুলি করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। ওরা রাইফেল উচিঁয়ে তাক করল গুলি করবে বলে। কিন্তু পরষ্পর কী সব বলাবলি করে রাইফেল নামিয়ে নিল। আমি কাদাঁ-পানিতে দাড়িয়েই থাকলাম। কমান্ডার গ্রেফতার করা সবাইকে হিন্দু মুসলমান দুই কাতারে ভাগ করে দাড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বলল, 'মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারের মত মাফ করে দেয়া হল।' এই বলে কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফা নামের দু'জন মুসলমান যুবককে রেখে বাকি সবাইকে এক একটা বেতের বাড়ি দিয়ে বলল, 'ছুটে পালাও'। তারা ছুটে পালিয়ে গেল। আমার পাক বাহিনীর কথা মনে পড়ল। তারাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে এমনিভাবে সাম্প্রদায়ীকতার আশ্রয় নিয়েছিল। পার্থক্য শুধু তারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়ীকতার আশ্রয় নিত আর এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধব্জাধারীরা ভন্ডামীর আশ্রয় নিচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফাসহ ২০জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। তিনজন ছাড়া এরা সবাই পেশায় জেলে। মাছ ধরে কোনরকমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সব আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে থাকল। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য! সন্ধ্যার সময় কলিমুদ্দিন, মোস্তাফা, গোবিন্দনাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকি সবাই গ্রামে ফিরে এল। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম তারা সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে তাদের। বেত ও বন্দুকের দাগ শরীর কেটে বসে গেছে। চোখ-মুখ ফোলা। হাতপায়ের গিরোতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম, সারাদিন দফায় দফায় তাদের চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি বেধে পানিতে বার বার ছুড়ে ফেলে ডুবিয়েছে। পিঠের নিচে ও বুকের উপর পা দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন লোক তাদের উপর উঠে দাড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের অনেককেই আত্মীয়রা বয়ে এনেছে। এদের অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও একবেলা পেটপুরে খেতে পায়না, অনাহার, দুঃখ-দারিদ্রের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত তাদের 'মরার উপর খাড়ার ঘাঁ'র অবসান কবে হবে? যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না, চুরি, ডাকাতি,

রাহাজানী, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না, তারা কোন অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের উপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন? অবশেষে চরম নির্যাতন আমার উপরও নেমে এল। ৬ই ফেব্রুয়ারীর রাতে ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী ঘুম থেকে আমাকে তুলল। আমাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে এলে দেখলাম রানীও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। রাস্তায় তারা রানীর প্রতি নানারকমের অশ্লীল উক্তি করেছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম সেখানে কলিমুদ্দিন, মোস্তাফা, গোবিন্দনাগ এবং হরিপদও রয়েছে। বুঝতে পারলাম তাদের উপর চরম দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। বিশেষ করে কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফাকেই বেশি অসুস্থ দেখলাম। কলিমুদ্দিন ও মোস্তাফা দুই ভাই। এদের সংসারে আর কোন সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমিতে চাষ করে ওরা কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা বিবাহিত ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জনক। আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাড়াল। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়। এমন সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় আমাকে উপরে দোতালায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম রানীর হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধঘন্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। নিঃস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছিল বেতের সপাং সপাং শব্দ আর পাশবিক গর্জন। রানীকে যখন এনে তারা কামরার মধ্যে ফেলল, রাত্রি তখন কত জানিনা। রানীর অচৈতন্য দেহ তখন বেতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। রক্ত ঝড়ছে। জ্ঞান ফিরলে রানী পানি চাইলো, আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রানী আস্তে আস্তে কথা বলতে পারল। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রানীর মুখে শুনলাম উপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং ঐ দুই স্থানের ক্যাম্প কমান্ডাররা উপস্থিত ছিল। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চলকে ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রানী কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে যা কোন সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও গালি বর্ষণের পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার বেত নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি এমন পেটাতে থাকে যে তিনখানা বেত ভেঙ্গে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে, শান্তি ও চঞ্চল কোথায়? রানীর একই উত্তর। ক্ষীপ্ত হয়ে রানীকে তারা সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমান্ডার এবার একই সাথে চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করে। মারার সময় অসহ্য যন্ত্রণায় রানী বলেছিল, 'আমাকে এভাবে না মেরে গুলি করে মেরে ফেলুন।' জবাবে একজন বলে, 'সরকারের একটা গুলির দাম আছে। তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলব। এখন পর্যন্ত মারার দেখেছোটা কি?' অল্পক্ষণ পরেই রানী অচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের চাবুক চালানো বন্ধ হয়নি। যখন জ্ঞান ফেরে রানী দেখে সে মেঝেতে পরে আছে। পানি চাইলে তারা তাকে পানি দেয় নাই। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রথমে আমাকে ও পরে রানীকে দোতালায় নেয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী ফজলু মিঞা ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারী হোসেন খাঁ। তারা চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে বলল, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। আমি বললাম, তারা ডাকাত নয়। তারা সৎ দেশপ্রেমিক, আমার স্বামী রাজনীতি করেন এ কথা কে না জানে। দেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় তিনি। রানীকে তারা একই প্রশ্ন করেন। রানী কিছুই জানে না বলায় তারা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমান্ডার করম আলী এবং ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার ফজলুর রহমান আমাদের অশ্লীল গালাগাল দিতে শুরু করে এবং আমাকে ও রানীকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রানীর বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর আমাদের দু'জনকে দু'দিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান হলে দেখি দু'জনেই মেঝেতে পরে আছি। রানীর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবুও এই রুগ্ন বৃদ্ধ দেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যাথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। এদের হুকুমে দু'জন সিপাই আমাকে টেনে তুলল। আমি অতিকষ্টে দাড়াতে পারলাম। রানী পারল না। দু'জন রক্ষী তার দুই বগলের নিচে হাত

দিয়ে তাকে টেনে তুলল ও তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল। তারপর টানতে টানতে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। কমান্ডার পেছন থেকে নির্দেশ দেয় ওকে ভালো করে হাটা নয়তো মরে যাবে। সকালে কমান্ডার কয়জন রক্ষীসহ রানীকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হল। বলল, 'বাচঁবিতো না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি।' রানীর সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে হেচঁড়াতে হেচঁড়াতে দু'মাইল পথ টেনে নিয়ে যাওয়া হল। রানীর মা রানীকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। কমান্ডার রানীকে তার মার মাথায় পানি দিতে বলে। রানীর মার জ্ঞান এলে রানীর চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমান্ডার বলে পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। রানীকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানালে কমান্ডার বলে 'খাসী খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।' এরপর আবার দু'মাইল রাস্তা হেচঁড়াতে হেচঁড়াতে তাকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হল। ঐ দিন ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এল ঐদিন। করিম নামের আর একটি কৃষক যুবককেও ওরা ধরে এনেছে দেখলাম রামভদ্রপুর থেকে। তাকে এত মারা হয়েছে যে তার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পন্ডিতসার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও দু'জন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামের একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাইরা বলাবলি করছিল। একজন জল্লাদ গর্জন করে বলছিল, 'দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে!' শুনেছি মতি নামের আর একটি যুবককেও তারা পিটিয়ে মেরেছে। আর আমাদের ধরে আনার দু'দিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত-পা বেধে দোতালার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে। ৯ তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রানী ও আমাকে নিয়ে গেল পুকুরের ধারে। সেখানে আমাদের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্য পানিতে নামাল। প্রথমে ওরা আমাদের সাতঁরাতে বাধ্য করল। আমরা ক্লান্ত হয়ে কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা যখন আর সাতঁরাতে পারছিলাম না, তখন আমাদের পানিতে ডুবিয়ে দেহের উপর দু'পা দিয়ে দাড়িয়ে থাকত।

এভাবে আমাদের তিন দফা পেটানো ও চুবানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আর একটি অল্প বয়সী যুবককে চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার উপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মোছানোর সময় হঠাৎ ছেলেটি চোখ খুলে তাকায়। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি ছেলেটাকে নাকি মেরে ফেলেছে। সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করল। দারুন শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচন্ড জ্বর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের উপর পরে থাকলাম। পরদিন রাতে রানীকে আবার নিয়ে গেল দোতালায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারল। ১১ তারিখে আবার রানীর ওপর চলল একই অত্যাচার। রানী জ্ঞান হারাল। রক্ষী সিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম 'রানী মরে গিয়েছে'। রানীর কাছে শুনলাম তার যখন জ্ঞান হল তখন সে দেখে তার পাশে ডাক্তার বসা। রানী জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে,আমি কোথায়?' ডাক্তার জবাব দেয়, 'আমি ডাক্তার, তুমি কথা বলো না।' কিছুক্ষণ পর ডাক্তার চলে গেলে রানীকে তারা ধরাধরি করে নিচে আমাদের কাছে নিয়ে এল।

একজন সিপাই রানী ও হনুফাকে বলল, 'তোরাতো মরেই যাবি। তার আগে আমরা প্রতি রাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করব। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই, বলেছিল অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দু'জন রক্ষী সিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দেয় এবং রানী ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধস্তাধস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমান্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, 'খবরদার এ কথা প্রকাশ করবি না। তাহলে মেরে ফেলব।'

রক্ষী সিপাইদের কারও কারও মাঝে মানবতাবোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তাদেরই একজন সিপাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ?' প্রশ্ন শুনে সে চমকে উঠল। বলল, 'বাংলাদেশে লেখাপড়া দিয়ে কি করব? আমরা জল্লাদ, জল্লাদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি?' এই বলে সে দে ছুট। মনে হয় যেন চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাল। রক্ষী সিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে আর হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে আর রানী ও অন্যান্য পুরুষ বন্দীকে মেরে ফেলা হবে। ১২ই ফেব্রুয়ারী আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওনা দিল। আমরা রানীকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রানীও আমাদের সাথে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিল। কমান্ডারের কাছে অনুনয়-বিনয় করছিল। কমান্ডার তার সহকর্মীদের সাথে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখল। ১২তারিখ রাতেও ওরা আবার রানীকে ঝুলিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রানীকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে। জোর করে চেপে ধরে রাখে নাক-মুখ-চোখ। এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা তাকে ছেড়ে দেয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়েই রওনা দিল প্রায় চার মাইল দূরে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের দিকে। কলিমুদ্দিন, মোস্তাফা, গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেল। রক্ষীরা বলাবলি করছিল তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছুদূর এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলির আওয়াজ পেলাম। ভাবলাম ওদের বুজি মেরে ফেলল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিল যে, হাটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাটতে। বোধ হয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। বোধ হয় বেঁচে যাব। এ চিন্তাই আমাদের হাটতে শক্তি যোগাচ্ছিল। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পীডবোট করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সর্বক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মুর্দার মত ঢেকে রাখা হল। বেদনা জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত শরীর। তার উপর কম্বল চাপা থাকায় শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেন জ্যান্ত কবর! সমস্ত দিন আমাদের ওভাবেই রাখল। খেতে দিল না। শেষরাতে আবার কম্বল চাপা দিয়ে জিপে করে ঢাকার দিকে রওনা দিল। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা। ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। সে আমাদের খুব ধমকাল। সেখান থেকে নিয়ে গেল তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠাল সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার পর আমাদের নিয়ে এল তেজগাঁ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মত রাখা হত। দিনরাত সেলে বন্দী। একই আহার্য দেয়া হত। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরোও বন্দিনী আছেন। তার মধ্যে ১৭ই মার্চে গ্রেফতারকৃত জাসদ নেত্রী মোমতাজ বেগম আছেন। অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত পারভীন। আরও একজন আছেন নাম রুমা। সবাইকেই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী করে রাখা হয়েছে। সাধারণ কয়েদীদের মত খাটানো হচ্ছে। এর উপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামা-কাপড় সেলাই, কাথাঁ সেলাই, কাপড়-চোপড় ধোয়ানো সবকিছুই মেয়ে কয়েদীদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দীরাও রেহাই পাচ্ছেন না।''

এমনই হাজার হাজার করুণ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে বাংলাদেশে। যার সবগুলো গুমড়ে মরেছে নির্বিচারে, প্রকাশিত হতে পারেনি। রক্ষীবাহিনীর বর্বরতার আর একটি চিত্র তুলে ধরা যাক। ঘটনাটি ঘটেছিল পাবনার বাজিতপুরের কোরাটিয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল আলীর ছেলে রশীদকে খুন করার কাহিনী।

আবদুল আলীর সাক্ষাৎকারটা ছিল নিম্নরূপ :-
''আমার সামনে ছেলেকে গুলি করে হত্যা করল। আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল, 'মাথা কেটে দে, ফুটবল খেলবো।' আমি কি তা পারি! আমি যে বাপ। কিন্তু অকথ্য নির্যাতন কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিয়েছি। রশীদ নাকি রাজনীতি করত আমি জানতাম না। একদিন মাতু আর শাহজাহান এসে ধরে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ অফিসে সারারাত ওরা ওকে বেদম মার মারল। সকালে বলল

এক হাজার টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। রশীদ স্বীকার করে এল এক হাজার টাকা দেবার। আমার কাছে টাকা চাইল। কিন্তু আমি দিন আনি দিন খাই, মজুর মানুষ। হঠাৎ তিন দিনের মধ্যে এক হাজার টাকা কোত্থেকে দেব? বললাম, তুই বরং পালিয়ে সিলেট চলে যা। রশীদ সিলেট চলে গেল। কিন্তু ১০-১২ দিন পর ফিরে এসে বলল, 'বাবা মন মানেনা তোমাদের ফেলে থাকতে।' সিলেট থেকে ফেরার পরই কঠিন অসুখে পড়ল। টাইফয়েড। অসুখ সারার পর একদিন তার মাকে বলল, 'মা আজ ভাত খাব।' তার মা শৈলমাছ দিয়ে তরকারী রানল। এমন সময় আওয়ামী লীগের পান্ডারা রক্ষীবাহিনীসহ বাড়ি ঘেরাও করল। অসুস্থ মানুষ। কোন রকমে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড় দিল। বাবা আমার জানত না সেখানেও ঘাপটি মেরে বসে আছে আজরাইল। পাষন্ডরা দৌড়ে এসে ধরল তাকে। রশীদ সিরাজের পা ধরে বলল, 'সিরাজ ভাই, বিমারী মানুষ আমায় ছেড়ে দেন।' ছাড়ল না। তারপর বাপ-বেটা দু'জনকেই বেধে মার শুরু করল। কত হাতে পায়ে ধরলাম। এরপর মাতু গুলি করল রশীদকে। ঢলে পড়ল রশীদ। আমি নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। মরার পর একজন বলল, 'চল ওর কল্লাটা নিয়ে যাই ফুটবল খেলব।' মাতু বলল, 'হ্যাঁ। তাই নেব। তবে ওর কল্লা আমরা কাটব না। তার বাবা কেটে দেবে।' বলেই আমার হাতে কুঠার দিয়ে বলল কেটে দিতে। আমার মুখে রা নেই। বলে কি পাষন্ডগুলো? চুপ করে আছি দেখে বেদম পেটাতে শুরু করল। বুড়ো মানুষ কতক্ষণ আর সহ্য হয়। সিরাজ এসে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বলল, 'এক্ষুনি কাট, নইলে তোকেও গুলি করব।' ইতিমধ্যে দেড় ঘন্টার মত সময় পার হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না কাটলে ওরা সত্যি আমাকেও মেরে ফেলবে কিনা? শেষে কুঠার দিয়ে কেটে দিলাম মাথা। নিয়ে সউল্লাসে চলে গেল তারা। আল্লায় কি সহ্য করব?"

সিরাজ সিকদার হত্যা মামলায় রাজ্জাক,তোফায়েল এবং নাসিমসহ ৭জন অভিযুক্ত

শেখ মুজিবের হুকুমে সর্বহারা পার্টির প্রধান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ সিকদারকে অকথ্য নির্যাতনের পর বন্দী অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যা প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামে ৫ই জুন ১৯৯২ সালে যে প্রতিবেদন ছাপা হয় তা থেকে শুধু তার হত্যা সম্পর্কেই অনেক কিছু জানা যাবে তাই নয়; শেখ মুজিব সরকারের অধিনে তৎকালীন সার্বিক অবস্থা এবং সেই প্রেক্ষাপটে সর্বহারা পার্টির কার্যক্রম সম্পর্কে ও অনেক তথ্য জানা যাবে।

রাজ্জাক, তোফায়েল, নাসিমসহ ৭জন আসামী। সিরাজ সিকদার হত্যা মামলা দায়ের।

স্টাফ রিপোর্টার: - পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে হত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল ও মোহাম্মদ নাসিমসহ ৭জনকে আসামী করে গতকাল বৃহঃস্পতিবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের (সিএমএম) আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সিরাজ সিকদার পরিষদের সভাপতি শেখ মহিউদ্দিন আহমদ বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামীরা হলেন: (১) সাবেক পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (২) আব্দুর রাজ্জাক এমপি (৩) তোফায়েল আহমদ এমপি (৪) সাবেক আইজি পুলিশ ইএ চৌধুরী (৫) সাবেক রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক বর্তমানে সুইডেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্নেল (অবঃ) নূরুজ্জামান (৭) মোহাম্মদ নাসিম এমপি গং।

আসামীদের বিরুদ্ধে ৩০২ ও ১০৯ নং ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার আর্জিতে বলা হয়, বিশিষ্ট প্রকৌশলী নিহত সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন আজাদী পাগল মুক্ত বিবেকের অধিকারী ও স্বাধীনচেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তার জীবদ্দশায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রথমে শ্রমিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পরবর্তীতে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে কাজ করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তৎকালীন সরকার প্রধান মরহুম শেখ মুজিবর রহমান ঈর্ষান্বিত হয়ে জনসমর্থন হারানোর কারণে, ক্ষমতাচ্যুত্যির ভয়ে ভীত হয়ে সর্বহারা পার্টির কর্মীদের ওপর দমন নীতি চালাতে থাকেন। এমনকি পার্টি প্রধান সিরাজ সিকদারকে হত্যার জন্য বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

আর্জিতে বলা হয় আসামীরা মরহুম শেখ মুজিবের সহচর ও অধিনস্থ কর্মী থেকে শেখ মুজিবের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও গোপন শলা-পরামর্শে অংশগ্রহণ করতেন এবং ১নং থেকে ৬নং আসামী তৎকালীন সময়ে সরকারের উচ্চপদে থেকে অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের সাথে শেখ মুজিবের সিরাজ সিকদার হত্যার নীল নকশায় অংশগ্রহণ করেন। তারা এ লক্ষ্যে সর্বহারা পার্টির বিভিন্ন কর্মীকে হত্যা, গুম, গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানি করতে থাকেন। সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার ও হত্যার বিবরণ দিয়ে আর্জিতে বলা হয়, মরহুম শেখ মুজিব ও উল্লেখিত আসামীরা তাদের অন্য সহযোগীদের সাহচর্যে সর্বহারা পার্টির মধ্যে সরকারের চর নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে ইএ চৌধুরীর একজন নিকট আত্মীয়কেও চর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এভাবে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে অন্য একজনসহ সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করে ঐদিনই বিমানে করে ঢাকায় আনা হয়। ঢাকার পুরাতন বিমান বন্দরে নামিয়ে বিশেষ গাড়িতে করে বন্দীদের পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মালিবাগস্থ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সিরাজ সিকদারকে আলাদা করে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ২রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডের অনুগত সদস্যরা বঙ্গভবনে মরহুম শেখ মুজিবের কাছে সিরাজ সিকদারকে হাত ও চোখ বাধাঁ অবস্থায় নিয়ে যায়। সেখানে শেখ মুজিবের সাথে তার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলীসহ আসামীরা, শেখ মুজিবের পুত্র মরহুম শেখ কামাল এবং ভাগ্নে মরহুম শেখ মনি উপস্থিত ছিলেন।

আর্জিতে আরো বলা হয়, প্রথম দর্শনেই শেখ মুজিব সিরাজ সিকদারকে গালিগালাজ শুরু করেন। সিরাজ এর প্রতিবাদ করলে শেখ মুজিবসহ উপস্থিত সকলে তার উপর ঝাপিঁয়ে পড়েন। সিরাজ সে অবস্থায়ও শেখ মুজিবের পুত্র কর্তৃক সাধিত ব্যাংক ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপকর্ম, ভারতীয় সেবাদাসত্ব না করার, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শেখ মুজিবের কাছে দাবি জানালে শেখ মুজিব আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সে সময় ১নং আসামী মাহবুব উদ্দিন তার রিভলবারের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে সিরাজ সিকদার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শেখ কামাল রাগের মাথায় গুলি করলে সিরাজ সিকদারের হাতে লাগে। ঐ সময় সকল আসামী শেখ মুজিবের উপস্থিতিতেই তার উপর ঝাপিঁয়ে পড়ে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর শেখ মুজিব, মনসুর আলী এবং দুই থেকে সাত নং আসামী সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১নং আসামীকে নির্দেশ দেন। ১নং আসামী মাহবুব উদ্দিন আহমদ আসামীদের সাথে বন্দী সিরাজ সিকদারকে শের-এ-বাংলা নগর রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে নিয়ে যায়। এরপর তার উপর আরো নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে ২রা জানুয়ারী আসামীদের উপস্থিতিতে রাত ১১টার দিকে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরেই সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে ১নং আসামীর সাথে বিশেষ স্কোয়াডের সদস্যগণ পূর্ব পরিকল্পনা মত বন্দী অবস্থায় নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ সাভারের তালবাগ এলাকা হয়ে সাভার থানায় নিয়ে যায় এবং সাভার থানা পুলিশ পরের দিন ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করে। কিন্তু সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করায় পুলিশ এনকাউন্টারে সিরাজ সিকদার নিহত হন। আর্জিতে উল্লেখ করা হয় যে, সিরাজ সিকদারকে হত্যার পর তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় সংসদে ভাষণ দেয়ার সময় 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?' এই দম্ভোক্তি উচ্চারণের মাধ্যমে তার জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বিলম্বে মামলা দায়ের করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, ঘটনার সাথে সাথে সিরাজের পিতা মরহুম আব্দুর রাজ্জাক মামলা দায়ের করতে যান। কিন্তু তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসন ও রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসের ভয়ে পুলিশ মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। শাসকদের সন্ত্রাসের মুখে মোকদ্দমা দায়ের করা যায়নি। দেশে অস্থির অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রী পরিবেশের কারণে আইন-শৃঙ্খলার অস্বাভাবিক অবনতি, ক্ষমতায় থাকা একনায়কত্ব ফ্যাসিবাদী দলের ক্ষমতার দাপটে ভয়ভীতি ও সন্ত্রস-তায় দীর্ঘ ১৭বছর এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতার বিচার নীরবে কেঁদে ফিরেছে। ঐ অবস্থায় মরহুমের পরিবার ও সহকর্মীদের পক্ষ থেকে এজাহার ও মামলা দায়েরের ক্ষুদ্রতম সাহসও কারো ছিল না এবং এখনও নেই। বাদী নিজে সিরাজ সিকদারের আদর্শের এক তরুণ, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই আর্জি পেশ করছে।"

এ আর্জির প্রেক্ষিতে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম দরখাস্তখানা তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ জারি করেন। বাদী পক্ষে মামলা পেশ করেন এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান। তাকে সহায়তা করেন জনাব মোঃ আফজাল হোসেইন। এভাবে চরম নিষ্ঠুরতায় পার্টি নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার পর অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে এবং সরকারি নিষ্পেষণে সর্বহারা পার্টির সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। জাতীয় পরিসরে পার্টির প্রভাব ও কর্মকান্ড এবং শক্তি ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। নেতৃত্বের দুর্বলতায় কর্মীরা উদ্দামহীন হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ফলে জনগণও হতাশ হয়ে সন্দিহান হয়ে উঠে সর্বহারা পার্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে। এভাবেই সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সাথে সাথে হঠাৎ করে জেগে উঠা গণমানুষের মুক্তির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় স্বৈরশাসনের আগ্রাসী জিঘাংসায়।

শেখ কামাল প্রধানমন্ত্রীর জেষ্ঠ পুত্র ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা করে

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় অবস্থা। সেই সময় ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয় শেখ কামাল।

১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। দেশে বিশৃংখলা সরকারের হাতের বাইরে চলে যায়। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত লোকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কিচ্ছা-কাহিনী তখন প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছিল। জনগণ খোলা দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরোধিতা করছিল। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্দ্ধগতি দৈনন্দিন জীবন সামগ্রী সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে গিয়ে দাড়িয়েছিল। জীবনধারণের নুন্যতম প্রয়োজন মেটাতে জনগণের তখন নাভিশ্বাস অবস্থা। এই অবস্থায় সরকার ৬৩ কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়লো। এতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেল। ঐ নৈরাজ্যিক সময়ে এক লোমহর্ষক ব্যাংক ডাকাতি সংঘঠিত হয় রাজধানী ঢাকায়। প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ ধাওয়া করে ডাকাতদের। ধাওয়াকালে দু'পক্ষেই গুলি বিনিময় হয়। ৬ জন ডাকাত ধরা পড়ে। এই ৬ জনের একজন ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের জেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল। শেখ কামালসহ কয়েকজন দুস্কৃতিকারী আহত হয় পুলিশের গুলিতে। কিন্তু পুলিশের বিবৃতিতে পরে বলা হয়, ''দুস্কৃতিকারীদের ধাওয়াকালে দুর্ঘটনাক্রমে শেখ কামাল ও তার সঙ্গীরা পুলিশের গুলিতে আহত হয়।''

মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনী সাহায্য প্রদান কমিটি' গঠন করা হয়

'মানুষের জীবন যখন প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল, জীবনের নিরাপত্তা হয়ে উঠেছিল অনিশ্চিত ঠিক তখনই কিছু বিবেকবান নাগরিক মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনী সাহায্য প্রদান কমিটি গঠন করেন।

এ সময় ৩১শে মার্চ ১৯৭৪, জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সভায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ আহমদ শরীফ। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কবি সিকান্দার আবু জাফর। এ ছাড়া মীর্জা গোলাম হাফিজকে আইন পর্যালোচনা সাব কমিটির, ডঃ আহমদ শরীফকে প্রকাশনা সাব কমিটির, বিনোদ দাশগুপ্তকে তথ্য অনুসন্ধান সাব কমিটির চেয়ারম্যান, এনায়েতউল্লাহ খানকে কোষাধ্যক্ষ, মওদুদ আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক ও সৈয়দ জাফরকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির ঐ সভায় জনগণের মৌলিক অধিকার ও তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ প্রস্তাবও গৃহিত হয়। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল :-

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'গণতন্ত্র' রাষ্ট্রের একটি নিয়ামক নীতি হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। ৩১, ৩২ এবং ৩৩ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শাসনতন্ত্র মোতাবেক জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে এবং প্রত্যেক নাগরিকই নিজেকে গ্রেফতার ও আটকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইনের সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার ভোগ করবেন।

(২) কিন্তু এরূপ সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা সত্ত্বেও উপরোক্ত শাসনতান্ত্রিক ওয়াদা এবং নাগরিক অধিকার খেলাপ করা হচ্ছে বলে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। এসব খবরে জানা যায় যে, কোন আদালতে হাজির না করেই অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করে আটক রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং যে সব সংস্থার নাগরিকদের অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা তাদের হাতেই অনেক লোক শারীরিকভাবে গুম হয়ে যাচ্ছে।

(৩) কাজেই যেসব দায়িত্বশীল নাগরিক আইনের শাসনের বিশ্বাসী তাদের মতামত সংগঠিত করা দরকার। এবং এই কাজের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও শান্তিকামী ব্যাপক জণগণের মৌলিক অধিকার হরণের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অভিহিত করে জনমত সংগঠিত করা প্রয়োজন। যাতে শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত আইনের শাসনের নিশ্চয়তাকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি নিপীড়নের কাজ চলছে তা প্রতিরোধ করা যায়।

(৪) এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে আটক ব্যক্তিগণকে বিনা বিচারেই ধরে রাখা এবং অনেককেই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই সাজা দেয়া হচ্ছে। সুতরাং এ ধরণের আটক ব্যক্তিদেরকে আইনের সাহায্য দেয়া প্রয়োজন।

(৫) আইনের এই সাহায্য দেয়ার জন্য উপযুক্ত সংগঠন ও ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(৬) তহবিল ছাড়া সংগঠনের প্রয়োজনীয় কাজ যথাযথভাবে চালানো সম্ভব নয়। কাজেই সুষ্টভাবে এই কাজ চালানোর জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করাও প্রয়োজন।

(৭) এই কমিটির কাজ শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কমিটিকে একটি কার্যকর সংগঠন পরিণত করার জন্য এবং সারাদেশের জনগণ যাতে আইনের সাহায্য পেতে পারে তার জন্য জেলা পর্যায়ে এমনকি তার নিম্ম পর্যায়ে ও এই কমিটি গড়ে তুলতে হবে। যাতে করে নিম্ন আদালতেও জনগণ আইনের সাহায্য লাভ করতে পারে।

(৮) এই সংগঠন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাগরিক অধিকার রক্ষামূলক সমিতিগুলোর সঙ্গেও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় রাখবে। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত প্রস্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :-

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১,৩২ এবং ৩৩ নং ধারায় ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো নানান সরকারি বাহিনী ও প্রশাসন যন্ত্রের দ্বারা খর্ব বা হরণ করা হচ্ছে শুধু তাই নয়; নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংবিধানে প্রদত্ত অনেক অধিকারকে ইতিমধ্যেই কাগুজে অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। এই সভা সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সমস্ত আইন প্রত্যাহার করে নেয়া এবং বিভিন্ন সরকারি বাহিনীও প্রশাসন যন্ত্র কর্তৃক ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ ও হামলা বন্ধ করার জন্য সাধারণভাবে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়ে অনির্দিষ্টিকালের জন্য আটক রাখা, যে কোন সংবাদপত্রকে যে কোন সময় বন্ধ করে দেয়া এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহের উপর যে কোন প্রকার হামলার তীব্র নিন্দা করা হচ্ছে। সভা বিশেষ ক্ষমতা আইনকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং বর্তমান সংবিধানের বিরোধী বলে মনে করছে এবং তা বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

রক্ষীবাহিনী আইনের মাধ্যমে যে সমস্ত ক্ষমতা রক্ষীবাহিনীর হাতে অর্পন করা হয়েছে সে ক্ষমতাগুলি এতকাল পুলিশের হাতেই একান্তভাবে ন্যস্ত ছিল। যে ক্ষমতা পুলিশের হাতে এতকাল ন্যস্ত ছিল এবং এখনও ন্যস্ত আছে সে একই ক্ষমতা আবার একটি নতুন বাহিনীর হাতে আইনের মাধ্যমে নতুন করে অর্পন করার উদ্দেশ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নয় বরং নানা ক্ষেত্রে যারা সরকারি নীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার হরণ এবং তাদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন পরিচালনা করাই হল এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বহু বিবরণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। কমিটি রক্ষীবাহিনীর এই নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছে এবং রক্ষীবাহিনী আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সভা বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য ব্যক্তিকে বিনা বিচারে এবং কোন কারণ না দেখিয়ে এ দেশের নাগরিকদের জেলে আটক রাখার নীতি ও কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও বিরোধিতা করছে এবং বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীর আশু মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার বিভিন্ন বিরোধী মতালম্বী সংবাদপত্রের ওপর নিয়মিত হামলা করে সংবাদপত্র সম্পাদক ও কর্মীদের উপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে প্রচলিত সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহ নিজেরাই খর্ব ও হরণ করেছে। দৈনিক গণকন্ঠের ওপর সামপ্রতিক হামলা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সভা বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং মৌলিক অধিকার

সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির কার্যকরী সংসদের সদস্য গণকন্ঠ সম্পাদক জনাব আল মাহ্‌মুদসহ অন্যান্য আটক বা গ্রেফতারী পরোয়ানাপ্রাপ্ত সংবাদপত্র কর্মীদের মুক্তি ও তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।

২৯শে অক্টোবর সারাদেশে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিন মজুতদারী আর কালোবাজারের দায়ে আওয়ামী লীগের আর একজন সংসদ সদস্য গ্রেফতার হন। ৩০ তারিখে লবন মজুতের জন্য আওয়ামী লীগের এমপি ডঃ শামসুদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

এ অবস্থায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে ১লা নভেম্বর ১৯৭৪ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সমাবেশে যোগদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবিদের এত বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। ‘মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির’ সভাপতি সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই ঘন্টার উপর এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আহমদ শরীফ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েত উল্লাহ খান, কামরুন্নাহার লাইলী, নিজামুদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন আলমগীর, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং বদরুদ্দিন উমর। সমাবেশে বিদ্যমান মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক আধিকার সম্পর্কে ১৭টি প্রস্তাব গৃহিত হয়। সমাবেশের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই সমাবেশের কর্মসূচী শেষ হয়। সমাবেশে গৃহিত প্রস্তাববলীর বিবরণ:-

১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মন্বন্তরের গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকেও অতিক্রম করেছে এবং এই মন্বন্তর, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকান্ডেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে ‘প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা’ বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণার জোর দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের একটি শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশের প্রস্তাবে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনে সরকারের বিরোধিতার নিন্দা করে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করার দাবি জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে বিরোধী দলসমূহের প্রতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও রেশনিং এলাকা সম্প্রসারন ও টেষ্ট রিলিফ চালু করার দাবি জানানো হয়। সমাবেশের প্রস্তাবে লঙ্গরখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন সমাবেশে রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও মিথ্যা মামলায় আটক ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

দেশবাসীর মৌলিক অধিকার প্রশ্নে জুলাই মাসে ‘মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি’-র কার্যনির্বাহী পরিষদ জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং এ বিষয়ে সরকারি নীতি লক্ষ্য করে এক বিবৃতিতে বলেন, “বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সরকার বিরোধী মতামত ও সরকার বিরোধী ব্যক্তিদের দমন করার জন্য রক্ষীবাহিনীকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তারা ‘বিশেষ ক্ষমতা আইন’ এর অস্ত্র দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করেছেন। বাহ্যতঃ সমাজ বিরোধী লোকদের মোকাবেলো করার জন্য প্রণীত এই আইন বস'ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলোর ওপর দমন

নির্যাতনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' এর স্থূল ও দারুন অপব্যবহার এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেপরোয়া রক্ষীবাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ ব্যাপকভাবে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

সব ধরণের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং রক্ষীবাহিনী আইনের মধ্যেও তাদেরকে আদালতে উপস্থিত করার যে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আছে তা না করে তাদের উপর তারা হিংসাত্মক শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অস্বাভাবিক নির্যাতন ও তাদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টির কাহিনী বিভিন্ন সংবাদপত্রে এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের মাধ্যমেও ফাঁস হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ সরকার বিরোধী দলীয় মতামতকে দমনের চেষ্টা করছেন শুধু তাদেরকে জেলে দিয়ে এবং নির্যাতন ও শারীরিকভাবে খতম করেই নয়; তারা এর জন্য ১৪৪ ধারাও দেশব্যাপী জারি করেছেন। বাহ্যতঃ এটা তারা করেছেন দুই মাস পূর্বে আরম্ভ করা তাদের তথাকথিত শুদ্ধি অভিযানের সুবিধার জন্য। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল এ দেশে বিরোধী মতামত প্রকাশ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সংগঠিত হতে না দেওয়া। আর একটি বিষয়ে আমরা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। একমাত্র সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই মত প্রকাশে যারা ইচ্ছুক তাদেরকে তা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে ভয়ানক রকম কড়াকড়ি করে এবং নিউজপ্রিন্টের কোটা দিতে অস্বীকার করে সরকার বর্তমানে বিরোধী দলীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর প্রকাশনা ক্ষেত্রে নিদারুন অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন। উপরে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি কারাগারের অবস্থার উন্নতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তি দাবি করছে।

জনগণের আশা এবং প্রত্যাশা এবং নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা

জনগণ সর্বকালে ত্যাগের বিনিময়ে কিছুই পায়নি কিন্তু নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফুলে ফেপে কলাগাছ হয়েছেন।

সদ্যমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। অনেক আশার বাংলাদেশ। জনগণকে সোনার বাংলার যে স্বপ্ন নেতারা এতদিন দেখিয়ে এসেছেন তা বাস্তবায়িত করার সুযোগ এসেছে স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে। জাতীয় পরিসরে মুক্তি সংগ্রাম শ্রেণীভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে-চুড়ে একাকার করে দিয়েছে। ফলে শ্রেণীভেদের অহমিকা ভুলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা : নেতারা তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠি এবং দলীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাতীয় স্বার্থে জনগণকে একত্রিত করে তাদের দেশপ্রেম এবং কর্মউদ্দীপনাকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পূর্ণগঠন করে গড়ে তুলবেন এক সোনার বাংলা। সমৃদ্ধ এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করে বিশ্ব পরিসরে সগর্বে মাথা উচুঁ করে দাড়াবে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক। অতীত ঐতিহ্য, নিজস্ব স্বতন্ত্রতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুদূরপ্রসারী বিচক্ষণতা, সঠিক দিক নির্দেশনা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কঠিন পরিশ্রম সর্বোপরি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাংলাদেশকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে উন্নতির চরম লক্ষ্যে। সুখী সমৃদ্ধ এবং গতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলে তার সুফল প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। লাখো শহীদের রক্তের বদলে অর্জিত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে অর্থবহ।

কিন্তু জনগণের মনে অনেক সন্দেহ। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের রাজনীতিতে কাজের চেয়ে কথার ফুলঝুরি ঝরেছে বেশি, তার চেয়ে বেশি থেকেছে প্রতিশ্রুতি। 'ক্ষমতায় গেলে জনগণের সার্বিক মুক্তি এনে দেব' এ ধরণের গালভরা বক্তব্য জনগণ হামেশাই শুনে এসেছে দীর্ঘকাল থেকে। কিন্তু 'যেই গেছেন লংকা সেই হয়েছেন রাবন' অর্থাৎ ক্ষমতায় গিয়ে বক্তৃতাকারীরাই নির্মমভাবে পদদলিত করেছেন জনগণ এবং জনগণের দাবিকে। এর মূলে রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গণবিচ্ছিন্নতা। দেশের ব্যাপক জনগণের সাথে তাদের কোন সংযোগ নেই। এখানে শাসকের সাথে শাসিতদের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। তাই শাসক গোষ্ঠির বক্তৃতা-বিবৃতি সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করে না। তারা যখন যা খুশি তাই বলেন, তাই করেন। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে তাদের নীতি ও কাজ হালাল করে নেন। জনগণ ঘুরে ফিরে একই প্রতারণার শিকারে পরিনত হয় বারবার। মোহ এবং ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ রাজনীতিকরা নির্দ্বিধায় বিসর্জন দেন সাধারণ গণমানুষের স্বার্থ।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৪৭ সাল হতে পরবর্তিকালে যত সরকার এসেছে তারা প্রত্যেকেই মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ধূঁয়া তুলেছে। ১৯৪৭ সালে সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ধূঁয়া তুললেন ইসলামের। ধর্মপ্রাণ মানুষ অতি সহজেই মোহিত হয়েছিল সেই ধূম্রজালে। ১৯৫২ সালে তারা ভাষা আন্দোলনকে আখ্যায়িত করলেন ইসলাম বিরোধী সংগ্রাম বলে। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে এলান করলেন মৌলিক গণতন্ত্রের। মানুষ বারবার আশাহত হয়েছেন এসমস্ত সরকারের কাছ থেকে। তাদের বিভিন্ন সব শ্লোগান পরিণত হয়েছে শুধু ফাঁকা আওয়াজে। সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার বোঝা ক্রমান্বয়ে গিয়েছে বেড়ে। গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে সামাজিক সংকট। অর্থনৈতিকভাবে তারা হয়েছেন দেউলিয়া। পরিণামে জনগণ হয়েছে পশ্চাদমুখী। তাই শুনতে পাই তাদের আক্ষেপ, "পাক আমলেই ভালো ছিলাম। বৃটিশ আমলে ছিলাম আরও ভালো।" ১৯৭১ সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতাদের মন-মানসিকতায় কোন গুনগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। তাই তারাও তাদের পূর্বসুরীদের মত সদ্য

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পন করেই পুরনো কায়দায় ধুঁয়া তুললেন মুজিববাদ কায়েম করতে হবে। কিন্তু মাত্র সাড়ে চার বছরের মাথায় যখন মুজিববাদের অসাড়তা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হল তখন জনাব শেখ মুজিব আবারো একই কায়দায় সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী প্রণয়ন করে এবং জরুরী আইন ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কুক্ষিগত করে একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেন। নজীরবিহীন তার এই শাসনতান্ত্রিক ক্যু'কে তিনি তার 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেন। তার এই সর্বক্ষমতা হরণের ফলে বাহ্যিকভাবে অবস্থা স্থিতিশীল মনে হলেও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এই অবনতির একটি প্রধান কারণ ছিল শেখ মুজিব ও তার সরকার মনে করত কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি এবং ক্ষমতাবলয়ের লোকজনের মাঝে সুখ-সুবিধা বন্টন করে তাদের খুশি রাখতে পারলেই ক্ষমতায় থাকার সমর্থন লাভ করা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, আদর্শ অথবা নীতিগত বিশ্বাসের অভাব সর্বোপরি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের সমস্যাদি এবং সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের মাধ্যমে সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের পূর্ণগঠনের সমস্যা সম্পর্কে তার জ্ঞানের অভাবের জন্যই শুধুমাত্র সুখ-সুবিধা বন্টনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। যে কোন নীতি নির্ধারনের ব্যাপারে তিনি তার অভিমতকেই প্রাধান্য দিতেন। কারো কোন যুক্তিই তার কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। তার এই সবজান্তা ভাবও তার প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পার্টি ও রাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল। ঐ ধরণের মানসিকতার জন্যই ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে শেখ মুজিবের মতবিরোধ ঘটে। জনাব খানের অভিমত ছিল প্রশাসনকে নির্দলীয় রাখতে হবে। প্রশাসনের উপর কোন প্রকার দলীয় প্রভাবের ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ বিঘ্নিত হবে। কিন্তু শেখ মুজিব তার এই মনোভাবের বিরোধিতা করে যুক্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "পার্টির আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে প্রশাসনকে তাদের নিরপেক্ষতা বর্জন করে। শুধু তাই নয় আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্যদের কাজকে সহায়তা করাই হবে প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্ব এবং এভাবেই আওয়ামী লীগের প্রভাব বাড়তে সহযোগী হতে হবে প্রশাসনিক যন্ত্রকে।" শেখ মুজিবের দাপটের কাছে জনাব আতাউর রহমান খানকে নিশ্চুপ থাকতে হয়। ফলে ১৯৫৬-৫৭ সালে শেখ মুজিব যখন শিল্পমন্ত্রী তখন তার বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি তার সরকারি ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তার প্রিয়জন ও পার্টির লোকদের অনেক পারমিট, ব্যাংক লোন, ইনডেটিং লাইসেন্স, শিল্প কারখানা গড়ার পারমিশন প্রভৃতি করিয়ে দেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি তার স্বভাবসুলভ প্রথায় তার পার্টির লোকজনদের নানাভাবে খুশি রাখার চেষ্টা করেন। কাউকে দেয়া হয় টাকা, কাউকে চাকুরী, কাউকে অযৌক্তিক পদোন্নতি, কাউকে বানানো হয় রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এভাবেই দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই অযোগ্য ও অসৎ পরিচালকগণ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মেশিনপত্র, স্পেয়ার পার্টস, কাচাঁমাল ভারতে পাচাঁর করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেন। সব রকম দেশী ও বিদেশী আমদানিকৃত পন্য সরবরাহ করা হত লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলারদের মাধ্যমে। তাদের সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের সুপাত্রগণ!

তাদের কেউই পেশাগতভাবে ব্যবসায়ী ছিল না। তারা তাদের লাইসেন্স পারমিটগুলো মধ্যসত্ব ভোগী হিসাবে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত। ফলে জিনিসপত্রের দাম অনেকগুন বেড়ে যেত। এছাড়া পাকিস্তানী নাগরিকদের পরিত্যাক্ত ৬০,০০০ বাড়ি আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবেই শুধু নয়, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের যোগ-সাজসে পাট, চাল, অন্যান্য কাচাঁমাল ও রিলিফের বিস্তর মালামাল ভারতে পাচাঁর করা হয়। এরই ফলে ব্যাঙের ছাতার মত দেশে একশ্রেণীর হঠাৎ করে আঙ্গুল ফুলে ভূঁইফোড় বড়লোকের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আমার সাথে শেখ মুজিবের একান্ত আলাপের সময় প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্য উল্লেখ্য।

মুজিব পরিবারের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কারণে আমি প্রায়ই যেতাম ৩২নং ধানমন্ডিতে। কখনো তিনি ডেকে পাঠাতেন, কখনো যেতাম স্বেচ্ছায়। এমনই একদিন দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাকে বলেছিলাম,
-দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আপনার পার্টির লোকজনদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আপনি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন।
জবাবে তিনি বলেন,
-আমার দলের লোকজন কি পাক আমলে নির্যাতন ভোগ করে নাই? তারা কি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই? তারা কি বিষয়-সম্পদ খোয়ায় নাই? আজ যদি তারা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পেয়েই থাকে তাইলে দোষের কি আছে? তাদেরতো আমি ফালাইয়া দিতে পারি না। এতে কেউ বেজার হইলে আমি কি করতে পারি।

এমন একটি জবাবের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মনে মনে ভেবেছিলাম, আজতো তিনি জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রের কর্ণধার। জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শুধু দলীয় স্বার্থ বড় করে দেখা কি তার উচিত? জাতিই বা সেটা আশা করে কি? এ বিষয়ে আর আলাপে না গিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম এক অবর্ণনীয় অস্বস্তি নিয়ে। শাসকদলের এই সমস্ত নব্য পুজিঁপতিরা জাতীয় অর্থনীতিতে কোন প্রকার বিনিয়োগ করেননি, তারা শুধু যা ছিল সেটাকেই লুট করে বড়লোক হয়েছেন। জাতীয় সম্পদ শুষে নিয়ে থোকলা করে দিয়েছেন অর্থনীতিকে। এভাবে পাকিস্তানের ২২ পরিবারের মত রাতারাতি বাংলাদেশ কয়েক হাজার পরিবার সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের প্রভাবে পরিচালিত দল আওয়ামী লীগের মাধ্যমে শেখ মুজিব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। জ্ঞানের অভাব নাকি জনতাকে বোকা বানাবার অতি চালাকি বোঝা মুশকিল! শুধু যে কর্মীরা অসৎ হয়ে উঠেছিল, তা নয়। মুজিব পরিবারের সদস্যগণ ও তার আত্মীয়-স্বজনও দুর্নীতি ও চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন। শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজন গাজী গোলাম মোস্তফা জাতীয়ভাবে 'কম্বল চোর' উপাধি পান এবং রিলিফের জিনিসপত্র নিয়ে কেলেংকারী ও চোরাচালানের জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি রেডক্রসের চেয়ারম্যান ছিলেন। শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসের শুধু খুলনায় বাড়িঘর এবং অবাঙ্গালীদের ব্যবসা-বাণিজ্য হাতিয়েই ক্ষান্ত হননি। ভারতে চোরাচালানের রিং লিডারও ছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের প্রত্যেকটি ভাগীনা (শেখ মনি, আবুল হাসনাত, শেখ শহিদুল ইসলাম) মামুর জোরে শুধু যে রাজনৈতিক আধিপত্যই বিস্তার করে রাতারাতি নেতা বনে যান তাই নয়; অসৎ উপায়ে অর্জিত ধনদৌলতের পাহাড় গড়ে তোলেন তারা। শেখ মুজিবের পুত্রদ্বয় বিশেষ করে শেখ কামালও অসৎ উপায়ে টাকা-পয়সা আয় করতে থাকে। এক ব্যাংক ডাকাতির সাথে শেখ কামালের জড়িত হয়ে পড়ার ব্যাপারে পূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

আওয়ামী সরকারের আমলে দুর্নীতি সম্পর্কে বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব লরেন্স লিফসুলজ ৩০শে আগষ্ট ১৯৭৪ সালে **Far Eastern Economics** এ লিখেন, "অসৎ কাজ ও অসাধু তৎপরতা কোন আমলেই নতুন কিছু নহে। কিন্তু ঢাকাবাসীদের অনেকেই মনে করেন যেভাবে মুজিব আমলে সরকারের ছত্রছায়ায় খোলাখুলিভাবে দুর্নীতি ও জাতীয় সম্পদের লুটপাট হয়েছে তার নজির ইতিহাসে বিরল।" স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে লুটপাট ও দুর্নীতির ফলে কোনরূপ অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক সুফল লাভ করা সরকারের পক্ষে ছিল অসম্ভব। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন পরগাছার মত গজিয়ে উঠা নব্য ধনীদের বিলাসবহুল জীবনধারা ও সহজ উপায়ে অর্জিত অর্থের অস্বাভাবিক অপচয় জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছিল একদিকে, অন্যদিকে তাদের নীতি বর্জিত ক্রিয়াকর্ম সরকার ও সরকারি দলের ভাবমূর্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল জনসাধারণের চোখে। আওয়ামী লীগের পক্ষে সেই হারানো মর্যাদা আর কখনো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মানুষের আকাশচুম্বি চাহিদা এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু লোককে ফায়দা দিতে পারলেও বেশিরভাগ জনগণের কাছ থেকে সরকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে সোনার

বাংলায় গড়ে তুলে সুষম সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজের প্রতি স্তরে, এটাকে জনগণ জাতীয় বেঈমানীর সমান বলেই মনে করেছিল। আওয়ামী নেতৃত্বের প্রতি তারা বীতঃশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জনগণের আস্থা হারায় আওয়ামী লীগ। শুধু তাই নয় জনগণের সাথে সাথে ক্ষমতাবলয়ের বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের আস্থা থেকেও বঞ্চিত হয় আওয়ামী সরকার। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল প্রশাসন, ছাত্র ও যুব সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা বাহিনী।

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের ৮ কোটি লোকের অন্নের সংস্থান করা ছিল অতি দুরূহ কাজ। বৈদেশিক বন্ধুরাষ্ট্রগুলো এবং সাহায্য সংস্থাগুলো মুক্তহস্ত নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্য। তাদের সহানুভূতির ফলে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সর্বমোট ১৩৭৩ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও অনুদান লাভ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত **UNROB** এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণের রিলিফ সাহায্যও দান করা হয় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে।

মাওলানা ভাসানী ছিলেন দিব্যদৃষ্টির অধিকারী

বাংলাদেশের পরিসীমা সম্পর্কে মাওলানার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরিষ্কার। কিংবদন্তীর নেতা আমাদের শেষ বৈঠকে সেটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন অপারেশনের জন্য। আমিও তখন লন্ডনেই অবস্থান করছিলাম। খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। খবর পেয়েই তিনি একদিন আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু সাংবাদিক জনাব গাজীউল হাসান খানের মাধ্যমে ডেকে পাঠান। সময়মত আমি ও গাজী তার ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম সকাল ১০টার দিকে। হাসপাতাল থেকে অপারেশনের পর বাংলাদেশ দূতাবাসই তাকে সেই ফ্ল্যাটে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম তার পুত্র জনাব নাসের খান ভাসানী মাওলানা সাহেবের ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। হুজুর আধশোয়া অবস্থায় বিছানায় চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবছিলেন! অপারেশনের ক্ষত তখনও শুকায়নি। চলাফেরা, পথ্য সব কিছুই রেসট্রিকটেড। আমরা এসেছি শুনে তিনি চোখ মেলে আমাকে ইশারায় তার বিছানায় গিয়ে বসতে বললেন। আমি তার আদেশ অনুযায়ী তাঁর শিয়রে গিয়ে বসলাম। গাজী কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিল। সালাম দোয়ার পর হুজুর জিজ্ঞেস করলেন,
-নাস্তা করছস?
-হ্যাঁ হুজুর, নাস্তা কইরাই আইছি। জবাব দিলাম।
-ভালো কথা। তাইলে আমারে নাস্তা খাওয়া। আমি ডিম খামু। স্বল্প দূরে দাড়িয়ে থাকা জনাব নাসের ভাসানীর সাথে চোখাচোখি হল। নিচুগলায় তিনি আপত্তি জানালেন। বললেন,
-ডাক্তারকে না জানিয়ে ডিম দেয়া ঠিক হবে না। ক্ষেপে গেলেন মাওলানা। জেদ ধরে বসলেন ডিম তিনি আজ খাবেনই। অগত্যা দু'টো ডিমের পোঁচ করে আনলেন নাসের ভাসানী। ডিমের প্লেটটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ইশারায় সেটা আমাকে দিতে বলে তাকে বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিলেন মাওলানা। নাসের ভাসানী চলে গেলেন। গাজী বসে আছে চুপচাপ। হুজুর বললেন,
-নে শুরু কর। খাওয়াইয়া দে।
আমি আস্তে একটু একটু করে চামচ দিয়ে তাঁকে ডিম খাওয়াতে শুরু করলাম। এ বয়সে অপারেশনের ধকলে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কথা বলছিলেন অতি ক্ষীণ স্বরে। খাওয়ার ফাকেই তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে নিলেন। লন্ডনে কবে এলাম? কেন এলাম? পরিবার কোথায়? সবকিছুরই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। খাওয়া শেষে মুখ ধুইয়ে মুছে দিলাম। খাওয়ার পর কিছু ঔষধ খাওয়ার ছিল সেগুলোও তাকে খাইয়ে দিলাম। এবার তাকে কিছুটা রিলাক্সড মনে হচ্ছিল। পাশে বসে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, মাওলানা যেন কোন এক গভীরে তলিয়ে গেছেন। বেশ অনেকক্ষণ পর হঠাৎ করেই বলা শুরু করলেন,
-বাবা, ৯৭ বছরের বেশি বয়স হইয়া গেছে। কবে আছি, কবে নাই কে জানে! তবে একটা কথা তোরে কইয়া যাইবার চাই। এ বুড়া সারাজীবনে যা করতে পারে নাই তুই ও তোর সাথীরা সেটা কইরা বাংলাদেশের ১০কোটি জনগণরে বাচাঁইছোস জালেমের হাত থ্যাইকা। এ বুইড়া তোদের দোয়া দিতাছে, আল্লাহ তোদের হায়াত দারাজ করুক। বলেই তিনি আমার মাথায় গায়ে তার ক্ষীণ হাত বুলিয়ে শরীরে, বুকে ফুঁক দিলেন। তার চোখের কোল ঘেষে তখন পানি বেরিয়ে এসেছে। চোখ বোঁজা অবস্থায় তিনি আমার জন্য দোয়া করছিলেন বিড়বিড় করে। কাছে বসেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না কোন সুরা বা আয়াত পড়ছিলেন তিনি। আমি তার অশ্রুধারা মুছিয়ে দিয়ে আবেগে বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। আমার প্রতি তার স্নেহ ও মমতা দেখে আমার চোখ দু'টোও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কেমন যেন এক ঐশ্বরিক স্তব্ধতায় মহীয়ান হয়ে চোখ বুজে ছিলেন

কিংবদন্তীর নায়ক বাংলাদেশের মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী। সে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ! অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তার হাত ধরে নিশ্চুপ বসে থাকলাম। তিনি চোখ খুললেন,
-বাবা, তোর জায়গা লন্ডন না, দেশে যাইতে হইবো।
হুজুরের কথার জবাব কি দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সে সময় আমাদের সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ভাবছিলাম হুজুরকে সব খুলে বলবো কিনা। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনিই বলে উঠলেন,
-জিয়ার সাথে মতের অমিল হইছে; সেইডা আমি জানি; কিন্তু জিয়ারই সব ভুল। আমি গিয়া তারে বুঝামু। কথা শুনলে ভালো আর না বুঝলে আমি জানি কি করতে অইবো। তুই তৈরি থাকিছ। তবে বাবাজান একটা কথা। বুড়া মানুষের কথাটা মন দিয়া হুনিস। যে কাজ শুরু করছস তার শেষ বহুদূরে। বাংলাদেশের মধ্যেই চোখ বন্ধ কইরা উট পাখি হইয়া বইসা থাকলে চলব না। চোখ খুইলা চাইতে হইবো সীমানার বাইর। কথাটা একটু ভাল কইরা চিন্তা কইরা দেখিছ।
কথা বলতে বলতে তিনি বেশ কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। আমি আস্তে আস্তে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম,
-হুজুর আপনি দোয়া করবেন যাতে আমি আমার নিয়তে কায়েম থাকতে পারি। আল্লাহ্‌পাক যেন আমারে সুযোগ দেন যাতে একজন মুজাহিদ হিসাবে আপনার ইশারা অনুযায়ী সঠিক রাস্তায় বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে প্রয়োজনে কোরবান করতে পারি।

আমার জবাব শুনে বিছানায় শুয়েই তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। তার উষ্ণতা ও আন্তরিকতায় আমার বুক ভরে উঠেছিল। ডাক্তার এসে গেছে। আমাদের বিদায় নিতে হবে। সালাম করে আমি আর গাজী বেরিয়ে এলাম। বুকের মাঝে গেথে নিয়ে এলাম মহান নেতার অমূল্য দিক নির্দেশ। সেটাই মাওলানা ভাসানীর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে........রাজেউন)। তার মৃত্যুতে জাতি হিসেবে আমরা হারালাম একজন জনদরদী অভিজ্ঞ মুরুব্বী এবং দূরদর্শিতা সম্পন্ন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

অর্থনৈতিক সংকট, হতাশা, শেখ মুজিবের ভারত তোষণ নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ন অত্যাচারী সরকার সর্ম্পকে জনগণের নেতিবাচক মনোভাব, আইন-শৃঙ্খলা ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সবকিছু মিলিয়ে দেশে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে তখনকার সবকয়টি প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণীর ভূমিকায় এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। দেশের সাধারণ গণমানুষের মুক্তির স্বপ্ন চিরজীবন দেখেছেন মাওলানা ভাসানী। মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের মুক্তি আসতে পারে এটা সম্পূর্ণভাবে মাওলানা ভাসানী কখনই মেনে নেননি। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রীয় ধারণাকে তিনি অধুনাকালের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লিবক রাষ্ট্রীয় চেতনায় বাস্তবায়িত করে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি এনে রাষ্ট্রীয় দুঃশাসনের অবসান করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার রাজনৈতিক চিন্তার ব্যাখ্যায় তিনি সর্বদা স্রষ্টা ও সৃষ্টির হকের কথা বলতেন। এ সমস্ত কিছু নতুন কথা নয়। ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শন, ক্রিশ্চিয়ান সোস্যালিজম ও আঞ্চলিক সাম্যবাদ, ইউরো কম্যুনিজম এর মধ্যেও একই ভাবধারা বিরাজমান। ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো চেয়েছিলেন ধর্ম, জাতীয়তাবাদ এবং কম্যুনিজমকে একত্রিকরণের মাধ্যমে 'নাসাকম' কায়েম করতে। পরে কম্যুনিজম বাদ দিয়ে সে জায়গায় সোস্যালিজম গ্রহণ করে তিনি স্থাপন করেন 'নাসাসোস'। মাওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে কায়েম করতে 'হুকুমতে রব্বানিয়া'। ১৯৭১ সালে ভারতে নজরবন্দী হিসেবে মাওলানা ভাসানীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব সাইফুল ইসলাম যখন শেষ বিদায় নিয়ে দেশে ফিরছিলেন তখন মাওলানা ভাসানী তাকে বলেছিলেন,
-চাইছিলাম লন্ডন যাব, প্রবাসী সরকার গঠন করব। কিন্তু কুটুম বাড়ি বেড়াইয়া গেলাম। অনেক বড় স্বপ্ন দেইখা দায়িত্ব কান্ধে নিয়া আমার সাথে আসছিলা। স্বপ্ন আমারও ছিল, বাংলার দুঃখী গরীব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। সেটা পাইতে হইলে আর একটা লড়াই লড়তে হইবো। এতো রক্ত

ঝরাইলো কিন্তু দ্যাশের মানুষ তো মুক্তি পাইবো না। আধা স্বাধীনতা নিয়া দ্যাশে ফিরলে আবার লাইগবো খটাখটি, তাই ভাইবতাছি----।
-হুজুর কথা ঠিক! কিন্তু সে লড়াইতো বাইরের দুশমনের সাথে সরাসরি নয়। দেশের মধ্যেই সে লড়াই ঘরে ঘরে।
-সেই জন্যই আরও কঠিন আরও হিংসার মনডা পোক্ত কইরা নিয়া যাইতে হইবো।

একাত্তরের বিচক্ষণ নেতা তার অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের যে অবস্থা দেখেছিলেন ঠিক সে অবস্থাই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছিল মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী-বাকশালী চক্র বাংলার মাটিতে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব কায়েম করে। স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে জনগণকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে অকুতোভয় মাওলানা ভাসানী ১৯৭১ সালে জনাব সাইফুল ইসলামের কাছে তার ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ঠিক সেই দায়িত্বই আন্তরিকভাবে পালন করেন। দেশ ও জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে আপোষহীন ছিলেন মাওলানা। না ভারতের প্রতি দুর্বলতা, না পাকিস্তানের পায়রবী। প্রয়োজনে চৈনীক নীতির তিরষ্কার, মার্কিনীদের অবিশ্বাস, সোভিয়েতের সমালোচক - এই হল সিংহ পুরুষ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

মুজিবের সময় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

মুজিব সরকারের 'দাস-প্রভু' সম্পর্ক জনগণের মনে ভারত বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।

পাকিস্তানী বাহিনীর সারেন্ডারের পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশী সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশে থেকে চলে যায়। বিজয়ী সেনা হিসেবে বা অন্য কোন কারণেই হোক চলে যাবার আগে তারা হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ, যুদ্ধের অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং মিল কারখানার মেশিনপত্রও খুলে নিয়ে যায় ভারতে। তারা অধিকৃত শহর ও সেনানিবাসগুলো থেকে আসবাবপত্র, ফিটিংস ফার্নিচার, এমনকি কমোড-বেসিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে যেতে থাকে। অনিক পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর ইস্যুতে ছাপা হয়, "ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে সর্বমোট ১০০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনপত্র, যুদ্ধ-সরঞ্জাম ও কাচাঁমাল ভারতে নিয়ে যায়।" স্বাধীনতার পর খুলনায় ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ভারতের কাছে সরকারিভাবে এক প্রটেষ্ট নোটের মাধ্যমে জানান যে, তার জেলা থেকে ভারতীয় বাহিনী লক্ষ লক্ষ টাকার মালসামগ্রী অন্যায়ভাবে ভারতে নিয়ে গেছে। তিনি ভারতীয় বাহিনীর এ ধরণের লুটপাটের ঘোর বিরোধিতা করেন। ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে আগেও চোরাকারবার চলতো। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর চোরাকারবারের মাত্রা বেড়ে যায় চরমভাবে। স্বাধীনতার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সীমান্ত সম্পূর্ণ খোলা রাখা হয়। মাওলানা ভাসানী দাবি করেন, "বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়ে যাওয়া অস্ত্র ও যুদ্ধসম্ভার এবং চোরাচালানের মাধ্যমে সর্বমোট ৬০০০ কোটি টাকা মুল্যের জিনিসপত্র ও কাঁচামাল ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সময়ে চোরাচালানের মাধ্যমে ২০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্রব্য সামগ্রী ভারতে পাচাঁর হয়েছে বলে দাবি করেন বাংলা সংবাদপত্র অনিক। বাংলাদেশ সরকার দেশে ফিরেই ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা উঠিয়ে নেয়। এর ফলে খোলা বর্ডার দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের একটি বৃহৎ অংশ ভারতে চলে যাওয়ার পথ আরো সুগম হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৭২ সরকার বাংলাদেশী টাকার মান কমিয়ে দিয়ে ভারতীয় রুপির সমপর্যায়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সরকার একই সাথে আরো ঘোষণা করে, ১৬ই ডিসেম্বরের আগে পাট ও পাটজাত সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যের ব্যাপারে রফতানির সকল চুক্তি বাতিল বলে গন্য করা হবে। দি বাংলাদেশ অবজারভার ২/১/১৯৭২ সংখ্যায় লেখে, "ব্যবসায়ী এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে উল্লেখিত সরকারি তিনটি সিদ্ধান্তই ভারতের স্বার্থে প্রণীত হয়েছে। ভারতীয় সরকারের চাপের মুখেই এ ধরণের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।" এরপর সরকার কর্তৃক টাকার মান কমাবার পর পাটের দাম পুনঃনির্ধারণ করার ফলে সৎভাবে ব্যবসা করার চেয়ে চোরাচালান অনেক লাভজনক হয়ে দাড়ায়। ফলে বাংলাদেশের জীবন সোনালী আশের রপ্তানী হ্রাস পায়। এতে জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রার আয় কমে যায় এবং জাতীয় সঞ্চয়ও কমে যায়। উৎপাদনে ভাটা পড়ে। ১৯৭৪ সালে রহস্যজনকভাবে নাশকতামূলক কার্যকলাপের ফলে অনেক জায়গায় পাটের গুদাম আগুনে পুড়ে যায়। গুদামে ভরা কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য এভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে পাট শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচন্ড ক্ষতি হয়। গুদামে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা করতে গিয়ে পাটমন্ত্রী ১৯৭৪ সালে সংসদে বলেন, "আগুন লেগে প্রায় ১৩৯২ মিলিয়ন টাকার শুধু পাটই পুড়ে যায়। পাটজাত দ্রব্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।" প্রচন্ড এই ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে BJMC এবং BJTC সরকারি ভুর্তুকির উপর চলতে থাকে। আজঅব্দি পাট শিল্পক্ষেত্রে সরকার কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে চলেছে। একদিনের সোনালী আশঁ আজ জাতির গলায় হয়ে পড়েছে ফাঁস।

পক্ষান্তরে যে ভারত কখনোই পাট রফতানি করতে পারত না, এমন কি পাটের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের ফলে অনেক জুট মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশের

অভ্যুদয়ের পর অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। ১৯৭৩ সালে ভারত ১ মিলিয়ন বেল পাট রফতানি করে বিদেশের মার্কেটে এবং ১৯৭৪ সালের মধ্যে শুধু যে তাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলগুলোই আবার ফুল শিফটে চালু করা হয় তা নয়; তারা ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তে আরো নতুন দু'টো মিল স্থাপন করে। দুই সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত বর্ডার চুক্তি বাংলাদেশের কোন উপকার না করে চোরাচালানের পথকেই প্রশস্ত করে দিয়েছিল। পরে জনগণের জোর আন্দোলন ও দাবির মুখে সরকার ঐ চুক্তি বছর শেষ না হতেই বাতিল করতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে চারটি ঋণ চুক্তি এবং একটি বাণিজ্য চুক্তি সই করে। কিন্তু চুক্তিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় দিক থেকে গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে চুক্তি অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে ভারতের বিমুখিতা বাণিজ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে। ভারত বাংলাদেশের জন্য টাকা ছাপায়। সেই কারণে নকল নোটে সারাদেশ ছেয়ে যায়। ফলে দু'দেশের সরকার বিব্রত হয় জনসম্মুখে। নকল টাকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্বল্পতা এবং উচ্চ মূল্য জনগণের জীবনকে যতই আঘাত করতে থাকে ততই জনগণ ভারত বিরোধী হয়ে উঠে। কালোবাজারী, মুনাফাখোররা বৈধ ব্যবসার পরিবর্তে ভারতে চোরাচালান করে বেশি ফায়দা লাভের মানসিকতা জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এভাবে একদিকে সরকার ও জনগণ এবং অপরদিকে বাংলাদেশের জনগণ ও ভারত সরকারের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন, ভারতীয় আমলাদের জাতীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ, সীমান্ত দিয়ে অবাধ চোরাচালান, ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ভারতে বাংলাদেশী মুদ্রা ছাপানো, রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি, বাংলাদেশের টাকার মূল্য কমানো, ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে অবস্থান এসমস্ত কারণগুলিই ক্রমান্বয়ে জনগণের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে বাংলাদেশের জনগণ।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারত সরকার শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে বলে ভুল করে যে বীজ বপন করেছিল তারই প্রতিফল 'ভারতীয় শোষণ' হিসাবে ক্রমশঃ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের মনে শিকড় গড়তে থাকে। বন্ধুবেশে বাংলাদেশকে শোষণ করে, জাতীয় সম্পদ লুটপাট করে, বাংলাদেশকে তাদের পশ্চাদভূমি ও মার্কেটে পরিণত করে তাদের নিয়ন্ত্রণে একটি করদ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নীল নকশায় আওয়ামী লীগ তাদের সহযোগী এ ধারণাও প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীর মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠে। তাদের এ ধারণা আরো জোরদার হয় ভারত কর্তৃক সিকিম দখল করে নেয়ার পর। জনগণের এ চেতনার যথার্থ মূল্য না দিয়ে আওয়ামী সরকার এবং ভারত সরকার এ ধরণের বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। ফলে এর প্রভাব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়ে উঠে সুদূরপ্রসারী। এভাবে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই দু'দেশের সম্পর্কে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। সরকারি পর্যায়ে যদিও বা সম্পর্ক বন্ধুসুলভ ও অটুট বলে আখ্যায়িত করা হয় তবুও এটাই সত্যি যে বাংলাদেশের জনগণ ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠে সেই দিন থেকেই যেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে সবকিছু পাঁচার করতে শুরু করল ভারতে এবং দু'দেশের সীমান্ত খোলা রাখা হল ভারতেরই স্বার্থে।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান দেশে বিদেশে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ সরকার দেশ শাসন করতে অক্ষম সে ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশ সরকারকে। এতে করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দেয়। পাকিস্তান ও তার স্বপক্ষের শক্তিগুলো এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, বাংলাদেশ ভারতীয় দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ভারত অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের একটি অংশকে জবরদখল করে রেখেছে। তাদের এ প্রচারণার ফলে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থানের বাস্তবতায়

আর্ন্তজাতিকভাবে অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মত হয়। দেশে ফিরে শেখ মুজিব যদিও বা ভারতীয় বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন কিন্তু জনগণ তাদের জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন ও অন্যান্য কার্যকলাপে তাদের ভবিষ্যত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে। মুজিব জনগণের মনোভাব বুঝতে পারেন কিন্তু তার তেমন বিশেষ কিছুই করার ছিল না। মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার পর ভারত সরকারের বাংলাদেশে তাদের সামরিক বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত ও তার বিরুদ্ধে জনরোষের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার কোন যুক্তিই তখন ভারতের পক্ষেও দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, 'নন এলাইনড মুভমেন্টে' এর প্রবক্তা এবং পঞ্চশীলা নীতির প্রতিষ্ঠাতা দেশগুলোর একটি হয়ে অন্য দেশে তার সেনাবাহিনী রাখার জন্য বিশ্ব পরিসরে ভারতের ভাবমুর্তিও ক্ষুন্ন হচ্ছিল এবং ভারতকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার চাপে ব্যবস্থা গৃহিত হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভূখন্ড থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তা রদবদল করে স্বাক্ষরিত হবে ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ইশতেহার। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ধারাও সংযুক্ত করা হবে চুক্তিতে।

এ চুক্তি এবং যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর মাঝে ১৯শে মার্চ ১৯৭২ সালে যখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের আমন্ত্রনে প্রথমবার বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরের সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ট্রানজিট ট্রেড এবং বর্ডার ট্রেড বজিয়ে রাখা হবে। দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোর দু'দেশের কর্মকর্তারা ছয় মাস অন্তর নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে মতবিনিময় ও কার্যপ্রনালী নির্ধারণ করবেন। ঐ সময় 'জয়েন্ট রিভার কমিশন'ও সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি, সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির আলোকেই প্রণীত হয়েছিল। এভাবেই দেশে ফিরে এসে শেখ মুজিব বাংলাদেশকে পূর্বের সুইজ্যারল্যান্ড বানাবার ঘোষণা দিয়ে মূলতঃ ভারতের একটি করদ রাজ্যেই পরিণত করলেন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশকে। তিনি চালনা এবং চট্টগ্রামের বন্দর পরিষ্কারের অজুহাতে সোভিয়েত ও ভারতীয় নৌ বাহিনীকেও আমন্ত্রন জানান। এভাবেই বাংলাদেশকে রুশ-ভারত অক্ষ শক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। পাকিস্তানের পরাজয়ের পর উপমহাদেশের আধিপত্যবাদী ভারত নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে দাবি করে ঘোষণা দেয়, ''দক্ষিন এশিয়া থেকে বিজাতীয় সবশক্তিকে চলে যেতে হবে।'' শুধু তাই নয়; উপমহাদেশের জন্য ভারত এক নতুন 'মনরোডকট্রেন' তৈরি করে। ফলে উপমহাদেশের সব ছোট দেশগুলো ভারতীয় আধিপত্যবাদের শিকারে পরিণত হওয়ার আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। ভারতের জন্য এত কিছু করার পরও শেখ মুজিব পানি সমস্যা, সীমান্ত নির্ধারন, সমুদ্রসীমা এবং অর্থনৈতিক জলসীমা নির্ধারণ, সমুদ্রে জেগে ওঠা দ্বীপসমূহের দখল প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলোর বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারেননি। শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলেন। এর ফলে জনমনে সন্দেহ হয় শেখ মুজিব ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই ভারতের পরামর্শে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলেছেন।

১৯৭৫ সালের এপ্রিলে ভারত সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে সিকিম দখল করে নেবার পর দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের জনগণ বিশেষভাবে ভারতীয় আগ্রাসন ও আধিপত্য সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ বাদে দেশের অন্যসব রাজনৈতিক দলগুলো ভারতের সাথে ২৫ বছরের চুক্তিকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে অবিলম্বে ঐ চুক্তি নাকচ করে দেবার দাবি জানায়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সাত দলীয় এ্যাকশন কমিটি সরকারের কাছে যে ১৫ দফা দাবি উত্থাপন করেন তার প্রথম দাবিই ছিল ভারতের সাথে অসম মৈত্রী চুক্তি বাতিল করতে হবে। তারা অভিমত প্রকাশ করেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বজিয়ে রাখার নীল নক্শা অনুযায়ী এ চুক্তি করা হয়েছে এবং সমগ্র

উপমহাদেশের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণকে পাকাপোক্ত করার জন্য এই চুক্তি সহায়ক হবে। পাঠকদের অবগতির জন্য ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির কয়েকটি ধারা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে বোধ করছি।

চুক্তির ৬নং অনুচ্ছেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৮, ৯ এবং ১০নং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সমস্ত অনুচ্ছেদগুলো দুই দেশের পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে। অনুচ্ছেদ ৮-এ বলা হয়, "কোন দেশ অপর দেশের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক জোটে যোগ দিতে পারবে না এবং অপর দেশের বিরুদ্ধে কোন রকম সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না এবং তার সীমানাধীন স্থল, জল এবং আকাশ অপর রাষ্ট্রের সামরিক ক্ষতি অথবা অপর রাষ্ট্রের সংহতির প্রতি হুমকিস্বরূপ কোন কাজে ব্যবহার করতে দিতে পারবে না।" অনুচ্ছেদ ৯-এ বর্ণিত রয়েছে, "প্রত্যেক পার্টিই অন্য পার্টির বিপক্ষে কোন তৃতীয় পার্টিকে যে কোন সামরিক সংঘর্ষে কোন প্রকার সাহায্য দিতে পারবে না। যদি কোন পার্টি আক্রমণের শিকার হয় কিংবা আগ্রাসনের হুমকির মুখাপেক্ষি হয়, তবে অনতিবিলম্বে দুই পার্টিই পারষ্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই আক্রমণ কিংবা আগ্রাসনের হুমকির মোকাবেলা করার জন্য। এভাবেই দুই দেশের শান্তি ও সংহতি বজিয়ে রাখা হবে।" অনুচ্ছেদ ১০-এ বর্ণিত আছে, "এই চুক্তির পরিপন্থী কোন প্রকার অঙ্গীকার কোন পার্টিই অন্য কোন দেশ বা একাধিক দেশের সাথে খোলাভাবে কিংবা গোপনে করতে পারবে না।" স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এ ধরণের কোন চুক্তির কি প্রয়োজন ছিল? ভারত বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। বাংলাদেশের তিন দিকই ঘিরে রয়েছে ভারত। পূর্বদিকে সামান্য সীমান্ত রয়েছে বার্মার সাথে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অনেকের মতে পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এ ধরণের কোন চুক্তির প্রয়োজন ছিল না। যেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা নেই বিধায় কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চুক্তির ৮, ৯ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সামরিক সাহায্য চাওয়ার মানে দাড়ায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে সম্পর্কের দিক দিয়ে হীনভাবে অনুগত।

চুক্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্কে যে শর্ত ছিল তার ফলে ভারত একটি অগ্রবর্তী শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি প্রকৌশলিক সাহায্য, ভারী এবং মাঝারি যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি দুই ক্ষেত্রেই অবকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ভারতের অর্থনীতি ও শিল্প কাঠামো বাংলাদেশের চেয়ে আকারে অনেক বড় ও উন্নত। তারা প্রায় প্রয়োজনীয় সবকিছুই নিজেরা তৈরি করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট ও দুর্বল। শিল্প ক্ষেত্রেও অনগ্রসর। প্রয়োজনীয় তেমন কিছুই বাংলাদেশে তৈরি হয় না। সে ক্ষেত্রে দুই দেশের মাঝে উল্লেখিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থনৈতিক সহযোগিতার মানেই হচ্ছে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে সব বিষয়ে একটি বাজারে পরিণত করা। অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে ভারতের বিশাল অর্থনীতির অঙ্গীভূত করে নেয়া। চুক্তিতে ব্যক্ত ইচ্ছানুযায়ী ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং গঙ্গা অববাহিকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুব্যবস্থা করার ধারার প্রভাব হচ্ছে অনেক সুদূরপ্রসারী। সাহায্য ও সহযোগিতার যে কোন চুক্তি যদি অসম দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়, একটি বৃহৎ এবং ক্ষমতাশালী এবং অপরটি ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্র তাহলে সেই চুক্তির সুবিধা সাধারণভাবেই পাবে তুলনামূলকভাবে যে দেশ বড় ও শক্তিশালী। এ অকাট্য সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অনেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের ভেতরের ভারতপন্থীদের প্ররোচণায় শেখ মুজিব ২৫ বছরের আত্মঘাতী মৈত্রী চুক্তি সই করেছিলেন।

সার্বভৌমত্বের মত বিষয়েও ভারতের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে। স্থলসীমা ছাড়াও, ইকোনমিক জোন সম্পর্কে দু'দেশের ভিন্ন অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জলসীমা নির্ধারণ করতেও দীর্ঘ সময় লাগবে। আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী আমাদের উপকূলের সমুদ্র সীমানাও এ পর্যন্ত ঠিক

করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪ সালে বিতর্কিত কিছু জায়গার ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ভারতের কাছ থেকে পাইনি। সমুদ্রসীমা ও ইকনোমিক জোন সর্ম্পকে ভারতের অবস্থানের ভিন্নতার কারণে যে ছয়টি তেল কোম্পানী ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। তাদের একটি কোম্পানী এ্যাসল্যান্ড অয়েল কোঃ-কে তৈলকুপ খনন করতে বাধা দেয় ভারত। ভারতীয় প্রতিবাদের মুখে ঐ তেল কোম্পানীকে খনন কার্য বন্ধ করে ফিরে চলে যেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কয়েক জায়গায় নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও কিডন্যাপিং এর মত পদক্ষেপের মাধ্যমে কোম্পানীগুলোকে ভয়ও দেখান হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কিছুই করতে পারেনি। বঙ্গোপসাগরের মুখে জেগে ওঠা ভূ-খন্ড বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। হারিয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় দক্ষিণ তালপট্টি নামের এক ভূ-খন্ড জেগে উঠেছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে দুই সরকারের মাঝে সমঝোতা হয় যৌথ সার্ভের মাধ্যমেই তালপট্টির মালিকানা নির্ধারন করা হবে। কিন্তু হঠাৎ করে সমঝোতার বরখেলাপ করে ভারতীয় নৌ বাহিনী একদিন তালপট্টি দখল করে নিয়ে সেখানে ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয় একতরফাভাবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পানি ভাগাভাগির সমস্যা। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অসংখ্য নদী-নালার পানিই হচ্ছে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের জীবন। দেশের বেশিরভাগ নদ-নদীর উৎপত্তি হয়েছে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালায় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, যমুনা, গোমতি, মুহুরী, সুরমা, খোয়াই, কুশিয়ারা, পদ্মার প্রবাহের উপরেই নির্ভরশীল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। আর্ন্তজাতিক নদী গঙ্গার উপর একতরফাভাবে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করায় জনগণের উপর নেমে এসেছে এক দুর্বিষহ অভিশাপ। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ আজ মরু প্রায়। নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে; একই হারে বাড়ছে লবনাক্ততা। লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ ও প্রকৃতির পরিবর্তন আজ বাংলাদেশের জন্য এক হুমকির সৃষ্টি করেছে। গঙ্গার পানি বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের জীবনসংস্থানের জন্য অতি প্রয়োজন। ফারাক্কা বাঁধের ফলে পানির অপ্রতুলতা দু'দেশের মধ্যে তিক্ততাই বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে একটি ন্যায়সংগত সমাধান খুঁজে পাবার চেষ্টা না করা হলে বাংলাদেশ-ভারত সর্ম্পকের আরো অবনতি ঘটবে ভবিষ্যতে। ভারত তিস্তা নদীর উপরও বাঁধ দিয়েছে একতরফাভাবে। এ নদীর পানি ভাগাভাগির ব্যাপারেও তারা এখন পর্যন্ত কোন আলোচনা করছে না। বাঁধ দেয়ার ফলে নদীতে পানির প্রবাহ কমে গেছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চারটি জেলা ক্ষতিগ্রস' হচ্ছে। এছাড়া ভারত খোয়াই, গোমতি এবং আরো প্রায় দশটা নদীতে বাঁধ দিচ্ছে একতরফাভাবে, কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই। এর ফলে খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে কৃষির জন্য যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন হবে কৃষকরা তা পাবে না। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং গঙ্গা অববাহিকার পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য ভারত ইতিমধ্যে আবার এক লিংক ক্যানালের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তারা চাচ্ছেন ক্যানাল খুড়ে ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি সরবরাহ করা হবে গঙ্গা ও হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়াবার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোন যুক্তিতেই এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন। যদিও মৈত্রী চুক্তিতে বলা হয়েছে, "আমাদের দুই দেশের মাঝে সীমান্ত হবে শান্তি ও বন্ধুত্বের অনন্তকালের সাক্ষী।" কিন্তু সামরিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথার ভিন্ন মানেও খুজে পাওয়া যায়।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্রিকরণের মাধ্যমে একটি অখন্ড প্রতিরোধ ব্যবস্থা কায়েম করার যে সামরিক উদ্দেশ্য ভারত অনেকদিন ধরে মনে পোষণ করে আসছে তার সাথে স্বাধীনতার পরপর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচারণা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার 'বাংলাদেশের মত ক্ষুদ্র আর গরীব দেশের জন্য কোন বড় আকারের সেনা বাহিনীর প্রয়োজন নেই' এর একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। ভারতের লক্ষ্য অর্জন করার জন্যই আওয়ামী সরকার এ ধরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। অনন্তকালের শান্তি আর বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব শুধুমাত্র দুই দেশের মধ্যে

সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনার সব পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমেই। রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সময় ও বাস্তবতার সাথে পরিবর্তনশীল। তাছাড়া দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যেখানে রয়েছে হাজারও সমস্যা সেখানে অনন্তকালের শান্তি আর বন্ধুত্বের গ্যারান্টি পাওয়া অসম্ভবই শুধু নয় অবাস্তবও বটে। বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি যেখানে সম্পূরক না হয়ে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলক এবং অসম অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ফলে যেখানে চোরাচালান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে দুর্বল প্রতিরক্ষা বাহিনীর তত্ব কি করে জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করতে পারে? তথাকথিত অনন্তকালের শান্তিই বা কি করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভ

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক ধরণের সমস্যাই থাকতে পারে। তাই বলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলোর সমাধান করা যাবে না এমনটা ভাবাও যেমন ঠিক নয় তেমনি দু'দেশের মধ্যকার সব সমস্যা সংঘাতের মাধ্যমেই শুধু নিরসন করা সম্ভব এ ধারণাও সঠিক নয়। দু'দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা, পরিপক্কতা, গতিশীলতা ও মানবিক দৃষ্টিকোন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার আন্তরিকতাই শুধু গড়ে তুলতে পারে বন্ধুত্ব। এর জন্য পোষাকি চুক্তির প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে অবিশ্বাস, দমন নীতি, একে অপরকে ঠকাবার প্রচেষ্টা যেখানে প্রকট সেখানে স্বাক্ষরিত চুক্তিও কোন কাজে আসে না।

“এক নেতা এক দেশ শেখ মুজিবের বাংলাদেশ!”

এ ধরণের শ্লোগান কোনভাবেই গণতান্ত্রিক নয়। হিটলারের জার্মানির ফ্যাসিস্ট নাজিদের অথবা মুসোলিনির ইতালির ফ্যাসিস্টদের শ্লোগানের সাথে এর মিল খুজে পাওয়া যায়। ব্যক্তি পুজাঁ যে কোন নেতার জন্য ভালোর চেয়ে মন্দই ডেকে আনে। ইতিহাসে এ ধরণের বহু নজির রয়েছে।

১৯৭৫ সালের আগে আইনজীবিরা সুপ্রীম কোর্ট এবং হাই কোর্টের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে রায় দেন। সরকার কর্তৃক বেআইনীভাবে আটককৃত অনেক রাজবন্দীদের তারা মুক্তিও দিয়েছিলেন সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। রক্ষীবাহিনীর অসামাজিক বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে আইনজীবিরা বিশেষভাবে সমালোচনা করতে থাকেন। কোন একটি কেসের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট রায় দানকালে বলে, “দেশের প্রচলিত সব আইন ও প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করে জাতীয় রক্ষীবাহিনী তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।” সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করে, “রক্ষীবাহিনী কোন আইনের ভিত্তিতে তাদের কার্যকলাপ জারি রেখেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।” এ ব্যাপারে **Far Eastern Economic Review** এর জানুয়ারীর ১০তাং ১৯৭৫-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন **Mujib’s Private Army’** এর প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আইনজীবিদের সরকার বিরোধী কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজিব আইন বিভাগের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্য আদেশ জারি করেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে তার অধ্যাদেশে বলা হয়, “দেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ দেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগ করা হবে। প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে যেকোন বিচারককে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে তার খারাপ ব্যবহার কিংবা অযোগ্যতার কারণে।” ফলে আইন বিভাগ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রধানের ত্রিয়াণকে পরিণত করা হয়।

জনগণের ফান্ডামেন্টাল রাইটস ও মানবিক অধিকার কায়েম রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য নেবার পথও বন্ধ করে দেন শেখ মুজিবর রহমান। সংশোধিত বিধিতে বলা হয়, “এ আইনের বলে সংসদ গণতান্ত্রিক কোর্ট, ট্রাইবুনাল কিংবা কমিশন গঠন করতে পারবে। এসমস্ত গঠিত করা হবে জনগণের ফান্ডামেন্টাল এবং মানবিক অধিকারগুলো যে সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের পার্ট থ্রি-তে বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর নিশ্চয়তা প্রধান করার স্বার্থে।” এভাবেই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং দেশের সব আইন তার মুঠোয় নিয়ে শেখ মুজিব দেশে কায়েম করলেন স্বৈরাচারী একনায়কত্ব। শ্লোগান তোলা হল, ‘এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ’!

এ শ্লোগান গণতান্ত্রিক শ্লোগান নয়। এটা ছিল নাৎসী জার্মানীর হিটলার কিংবা ইটালীর মুসলিনির শ্লোগান। ব্যক্তি পুজাঁ কোন নেতার ভাবমুর্তিকে উজ্জ্বল করার পরিবর্তে তার চরম ক্ষতিই সাধন করেছে। এর নজির ইতিহাসে অনেক খুজে পাওয়া যাবে।

১৯৭৫ সালের ২১শে জুন রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সারা বাংলাদেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৬ই জুলাই শেখ মুজিব ৬১ জন জেলা গভর্ণরের নাম ঘোষণা করেন। তারা ১লা সেপ্টেম্বর থেকে জেলা প্রশাসনের সর্বময় অধিকর্তা হয়ে বসবেন সেটাই ছিল সরকারি সিদ্ধান্ত। ৬১জনের মাঝে ৪৪ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতারা এবং বাকি ২৭ জন ছিলেন বাছাই করা সাংসদ। জাতীয় সংসদের মধ্য থেকে বাছাই করে নেয়া সদস্যবৃন্দ। নিয়োজিত গভর্ণরদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন প্রাক্তন **CSP** অফিসার, ৬ জন ছিলেন প্রাক্তন **EPCS** অফিসার, কাদের সিদ্দিকী, সেনা বাহিনীর একজন কর্নেল এবং পার্বত্য চট্টগাম থেকে দু’জন উপজাতীয় নেতা।

এই ৬১জন গভর্ণরদের বিশেষ রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। প্ল্যান অনুযায়ী ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে প্রশিক্ষণ শেষে তারা যার যার জেলায় গিয়ে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ

করবেন। তাদের প্রত্যেকের অধিনে দেয়া হবে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অর্ধেক ব্যাটেলিয়ন। তারা সরাসরিভাবে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের কাছেই জবাবদিহি থাকবেন। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রতি গভর্ণরের অধিনে একটি পূর্ণাঙ্গ রক্ষীবাহিনীর ব্যাটেলিয়ন নিয়োগ করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল। এসমস্ত গভর্ণরদের অধিনে রক্ষীবাহিনী নিয়োগ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের অধিনস্থ জেলায় বাকশাল বিরোধীদের সমূলে নির্মূল করে মুজিব ও তার পারিবারিক শাসন বংশানুক্রমে বাংলাদেশের মাটিতে পাকাপোক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশকে ভারতের পদানত একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা।

নির্যাতন ও সংগ্রাম

আওয়ামী বাকশাল শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের আন্দোলন বিশদ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

আওয়ামী-বাকশাল বিরোধী আন্দোলনকালে বিভিন্ন বিরোধী দলগুলো সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তাদের দলীয় অবস্থা, আন্দোলনের স্বরূপ, দলীয় নীতি ও কার্যপ্রনালী, সাফল্য, ব্যর্থতা, দলীয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্ন তৎপরতা প্রভৃতি বিষয় এবং তাদের প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারা যাবে এ আলোচনার মাধ্যমে। বিচ্ছিন্নভাবে তাদের দলীয় প্রতিরোধ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে কতটুকু কার্যকরী ছিল এবং তারা কি কখনও একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে পারত কি না সে সম্পর্কেও জনগণের মনোভাব বোঝা যাবে। সে সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি কেন? ঐক্য গঠন করার পথে বাধা ছিল কোথায়? ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদৌ কোন চেষ্টা হয়েছিল কিনা? এসমস্ত বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল উৎপাটন করার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছিল এবং তারা তাদের উদ্দেশ্যে কতটুকু সফলকাম হয়েছিল, এসমস্ত প্রশ্নের জবাব খুজে পাবার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনের যুক্তিকতা।

গোড়া থেকেই আওয়ামী-বাকশালী বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী। কিন্তু তার সেই বিরোধিতার আগুন সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে সংগঠিত করতে পারেনি তার দল। '৭১ এর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ভাসানী ন্যাপের দলীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর ভেঙ্গে পড়া সেই দলকে আবার গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করার মত অবস্থা ছিল না মাওলানা ভাসানীর। বার্ধক্যের জড়া এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যই ছিল এর প্রধান কারণ।

আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের বিরোধিতা করেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই জন্ম হয়েছিল জাসদের। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের একাংশ দাবি জানায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই কায়েম করতে হবে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ। জনাব সিরাজুল আলম খানই ছিলেন এ দাবির মূল প্রবক্তা। জনাব আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই জনগণের মধ্যে এ দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা করেন এবং এ দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই গ্রুপ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিল করে দিলে ১লা মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন বলে দাবি তোলেন। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রসিদ্ধ বটতলায় জনাব রব সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এর পরদিনেই এক সভায় শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে হঠাৎ করেই জনাব সিরাজ স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। রব-সিরাজ গ্রুপ মনে করেন ইয়াহিয়া সরকারের সাথে শেখ মুজিবের আলোচনার ফলে জনগণের বিপ্লবী চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল; তাই তারা শেখ মুজিবকে সব আলোচনা বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্র এর সাক্ষ্য দেয়। ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন জনাব মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধকালে তারা জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকারের প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করে জনাব তাজুদ্দিনকে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করার পরামর্শ দেন ও তাদের কথা মেনে নেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। ফলে জনাব তাজুদ্দিনের সাথে তাদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। জনাব তাজুদ্দিন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবের উপর এই গ্রুপের প্রচন্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে

তাজুদ্দিন যখন তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তখন তারা বুঝতে পারলেন প্রবাসী সরকারের অধিনে মুক্তিযুদ্ধ করলে তারা তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা দু'টোই হারাবেন। তাই তারা পরবর্তিকালে ভারতীয় সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থা 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সহায়তায় তাজুদ্দিন সরকারের আওতার বাইরে মুজিব বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীর সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এ বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলতে ভারত সরকার সাহায্য প্রদান করে। যদিও মুজিবের ফিরে আসার পর তার প্রধান্যই বজায় রাখার জন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে এ বাহিনী গঠন করা হয়েছে বলে জনগণ মনে করে।

কিন্তু রব-সিরাজ গ্রুপ মুজিব পূজায় কতটুকু বিশ্বাস রাখতেন সেটা ছিল একটা বড় প্রশ্ন। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালেই ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, এর মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেন সর্বদা পর্দার অর্ন্তরালে থাকা নেপথ্যের নায়ক জনাব সিরাজুল আলম খান। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সমন্বয়ে ৩১শে অক্টেবর ১৯৭২ সালে মেজর জলিলকে প্রেসিডেন্ট এবং জনাব রবকে সাধারণ সম্পাদক করে আত্মপ্রকাশ ঘটে নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' বা জাসদ-এর। নতুন রাজনৈতিক দলের মূল তাত্বিক গুরু হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব সিরাজুল আলম খান। জাসদের অভিমত ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন জাতির মুক্তি সংগ্রামের রূপ নিচ্ছিল ঠিক তখনই তাকে বন্ধ করে দেয়া হয় চক্রান্তের মাধ্যমে। স্বাধীনতা সংগ্রামকাল থেকেই জাসদ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে আসছিলেন বলে তারা দাবি করেন। তাদের সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর। তারা দাবি তোলেন জনগণের ৮% সমর্থনপুষ্ট আওয়ামী লীগ জাতীয় সম্পদের ৮৫% লুট করে নিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে। (জাসদের ১৯৭৩ সালের ঘোষণাপত্র দ্রষ্টব্য)। জাসদ নিজেকে সত্যিকারের সর্বহারাদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ (BCL) এর গণসংগঠক হিসাবে দাবি করে। বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট লীগ গঠন করেন জনাব সিরাজুল আলম খান। এটি ছিল একটি গোপন সংগঠন। যুদ্ধকালীন সময় থেকে জাসদের জন্ম পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সালে সরকারি আদেশে বন্ধ করে দেয়ার আগ পর্যন- বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ কতৃর্ক গণকন্ঠ নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। অতি পরিচিত ও বিখ্যাত প্রগতিশীল কবি আল মাহমুদ ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক।

দেশের অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলোর মতই দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি জনগণের কাছে তুলে ধরে জাসদ। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগের ছাত্রফ্রন্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলনে ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে তৎকালীন জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বসমূহের বিশ্লেষন করে জাতীয় বিপ্লবকে বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে দ্বন্দ্বগুলোর অবসান ঘটানোর জন্য বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে দলিলে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ সমাজতন্ত্রের উত্তরণে তিনটি ধাপ নির্ণয় করে বলে, "স্বাধীনতা সংগ্রামের তৃতীয় ধাপের পরিসমাপ্তি ঘটবে আওয়ামী লীগ ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের সাথে সর্বহারাদের রক্তক্ষয়ী ভবিষ্যত সংগ্রামের মাধ্যমে।" সংসদীয় রাজনীতিকে স্বার্থবাদী মহলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করা হয়। গ্রামের সামন্তবাদীর অবশেষ, মধ্যসত্বভোগী এবং উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের সর্বহারাদের শত্রু শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয় সেই দলিলে। তাদের দলিলে বলা হয় জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার শাসন কায়েম হওয়ার আগে জনগণ বর্হিঃশোষণের শিকারে পরিণত হবে কারণ আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের পদানত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগের তত্ব অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পরিচালিত হবে মূলতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঋন ও অনুদানের মাধ্যমে। তবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হবে রুশ ও ভারতের দ্বারাও। এজন্য প্রয়োজনীয় শোষণমূলক অর্থনৈতিক সম্পর্কের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাদের রিপোর্টে বলা হয়- যুক্তিহীন এবং অন্যায়ভাবে ঢাকার পরিবর্তে দিল্লীতে ইন্দো-বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ মনে করে কোন এক পর্যায়ে গণচীন

বাঙ্গালীদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে যদিও কম্যুনিষ্ট লীগ আর্ন্তজাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দ্বন্দ্বের বাইরে নিজেদের রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল; তথাপি চীনপন্থী অন্যান্য সাম্যবাদী লেনিনবাদী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছিল রিপোর্টে। জাসদ মুক্তি বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের মাঝ থেকে দলীয় সদস্য রিক্রুট করতে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাদের প্রকাশনী লাল ইশতেহার এর মাধ্যমে গোপন সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে জাসদ।

২০শে জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে জাসদ, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট লীগ এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ (জাসদপন্থী) যুক্তভাবে বাংলাদেশের উপর মার্কিন, রুশ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধিতা করে এক হরতালের ডাক দেয়। হরতালের সময় নেতারা শিক্ষক এবং শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানান। তারা বাংলাদেশের সর্বোপরিসরে দুর্নীতি, বিশেষ জরুরী আইন, সরকারের স্বজনপ্রীতি এবং বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে পারমিট লাইসেন্স বিতরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দেশব্যাপী সেদিন পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ১৭ই মার্চের মধ্যে সরকার তাদের দাবি না মানলে তারা ঘেরাও এর হুমকি দেন। ১৭ই মার্চ জাসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশ ঘেরাও ভঙ্গ করে। পুলিশের গুলিতে ৩জন নিহত ও ১৪ জন গুরুতরভাবে আহত হন। মেজর জলিল, জনাব রব এবং আরো ৪০জন জাসদ কর্মী আহত অবস্থায় বন্দী হন। গোপন সংগঠনের অন্যান্য নেতাদের সাথে জনাব সিরাজুল আলম খান সেদিন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তারা গ্রামাঞ্চলে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। সেদিনের ঘটনাকে অনেকে চরম হঠকারী প্ররোচণা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জাসদ সম্পর্কে তার 'স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়' গ্রন্থে লেখেন, "মুসলিম লীগের ঘর ভেঙ্গে একদা আওয়ামী লীগ বের হয়ে এসেছিল। অনেকটা সেই পদ্ধতিতেই আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে বের হয়ে এসেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। এরা নিজেদেরকে বলছে র‍্যাডিকেল-চরমপন্থী। তাদের তরুণ ও বিরাট কর্মী বাহিনী যে সমাজতন্ত্রের ডাকেই এই দলে এসে যোগ দিয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনই কারণ নেই। কিন্তু নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা মনে হয় সমাজতন্ত্রী ছিলেন না। আওয়ামী লীগারই ছিলেন আসলে। তাদের ইচ্ছা ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করবেন। কিন্তু শেখ মুজিব তার অবস্থান ছেড়ে বিপ্লবী হতে রাজি হননি ফলে এরা এগিয়ে গেছেন নিজেদের পথ ধরে। এদের দলের নামের সঙ্গে 'জাতীয়' এর যোগাযোগ আপতিক ঘটনা বলে মনে হয় না। এরাও জাতীয়তাবাদীই ছিলেন। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থই দেখছিলেন (যার সঙ্গে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত)। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের আওয়াজ দিয়েছেন যাতে লোক জড়ো করা যায়, নায়ক হওয়া যায় নতুন প্রজন্মের ও নতুন বাংলাদেশের। শেখ মুজিব যদি আর না ফেরেন তাহলে বামপন্থীদের কি করে মোকাবেলা করা যাবে তার আগাম ব্যবস্থা হিসেবে এরা একাত্তরে মুজিব বাহিনী গড়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের রাজনীতি ছিল বুর্জুয়াদের রাজনীতিই। যদিও তাদের আওয়াজগুলো ছিল 'বিপ্লবী'; ফলে তাদের নেতারা জাতীয় পুর্নগঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকেই সমর্থন দান করে যাচ্ছিলেন এতে বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই।"

তার এই বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার ভার রইলো পাঠকদের উপর। জাসদের এবং মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠে। ভারতীয় সরকার চার খলিফার মাধ্যমে প্রথমে মুজিব বাহিনী, পরে খলিফাদের মূল ব্যক্তিত্ব জনাব সিরাজুল আলম খানের প্রচেষ্টায় জাসদ সৃষ্টি হওয়ায় বিশেষভাবে উপকৃত হয়। শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং এর সাথেই জনাব সিরাজুল আলম খানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল তা নয়; সংগ্রামকালে ১৯৭১ সালে ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণের সাথেও জনাব সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সালে জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রনেতারা দিল্লী গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাজুদ্দিনের বিরোধিতা করে তাদের নেতৃত্বে মুজিববাহিনী গঠন করার প্রস্তাব পেশ করলে ভারত সরকার প্রধান শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী

ও 'র' প্রধান জেনারেল ওবান সিং তাদের সেই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন মূলতঃ দু'টো সুদূরপ্রসারী কারণে।

প্রথমত: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে এদের গুটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে।

দ্বিতীয়ত: এ বাহিনীর মাধ্যমে মুজিব ও তার সরকারকে সম্পুর্ণভাবে ভারতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল করে তুলে শেখ মুজিবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে। অনেকের মতে জাসদকে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতের ক্ষমতা বলয়ের একাংশের সমর্থন ও মদদেই। জাসদের মূল্যায়ন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে যেভাবেই করা হোক না কেন একটি সত্যকে কোন ঐতিহাসিকই অস্বীকার করতে পারবেন না- স্বৈরাচারী নির্যাতনের হাত থেকে জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করার জন্য জাসদের ডাকে হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ কর্মী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। নেতারা কে কি ভেবেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গবেষণার বিষয়, তবে কর্মীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মধ্যে ছিল না কোন খাঁদ কোন কলুশতা। মুজিবের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তাদের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি প্রজন্ম। তাদের রক্ত প্রেরণা যোগাবে প্রতিটি বাংলাদেশী দেশপ্রেমিককে তাদের ভবিষ্যত সংগ্রামে। তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার সঠিক মূল্যায়নের মাঝে খুজে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের সঠিক দিক নির্দেশনা। আওয়ামী-বাকশালী শাসনের বিরোধিতা করেছিল বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCPL)। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পিকিংপন্থী ৫টি কম্যুনিষ্ট গ্রুপ একত্রিত হয়ে যে বিপ্লবী সমন্বয় কমিটি কোলকাতায় গঠন করেছিল তাদেরই চারটি গ্রুপের ঐক্যের মাধ্যমে স্বাধীনতার পর সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী। এ পার্টিতে যোগ দেয় (১) কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (২) পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি র্মাকসবাদী, লেনিনবাদী (৩) খুলনার কিছু কম্যুনিষ্ট কর্মী জনাব মারুফ হোসেন ও ডঃ সাইদুর দাহারের নেতৃত্বে। (৪) জনাব নাসিম খানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক কম্যুনিষ্ট। এই দলের নেতারা মনে করেন পূর্ব বাংলায় কম্যুনিষ্টরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিষ্টদের পক্ষে নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হয়নি। তাই তারা কম্যুনিষ্ট ঐক্য গঠন করে অসম্পূর্ণ বিপ্লব সম্পূর্ণ করার আহ্বান জানান। 'একটি ঐক্যবদ্ধ কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলুন' শিরোনামের একটি ইশতেহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট সংহতি কেন্দ্র এ আহ্বান ঘোষণা করে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এরই ফলে গঠন করা হয় বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী (BCPL)। এই পার্টি প্রকাশ্য এবং একই সাথে গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। BCPL বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি ছাত্রফ্রন্টও গঠন করেন। শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য গঠন করা হয় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন। পরবর্তিকালে বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী দল তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (UPP) গঠন করেন। ১৯৭৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জনাব নাসিম আলী খান এই রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করেন। UPP এর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে BCPL এর দর্শনের মিল পাওয়া যায়। দু'টো দলের মতেই বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায় ১৯৭১ সালে, যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল বুর্জুয়াদের হাতে। দু'দলই অভিমত পোষণ করে সোভিয়েত রাশিয়া একটি সংশোধনবাদী দেশ এবং রাশিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ করা। ভারতকে ও দু'টো দলই সম্প্রসারণবাদী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু দু'টো দলই ভারতের নকশাল আন্দোলনের সমালোচনা করে এবং আন্দোলনকে শৃঙ্খলাহীন হঠকারীতা বলে আখ্যায়িত করে। (দ্রষ্টব্য: বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমল সেনের ১৯৭২ সালের ঘোষণাপত্র।) UPP এর তুলনায় তাদের গণসংগঠন শ্রমিক এবং ছাত্রসংগঠন অনেক দুর্বল ছিল ফলে দেশব্যাপী তাদের আবেদনও ছিল কম এবং অঞ্চলভিত্তিক। যদিও BCPL এর বেশিরভাগ নীতি আদর্শের সাথে মিল ছিল দেবেন সিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) মূল সমন্বয় কমিটির অপর

একটি দলের তবুও সামান্য কয়েকটি বিষয়ে মত পার্থক্যের ফলে এ দলটি BCPL এর সাথে ঐক্য স্থাপন করা থেকে বিরত থাকে। এই দলটি বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী নির্যাতনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল কারণ বলে আখ্যায়িত করে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের উপর ভারতের আধিপত্যকেই মূল দ্বন্দ্ব বলে নির্ধারণ করে। এ দলের নেতৃবৃন্দ অভিমত পোষণ করেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তি সংগ্রামে গণচীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিই মুখ্য ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে BCPL নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল কিছুটা নমনীয়। এ ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে হলে পাঠকদের ১৯৭২ সালে 'পূর্ববাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির আবেদন' নামে সলিডারিটি সেন্টার অফ বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহারটি এবং 'বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলুন' BCPL কর্তৃক প্রকাশিত ইশতেহার দু'টি পড়ে দেখতে হবে। সিকদার-বাশার গ্রুপের পার্টিকে পরে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি বলা হয়। এই দলও প্রকাশ্য এবং গোপন রাজনীতি পাশাপাশি চালিয়ে যাবার পক্ষে ঘোষণা দেয়। এ দলেরও নিজস্ব ছাত্র, শ্রমিক সংগঠন গঠন করেন নেতৃবৃন্দ। কৌশলগত কারণে এ দলটি সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দেয়। BCPL এবং UPP দু'টো দলই প্রকাশ্য গণসংগঠন এবং পার্টি সেল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এদের ছাড়া আরো চারটি রাজনৈতিক সংগঠন শুধুমাত্র তাদের গোপন পার্টি সেল এবং গোপন সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে। এই চারটি দলের দু'টো দল ছিল EPCP(ML) থেকে বেরিয়ে আসা কম্যুনিষ্টদের নিয়ে গঠিত। তৃতীয় দলটি ছিল পূর্ববাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা একটি অংশ। পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে সিকদার-বাশারও গঠন করেছিল BCP (বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি)।

চতুর্থ দলটি ছিল এসমস্ত দলগুলোর উৎস থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গড়ে ওঠা সর্বহারা পার্টি (পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি)। বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন। এ আন্দোলন থেকেই পরে গড়ে উঠে সর্বহারা পার্টি। ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকারের হাতে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই পার্টির নেতৃত্ব দেন। এ দলের নেতৃত্বে মূলতঃ ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ। যার ফলে তাদের বিপ্লব সম্পর্কীয় গবেষণা এবং প্রচারণা অন্যান্য পার্টিগুলোর চেয়ে ছিল ভিন্নতর এবং অধিক কার্যকরী। লাল ঝানডা এবং সংবাদ বুলেটিন ছাড়াও এ পার্টি নিয়মিতভাবে তাদের কেন্দ্রিয় কমিটির বৈঠক সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর লিখিত দলিল প্রকাশ করতো। বেশিরভাগ দলিলগুলো জীবিত অবস্থায় ছিল সিরাজ সিকদারের নিজ হাতে লেখা। তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সুবিন্যাস্ত এবং প্রচার মাধ্যম ছিল অতি উত্তম। দেশের যে কোন প্রান্তে তাদের প্রকাশিত দলিলপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। সর্বহারা পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল ও বিপ্লবী পার্টিগুলোর সাথে একমত হয়ে মত প্রকাশ করে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে তড়িঘড়ি করে শেষ করে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় বাংলাদেশের বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আওয়ামী লীগ সরকারকে তারা ভারতের পুতুল সরকার বলে অভিহিত করেন। পার্টির প্রকাশনায় প্রচারিত হয় স্বাধীনতার পর ভারতের সহায়তায় ক্ষমতায় বসে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে লুটপাট করে ভারতীয় নীল নক্শা বাস্তবায়নের পরিপ্লনাকেই সহায়তা করতে থাকে। সর্বহারা পার্টি মনে করে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত বিকল্প প্রথায় বাংলাদেশে তাদের স্বার্থ বজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য তাদের সামরিক অবস্থানকেই অটুট রাখে। বাংলাদেশ আওয়ামী সরকারের অধিন মার্কিন ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের হুমকির সম্মুখীন বলেও সর্বহারা পার্টি জনগণকে হুশিঁয়ার করে দেয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের আহ্বানকে সর্বহারা পার্টি ট্রটস্কাইডপন্থী হঠকারীতা বলে আখ্যায়িত করে। কারণ জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয় বলে পার্টির তাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেন। তারা আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে জাতীয় বিপ্লব সম্পূর্ণ করা অসম্ভব কারণ তারা চারিত্রিকভাবে জাতীয় বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি নয়, তারা হল সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের দালাল এবং মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতিনিধি। সর্বহারা পার্টির মতে বাংলাদেশের অসম্পূর্ণ বিপ্লবকে ধাপে ধাপে চুড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের। বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার জন্য

সর্বহারা পার্টি কৃষক, শ্রমিক, নিপীড়িত জনতা, বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গোষ্ঠির সমন্বয়ে গড়ে তোলে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নামে একটি গণসংগঠন। সর্বহারা পার্টির তাত্ত্বিকরা মনে করেন যেহেতু বাংলাদেশ তিন দিক দিয়েই ভারত বেষ্টিত, সেক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্য বাইরের কোন সাহায্য পাওয়া হবে অতি দুঃষ্কর। তাই বিপ্লবীদের নিজস্ব শক্তির উপরই মূলতঃ নির্ভরশীল থাকতে হবে। সিরাজ সিকদারের গতিশীল নেতৃত্বে এবং সর্বহারা পার্টির বিপ্লবী কার্যক্রমে মুজিব সরকারের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। অসীম সাহসিকতার সাথে সর্বহারা পার্টির সদস্যরা একের পর এক সফল অভিযান চালিয়ে সরকার ও তার বিভিন্ন বাহিনীকে নাজেহাল করে তুলতে সমর্থ হয় অতি অল্প সময়ে। তাদের সাফল্যে দেশজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। তরুণ সমাজের কাছে পার্টির ভাবমুর্তি বেড়ে যায়। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দলে দলে জনগণের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিতে শুরু করে এবং পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। এত অল্প সময়ে এ ধরণের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জাসদের চেয়েও ক্রমান্বয়ে সর্বহারা পার্টি বেশি জনসমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়।

১৯৭৩ সালের ২রা ডিসেম্বর এক বিবৃতির মাধ্যমে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী সর্বহারা পার্টিকে সমর্থন জানান এবং সিরাজ সিকদারকে অভিনন্দন জানান। ১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী শেখ মুজিবের নির্দেশে রক্ষীবাহিনীর শেরেবাংলা নগরের ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় অকথ্য নির্যাতনের পর বীর মুক্তিযোদ্ধা সর্বহারা পার্টির শীর্ষ নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এভাবে চরম নিষ্ঠুরতায় পার্টি নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার পর অর্ন্তদন্ধ ও নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে এবং সরকারি নিষ্পেষণে সর্বহারা পার্টির সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। জাতীয় পরিসরে পার্টির প্রভাব ও কর্মকান্ড এবং শক্তি ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে। নেতৃত্বের দুর্বলতায় কর্মীরা উদ্দামহীন হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। ফলে জনগণও হতাশ হয়ে সন্দিহান হয়ে উঠে সর্বহারা পার্টির ভবিষ্যত সম্পর্কে। এভাবেই সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সাথে সাথে হঠাৎ করে জেগে উঠা গণমানুষের মুক্তির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায় স্বৈরশাসনের আগ্রাসী জিঘাংসায়।

জনাব তোহা ও শরদীন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল গোপন সংগঠন হিসেবে মুজিব বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করছিল। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে ১৯৬৮ সালে পিকিংপন্থী হিসাবে এ দলের উৎপত্তি ঘটে। স্বাধীনতার পর এই দল তাদের মুখপত্র গণশক্তির মাধ্যমে দাবি জানায়, ‘‘বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। রুশ-ভারত চক্র মূলতঃ বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের প্রতিষ্ঠিত মুজিবের পুতুল সরকারের মাধ্যমে।’’ সর্বহারা পার্টির মতই সাম্যবাদী দল বাংলাদেশের রক্ষীবাহিনীকে পরোক্ষভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপস্থিতি বলেই মনে করে। কারণ এই রক্ষীবাহিনী সর্বোতভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যেই গঠন করা হয়েছিল। সাম্যবাদী দল অভিমত প্রকাশ করে যে, রক্ষীবাহিনী তৈরি করে তাদের সাথে যৌথভাবে ভারতীয় বাহিনীর সহযোগিতায় সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলোকে দমন করার চেষ্টা করছে। মুজিব তার সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যই রক্ষীবাহিনী তৈরি করার ভারতীয় প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। সর্বহারা পার্টির মতই সাম্যবাদী দল একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে এবং একই সাথে গোপনে গণবাহিনী সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানত: ঢাকা, রাজশাহী, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর জেলাতেই সাম্যবাদী দল তাদের ঘাটি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে ঐ জেলাগুলোতেই তাদের সরকার বিরোধী সংগ্রাম তীব্রতা লাভ করে। প্রগতিশীল এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী ভূমিকায় মূল্যবান অবদান রাখলেও দলীয় মতবিরোধ ও পার্থক্য নিয়ে দলগুলো একে অপরের প্রকাশ্য সমালোচনা ও নিন্দা করতে থাকে।

সাম্যবাদী দল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে BCPL এবং BCP এর অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করে। BCPL এবং BCP আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের উপর নির্ভরশীল বলে দাবি করলে সাম্যবাদী দল এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বলে, "আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের পুতুল সরকার। তাকে ভারতের উপর নির্ভরশীল বলা মানেই হচ্ছে তাদের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখা।" সর্বহারা পার্টির সমালোচনা করে সাম্যবাদী দল বক্তব্য দেয়, "সাম্যবাদী দল সর্বহারা পার্টিকে একটি হঠকারী গ্রুপ বলেই মনে করে। এ গ্রুপ আত্মম্ভর সিরাজ সিকদারের ভুল প্ররোচণায় পরিচালিত হচ্ছে।" সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বন্দ্বকে প্রধান্য দেওয়ায় সাম্যবাদী দল সর্বহারা পার্টির্কে তাত্বিক দিক দিয়েও ভুল এবং দুর্বল বলে দাবি তোলে। সাম্যবাদী দলের তত্ব অনুযায়ী, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্বই মূল দ্বন্দ্ব। (দ্রষ্টব্য: সাম্যবাদী দলের প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দলিল– 'বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল', ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ– 'এক ভূইফোড় বিপ্লবী সম্পর্কে') একইভাবে জাসদ সম্পর্কে সাম্যবাদী দলের অভিমত ছিল, আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা তরুণ নেতাদের সমন্বয়ে ভারতই এই সংগঠন গড়ে তোলায় সাহায্য করে। মুজিব ও তার অনুগতদের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যেই ভারত জাসদ গঠনে মদদ যোগায়। (দ্রষ্টব্য: এপ্রিল–মে ১৯৭৩ সালে গণশক্তিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'ইস্পাত কঠিন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে গড়ে তুলুন') জনযুদ্ধ EPCP (ML)-এর মুখপাত্র হিসেবে সেই সময় আব্দুল হকের সম্পাদনায় বের হত। পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) থেকে বেশিরভাগ কর্মীকে বের করে এনে জনাব তোহা এবং শরদীন্দু দস্তিদার সাম্যবাদী দল গঠন করলেও জনাব আব্দুল হক পার্টির নাম পরিবর্তন না করার প্রশ্নে অটল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) বা EPCP (ML) নামে একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এই গ্রুপটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অস্বীকার করে। স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতীয় আগ্রাসন বলে EPCP (ML) আখ্যায়িত করে। জনযুদ্ধের মাধ্যমে আগ্রাসী শক্তির কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার লাইন গ্রহণ করে EPCP (ML)। এই দল তাদের নাম না বদলানোয় সরকারি নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। গ্রুপের বেশিরভাগ সদস্যই মারা যায় নতুবা কারাবন্দী হয়। জনাব আব্দুল হককে বন্দী অথবা হত্যা করার সরকারি সব প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়।

পূর্ব বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টি (এম এল) EBCP (ML) এবং সাম্যবাদী দলের মধ্যে তত্বগতভাবে খুব একটা ব্যবধান দেখা যায় না। তবে EBCP (ML) কৃষক ও সামন-বাদের অবশেষের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বকে বেশি প্রধান্য দেয়। এ দল ভারতের বিপ্লবীদের সাথে একত্রিতভাবে বিশেষ করে নকশালীদের সাথে সম্পর্ক রেখে বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার ঘোষণা ব্যক্ত করে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য প্রায় বিপ্লবী সব দলগুলোর কাছে নকশাল আন্দোলন একটি চরমপন্থী হঠকারীতা বলেই গৃহিত হয়। নকশালীদের দলগুলো বিশ্বাস করতেও রাজি ছিল না। আত্রাই, রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে EBCP (ML) বিশেষভাবে তৎপরতা চালায়। প্রগতিশীল ও বামপন্থী তৎকালীন প্রায় সবগুলো দলই একমত প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব ১৯৭১ সালে অসমাপ্ত থেকে যায়। মুজিব সরকার বাংলাদেশের উপর রুশ-ভারতের আধিপত্য কায়েমে সহযোগিতা করে। মুজিব সরকার মূলতঃ ভারতের একটি পুতুল সরকার।

উপরের পর্যালোচনা থেকে একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়ে উঠে। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রবীণ নেতৃত্বের চেয়ে নবীনরাই সংগ্রামে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি করে। তারা যখন জনসমর্থন পেয়ে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত তখন পুরনো নেতৃত্ব তাত্বিক কচকচানি নিয়েই ব্যস্ত থেকে নিজেদের দেউলিয়াপনা প্রকাশ করে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের দেউলিয়াপনা, নেতৃত্বের লোভ, ভাববাদী তাত্বিক চর্চা, সন্দেহপ্রবণতা, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা উল্লেখযোগ্য বা আশানূরূপ অবদান রাখতে ব্যর্থ হন। ফলে ক্রমশঃ তারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণভবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নবীন প্রজন্ম তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। নেতাদের

অনেকের ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকলেও এটাই বাস্তব সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ব্যর্থতা সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি সেটাও আজ প্রমাণিত। অতীতে বিভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ যখন সত্যিকারের মুক্তির জন্য পরিস্থিতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন নেতাদের ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ভূমিকার ফলেই ইপ্সিত লক্ষ্য জনগণ অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ সর্বদা চলেছে আগে আর নেতারা চলেছেন পেছনে। আমাদের দেশের জনগণের সংগ্রামের ঐতিহ্যে এটাই বড় সত্য। লজ্জাকর হলেও এ সত্যকে খন্ডাবার উপায় নেই। সত্যকে মিথ্যা করার প্রচেষ্টা থেকেছে সর্বকালে। কিন্তু সত্যকে মেনে নিয়ে এগুলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। মিথ্যার আবর্তে পাওয়া যায় শুধু বঞ্চনা ও প্রতারণা। ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে না চাইলে নতুন প্রজন্মকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতে হবে ভবিষ্যতপানে। তারুণ্যের উদ্দাম ও গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে প্রবীণরা নবীনদের পথ থেকে সরে দাড়ালেই অক্ষুন্ন থাকবে তাদের সম্মান। আর যদি তারা স্বার্থপরের মতো নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করেন তবে তারুণ্যের প্লাবনের দুর্বার স্রোত তাদের টেনে নিয়ে ফেলবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। সময়কে হাতের মুঠোয় পুরে রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে সময়ের দাবিকে মেনে নেয়াটাই হবে নেতাদের জন্য কল্যাণকর। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন সচেতন মুক্তিযোদ্ধারা। সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলো অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার এবং লুটপাটের বিরোধিতার সংগ্রামে উজ্জ্বল প্রতীক। তারা লড়েছেন বিভিন্ন অবস্থানে থেকে। কেউ তাদের নিজস্ব এলাকায় জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ সংগ্রাম করেছেন রাজনৈতিক বিরোধী দলের ছত্রছায়ায়। কেউ বা লড়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে। তাদের এ বহুমুখী ধারার সচেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দেবার প্রচেষ্টা না থাকায় প্রতিরোধ দানা বেধে উঠতে পারেনি। যারা রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন দলীয় গন্ডির মাঝেই তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের মাঝে যে দেশপ্রেম জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সুষ্ঠ নেতৃত্বের অধিনে সুসংহত করতে পারলে বাংলাদেশের বর্তমান অনেক সংকটের অবসান হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদিও তৎকালীন সরকার তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে বাড়তি সুবিধাদী দিয়ে হাত করার চেষ্টা করেছিলেন তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা তাদের সততা, দেশপ্রেম সামান্য প্রলোভনে কারো কাছে বিক্রি করে দেননি।

তুলনামূলকভাবে জামায়াত এবং গোলাম আযমের চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক ছিল শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগ

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করেছিল জামায়াত। কিন্তু তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রক্ষক আওয়ামী-বাকশালীরা স্বাধীনতার পর অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধা।

'৯০ এর দশকের প্রথম যখন প্রফেসর গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিষয়টি কোর্টে বিবেচনাধীন তখন তথাকথিত '৭১ এর চেতনার ধারক-বাহকরা জাহানারা ইমামকে সামনে রেখে 'ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এ বিষয়ে কোন বিতর্কে না গিয়ে সহজেই বলা চলে ঐ ধরণের উদ্যোগ নেবার আগে নিজেদের অতীতের দিকে তাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিন পরই ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪ সালে। চুক্তিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ অপরাধীদের বিনা বিচারে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন মুজিব। আপোষকামী এবং সুবিধাবাদী চরিত্রের শেখ মুজিবর রহমান সর্বোপরিসরে স্বাধীন বাংলার মাটিতে স্বাধীনতার শত্রুদের পুনর্বাসিত করে স্বাধীনতার চেতনার সাথে বেঈমানীর এক অবিশ্বাস্য নজীর স্থাপন করেছিলেন। সে সময় অধুনাকালের তথাকাথিত স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তির চ্যাম্পিয়নরা সব কোথায় ছিলেন? কেন সেদিন শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠলেন না? শেখের আমলে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালত গঠন করা হল না কেন? গোলাম আযম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন তার রাজনৈতিক আদর্শের কারণে। তিনি যদি অপরাধী হন তবে তার চেয়েও বড় অপরাধী শেখ মুজিব, তার দল ও আওয়ামী-বাকশালীরা। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এককভাবে কুক্ষিগত করে নিয়ে স্বাধীনতার চেতনাকে সমূলে উৎপাটন করার চক্রান্ত করে জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তিনি ও তার দল। নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের মাটিতে গণআদালতে গোলাম আযম ও তার দোসরদের বিচারের আগে বিচার করতে হবে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী-বাকশালীদের। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা রুমীর মা জাহানারা ইমাম। পুত্র হারাবার শোকে তার স্বামীও মারা যান। বিশ বছর পর তথাকথিত গণআদালত গঠন করে আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একই মঞ্চে দাড়িয়ে গোলাম আযমের বিচারের প্রহসন করে তিনি তার ছেলে শহীদ রুমীর বুকের রক্তের সাথেই বেঈমানী করার অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা নিধনকারী আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তার সম্মান হারিয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার এ ধরণের উদ্যোগে ব্যক্তিগতভাবে আমিও দুঃখ পেয়েছি। জনাব রব, মেনন এন্ড গং এবং তথাকথিত প্রগতিশীল বিপ্লবী দলগুলোর নেতারা যারা বর্তমানে আওয়ামী লীগের লেজুড়বৃত্তি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন তারাও আজ একই অপরাধে অপরাধী। তাদের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও দলীয় কর্মী। হালে আওয়ামী-বাকশালীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার তাদের অপচেষ্টা জনগণকে বিস্মিত করেছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে আওয়ামী লীগে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা নিজেদের আওয়ামী-বাকশালীদের 'বি' টিম বলে জনগণের মনে যে সন্দেহ বিরাজমান ছিল তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। হারিয়েছেন বিশ্বাসযোগ্যতা। লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর শাস্তিস্বরূপ তারা নিক্ষিপ্ত হবেন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। ইতিহাসের বিধান অমোঘ। সত্যকে খুজে

বের করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকদের। সত্যের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে গতিশীল মানব সভ্যতার ইতিহাস। বাংলাদেশের ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এবং মুজিব সরকার

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চরিত্র এবং প্রত্যয়

স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতি যখন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের ভারত তোষণ নীতি, ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি, সীমাহীন দুর্নীতি, অবাধ চোরাকারবার, রক্ষীবাহিনী এবং ব্যক্তিগত বাহিনী সমূহের ত্রাস, দমন নীতি, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্দ্ধগতি, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, সমাজতন্ত্রের নামে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত; তখন সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তারা শাসকদের হাতে শোষণের হাতিয়ার না হয়ে জনগণের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন।

এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সব দেশই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো অস্ত্রবলে দখল করে নেয়। দখল করে নেবার পর ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রতিটি দেশে জাতীয় শোষক শ্রেণীর যোগসাজসে গড়ে তোলে দু'টো প্রশাসনিক হাতিয়ার, সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র। নিজেদেরকে জনগণের প্রত্যক্ষ শোষক হিসেবে প্রতিপন্ন না করার এক অপূর্ব ব্যবস্থা। 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা' তোলার এ কৌশল গ্রহণ করে জাতীয় শোষক শ্রেণীকে যৎসামান্য সুখ-সুবিধা দিয়ে জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ তারা নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। জাতীয় শোষক শ্রেণীকে বশীভূত করে তাদের বিদেশী ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা প্রগতি ও মানবতাবাদের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে জনগণের মাঝে। তারা মনে করে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেই তাদের দাসত্ব ঘুচেঁ যাবে। দেশের উন্নতি হবে এবং জীবনের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। তারই ফলে শুরু হয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। সংগ্রামের প্রচন্ডতার মুখে এক পর্যায়ে প্রত্যক্ষ শোষণ টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লে ঔপনিবেশিক শাসকরা পরোক্ষ শোষণের বন্দোবস্ত করে। জাতীয় উচ্চবিত্ত ও তাদের দোসরদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দান করে প্রতিটি দেশের উপর পরোক্ষভাবে তাদের শোষণ কায়েম রাখে। বিদেশী প্রভুদের জায়গায় নতুন দেশী প্রভুরা ক্ষমতায় আসীন হয়ে তাদের প্রভুদের শিক্ষা অনুযায়ী এবং প্রভুদের প্রতিষ্ঠিত সামরিক বাহিনী, শাসন ব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রকে অটুট রেখে নিজেদের স্বার্থে জনগণের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে থাকে। জাতীয় শোষক শ্রেণীর এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শুরু হয় জাতীয় শোষণ ও শাসন। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। দেশগুলো আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক সূত্রে অর্থনৈতিকভাবে জরাজীর্ণ এসমস্ত দেশগুলোর শাসনভার যারা গ্রহণ করে তাদের অযোগ্যতা, প্রশাসন চালানোর অনভিজ্ঞতা, লোভ-লালসা, কোন্দল এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ায় পালাক্রমে ক্ষমতা হাতবদল হতে থাকে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত দলগুলোর মধ্যে। এই 'মেরি গো রাউন্ড' এর গোলক ধাধাঁয় আজও তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ ঘুরপাক খাচ্ছে।

সামরিক বাহিনীই ক্ষমতায় থাকুক আর বেসামরিক রাজনৈতিক নেতারাই ক্ষমতায় থাকুক তাদের শিকড় একই শ্রেণীতে। তাই তাদের মধ্যে থাকে এক অটুট বন্ধন। তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইকে রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে জাহির করার প্রচেষ্টা একটা প্রহসন মাত্র। জনগণকে বোকা বানানোর আরেকটি কায়দা। তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব যতই তীব্র হোক না কেন জনগণের বিরুদ্ধে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা নিজেদের বিবাদ ভুলে সব এক হয়ে যায়। এর ফলেই সম্ভব হয় সমঝোতার মাধ্যমে লোক দেখানো গণতন্ত্রের খেলা, দলবদলের ভেলকিবাজী। এই

উদ্দেশ্যেই মুক্তিযুদ্ধের অস্বাভাবিক ইতি টানার সাথে সাথে ঔপনিবেশিক ছাচে গড়া রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো পুরোপুরি অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি, ইতিহাস ও চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পাকিস্তান স্বাধীন করার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার জনগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ সৃষ্ট শাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণের যাতাকলে পিষতে থাকে। এরই ফলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। স্বৈরতন্ত্র বিরোধী জাতীয়তাবাদী এ সংগ্রামে গণতান্ত্রিক চেতনাও গড়ে উঠতে থাকে। সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল দেশ স্বাধীন করে গণতান্ত্রিক, জনগণের মৌলিক এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে স্বনির্ভর সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠিদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল তৎকালীন সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাঙ্গালী সদস্যদেরও। তাদের উপরও করা হয়েছিল অন্যায়-অবিচার। ফলে গোড়া থেকেই তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে এসেছেন জাতীয় সংগ্রামে। জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক সংগ্রামের চরম স্তরই ছিল '৭১ এর স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। হানাদার বাহিনীর আচমকা হামলার মুখে যখন রাজনৈতিক নেতারা জাতিকে লক্ষ্যহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যান তখন ঔপনিবেশিক ছাঁচে গড়া সেনাবাহিনীরই এক জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সেনা অফিসার মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যরাই প্রথম বিদ্রোহ করেন এবং কৃষক, শ্রমিক, যুবক, ছাত্র, প্রশাসনিক আমলাদের একাংশ এবং জনগণের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয় দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম। জনগণের সাথে সৈনিকদের চেতনা, আশা-আকাংখা এক হয়ে মিলে গিয়েছিল বলেই গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। পরবর্তিকালে নয় মাস জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তারা। শ্রেণী বিন্যাসের সব বাধাঁ ভেঙ্গে তারা নিজেদের পরিচয় কায়েম করেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন জনগণের সাথে এক হয়ে গিয়ে যুদ্ধ সংগঠিত করছিলেন তখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগ সদস্য ভারতে পালিয়ে গিয়ে ভারতীয় সরকারের সহায়তায় তথাকথিত মুজিবনগর প্রবাসী সরকার গঠন করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একক নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে বসেন। যুদ্ধক্ষেত্রে না যেয়ে অবস্থান নেন কোলকাতার ৫৮নং বালিগঞ্জ, ৮নং থিয়েটার রোড এবং ১৯নং সার্কাস এ্যাভেনিউতে। এভাবেই তারা নিজেদের ভারতীয় চক্রান্তের ক্রীড়ানকে পরিণত করেন। মুক্তিযোদ্ধারা চেয়েছিলেন তাদের আত্মত্যাগ, তিতিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের সংগ্রাম আর তারই ফলে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে পরীক্ষিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব; যারা পরিচালিত করবে মুক্তি সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর তারা গড়ে তুলবেন জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। কিন্তু ভারতীয় সেনা বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে মুক্তিযুদ্ধ সেই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারেনি। ফলে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন তাদের বদলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে গেল আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে।

যেসব বাঙ্গালী সৈনিকরা ঔপনিবেশিক ধাচেঁ গড়া সেনা বাহিনীর কাঠামো ভেঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের আবার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হল। গড়ে তোলা হল পুরনো ধাচেঁর সশস্ত্র বাহিনী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেশিরভাগই তখন হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন। এই সচেনতার বিকাশ ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। তাই বিশ্বের অন্যান্য গতানুগতিকভাবে সৃষ্ট সেনা বাহিনীগুলোর ধাঁচে তাদের আবার সংগঠিত করলেও চারিত্রিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহৎ অংশই ছিলেন নিঃস্বার্থ অকুতোভয়, দেশপ্রেমিক। কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট বক্তা মুক্তিযোদ্ধারা কোন অন্যায়কে মেনে নেননি যুদ্ধের সময় থেকেই। সীমিত গন্ডির ভেতরে থেকেও তারা সব অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন; সুযোগ মত অন্যায়কে প্রতিহত করার চেষ্টাও করেছেন সাধ্যমত। তাই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় এ ধরণের চরিত্রের সেনাবাহিনীকে জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ব্যারাকে আবদ্ধ রাখার চিন্তা-ভাবনা ছিল

নেহায়েতই অবাস্তব। সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা সমাজ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি জনগণের মত তারাও স্বাভাবিকভাবে ছিলেন সদা সচেতন। সেই কারণেই ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণায় সেনা সদস্যদের জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ব্যারাকে আবদ্ধ করে রাখার সরকারি প্রচেষ্টা ফলদায়ক হয়নি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে। জনগণ ও সেনা সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠা দেশপ্রেমের অটুট বন্ধনের গভীরতা অনুধাবন করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন আওয়ামী-বাকশালী শাসকগোষ্ঠি। সৈনিকদের ব্যারাকে আবদ্ধ করে রাখলেও তাদের সিংহভাগই দেশের রাজনৈতিক গতিধারার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখে চলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কারণেই। শুধু বাইরেই তার প্রকাশ ছিল না। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পুরনো ধাঁচের রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে পশ্চিমা শাসকদের স্থলাভিষিক্ত আওয়ামী লীগ সরকার দেশ শাসন করতে গিয়েও চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত সেনা বাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ ধুঁমায়িত হয়ে উঠতে থাকে।

বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভাগ্যে জোটে 'বিড়ম্বনা'

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ কখনোই একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে চায়নি। উপরন্তু সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখার জন্য তারা সেখানেও 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি প্রবর্তন করে। বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিও ছিল তাদের অবিশ্বাস।

ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পর আমাদের তরফ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের জোর দাবি জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সরকারি মহল থেকে জোর প্রচারণা চালানো হয়, "বাংলাদেশের মত শান্তিপ্রিয় দরিদ্র একটি দেশের জন্য সেনাবাহিনীর কি প্রয়োজন? বাংলাদেশের তিন দিক ঘিরে রয়েছে ভারত। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাথে রয়েছে মৈত্রী চুক্তি। সেখানে যুদ্ধ হবে কার সাথে? অন্য কোন তৃতীয় শক্তির পক্ষ থেকে আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর কোন হুমকি এলে চুক্তি অনুযায়ী বন্ধুরাষ্ট্রই আমাদের রক্ষা করবে।" কি উদ্ভট যুক্তি!! আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী মিত্র বা শত্রু বলে কিছু নেই। সব সম্পর্কই পরিবর্তনশীল। তাছাড়া জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সুস্পষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির অধিনে সম্পদের সংকুলান অনুযায়ী ধাপে ধাপে একটি সুসংগঠিত সামরিক বাহিনী আমাদের গড়ে তুলতে হবে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই। সেই বাহিনীর দায়িত্ব হবে সমর্থ ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা। অনেক দর কষাকষির পর সরকার অনুমতি দিল সেনা বাহিনী গঠন করার। সিদ্ধান্ত নেয়া হল– মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হবে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং যশোর সেনা নিবাসের পাচঁটি ব্রিগেড। এই ব্রিগেডগুলোকে পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা হবে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন রূপে। একই সাথে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর অবকাঠামোও গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন দেখা দিল পাকিস্তানে আটক অবস্থায় থাকা ৩০,০০০ বাঙ্গালী সৈনিকদের কি করা হবে। যদিও তারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তবুও তাদের বেশিরভাগই ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং বাংলাদেশের প্রতি অনুগত এবং সমর্থক। তাই তাদের দেশে ফিরে আসার পর পূর্ণমর্যাদায় নিয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে ফলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বললেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের সেনা বাহিনীতে থাকবে শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই। যুদ্ধবন্দীরা দেশে ফিরে এলে সামরিক বাহিনীর বিধান অনুযায়ী তাদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে বেসামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করা উচিত।" সরকার সিদ্ধান্ত নিল, "পাকিস্তান প্রত্যাগতদের সামরিক বাহিনীতেই নিয়োগ করা হবে।" একই সাথে সরকারি সিদ্ধান্তে বলা হল, "মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটি দেয়া হবে পাকিস্তান প্রত্যাগতদের উপর।" এভাবেই সেনাবাহিনীর মধ্যে সুস্পষ্ট ফাটল সৃষ্টি করল আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের এ সুদূরপ্রসারী চক্রান্তে সমর্থন জানিয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী এবং সুযোগ সন্ধানী সিনিয়র অফিসার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির প্রয়োগ করে যে চরম সর্বনাশা খেলা শুরু করেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান তার খেসারত জাতি এবং সেনাবাহিনীকে চরমভাবে দিতে হয়েছে পরবর্তিকালে।

এছাড়া অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়াই মেজর জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে মেজর শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করে শেখ মুজিব সেনা বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন। এভাবেই সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে জাতির মেরুদন্ড সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন শেখ মুজিব। সামরিক বাহিনীতে বিভেদ নীতি প্রণয়ন করার সাথে সাথে বিএলএফ পরবর্তিকালে মুজিব বাহিনী এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় তৈরি করা হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী। সেনা বাহিনী গঠন করার অনুমতি সরকার দিলেও সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার তেমন কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা

সরকারিভাবে নেয়া হয়নি মুজিব আমলে। পক্ষান্তরে রক্ষীবাহিনীকে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ভারতীয় সহযোগিতায়। রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর উপর। তাদের পোষাকও ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোষাকের মতো। ভারত সরবরাহ করে তাদের গাড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, রসদপত্র এবং আনুসাঙ্গিক সমস্ত কিছু। এদের অফিসারদের প্রশিক্ষণ হত দেড়াদুনের ভারতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সৈনিকদের ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ দিত ঢাকার অদূরে সাভারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত রক্ষীবাহিনী। সামরিক অধিনায়ক ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য কর্নেল নূরুজ্জামান। রক্ষীবাহিনী সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। জনসাধারণ ক্রমশঃ রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের যে কাউকে বিনা বিচারে বন্দী এবং হত্যা করার ক্ষমতা প্রদান; অপরাধীদের দেশের প্রচলিত আইনে বিচার না করে গোপনে হত্যা করার প্রচলন এবং আওয়ামী লীগ বিরোধীদের নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়নের ফলে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবের ভাবমুর্তি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় বাহিনীর অনূরুপ জলপাই রং-এর পোষাক জনগণের মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাদের মনে ধারণা জন্মে, প্রয়োজনে মৈত্রী চুক্তির আওতায় আওয়ামী সরকার মতলব হাসিল করার জন্য যে কোন সময় রক্ষীবাহিনীর আবরণে ভারতীয় বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরেও ডেকে নিয়ে আসতে পারে। উপযুক্ত কোন এক সময় বাংলাদেশ সেনা বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে সরকার রক্ষীবাহিনীকেই সেনাবাহিনী হিসেবে অধিষ্ঠিত করবে; এ ধরণের কথাও শোনা যাচ্ছিল সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ধরণের বৈরী মনোভাবে এবং অবহেলায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা মনঃক্ষুন্ন হন।

একইভাবে দেশের বেসামরিক প্রশাসনিক অবকাঠামোকে দুর্বল করে তোলার জন্য সেখানেও বিভেদ নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাজুদ্দিন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভারতীয় আমলাদের সাহায্যে ঢেলে সাজাতে। কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা বাঙ্গালী আমলাদের তীব্র বিরোধিতার ফলে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। পরিণামে বাংলাদেশের বেসামরিক আমলারাও মুজিব সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। সেনাবাহিনীর সদস্যদের মত তাদেরও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে মুজিব সরকার। এভাবে জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দেশপ্রেমের যথার্থ মূল্যায়ন না করে তাদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। বেসামরিক প্রশাসনকে সর্ম্পূনরূপে দলীয় নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য আওয়ামী সরকার অভিজ্ঞ আমলাদের বাদ দিয়ে সে সমস্ত পদে দলীয় লোক নিয়োগের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের দলীয় সমর্থকদের মাঝ থেকে প্রায় ৩০০ তরুণ যুবককে পাঠানো হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পর তাদের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ করা হয়। এদের বলা হয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমস) ক্যাডার। এছাড়া পুরো বেসামরিক প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেন শেখ মুজিবের বোনের জামাই জনাব সাইদ হোসেন। জনাব হোসেন ছিলেন একজন সেকশন অফিসার। রাতারাতি পদোন্নতি দিয়ে প্রশাসন পরিচালনার সব ক্ষমতাই অলিখিতভাবে তার হাতে সঁপে দেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিবের সমর্থনপুষ্ট জনাব সাইদ হোসেন সমস্ত বেসমারিক প্রশাসন চালাতে থাকেন অঙ্গুলী হেলনে। ফলে আমলাতন্ত্রের মধ্যেও অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। এটাও ছিল নীল নকশা বাস্তবায়নেরই একটি সূক্ষ্ম চাল।

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান সুপারসিড (Supersede) হলেন

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে চীফ অব ষ্টাফ বানালেন শেখ মুজিব।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠন পর্বের শুরুতে আমি কুমিল্লাতে পোষ্টেড হই। কর্নেল জিয়াউর রহমান ছিলেন আমাদের প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার। কুমিল্লাতে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নতি লাভ করেন। জেনারেল ওসমানী তখনো আমাদের কমান্ডার-ইন-চীফ। তার হেডকোয়ার্টার্স তখন ২৭নং মিন্টু রোডে। অল্প কিছুদিন পর সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। সাধারণ নিয়মে জেনারেল ওসমানীর পর ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকেই আর্মির সিনিয়র মোষ্ট অফিসার হিসেবে চীফ অব আর্মি ষ্টাফ বানানো উচিত ছিল। কিন্তু অত্যান্ত অন্যায়ভাবে জিয়াউর রহমানকে তার ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত করা হল। স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার ফলেই আওয়ামী লীগ সরকার তার প্রতি এ ধরণের অবমাননাকর আচরণ করে তার জুনিয়র ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে আর্মি চীফ অব ষ্টাফ পদে নিযুক্ত করে। অস্বাভাবিক এ পদোন্নতির ফলে শফিউল্লাহ শেখ মুজিব ও তার সরকারের একান্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত তাবেদার হয়ে তাদের খেদমত করতে শুরু করে। আর্মির স্বার্থ ও নিয়ম জলাঞ্জলী দিয়ে শফিউল্লাহ শেখ মুজিব ও তার সরকারের ইচ্ছা ও স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলেই মুজিব ভক্ত কয়েকজন অফিসারকে উত্তরোত্তর পদোন্নতি দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করা হল নিয়ম বর্হিভূতভাবে। মুজিব সরকারের এ সমস্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আর্মির তরুণ দেশপ্রেমিক অংশ সোচ্চার হয়ে উঠেন।

আর্মিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়

ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সুপারসিড করে ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহকে চীফ অব ষ্টাফ পদে নিয়োগ করায় আর্মিতে আশংকাজনক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবর রহমান সেটা জানতে পেরে আমায় ডেকে পাঠান; ঘনিষ্টতার সুবাদে তিনি আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন খবরা-খবর নিতে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ভেতরের খবর জানতে চাইতেন তিনি।

৩২নং ধানমন্ডিতে গিয়েই তার সাথে দেখা করলাম। তিনি জানতে চাইলেন শফিউল্লাহকে সেনা প্রধান বানানোর সিদ্ধান্তের ফলে সেনাবাহিনীতে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে? আমি পরিষ্কারভাবে তাকে জানালাম- তার এ সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আমি তাকে বলেছিলাম অন্যায়ভাবে ব্রিগেডিয়ার জিয়াকে তার ন্যায্য পদে নিয়োগ না করে শেখ মুজিব অত্যন্ত ভুল করেছেন। কারণ এ সিদ্ধান্তে শুধু যে প্রচন্ড ক্ষোভই সেনাবাহিনীতে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়; সরকার এবং সেনাবাহিনীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সবাই তাকেই একান্তভাবে দায়ী করেছে জিয়াউর রহমানের প্রতি এ অবিচার করার জন্য। ফলে তারই ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের কাছে। অবিলম্বে এ ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত। আমার বক্তব্য শুনে শেখ মুজিব সেদিন বলেছিলেন, কর্নেল ওসমানীর পরামর্শ অনুযায়ীই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি। সিদ্ধান্ত বদলিয়ে এই মূহুর্তে শফিউল্লাহকে সরিয়ে জিয়াউর রহমানকে চীফ বানানো তার জন্য বিব্রতকর হয়ে দাড়াবে। তিনি এ জবাব দিয়েছিলেন তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে। তবে তিনি কথা দিয়েছিলেন কিছুদিন পর জিয়াউর রহমানকে চীফ অব ষ্টাফ বানানোর কথা তিনি পুর্নবিবেচনা করবেন। তার এ বক্তব্য অনেক কারণেই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবুও আমি তার প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যতদিন শফিউল্লাহ চীফ থাকেন ততদিন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে সাধারণ ব্রিগেড কমান্ডার কিংবা চীফ অব ষ্টাফের পিএসও হিসাবে না রেখে উপপ্রধান হিসাবে নিয়োগ করলে সেনাবাহিনীতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে সেটা অনেকাংশে কমে যাবে। জনাব মুজিব আমাকে কথা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে তিনি চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন। তিনি আমাকে একইসাথে অনুরোধ করেছিলেন, তার এই অভিমত ব্যক্তিগতভাবে ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানকে জানাতে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার করতে। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে আর্মিতে উঈঙঝ (ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ) পদ সৃষ্টি করা হয় এবং মেজর জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে জিয়াউর রহমানকে সে পদে নিয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, যোগ্য চীফ অব ষ্টাফ হিসাবে জনাব শফিউল্লাহর পদমর্যাদাও ছিল মেজর জেনারেল। আমাদের সবার প্রিয় জেনারেল জিয়াউর রহমানের চীফ অব ষ্টাফ পদে উন্নতির যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন তার বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

আমি এবং ৩২নং ধানমন্ডি

ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে ৩২নং ধানমন্ডির বাসভবন আমার জন্য ছিল অবারিত দ্বার। যখন ইচ্ছে তখনই আমি সেখানে যেতে পারতাম।

যখনই আমি ৩২নং এ গিয়েছি, সবসময় দেখেছি লোকের ভীড়; সবাই শেখ মুজিবকে ঘিরে রাখছে। কিন্তু কম লোকজনকেই দেখেছি তার সামনে কোন প্রশ্নের সঠিক এবং সত্য জবাব দিতে। বেশিরভাগ লোকই তোষামোদ করে যা বললে তিনি খুশি হন সেটাই বলত। আশ্চর্য হতাম তাদের চাটুকারিতা এবং মোশায়েবীপনায়। দর্শনার্থীরা একথা সেকথার পর সুবিধামত নিজের ব্যক্তিগত কাজটি বাগিয়ে নিয়ে কেটে পড়তেন। এটাই ছিল নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। তিনি আমাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। মুজিব পরিবারের অন্য সবাইও আমাকে এবং আমার স্ত্রী নিম্মীকে খুবই ভালোবাসতো। পাকিস্তান থেকে ফেরার পর ১৯৭২ সালে আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে তিনি স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে আমাদের আর্শীবাদ করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানই ছিল তার বাংলাদেশে আসার পর প্রথম কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। পুরো মন্ত্রী পরিষদও উপস্থিত ছিলেন সে অনুষ্ঠানে। আমি ও আমার পরিবারবর্গ রাজনৈতিকভাবে তার দল ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার নীতিকে সমর্থন না করলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। নিজের কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য আমি তার কাছে কখনোই যাইনি। যেতাম সত্যকে তার কাছে তুলে ধরার জন্য। ভাবতাম, সবাই যেখানে চাম্‌চাগিরী করছে সেখানে সাহস করে সত্যকে তার সামনে তুলে ধরলে তিনি নিশ্চয়ই তা অনুধাবন করতে পারবেন এবং এতে করে তার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে তার সুবিধা হবে। তার রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটবে।
একদিন বেশ রাত করে ধানমন্ডির এক বন্ধুর বাসার পার্টি থেকে ফিরছিলাম আমি ও নিম্মী। মশুলধারে বৃষ্টি পড়ছে। অল্পদূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইন্টারকন ছেড়ে পুরনো গণভবন মানে বর্তমানের সুগন্ধার কাছাকাছি এসেছি; হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে একটি গাড়ি অতি দ্রুতগতিতে আসছে দেখলাম। দূর থেকেই গাড়ির ভিতর থেকে হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিছু উশৃঙ্খল তরুন বেসামাল অবস্থায় হৈ-হুল্লোড় করছিল। গাড়িটিও এগিয়ে আসছিল ঠিক একই অবস্থায় একেবেকে। নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য গাড়ি একটু সাইড করতেই গাড়ি স্কিড করে গিয়ে জোরে মুখোমুখি ধাক্কা খেল সামনের ল্যাম্পপোষ্টের সাথে। জোরে ধাক্কা লাগায় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। সামনের বনেটটাও দুমড়ে-মুচড়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। গাড়ি কিছুতেই আর স্টার্ট নিচ্ছে না। অন্য গাড়িটি আমাদের অবস্থা দেখে না থেমে আরো দ্রুতবেগে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। বৃষ্টির প্রচন্ডতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। রাত অনেক হয়েছে তার উপর এমন বৃষ্টি তাই রাস্তাও একদম ফাঁকা। ষ্টিয়ারিং এর সাথে মাথা লেগে মাথা ফেটে রক্ত ঝরে পরছে আমার কপাল বেয়ে। নিম্মীর অবশ্য কিছুই হয়নি। আমার রক্ত দেখে ঘাবড়ে গেছে বেচারী। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ইঞ্জিনটা একটু নেড়েচেড়ে দেখছিলাম যদি কোনমতে গাড়িটা স্টার্ট নেয়। না; কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ সাইরেন বাজিয়ে রাষ্ট্রপতির কাফেলা এগিয়ে আসছে দেখতে পেলাম। আমি তখন অসহায় অবস্থায় দাড়িয়ে আছি গাড়ির পাশে। কাফেলা কাছে আসতেই রাষ্ট্রপতির গাড়ি দাড়িয়ে পড়ল। গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি মুখ বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? কপালের রক্তক্ষরণ দেখে বুঝতে পারলেন গাড়ির এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মুহুর্তে তিনি তার একজন সহযোগীকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে গাড়িতে করে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তার হুকুমে আমি ও নিম্মী তার কাফেলারই একটি গাড়িতে করে সিএমএইচ-এ পৌঁছালাম। চিকিৎসার পর তার গাড়িতেই বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে দেখি বাসার সবাই উৎকন্ঠিত অবস্থায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি বাড়ি ফিরেই মালিবাগে আমাদের দুর্ঘটনার খবরটা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফোনে অবশ্য জানানো হয়েছিল অ্যাকসিডেন্ট

তেমন একটা সিরিয়াস নয়; তাই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আব্বাকে আস্বস্ত করার জন্য বলা হয়েছিল দুর্ঘটনাস্থলের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখতে পেয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই আমাদের গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছেন। সবাইকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত করার জন্য বলেছিলাম, "Injury is not serious at all only three stitches that's all. So nothing to worry about and Nimmi is absolutely unhurt."

এ ঘটনার অবতারনা এখানে এর জন্য করা হল যা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন ব্যক্তি এবং পারিবারিক পর্যায়ে মুজিব পরিবারের সাথে আমাদের কি ধরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু কোন সম্পর্কই নীতি-আদর্শের উর্ধ্বে নয়। তাই আমিও পারিনি আপোষ করতে। ব্যক্তি মুজিব নয়; গণবিরোধী পুতুল সরকার প্রধান, গণতন্ত্রের হত্যাকারী, বাকশালী স্বৈরশাসনের প্রবর্তক শেখ মুজিবর রহমানের সাথে।

কর্নেল তাহের ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক কমান্ডার

কুমিল্লা ব্রিগেড জনহিতকর কাজে লিপ্ত হয়। আওয়ামী লীগ সেটা অপছন্দ করে। কর্নেল তাহেরকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

জিয়াউর রহমানের জায়গায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে পোষ্টেড হলেন আমার পূর্ব পরিচিত এবং সুহৃদ কর্নেল তাহের। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা সর্বদাই যোগাযোগ রাখতাম ঘনিষ্ঠভাবে। তরুণ কর্নেল তাহের ছিলেন অসীম সাহসী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনীতে অবকাঠামো গড়ে তোলা ছিল অত্যন্ত দূরুহ কাজ। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় কিছুই নেই তখন। নেই পর্যাপ্ত হাতিয়ার, ইকুইপ্টমেন্ট, পোশাক-পরিচ্ছদ, নেই টুপি, বুট, প্রয়োজনীয় রশদপত্র এবং প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কুমিল্লায় সিদ্ধান্ত নিলাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত ক্যান্টনমেন্টকে বাসপযোগী করে গড়ে তোলার সাথে সাথে আমাদের অপারেশন এরিয়াতে গিয়ে পুর্নঃগঠন কাজে জনগণকে আমরা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করব। রাস্তাঘাট মেরামত, ব্রিজ কালভার্ট ঠিক করা, বাড়ি-ঘর তৈরির কাজে সাহায্য করা হবে। হেলথ সার্ভিস, ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল কলেজগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজে আমরা স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় সাহায্য করব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই আমাদের উদ্ধুদ্ধ করেছিল এ ধরণের উদ্যোগ নিতে। আমাদের এ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল জনগণ। এই ধরণের কর্মতৎপরতায় আমরা জনগণের মনে এই ধারণা জন্মাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, শোষণমূলক পাক বাহিনী এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক ব্যাতিক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জনগণের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এবং দেশপ্রেমিক। জনগণকে শোষণ এবং নির্যাতন করার জন্য এ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা যাবে না।

সেনা বাহিনীর জনপ্রিয়তাই শুধু যে বেড়ে গিয়েছিল আমাদের তৎপরতায় তাই নয়; আমাদের সর্ম্পকে জনগণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীলতা। আমাদের এ ধরণের গঠনমূলক তৎপরতার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সর্বত্র। আমাদের সাফল্য এবং ইতিবাচক দিকগুলো অন্যান্য ফরমেশনের দেশপ্রেমিক সচেতন অংশের মাঝে অভূতপুর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। যার ফলে অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরাও এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ ধরণের গণমুখী ভূমিকা পালনের জন্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শাসকমহল এমনকি সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিও আতংকিত হয়ে উঠে। জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর এ ধরণের সুসম্পর্ক এবং বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে উঠাকে তারা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ জুড়ে তখন ব্যাপক রিলিফ তৎপরতা চলছিল। রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অসাধুতার কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনেরা রিলিফ পাচ্ছিলেন না। আমরা আমাদের অধিনস্ত এলাকায় রিলিফ বিতরণের ব্যাপারে সবরকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ঠিকমত রিলিফ সামগ্রী পান। এতে বিশেষভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের স্বার্থে আঘাত লাগে ফলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে চটে যান। এরই ফলে পার্টি প্রধান শেখ মুজিব জেনারেল শফিউল্লাহর মাধ্যমে এক আদেশ জারি করে আমাদের গণমুখী সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে দেন। আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রচার চালানো হয়- সেনাবাহিনী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়।

কুখ্যাত আত্রাই অপারেশন

শেখ মুজিব তার অনুগত আস্থাভাজন কর্নেল সাফায়াত জামিলকে আত্রাই ও পাবনা অঞ্চলে সরকার বিরোধী আন্দোলন নির্মূল করার জন্য নিয়োগ করেন।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি জনাব ওহিদুর রহমান ও টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা আত্রাই, পাবনা, রাজবাড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় বেশ তৎপর হয়ে উঠে। শেখ মুজিব তাদের দমন করার জন্য তার বিশেষ প্রিয়ভাজন কর্নেল সাফায়াত জামিলকে (তৎকালীন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার) হুকুম দিলেন তাদের নির্মূল করার জন্য। নেতার ব্যক্তিগত অনুকম্পা লাভের জন্য কর্নেল সাফায়াত জামিল অন্ধের মত আত্রাই অপারেশনে ঝাপিঁয়ে পড়লেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ঐ সমস্ত এলাকা থেকে সমর্থ ছেলে মেয়েদের ধরে এনে কোন রকম তদন্ত এবং বিচার ছাড়াই তাদের মেরে ফেলার এক জঘণ্য খেলায় মেতে উঠলেন তিনি। তার এই অন্যায় তৎপরতার বিরোধিতা করে তারই ব্রিগেড মেজর ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী। সাফায়াত জামিলকে ষ্টাফ অফিসার হিসাবে নূর বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, শেখ সাহেবের প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য থাকলেও এভাবে ব্যক্তি স্বার্থে নিষ্ঠুরের মত ছেলে মেয়েদের মেরে ফেলা অন্যায় এবং অযৌক্তিক। এ ধরণের পাশবিকতার জন্য নিজের বিবেকের কাছেই তিনি একদিন দায়ী হয়ে পড়বেন। অযুক্তিক এই হত্যাযজ্ঞের ভাগীদার হওয়া ক্যাপ্টেন নূরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্যাপ্টেন নূরের এ পরামর্শ সেদিন কর্নেল সাফায়াত জামিল গ্রহণ করেননি। ফলে ক্যাপ্টেন নূর বাধ্য হয়ে নিজের উদ্যোগেই হেডকোয়ার্টার্সে পোষ্টিং নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। আত্রাই অপারেশনের সাফল্যের জন্য শেখ মুজিব পুরষ্কার স্বরূপ কর্নেল সাফায়াতকে পরে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেন। সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের অনুগত রাখার নীতি গ্রহণ করে মুজিব সরকার। এমনকি কৃতি ও জনপ্রিয় অনেক সামরিক অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং বিদেশের দূতাবাসে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল আওয়ামী সরকার।

সেনা পরিষদ

সেনা বাহিনীর কিছু সমমনা সদস্য সেনা পরিষদ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত সব অফিসারদের ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসন করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানের বিশেষ আস্থাভাজন এ সমস্ত অফিসারদের একটি অংশ শেখ সাহেবের চোখ ও কান হিসাবে সেনাবাহিনীর উপর নজর রাখছিল। প্রভাবশালী এই মহলটির করুণা পেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ এগিয়ে নেবার জন্য তাদের দালালি করতে তখন অনেকেই নীতি বিসর্জন দিয়ে তাদের এজেন্ট হয়ে যান। এদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সব খবরা-খবর শেখ মুজিবের কান অব্দি পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল।

সেই সময় এদের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা কিছু তরুণ অফিসার উদ্যোগ নেই ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে সচেতন দেশপ্রেমিক ও সমমনা ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি অঘোষিত সংগঠন গড়ে তোলার। প্রতিষ্ঠিত হয় সেনা পরিষদ। সেনা পরিষদ সরকারের প্রতিটি নীতিও পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকত। প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ইস্যুর চুলচেরা বিশ্লেষন করে জাতীয় পরিসরে এবং সামরিক বাহিনীর উপর এসমস্ত নীতি পদক্ষেপের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া কি হবে অথবা হতে পারে সে বিষয়ে অধিনস্ত সৈনিকদের বুঝিয়ে বলা হত সেনা পরিষদের তরফ থেকে। সৈনিকদের সচেতনতার মান বাড়িয়ে তোলার জন্যই এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম আমরা। সরকারি নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা ছাড়া দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করত সেনা পরিষদ। কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত, কি উচিত নয় বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা হত সেনা পরিষদের ষ্টাডি সার্কেলগুলোতে। সবকিছুই করা হত অতি সর্তকতার সাথে, গোপনে। বেসামরিক আমলা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি মহলের দেশপ্রেমিক সচেতন সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন সূত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে মত বিনিময় করতেন সেনা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরা। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরের অনেকের সাথেও যোগাযোগ ছিল সেনা পরিষদের। আন্তরিকভাবে নিয়মিতভাবে খবরা-খবর আদান-প্রদান এবং খোলামেলা মত বিনিময়ের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে অনেকের সাথে সেনা পরিষদের সদস্যদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে। সেনাবাহিনীর সদস্য হওয়া সত্বেও সেনা পরিষদের সদস্যরা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অনেকের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও গড়ে উঠে। আলোচনাকালে অনেকেই মত পোষণ করেন- জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে বাচাঁবার সংগ্রামে সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে অগ্রণী হয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব নিতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

তাদের এ ধরণের বক্তব্যের জবাবে সেনা পরিষদের তরফ থেকে বলা হত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্য কিছু করণীয় থাকলে সে দায়িত্ব যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে পালন করতে প্রস্তুত রয়েছে সেনা পরিষদ তবে সেনা পরিষদের যে কোন ভূমিকাই হবে সহায়ক শক্তি হিসেবে সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে; নিজেদের ক্ষমতা দখলের জন্য নয়। তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা কিংবা সামাজিক অস্থিরতার সুযোগে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে কোন দেশেই গণতান্ত্রিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি; প্রতিষ্ঠিত হয়নি মানবিক অধিকার। একমাত্র সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব সার্বিক আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জন আর এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের। এটাই ছিল সেনা পরিষদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এ সম্পর্কে মেজর রফিক পিএসসি তার বই 'বাংলাদেশ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, ''সমসাময়িক ইতিহাসে কম্বোডিয়া, গণচীন, কিউবা, ভিয়েতনাম তথা সর্বত্রই মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন হবার পর ক্ষমতা দখল করেছে। শুধু বাংলাদেশেই ঘটেছে এর ব্যতিক্রম। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর অস্ত্র সমর্পন করেছে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে; দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অফিসার-সৈনিকেরা স্বাভাবিকভাবেই দেশের দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকরা সরকার পরিচালনার মত একটি দূরহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। মেজর ডালিম, মেজর পাশা, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার তখন কুমিল্লা সেনানিবাসে চাকুরিরত ছিলেন। এরা প্রায়ই অবসর সময়ে মিলিত হতেন এবং দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগের দুর্নীতিবাজ লোকদের নিয়ে সরকার পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সর্ম্পকে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এভাবে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্নেল তাহের ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্নেল জিয়াউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে ষ্টাডি পিরিয়ডের নামে অফিসারদের সমবেত করে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে তরুণ অফিসারদের সঙ্গে সমালোচনায় লিপ্ত হতেন।''

কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ সাপ্তাহিক হলিডেতে ছাপিয়ে পদত্যাগ করেন। কর্নেল তাহেরকেও পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

"এ্যান্টি স্মাগলিং" এবং "অপারেশন ফুড" থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয় সেনা সদস্যদের মাঝে। সবাই এই সিদ্ধান্তে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।

এই পরিস্থিতিতে কর্নেল জিয়াউদ্দিন (ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার) অভিমত প্রকাশ করেন, "বর্তমান সরকারের অধিনে সামরিক বাহিনীতে থেকে জনগণের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব নয়। সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধিতা করাও সম্ভব নয়। তাই সরকারি অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মাঝ থেকেই গড়ে তুলতে হবে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম।" তার অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেলাম। তিনি সক্রিয় রাজনীতির কথা ভাবছেন। তার অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেনা পরিষদের মনোভাব ছিল তার বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিসম্পন্ন। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের চুড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেয়া সম্ভব জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে গতিশীলতা সৃষ্টি করেই। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের ভার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দল ও নেতৃত্বের উপর। তবে আমরাও সেনাবাহিনীর ভেতরে অবস্থান করেও জনগণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারব যদি নিজেদের সংগঠিত করতে পারি।

১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, "Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."

নির্ভিক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পচিঁশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "We fought without him and won. If need be we will fight again without him."

শেখ মুজিবর রহমান সে সময় লন্ডনে গলব্লাডার অপারেশনের পর সুইজ্যারল্যান্ডের এক স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করছিলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে জানতে পেরে তড়িঘড়ি করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কষ্টের এবং ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে আবার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না তারা। তার এই লেখা থেকে দেশবাসী প্রথম পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। প্রমাদ গুনলেন আর্মি চীফ শফিউল্লাহ। তিনি জিয়াউদ্দিনকে হাতেপায়ে ধরে অনেক মিনতি করেছিলেন যেন শেখ সাহেব ফিরে এলে ছাপানো নিবন্ধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ শফিউল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে তরুণ ও ছাত্রসমাজ এবং সেনাবাহিনীতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীতে কোন প্রকার বিষ্ফোরন যাতে না ঘটে তার জন্যই মিনতি জানিয়েছিলেন তিনি। শেখ মুজিব দেশে ফিরে বিষ্ফোরন্মুখ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্দি করতে পেরে জেনারেল শফিউল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন কি করে

অবস্থার সামাল দেয়া যায়? শফিউল্লাহ শেখ সাহেবকে জানালেন, নিবন্ধ ছাপানোর পর কর্নেল জিয়াউদ্দিনের ভাবমুর্তি তরুণ অফিসার এবং জোয়ানদের মধ্যে আরো বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কর্নেল জিয়াউদ্দিনের প্রতি কোন কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হলে আর্মির মধ্যে আকষ্মিক বিষ্ফোরন ঘটে যেতে পারে। শেখ মুজিব তার মোড়লী বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে ডেকে কিছু বকাবকি করে তাকে দিয়ে কৌশলে মাফ চাইয়ে নেবেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হল জেনারেল সফিউল্লাহকে। গণভবনে জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে এলেন শফিউল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে স্যালুট করে দাড়াতেই গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব, ''তুমি কোন সাহসে এ ধরণের নিবন্ধ ছাপালে? জানো, তোমার অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান? সামরিক বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় এ ধরণের লেখা ছাপানো বেআইনী। আমি তোমাকে এ ধরণের গুরুতর অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোমার বিশেষ অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের মত তোমাকে আমি মাফ করব যদি তুমি শফিউল্লাহকে লিখিতভাবে দাও যে, তুমি অন্যায় করেছ।'' একনাগাড়ে বলে গেলেন শেখ মুজিব। সবকিছুই চুপ করে শুনলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিন।

তিনি জবাব দিলেন, ''শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী। আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি যা লিখেছি সেটা আমার বিশ্বাস। অতএব, ক্ষমা চাওয়ার কিংবা ক্ষমা পাওয়ার কোন অবকাশ নেই এখানে। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, চাকুরীতে থাকাকালীন অবস্থায় এ ধরণের লেখা ছাপানো অন্যায়। তাই আমি আমার কমিশনে ইস্তফা দিয়েই আমার নিবন্ধ ছেপেছি।'' এভাবেই সেদিন শার্দুল সন্তান কর্নেল জিয়াউদ্দিন শেখ মুজিবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গণভবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার বেরিয়ে আসার পর শফিউল্লাহকে শেখ মুজিব অনুরোধ করেছিলেন জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার জন্য। হেডকোয়াটার্সে ফিরে এসে জেনারেল শফিউল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রমুখ অনেকেই কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার শাণিত জবাব দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নিজের আত্মার সাথে বেঈমানী করতে পারবেন না সামান্য চাকুরীর লোভে। তাছাড়া তাদের মত মেরুদন্ডহীন কমান্ডারদের অধিনে একই সংগঠনে তাদের অধিনস্ত হয়ে চাকুরী করে তিনি তার আত্মসম্মান খোয়াতে রাজি নন। এভাবেই সেনাবাহিনীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পরে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর অন্যায়ভাবে কর্নেল তাহেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে ড্রেজার অর্গানাইজেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এই নতুন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্নেল তাহের জাসদের সশস্ত্র গোপন সংগঠন 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী থেকে তাকে বের করে দেবার পরও আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি কখনো। আমরা আমাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকি। লক্ষ্য একটাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন। গণতান্ত্রিক সুষম সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী এবং মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করা। আমাদের মাঝে আদর্শগত বন্ধন এত সুদৃঢ় ছিল যে, আমরা বিশ্বাস করতাম জাতীয় মুক্তির বৃহৎ স্বার্থে যেকোন ক্রান্তিলগ্নে আমরা সবাই এক হয়ে লড়তে পারব নির্দ্ধিধায়।

অসাংবিধানিক গোপন রাজনীতি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠে

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য করে ফলে গোপন রাজনীতি একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠে।

১৯৭৩ সালে জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হল আওয়ামী লীগ। কিন্তু দেশের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। সার্বিক অবস্থার অবনতির গতি দ্রুততর হল মাত্র। মরিয়া হয়ে উঠলেন সরকার; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার প্রচেষ্টায়। সরকারি দলের লক্ষ্যহীনতা ও নৈরাজ্যিক কার্যকলাপের মুখে বাংলাদেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে বিরোধী দলগুলি এবং সামগ্রিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি নিক্ষিপ্ত হল এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি শাসিত যে কোন দেশেই কোন বিশেষ একটি দল দেশের শাসনতন্ত্রকে দলীয় সম্পদ মনে করে না। সেখানে শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল থাকে। ক্ষমতার হাত বদল হয় সে সমস্ত দলগুলোর মধ্যেই। জাতীয় স্বার্থের মৌলিক বিষয়ের প্রশ্নে তারা একে অপরের সহযোগিতা করে থাকে। এই সহযোগিতার ভিত্তিতেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে যেখানে সরকার নিজের স্বার্থের সাথে রাষ্ট্রের স্বার্থকে এক করে দেখেছে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ মোটেই সম্ভব নয়। বিরোধী দলগুলো অনৈক্য এবং অন্যান্য কারণে আওয়ামী লীগের বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। তাদের উপর নিষ্পেষন চালিয়ে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সেখানে বিরোধী দলগুলো ভবিষ্যতে কখনো পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগকেও নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। যেভাবে সরকারি দল আইনের শাসনের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সব নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে উঠে-পড়ে লেগেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতেই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বৈরাচার। স্বৈরাচার যখন খোলা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশের সব দরজা বন্ধ করে দেয় তখনই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠে রাজনৈতিক গোপন তৎপরতা। রাজনীতিতে বেজে উঠে অস্ত্রের ঝনঝনানি। রাজনৈতিক বিরোধিতা রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামের।

১৯৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভাষণই এর বড় প্রমাণ। তিনি ঐ ভাষণে বলেন, "যারা রাতের বেলায় গোপনে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের কোন পার্থক্য নেই। কেউ যদি নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে পারে তাহলে আমাদেরও তাদের গুলি করে হত্যা করার অধিকার আছে।" (বঙ্গবার্তা ১২ই নভেম্বর ১৯৭৩) ইতিহাসের লিখন যে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অস্ত্রের জোরে বিরোধীদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছেন তার পতনও ঘটেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্ত্রের মুখেই।

ঐ একই দিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ভাসানী রাজশাহীর এক জনসভায় বলেন, "সরকার যেভাবে বিরোধী দলীয় কর্মী হত্যা করা শুরু করেছে তার ফলে এ দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ বন্ধ হতে চলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কোন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। দমন নীতি এবং মানুষকে হত্যা করে দেশ শাসন করা যায় না। আইয়ূব খান-ইয়াহিয়া খানের পতন হয়েছে অতীতে; এ ধরণের দমন নীতি চলতে থাকলে এ সরকারের পতনও অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নাও। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এবং বিরোধী দল ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক সরকার বেচে থাকতে পারে না।" (১২ই নভেম্বর ১৯৭৩) রাজনৈতিক কর্মী নিধনের ব্যাপারে জাসদের বক্তব্য ছিল একই রকম। সরকার এবং বিরোধী পক্ষের বক্তব্য থেকে যে জিনিষটা স্পষ্ট হয় তাহল আজকের বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবেশ আছে

সেটা কেউই স্বীকার করছেন না। উভয় পক্ষই একমত যে, দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অসি'রতা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের শান্তি-শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে রক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের দু'টি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য। প্রথমত: তিনি বিরোধী দলীয় কর্মীদের 'ডাকাত' বলে অভিহিত করছেন। দ্বিতীয়ত: সে সমস্ত ডাকাতদের গুলি করে হত্যা করার অধিকারও তার রয়েছে বলে দাবি করছেন। বিরোধী কর্মীদের চোর, ডাকাত, দেশদ্রোহী, ক্রিমিনাল আখ্যা দেয়ার রেওয়াজ সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫০ সালে নূরুল আমিন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে 'ডাকাত দলের সরদার' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। রাজশাহীর 'ছাপড়া-ওয়ার্ডে' নাচোল বিদ্রোহের রাজবন্দীদের গুলি করে মারা এবং ইলা মিত্রকে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণকেও সরকার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে দাবি করেছিলেন। ১৯৭০ সালে যখন রাজবন্দীদের মুক্তির জোর দাবি উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানে তখন স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানও পূর্ব পাকিস্তানের সব রাজনীতিবিদদের 'ক্রিমিনাল' আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তাদের মুক্তির দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছিল নূরুল আমীন এবং ইয়াহিয়া খানের দোসররাই ছিল প্রকৃত ক্রিমিনাল। বিরোধী পক্ষকে চোর, ডাকাত ইত্যাদি বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টার ফল কি দাড়ায় সেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অজানা থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু দীর্ঘদিনের সেই শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমানের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চোর-ডাকাত আখ্যা দিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ যে সুগম করছেন না সেটা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি বিরাজমান সে অবস্থায় সরকার এবং বিরোধী দলসমূহ যে দাবি করছে তাতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অবক্ষয় অবধারিত।

সেনাবাহিনীকে “এ্যান্টি স্মাগলিং অপারেশন” এর জন্য তলব করা হয়

১৯৭৩ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে চরম দুর্নীতি এবং ব্যাপক চোরাচালানের ফলে রিলিফ অপারেশনে বিপর্যয় দেখা দেয়। ফলে সরকার অবস্থা সামাল দিতে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে তলব করতে বাধ্য হয়।

সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এবং সদস্যরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের আন্তরিকতা অল্পসময়ের মধ্যেই জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। এই অপারেশনের নাম ছিল ‘অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন’। আমরা সমমনা সবাই সিদ্ধান্ত নেই যদিও তখনো আমরা সুগঠিত নই তবুও যেকোন ত্যাগের বিনিময়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাব। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্বব্যবহার করতে হবে আমাদের। এই অপারেশন করার সময়ই তরুণ অফিসার এবং সৈনিকগণ ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও টাউট বাটপারদের অসৎ চরিত্র এবং সম্পদ গড়ে তোলার লোভ-লালসার অভিলাষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ হন। রাজনৈতিক নেতাও টাউটদের সঙ্গে তারা মুখোমুখি দ্বন্দ্বে আসার সুযোগ পান। আমরা অপারেশন কমান্ডার হিসাবে প্রতিজ্ঞা করি পেটের ক্ষুধার তাড়নায় যে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা পোর্টার বোঝা বয়ে চোরাচালানের সামগ্রী বর্ডারের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের ধরেই ক্ষান্ত হব না, আমাদের প্রচেষ্টা হবে চোরাচালানের মূল ব্যক্তিদের জনসম্মুখে প্রকাশ করা। ক্ষমতাবলয়ের ঐ সমস্ত অসাধু রুই-কাতলাদের উম্মোচন করা; যারা পর্দার অন্তরালে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতীয় সম্পদের চোরাচালানের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে জনগণের লাশের উপরে। অল্প সময়েই জানা গেল সব সীমান্তে চোরাচালানের মূলে রয়েছে ভারতের একটি প্রভাবশালী মারোয়াড়ী গোষ্ঠি এবং সরকারি দলের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ও নেতারা। শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, স্বরাষ্টমন্ত্রী মনসুর আলী তদীয় পুত্র নাসিম, বন ও মৎস্য মন্ত্রী সেরনিয়াবাত তদীয় পুত্র হাসনাত। গাজী গোলাম মোস্তফা সরাসরিভাবে ঐ মারোয়াড়ী চক্রের সাথে জড়িত বলেও তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে এবং সরেজমিনে তদন্তের ফলে। সব ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে আমরা তাদের চরিত্র এবং দুঃষ্কর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে থাকি জনগণের কাছে। অফিসার এবং সৈনিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং নেতারাই হচ্ছে দেশের দুর্গতির মূল উৎস। তাদেরই যোগসাজসে লুটেরারা দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে তুলছে। সেনা পরিষদের প্রচারণা এবং সরকার সম্পর্কে সংগঠনের মূল্যায়নের সত্যতা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করার সুযোগ পান সেনা সদস্যরা। তারা বুঝতে পারেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়েই চাকুরী ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেনা পরিষদের নেতৃত্ব এবং সদস্যরা তাদের সচেতনতা বাড়াবার জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়েই সবকিছু করছিলেন। এর ফলে সেনা পরিষদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল। এভাবেই সেনাবাহিনীতে সেনা পরিষদের ভাবমুর্তি এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ থেকেই তৎকালীন সরকারের চরিত্র সর্ম্পকে তারা ধারণা করতে পারবেন। দিনাজপুরের অপারেশন কমান্ডার একদিন ঢাকায় কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠাল, চারজন মারোয়াড়ী স্ম্যাগলার আর্মির ভয়ে ঢাকায় গিয়ে জনাব মনসুর আলীর ছেলে নাসিমের সাহচর্যে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মগোপন করে আছে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত নেয়া হল, জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করে মারোয়াড়ীদের গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু আর্মি হেডকোয়াটার্সের হস্তক্ষেপে ঢাকার এরিয়া কমান্ডার জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত বাদ দিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চাপের মুখেই আর্মি হেডকোয়াটার্স থেকে এ ধরণের হস্তক্ষেপ হয়েছিল। ঐ ঘটনার পর সরকার আর্মির তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। অপারেশনের ফলে একদিকে সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে সরকার ও তার দলের মুখোশ উম্মোচিত হয়ে পড়ায় ক্ষমতাসীনরা

বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ভেবে উভয় সংকটে পড়ল সরকার ও সরকারি দল। এই অবস্থাতেও দাতাগোষ্ঠির চাপে সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিল খাদ্যসামগ্রী দেশের সকল অঞ্চলে সময়মত পৌঁছে দেবার। সেনাবাহিনী শুরু করল 'অপারেশন ফুড'। এই অপারেশনেও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে সেনাবাহিনী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে। এই অপারেশন আর্মির হাতে দেয়ায় ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয় সরকারি দলের মাঝে। কারণ তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল প্রতিক্ষেত্রে। সব পর্যায়ে দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই সমস্ত অপারেশন বন্ধের জন্য প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হল প্রধানমন্ত্রীর উপর। তিনি দলীয় স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এতে জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। সরকার প্রধানের এ ধরণের পক্ষপাতিত্বের ফলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন।

আওয়ামী দুঃশাসন এবং দুর্নীতির মুখোমুখি সামরিক বাহিনী

অবাধ চোরাচালান এবং চরম দুর্নীতির ফলেই ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ হয়

১৯৭২ সালের যে কোন খবরের কাগজ খুললে দেখা যাবে প্রায় সব খবরই হচ্ছে খুন, রাহাজানি এবং ছিনতাই সংক্রান্ত।

১৯৭২ সালের যে কোন জাতীয় সংবাদপত্র খুললে প্রথমেই চোখে পড়বে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী, আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খবর। প্রতিদিন দেশের শহরগুলোতে ঘটছিল প্রকাশ্য খুন, ডাকাতি ও রাহাজানীর ঘটনা। গ্রামে-গঞ্জেও চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। ক্রমবর্ধমান এ ত্রাসের নাগপাশে জনগণ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাল অতিবাহিত করছিল। যখন জনগণের পরনে কাপড় নেই তখনই ঘটেছিল সুতা নিয়ে কেলেংকারী। পেটে যখন ভাত নেই তখন লাখ লাখ টন বিদেশী সাহায্যে প্রাপ্ত খাদ্য নির্বিবাদে পাচাঁর হয়ে গিয়েছিল সীমান্তের ওপারে।

মজলুম নেতা ভাসানী অবাধে চোরাচালানের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি আওয়াজ তোলেন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারনবাদের বিরুদ্ধে। জবাবে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে চীন ও পাকিস্তানের দালাল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ১৯৬৮-১৯৬৯ এর সাড়া জাগানো আন্দোলনকালে বরফের উপর আঘাত করেছিলেন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তার নাম মাওলানা ভাসানী। মাওলানার সার্বজনীন আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই ছাত্ররা দিলেন ১১ দফা। তারই নির্দেশে ন্যাপ তার নিজস্ব ১৪ দফা বাদ দিয়ে ১১ দফাকেই তাদের দাবি হিসাবে গ্রহণ করে। ঊনসত্তোরের কারাবন্দী মুজিবর রহমানকে মুক্ত করার দুর্বার গণ আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন এই মাওলানা ভাসানীই। ১৬ই ফেব্রুয়ারী পল্টনের বিশাল জনসভায় তিনি বজ্রকন্ঠে হুশিঁয়ারী উচ্চারণ করেন, "প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মত জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে বের করে আনব।" তার মতো একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ রাজনৈতিক উদারপন্থী নেতাকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা বলে গালাগালি দিতেও কুন্ঠাবোধ করেনি শাসক দল। এই গালাগাল পর্ব শুরু করেন তরুণ নেতারা। পরে প্রবীণরাও ক্রমে তাদের সাথে যোগদান করেন। মার্চের শুরু থেকেই খবর আসতে থাকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে- মানুষ মরছে অনাহারে, না খেয়ে। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইলে বিরাজ করছে দুর্ভিক্ষ অবস্থা। আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের হতে থাকে স্থানে স্থানে। এ অবস্থায় ভারতীয় দূতাবাসের মুখপাত্রও স্বীকার করেন যে, চোরাচালান হচ্ছে ব্যাপক হারে। তারা বলেন, "সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি হয়ে গেলেই এই চোরাচালান বন্ধ হবে।" এ বক্তব্য দূতাবাস থেকে দেয়া হয় ২৩-৩-১৯৭২ তারিখে। দুর্নীতি ছড়িয়ে পরে দেশের সব জায়গায়, সর্বস্তরে।

১৯৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব তার সংসদ সদস্যদের প্রতি এক নির্দেশ জারি করে বলেন, "চাকুরি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। প্রশাসনকে চলতে দিন।" ১১ই মার্চ দৈনিক বাংলায় এক খবর বের হয় সিগারেটের পারমিট নিয়ে, "বাংলাদেশ ট্যোবাকো কোম্পানীর ২৫জন ডিষ্ট্রিবিউটর নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ তিন হাজার সুপারিশপত্র পেয়েছেন। সুপারিশকারীরা প্রত্যেকেই এমন প্রভাবশালী যে, কোম্পানী কাকে ছেড়ে কাকে ডিলারশীপ দেবেন সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছেন না।" ৬ই জুন চোরাচালানের স্বর্গ সিলেট থেকে দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি খবর পাঠান যে, গ্রেফতারকৃত চোরাচালানীরা প্রভাবশালী ক্ষমতাসীন নেতাদের চাপে ছাড়া পাচ্ছে। একইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য নেমে আসে

সরকারের পারমিটবাজী নীতির সূচনায়। সুতার পারমিট যে পাচ্ছে তার তাঁত নেই, কেরসিনের পারমিট যে পেল সে কোন ডিলার নয়। পারমিট দেয়া হল অব্যবসায়ী রাজনৈতিক টাউটবাজদের খুশি করার জন্য। ফলে র্দুভোগ গিয়ে বর্তাল জনগণের উপর। পারমিট হাত বদল প্রথায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল কয়েকগুন। কাপড়ের অভাবে মা-বোনেরা দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে পারতেন না। মেয়ে-মা একখানি কাপড় গোসল করে পালা বদলিয়ে পরছে। এ সমস্ত খবরও প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক পত্রিকায়। ঠিক সেই সময় সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে ভারত থেকে আনল 'সুন্দরী শাড়ী'। যে শাড়ীতে হাঁটু ঢাকে না, পর্দাও হয় না। ভারতীয় দূতাবাস বলল টিসিবি দেখেই এনেছে এই শাড়ী। টিসিবি কোন জবাব দিতে পারল না।

আগষ্ট মাসে দেশে বন্যা শুরু হয়। আসে বিস্তর রিলিফ। রিলিফ নিয়ে লুটপাটের কাহিনী পাওয়া যাবে ১৯৭৪ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের সংবাদপত্রসমূহে। অবাধ লুটপাট চলে বাশঁ, টিন, খাদ্যসামগ্রী, রিলিফের ঔষধপত্র এবং কম্বল নিয়ে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে ছাপা হয় ক্ষুধাতুর মানুষের ছবি। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মাথা গোজাঁর ঠাঁই নেই। কোটি কোটি লোক হয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুহারা। ৩রা আগষ্ট ইত্তেফাকে ছাপা হয় এসব ছবি। দৈনিক বাংলায় খবর বের হয়, বমি খাচ্ছে মানুষ। বাংলাদেশ রেডক্রস সর্ম্পকে প্রকাশিত হয় চুরি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অসংখ্য অভিযোগ। গ্রামে-গঞ্জে রেডক্রস প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার নামে ছড়া বের হয়। আতাউর রহমান খান রেডক্রসের অসাধু তৎপরতার প্রতিবাদ করেন। দুর্নীতির অভিযোগ করেন। ১০ই আগষ্টের ইত্তেফাকে সে বিবৃতি ছাপা হয়। ১৩ তারিখ সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যায় যে, সারাদেশের মানুষ কচু-ঘেচু খেয়ে জীবনধারণ করছে। আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন যে, বিরোধী দলীয় সদস্যদের ত্রান সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টায় পুলিশ বাধা দিচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করছে। জনাব খান ১১ই আগষ্ট কাগজে বিবৃতি দেন যে, দুনিয়ায় এমন কোন নজির নেই যে রেডক্রস সমিতির চেয়ারম্যান কোন দলীয় লোক হয়। তিনি একজন বিচারপতি অথবা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে এ সমিতির দায়িত্ব দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গ্রাম থেকে, উপদ্রুত এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ শহরে আসতে থাকে। ঢাকা শহরে ১৩৫টি রিলিফ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ১২ই আগষ্ট যাত্রাবাড়ির রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারীরা বলেন যে, তিনদিনে তাদের জন্য একমুঠো খাবারও বরাদ্দ করা হয়নি। ১৬ই আগষ্ট আইসিআরসির সদস্য মিঃ এলভিন কাজ পরিদর্শনের জন্য আদমজী রিলিফ ক্যাম্পে গেলে লোকেরা কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চুরি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করে। এলভিন চলে এলে কমিটির চেয়ারম্যান তার গুন্ডা বাহিনী দ্বারা অভিযোগকারীদের উপর হামলা চালায়। এতে ছুরিকাহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খাওয়ার অনুপযুক্ত পচাঁ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। তা থেকে ক্যাম্পগুলোতে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয়। মরতে থাকে মানুষ।

মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। সে সময়কার পত্রিকার পাতা উল্টালে গা শিউরে উঠে। মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ কেড়ে নেয় লাখ লাখ মানুষের প্রাণ। হাজার হাজার চাষী যারা একদা কষে ধরতো লাঙ্গল, মাঠ ভরে তুলত সবুজ শস্যের সমারোহে, তারা ভিক্ষার জন্য শহরের মানুষের কাছে হাত পাতে। ফিরে যায় ভিক্ষা না পেয়ে। তারপর বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়ে থাকে। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম প্রতিদিন ঢাকা শহর থেকেই তিরিশ থেকে চল্লিশটি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করছিল। সে কাহিনী ও ছবি আছে সেই সময়কার দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর পাতায় পাতায়। ঢাকায় প্রতি ঘন্টায় ৩-৪ জন লোক মারা যেতে থাকে অনাহারে। এর এক পর্যায়ে আঞ্জুমানের লাশ দাফনের কথা খবরের কাগজে প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়া হয় সরকারি আদেশে। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর মাস অব্দি প্রতিটি জেলা থেকে খবর আসতে থাকে যে, শত শত লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। ভাত নেই, কাপড় নেই, বাসস্থান নেই। ১০ই সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক ছবি ছাপে- মাছ ধরার জাল পরে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে গ্রামের কোন কুল বধু। চট পরে ভিক্ষার

আশায় সন্তান কোলে ঘুরে ফিরছে অসহায় জননী। গৃহবধুরা ক্ষুধার জালায় হচ্ছে প্রমোদবালা। রিলিফের কেলেঙ্কারীর খবর ছাপা হচ্ছিল খবরের কাগজে। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তিদের একজনেরও বিচার হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি কখনো। কেন হয়নি সে খবরও সংবাদপত্রের পাতায় আসেনি। উত্তরাঞ্চলে পানির দামে বিক্রি হতে থাকে জমি। অসংখ্য সম্ভ্রান্ত কৃষক ভিক্ষুকে পরিণত হন। সে সময়ের ২২শে সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমে দুই শতাধিক উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ নারী পুরুষ অন্নবস্ত্রের দাবিতে মিছিল করে। গ্রাম থেকে আসা অসহায় মানুষের আর্তনাদ একটুও কম্পিত করতে পারেনি আওয়ামী লীগের শাসককুলের হৃদয়। আর সেই সময়েই শেখ মুজিবের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫৫ পাউন্ড ওজনের কেক কাটেন শেখ মুজিব নিজেই!!!

২৩শে সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলার কথা ঘোষণা করা হয়। সে সমস্ত লঙ্গরখানার ইতিহাস আর এক করুণ কেলেঙ্কারীর ইতিহাস। নওগাঁর আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ২৪শে সেপ্টেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে জানান যে, সারা জেলার মানুষ গত ৩-৪ দিন ধরে না খেয়ে আছে। চালের সের সাত টাকা। তার ক'দিন পরেই ৬ই অক্টোবর ইত্তেফাক খবর দেয় যে, ২১ লাখ টাকার বিদেশী মদ ও সিগারেট আমদানি করা হয়েছে সরকারি টাকায়। ঐ দিনই খাদ্যমন্ত্রী বললেন, "তখন পর্যন্ত অনাহারে কতলোক মরেছে সরকারের তা জানা নেই। প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর খবর অতিরঞ্জিত।" তবে তিনি স্বীকার করেন চোরাচালান কিছুটা হয়েছে।

৮ই অক্টোবর অধ্যাপক আবুল ফজলসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতির জীবনে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রতি এত অনাসক্তি, এত অবজ্ঞা, এত অদ্ভুত রকম ঔদাসীন্য কখনও দেখা গেছে বলে মনে হয় না। নিজের প্রতি আস্থাহীন জাতি যে কী রকম জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে বর্তমান বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই একাত্মতা, ত্যাগের মহৎ শক্তির সেই প্রচন্ডতা পরবর্তিকালে সিদ্ধান্তহীনতায়, ভুল সিদ্ধান্তে, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় আর গুটিকতক লোকের লাগামহীন দুর্নীতির সয়লাবে সব ধুয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের প্রতি এই জাতীয় দুর্দিনে আমাদের আকুল প্রার্থনা, জাতি হিসেবে আমাদের শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে দিন।"

৮ই অক্টোবর ১৯৭৪ শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান এমপি জানান, "লবনের দুঃপ্রাপ্যতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্রকার খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যে, মজুতদার উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ২টাকা মন দরে লবন কিনে থাকে। সরকারিভাবে মজুতদারদের জন্য অশোধিত লবনের দাম ১৫ টাকা আর শোধিত লবনের দাম ৫৫ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "অশোধিত লবনের দাম ৪০ টাকা করা হলে বাজারে প্রচুর লবন পাওয়া যাবে। প্রকাশ, এ ব্যাপারে নাকি আমাদের দলীয় কোন কোন সংসদ সদস্য জড়িত রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।"

১৩ই অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় যে, প্রতিদিন গড়ে ৮৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন হচ্ছে। ২৭শে অক্টোবর খবর আসে জামালপুরে প্রতিদিন অনাহারে শতাধিক লোক মারা যাচ্ছে। সরকার এই মৃত্যুকে পুষ্টিহীনতা বলে অভিহিত করে। অনাহারে মানুষ মরছে সরকার সেটা অস্বীকার করে। ২৫শে অক্টোবর ঢাকার সংবাদপত্রে বের হয় ট্রাক বোঝাই ধানচাল ভারতে পাচাঁর হচ্ছে। দিনাজপুরে চালের সের ৮ টাকা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানিকগঞ্জের এক পরিবারের ৭জন আত্মহত্যা করেছে। এসময়ে ২৫শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব কামরুজ্জামান দাবি করেন, "দেশের প্রচলিত আইনে চোরাচালানীদের দমন করা হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে সংসদে চোরাচালানীদের গুলি করে হত্যা করার বিধান পাশ হয়। কিন্তু কাউকে কোন দিন ঐ বিধানে হত্যা করা হয়নি।" একই সঙ্গে কামরুজ্জামান অবশ্য বলেন, "দলের ভেতর থেকে দলের সমালোচনা চলবে না।" তখন থেকে আওয়ামী লীগের ভেতরেও কোন্দল দানা বেঁধে উঠে। সেই ক্রান্তিলগ্নে ২৬শে অক্টোবর '৭৪ স্বাধীনতা সংগ্রামকালের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নির্দেশে মন্ত্রীত্ব হারান। জনাব তাজুদ্দিন এক

বিবৃতিতে বলেন, "জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কোন বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান না।" ঢাকার এবং বিদেশী সাংবাদিকদের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করায় জনাব তাজুদ্দিন আহমদের যে ইমেজ গড়ে উঠে তা পাকিস্তানে আটক শেখ মুজিবর রহমান সহ্য করতে পারছিলেন না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটক শেখ মুজিবের চেয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নকে বড় করে দেখার জন্য বেগম মুজিবও তাজুদ্দিনকে সহ্য করতে পারতেন না বলে জানা যায়। তাজুদ্দিন সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয় যে, তিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের পথে চলে যায়। তাজুদ্দিন আহমদ বাকশালের কেন্দ্রিয় কমিটি থেকেও পরবর্তিতে বাদ পড়েন।

২৯শে অক্টোবর সারাদেশে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই দিন মজুতদারী আর কালোবাজারীর দায়ে আওয়ামী লীগের আর একজন সংসদ সদস্য গ্রেফতার হন। ৩০ তারিখে লবন মজুতের জন্য আওয়ামী লীগের এমপি ডঃ শামসুদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

এ অবস্থায় মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগে ১লা নভেম্বর ১৯৭৪ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে শিক্ষক, আইনজীবি, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, চিত্রশিল্পী ও ছাত্রসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বর্তমান মন্বন্তর প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সমাবেশে যোগদান করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবিদের এত বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয়নি। 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির' সভাপতি সিকান্দার আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই ঘন্টার উপর এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ, ডঃ আহমদ শরীফ, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েত উল্লাহ খান, কামরুন্নাহার লাইলী, নিজামুদ্দিন আহমদ, মহিউদ্দিন আলমগীর, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং বদরুদ্দিন উমর। সমাবেশে বিদ্যমান মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক আধিকার সম্পর্কে ১৭টি প্রস্তাব গৃহিত হয়। সমাবেশের পর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গন থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই সমাবেশের কর্মসূচী শেষ হয়। সমাবেশে গৃহিত প্রস্তাববলীর বিবরণ:-

১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মন্বন্তরের গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকেও অতিক্রম করেছে এবং এই মন্বন্তর, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি বরং শাসকশ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকান্ডেরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে 'প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা' বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণার জোর দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের একটি শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

সমাবেশের প্রস্তাবে সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠনে সরকারের বিরোধিতার নিন্দা করে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠন করার দাবি জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে বিরোধী দলসমূহের প্রতি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও রেশনিং এলাকা সম্প্রসারন ও টেষ্ট রিলিফ চালু করার দাবি জানানো হয়। সমাবেশের প্রস্তাবে লঙ্গরখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেখানে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন সমাবেশে রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসাবে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ ও মিথ্যা মামলায় আটক ও বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।

পরবর্তিকালে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আওয়ামী লীগ সরকার ও সরকারি দলের নেতা-সদস্যদের রিলিফ চুরির ও চোরাচালানের বিবরণ দিতে গিয়ে

১৩ই আগষ্ট ১৯৯২ সালে সংসদে বলেছিলেন, “রিলিফ চুরি ও চোরাচালানের মাত্রা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল আওয়ামী শাসনামলে যে তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধানকে বলতে হয়েছিল, ‘আমার কম্বলটা কোথায়??’ ”(২১শে আগষ্ট ১৯৯২ বিচিত্রায় প্রকাশিত)।

সেই সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ঐ বক্তব্যের বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিক্ত সত্যকে গলঃধরণ করে তাকে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে অসহায়ের মত।

শেখ কামাল নিজেকে ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে দাবি করলো!

বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে আমরা তখনও ব্যস্ত। একরাতে হঠাৎ করে শেখ কামাল, সাহান এবং তারেক এসে উপস্থিত আমার কুমিল্লা সেনানিবাসের বাসায়। সাহান ও তারেক ছিল কামালের বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধু।

কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন বেশ রাত করেই শেখ কামাল, সাহান এবং তারেক কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আমার বাসায় এসে হাজির। রাত তখন প্রায় ১১টা বাজে। এতরাতে কোন খবর না দিয়ে ওদের আগমণে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলাম।

-কি ব্যাপার কামাল। তোমরা এত রাতে এখানে ? প্রশ্ন করলাম।

-বস সরি! কিন্তু উপায় নাই। রাতটা আপনার বাসায় নিরাপদে কাটাবো বলেই এলাম। সকালে এসেছি পার্টির কাজে। সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম শহরে। খবর দেবার সময়ও পাইনি। কিছুক্ষণ আগে কাজ শেষ হল। দিনকাল খারাপ তাই ভাবলাম শহরে না থেকে আপনার কাছে চলে আসি।

-তা বেশ করেছো। শহরেতো আজ গোলাগুলিও হয়েছে শুনলাম।

-না বস। গোলাগুলি না; এই একটু রংবাজী আর কি! জানাল কামাল। এরি মধ্যে নিম্মী খাবারের বন্দোবস্ত করে এসে বলল,

-সবার মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে কারোই খাওয়া হয়নি, এসো খেয়ে নাও; তারপর কথা বলার জন্য সারারাত পড়ে আছে।

-নিম্মী **You are really great** বলল কামাল। সবাই হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল। এরা তিনজনেই বিশেষভাবে পরিচিত এবং আপনজন। খাওয়ার মাঝেই সাহান বলে উঠল,
-ডালিম ভাই কামাল বিয়ে করছে।
-তাই নাকি! তা হঠাৎ করে বিয়ে কি বিষয়?
-না মানে, সবাই ধরছে; না করে আর উপায় কি বস ? রাজি হতেই হল।
-এত খুবই সুখবর। তা তোমার স্কলারশীপের কি হল? সস্ত্রীক যাচ্ছ নাকি? জানতে চাইলাম আমি।
-যাওন যাইবো না বস। পড়ালেখা করার সময় নাই। এরপর কামাল শার্টের কলারের একপ্রান্ত আঙ্গুল দিয়ে নাড়িয়ে বেশ একটু গর্বের সাথেই বলল,
- **Future Prime Minister** বুঝতেইতো পারেন কত কাম। একদম সময় নাই।
-সেটাতো বুঝতেই পারছি; কিন্তু **There is no short cut to knowledge.** মাত্রতো ২-৪ বছরের ব্যাপার ছিল। লেখাপড়াটা সেরে আসলে ভবিষ্যতে একজন **Educated Prime Minister** পেতাম। **This is my only interest nothing else.** তাই বলা আর কি। তাছাড়া আগামী দু'চার বছরেতো চাচা রিটায়ার করছেন না; সেক্ষেত্রে স্কলারশীপটা **avail** করলেই পারতে। দেখ কামাল, চাচা বলেন তিনি প্রায় সর্বমোট ১৭ বছর জেল খেটেছেন পাক আমলে। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় পৃথিবীর প্রায় সব নামি-দামী নেতারা বিস্তর লেখাপড়া করেছেন। আমাদের ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের লাইব্রেরীটাও শুনেছি খুবই **rich.** জেলে থাকাকালীন সময়টার যথাযথ সদব্যবহার করে চাচা কিন্তু তেমন একটা লেখাপড়া করেননি। সময়টাকে কাজে লাগালে আজ তারই অনেক সুবিধা হত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। কি কথাটা ঠিক বললাম কি না? ওরা সবাই আমার কথা শুনছিল আর খাচ্ছিল। কামাল কিংবা অন্যদের কেউ কোন উত্তর দিল না। আমার কথাগুলো

সম্ভবত ওদের মনঃপুত হয়নি। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হালকা আলাপ করে সবাই শুয়ে পড়েছিলাম। পরদিন নাস্তার পর ওরা ঢাকায় ফেরার জন্য রওনা হয়ে গেল।

জেনারেল জিয়াকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা

সরকার জেনারেল জিয়াকে বার্মায় 'ডিফেন্স এ্যটাসী' করে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

আমরা তখনো সারাদেশে ডিপ্লয়েড। একদিন নূর ফোন করে জানাল- জেনারেল জিয়া অতি জরুরী প্রয়োজনে আমার সাথে দেখা করতে চান। ফোন পেয়েই এলাম ঢাকায়। নূর জানাল বস আমাকে বাসায় দেখা করতে বলেছেন। বুঝলাম বিশেষ জরুরী বিষয়ে আলাপ করতে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। জরুরী এবং গোপন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সাধারণতঃ তার বাসাতেই হত। বাসায় গিয়েই দেখা করলাম। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনার পর তিনি আসল কথাটা বললেন,

-**I hear that I am going to be sent out from the army as Defense Attaché to Burma soon, do you know anything about it?**

-আকাশ থেকে পড়লাম! কি বলছেন জেনারেল জিয়া? শেখ মুজিবতো কথা দিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাকে চীফ বানাবেন; তাহলে? জবাব দিলাম,

-আমি কিছুই জানি না স্যার। তবে আপনার যাওয়া চলবে না। আপনাকে হারাতে চাই না আমরা।

- **Well then try to do something..** তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি চাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ বিষয়ে আমি আলাপ করি। অবশ্যই আমার সাধ্যমত যা করার সেটা আমি করব। প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব আজই। বললাম আমি।

- **I shall appreciate that. Do let me know the outcome of your meeting. I shall be waiting for your return.**

-ঠিক আছে স্যার। বলে বেরিয়ে এসেছিলাম তার বাসা থেকে।

সেদিন রাতেই গিয়ে উপস্থিত হলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে। নেতা তখনো বাড়ি ফেরেননি। রেহানা ও জামালের সাথে বসে গল্প-গুজব করছিলাম। জামাল জানাল সে স্যান্ডহার্টস না হয় যুগোস্লাভিয়ায় যাচ্ছে **Army officer's course** করার জন্য। শুনে বললাম, " ভালইতো; ক্যারিয়ার হিসাবে আর্মিকে যদি তোমার পছন্দ হয় তবে তো তোমার যাওয়াই উচিত।" আমরা যখন কথা বলছিলাম কামাল যেন কোথা থেকে বাসায় ফিরে এল। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল,

-বস কি ব্যাপার ?

-কোন ব্যাপার ছাড়া ৩২নং এ বুঝি কেউ আসে না? আমার পাল্টা প্রশ্নে ও একটু লজ্জা পেলো। তাড়াতাড়ি পরিবেশ হালকা করার জন্য বলল,

-না না তা ঠিক নয়। তবে বেশিরভাগ লোকজনদেরই কিছু না কিছু ব্যাপার থাকে; তবে ব্যতিক্রমও আছে যেমন আপনি। আপনি আসেন শুধু আব্বার সাথে ঝগড়া করতে।

-ঝগড়া করার অধিকার তার, ভালবাসার অধিকার যার। জবাবে বলেছিলাম আমি।

-তাতো অবশ্যই, সেটা কি আমরা বুঝি না। বাদ দেন এসব। একটা পরামর্শ দেনতো বস। বলল কামাল।

-কি বিষয়ে? জিজ্ঞেস করলাম।

-একটা স্কলারশীপ পাইছি ক্যানাডায় ল' পড়ার জন্য। ঠিক করতে পারতাছি না যামু কি যামু না।

-এটাতো অত্যন্ত সুখবর! যাবে না মানে? নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত। জ্ঞান অর্জন করার জন্যতো চীন পর্যন্ত যেতে বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী। মাত্র ৩-৪ বছরের ব্যাপার। সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আমি যদি এমন একটা সুযোগ পেতাম তবে খুশী হয়ে চলে যেতাম। আমার জবাব শুনে কামাল বলল,

-তাহলে যাওয়াই উচিত আপনার মতে?

-অবশ্যই যাওয়া উচিত। এরই মধ্যে বাড়ির কাজের ছেলেটা এসে জানাল কেউ এসেছে কামালের সাথে দেখা করতে তাই বিদায় নিয়ে কামাল চলে গেল। নেতা ফিরলেন বেশ রাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ডাক পড়ল।

-কি খবর অনেকদিন পর আইলি যে? শেখ সাহেব বললেন।

-ঢাকায় কাজে এসেছি ভাবলাম আপনাকে সালাম জানিয়ে যাই। তিনি বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন। কথার সাথে সাথে পাইপ টানছিলেন।

-চাচা, আপনি নাকি জেনারেল জিয়াকে বার্মায় Defense Attaché করে পাঠবেন ঠিক করেছেন? তার ভাল মুড এর সুযোগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

-ঠিক করি নাই; তবে বার্মায় একজনরে পাঠাইতে হইবো। শফিউল্লাহ কইলো জিয়ার নাকি ইন্টিলিজেন্সের ট্রেনিং আছে তাই ওর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হইতাছে।

তার কথার খেই ধরে আমি বললাম,

-ইন্টিলিজেন্স কোর্স করা আর্মিতে আরো অনেক অফিসারই আছে। তাদের থেকে কাউকে পাঠান। General Zia is too senior for that post anyway. তাছাড়া এই মুহুর্তে তাকে বাইরে পাঠালে সবাই ভাববে আপনি আপনার কথার খেলাপ করে তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আর্মি থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এটা আপনার জন্য ভাল হবে কি? তাছাড়া বেশকিছু কারণে আর্মির ভেতরে একটা সুপ্ত ক্ষোভ বিরাজ করছে। এ অবস্থায় এ ধরণের একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যদি কোন Out burst ঘটে; সেটা সরকার এবং সরকার প্রধান হিসাবে আপনার জন্য বিব্রতকরও হতে পারে। বেয়াদবী নেবেন না চাচা, আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না। চুপ করে আমার কথাগুলো শুনে গেলেন শেখ সাহেব পাইপ মুখে নিয়ে।

-তুই কেমন আছস? কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন তিনি।

-যেমন রাখছেন। জবাব দিলাম।

-তোরাতো একটা কথা বুঝস না। পার্টির রাজনীতি করতে গেলে সবকিছুতে যুক্তি চলে না। নিজের ইচ্ছামতও সবকিছু করন যায় না। আমার অবস্থাটা বুঝিস। দেশও চালাইতে হয় আবার পার্টির স্বার্থও দেখতে হয়।

-চাচা আমি রাজনীতি করি না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। সেই তুলনায় আমার কোন জ্ঞান নাই বললেই চলে। তবু কেন জানি মনে হয় প্রচলিত প্রবাদটায় একটা গভীর মানে আছে, একটা ঈঙ্গিত বলা চলে।

-কোন প্রবাদের কথা কছ তুই? জানতে চাইলেন জনাব শেখ মুজিব।

-ঐ যে, 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়; দলের চেয়ে দেশ বড়।' হালকাভাবে কথাটা বলেই ফেললাম। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন শেখ সাহেব।

-জিয়া তোরে পাঠাইছে? প্রশ্ন করলেন তিনি।

-জিয়া পাঠাবে কেন? আপনিই আমাকে কথা দিয়েছিলেন উপযুক্ত সময় তাকে আপনি চীফ বানাবেন; তাই খবরটা জানার পর আমি নিজেই এসেছি স্বেচ্ছায় আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে। বেয়াদবী হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন।

-ঠিক আছে বুঝলাম। তুই যা এখন, কিছু লোকজন আইবো।

আমি সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। পরদিন জেনারেল জিয়াকে সবকিছু জানিয়ে কুমিল্লায় ফিরে এলাম। আমাদের সেদিনের আলোচনার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক জেনারেল জিয়াকে আর বার্মায় যেতে হয়নি। তার জায়গায় পাঠানো হয়েছিল কর্নেল নূরুল ইসলাম শিশুকে। তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে চলে গেলেন বার্মায়। তার খুশী হওয়ার কারণ ছিল। যুদ্ধের সময় হার্টের পালপিটেশনের অযুহাতে রণাঙ্গন ছেড়ে কোলকাতার মুজিবনগর হেডকোয়াটার্স চলে এসেছিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর তিনি হঠাৎ করে একদিন ২৭নং মিন্টু রোডের হেডকোয়াটার্স থেকে লাপাত্তা হয়ে যান। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল তবুও তিনি ফিরলেন না। এতে জেনারেল ওসমানী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ক্যাপ্টেন সালাহ্উদ্দিনকে ডেকে হুকুম দিলেন যেকরেই হোক না কেন deserter শিশুকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসতে। আমরা সবাই জানতাম আর্মিতে আর চাকুরি করতে চাচ্ছেন না শিশু ভাই।

কিন্তু জেনারেল ওসমানীও ছাড়বেন না তাকে। সে এক উভয় সংকট অবস্থা। এ কারণেই লাপাত্তা হয়েছিলেন তিনি। যাই হোক অনেক কষ্টে তাকে সবাই মিলে বুঝিয়ে কোনরকমে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই শিশু ভাই পরবর্তিকালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মেজর জেনারেল ইসলাম "The Rasputin of Bangladesh" হয়ে উঠেন। একেই বলে 'কপালের নাম গোপাল'। বাংলাদেশের রাজপুটিন শিশুর কর্মতৎপরতার পরিণাম কি হয়েছিল সে এক করুণ ইতিহাস। সেক্সপিয়রীয় বিয়োগান্তর নাটকের জুলিয়াস সিজারে পরিণত হয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। যাই হোক, জেনারেল জিয়াকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেও পরিষ্কার বোঝা গেল সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী চেতনার অধিকারী অংশকে দুর্বল করে তোলার জন্য সরকার ক্ষেপে উঠেছেন। মেজর জলিল, কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং কর্নেল তাহেরকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছি এবং আরো অনেককেই হয়তো বা বের করে দেয়া হবে সেনাবাহিনী থেকে কোন না কোন অজুহাতে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে, রাজনৈতিক মহল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সমমনা লোকদের সাথে আলোচনা হল। প্রায় সবাই একই মত পোষণ করলেন যে, সেনাবাহিনীতে স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকদের ক্রমান্বয়ে বের করে দিয়ে শুধুমাত্র খয়ের খাঁ, জী হুজুর টাইপের সদস্যদেরকেই রাখা হবে সেনাবাহিনীতে। এরপর এক সময় রক্ষীবাহিনীকে তাদের সাথে একত্রীভূত করে গড়ে তোলা হবে সম্পূর্ণভাবে সরকারের তাবেদার এক সেনাবাহিনী। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম- এখন থেকে যতটুকু সম্ভব এ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখব।

সেনাবাহিনীকে পুনরায় আইন-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে তলব করা হয়।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিকহীন আওয়ামী লীগ সরকার আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যে সেনাবাহিনীকে তলব করতে বাধ্য হন শেখ মুজিব ও তার সরকার।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশের এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিশেহারা মুজিব সরকার নেহায়েত অনোন্যপায় হয়ে আবার সেনাবাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুস্কৃতিকারী দমন করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল নাজমুল হুদা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ছিলেন কর্নেল হুদা। সেই সুবাদে কিংবা অন্য যেকোন কারণেই হোক শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিল তার। তবে এ বিষয়ে সুশিক্ষিত কর্নেল হুদার মনে দ্বন্দ্বও ছিল যথেষ্ট। একই সাথে যুদ্ধ করেছি আমরা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সম্পর্ক এত নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে আমরা রাজনীতি নিয়ে অবাধে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার স্পষ্টবাদিতায় অনেক সময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় বড় ভাইয়ের মত উপদেশ দিতেন বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমি যাতে নিজেকে বিপদে না ফেলি। তার আন্তরিকতায় আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম। অপারেশন অর্ডার আসার পর আমি হুদা ভাইকে একদিন বলেছিলাম '৭২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি নিজেও সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঠিক করা হল চীফ অফ স্টাফকে অনুরোধ জানানো হবে যাতে তিনি সশরীরে কুমিল্লায় এসে অপারেশন সম্পর্কে সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে করে আমরাও জানার সুযোগ পাবো এবার সরকারের উদ্দেশ্য কি? প্রধনমন্ত্রী কি এবার সত্যিই তার 'চাটার দল' ছেড়ে জনগণের কল্যাণ চান? এর জন্যই কি তিনি আমাদের সাহায্য চাইছেন? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল শফিউল্লাহকে কর্নেল হুদা কুমিল্লায় আসার অনুরোধ জানালেন। এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কনফারেন্সে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "৭২ সালের মত সেনাবাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নাতো এবারও?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, , "**This time 'BangaBandhu' means business. If even his dead father is found to be implicated in any crime then his body could be exhumed for trial. No exception this time whatsoever. This is what he told me personally and I have no reason to disbelieve him.**" খুবই ভালো কথা। শেখ মুজিব এবার সত্যিই চিনতে পেরেছেন তার সরকার ও দলকে। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিকার চান। এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্থে জননেতা হবার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইছেন তিনি। তার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করব সব ঝুঁকি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে; সে কথাই দেয়া হয়েছিল জেনারেল শফিউল্লাকে। অপারেশনকে যেকোন মূল্যে সফল করে তুলবো আমরা। খুশি মনেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কুমিল্লা ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেয়া হল কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেটে অপারেশন পরিচালনার। আমাকে কর্নেল হুদা (হুদা ভাই) কুমিল্লা অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন। সিলেট এবং নোয়াখালীর দায়িত্ব দেয়া হল মেজর হায়দার এবং মেজর রশিদকে। **Combing Operation** শুরু হল। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেল সব সেক্টরে আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাছেই রয়েছে বেশিরভাগ অবৈধ অস্ত্র। প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়াতেই নিরাপদে রয়েছে ঐসব অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা। তাতে কি? এবার মুজিব তার মরা বাপকেও ছাড়তে রাজি নন। আমরা যার যার এলাকায় সব প্রস্তুতি শেষে অপারেশন শুরু করলাম। সব জায়গায়ই খবর পাওয়া যাচ্ছিল এলাকার যত দাগী লোক, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী, লুটেরাদের মাথা হল আওয়ামী লীগের নেতারা কিংবা নেতাদের পোষ্য মাস্তানরা। সব জায়গাতেই আবার আমাদের সরকারি দলের নেতারাও তাদের তৈরি সন্ত্রাসীদের

নামের তালিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তের ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত লোকেরা প্রায়ই এলাকায় সৎ এবং নীতিবান বলে পরিচিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হল দুঃস্কৃতিকারীদের ধরা সে যেই হোক না কেন। দল বিশেষের প্রতি আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হল অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিল তাদের বেশিরভাগই হোমরা-চোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রীরা। সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগম থেকে কুমিল্লার জহিরুল কাইউম কেউই বাদ পড়লেন না। সিলেট, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল এবং দেশের অন্যান্য জায়গাতে আর্মির হাতে ধরা পড়ল শেখ নাছের, হাসনাত প্রমুখ অনেক নামী-দামী নেতারা। সব জায়গায় একই উপাখ্যান। এলাকার দুস্কৃতিকারীদের বেশিরভাগই সরকার ও সরকারি দলের লোকজন। এই অপারেশনের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-পাতি নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। আর্মি অপারেশনের ফলে সারাদেশে চমক সৃষ্টি হল। লোকজন ভাবল শেখ মুজিব আর্মির সাহায্যে 'চাটার-দল' এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ফলে সবখানেই জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন আর্মি অপারেশনে সাহায্য করতে। কয়েকদিনের দেশব্যাপী অভিযানের ফলে সন্ত্রাস কমে গেল অস্বাভাবিকভাবে। জনগণের মনে আশা ফিরে এল। দুঃশাসনের ফলে র্নিজীব হয়ে পড়া জাতির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হল। ধরা পড়া সবার বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হল। কারো ব্যাপারেই কোন ব্যতিক্রম করা হল না। যদিও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও অনেকের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিল অনবরত। কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে সবাই অটল। কারো ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা হবে না। আইন সবার জন্যই সমান। হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র আইনই এখন তাদের ভাগ্য নির্ধারন করতে পারে। আইনকে নিজের হাতে নেবার কোন অধিকার তার নেই। ব্রিগেড কমান্ডারের এই জবাব জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কর্নেল হুদার কাছে ফোন এল প্রধানমন্ত্রীর। কর্নেল হুদা বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রী যেন তার রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েলকে পাঠিয়ে দেন চীফের সাথে সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত করার জন্য। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে আর্মি কারো প্রতি কোন অবিচার কিংবা অন্যায় আচরণ করেছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যেকোন শাস্তিই তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন এরিয়া কমান্ডার হিসাবে। প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন যখন আসে তখন দৈবক্রমে আমিও কন্ট্রোল রুমে এ উপস্থিত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ফোন তাই আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কর্নেল হুদার নির্দেশেই রুমে থেকে যেতে হয়েছিল আমাকে। কর্নেল হুদার চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নেতার প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য এবং শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজনদের একজন হয়েও কর্নেল হুদা (গুডু ভাই) এ ধরণের জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন সেটা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অতিসত্বর তিনি লোক পাঠাচ্ছেন তদন্তের জন্য। সেদিনই হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছালেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জনাব তোফায়েলকে কিছুতেই তিনি সঙ্গে আনতে রাজি করাতে পারেননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জনাব তোফায়েল কুমিল্লায় এলে সবকিছু বিস্তারিত জানার পর মাথা হেট করে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর থাকত না তার। জেনারেল জিয়ার আগমণের পর কুমিল্লাসহ অন্য সব জেলার শীর্ষ নেতাদের যারা তখনও বাইরে ছিলেন তাদের সবাইকে সেনানিবাসে আমন্ত্রণ জানানো হল এক মধ্যাহ্ন ভোজে। ভোজপর্ব শেষে একে একে সব ধৃত ব্যক্তিদের কেন এবং কোন চার্জে ধরা হয়েছে; প্রমাণাদিসহ তার বিশদ বিবরণ দিলেন অপারেশন কমান্ডাররা। কেউ কোনকিছুর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। জেনারেল জিয়া কর্নেল হুদা এবং আমাকে সঙ্গে করে একই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় সেনা সদরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২নং ধানমন্ডিতে শেখ সাহেবের

সাথে দেখা করতে। সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমদ আমাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখা মাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন,

–কি পাইছস তোরা? আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে আর কোন দুস্কৃতিকারী নাই? জাসদ, সর্বহারা পার্টির লোকজন তোদের চোখে পড়ে না? অবাক হয়ে গেলাম। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী! কর্নেল হুদা জবাব দিলেন,

–স্যার আমরা আপনার নির্দেশে অপারেশন করছি প্রকৃত দুস্কৃতিকারীদের ধরার জন্য। আমরা র্নিদলীয়। আমাদের কাছে সবাই সমান। বিভিন্ন এজেন্সীর দেয়া রির্পোটের ভিত্তিতে এবং আমাদের নিজস্ব এজেন্সী দিয়ে ঐ সমস্ত রিপোর্ট ভেরিফাই করার পরই আমরা এ্যাকশন নিয়েছি। ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই যদি আওয়ামী লীগার হয় তাতে আমাদের দোষ কোথায়? কথা বাড়তে না দিয়ে জনাব তোফায়েল কয়েকজনের নাম করে তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বললেন। তাকে সমর্থন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

–যা হবার তা হইছে। এখন এদের ছাড়ার বন্দোবস্ত কর। জবাবে আমি বললাম,

–ধরার বা ছাড়ার মালিক আমরা নই স্যার। চীফের মাধ্যমে আপনার নির্দেশই কার্যকরী করেছি আমরা। ধরার হুকুম দিয়েছিলেন আপনি; ছাড়ার মালিকও আপনি; তবে এ বিষয়ে আইন কি বলে সেটা আমার জানা নেই। ছেড়ে দেয়াটা যদি আইনসম্মত মনে করেন তবে হুকুম জারি করে আইন সংস্থাকে বলেন তাদের ছেড়ে দিতে। আমরা তাদের ছাড়বো কিভাবে? তারাতো এখন আমাদের অধিন নয়। সবাই এখন রয়েছে আইনের অধিনে। আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। আমার জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল শফিউল্লাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,

–বাজান! কিছু একটা কর নাইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শ্যেষ হইয়া যাইবো। জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর 'বাজান' সম্বোধনে বিগলিত হয়ে দাড়িয়ে পড়ে প্রায় হাতজোড় করে বললেন,

–স্যার। আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করব। আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কথাগুলো শেষ করে বসতেও ভুলে গিয়েছিলেন সেনা প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় আবার নিজের আসনে বসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। আমরা সবাই নিশ্চুপ বসে থেকে তার মোসাহেবীপনার কৌতুক উপভোগ করছিলাম কিছুটা বিব্রত হয়ে। **After all he is our Chief!** ইতিমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নীচুস্বরে কিছু বললেন। তার কান পড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন,

–কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেফটেন্যান্ট জহির এর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে হইবো। তারা বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। হুদা ভাইকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

–স্যার ওরা সব জুনিয়র **Subordinate officer.** ওরা যা করেছে সেটা আমার হুকুমেই করেছে। অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি নয়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার পরেও যদি ওদের শাস্তি দিতে চান তবে সেটা সবার আগে আমারই প্রাপ্য। আমাকে ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে সেক্ষেত্রে কমান্ডার হিসাবে অধিনস্থ সব অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাড়ালেন তিনি এবং বললেন,

–ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখ সাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। যথাযথ নিয়মে বারান্দায় খাওয়া পরিবেশন করা হল। খেতে খেতে শেখ সাহেব বললেন,

–তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইলো ক্যান?

–চাচা বিশ্বাস করেন; আমরা কোন দল দেখে অপারেশন করিনি। চীফ কুমিল্লায় এসে আমাদের বলেছিলেন এবার নাকি আপনি আপনার মরা বাপকেও ছাড়বেন না। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আপনি একবার কুমিল্লায় গিয়ে দেখেন লোকজন কি খুশী। সবাই মনে করছে এবার আপনি সত্যিই চাটার দল এবং টাউট বাটপারদের শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নেতা

হিসাবে জনগণের মনোভাবকেই তো আপনার প্রাধান্য দেয়া উচিত। আমিতো মনে করি আমাদের এই অপারেশনের পর আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেকোন কারণেই আপনি যদি এদের ছেড়ে দেন তবে কি আপনার লাভ হবে? আমারতো মনে হয় ক্ষতিই হবে আপনার। আপনার পরামর্শদাতারা যে যাই বলুক না কেন আমার মনে হয় বিনা বিচারে কাউকেই ছাড়া আপনার উচিত হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন সবচেয়ে বেশি।

-কিন্তু পার্টি ছাড়া আমি চলমু কেমনে ? প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব।

-পার্টি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন। মনে করেন না কেন এটা একটা শুদ্ধি অভিযান। খারাপদের বাদ দিয়ে সৎ এবং ভালো মানুষদের নিয়েওতো পার্টি চালানো যায়। কিছু মনে করবেন না চাচা; চোর, বদমাইশ, সন্ত্রাসী, লুটেরা, টাউট-বাটপারদের নেতা হিসাবে পরিচিত হওয়াটাকি আপনার শোভা পায়? যারাই ধরা পড়ছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগার। তার মানে বর্তমানে আপনার দলে ভালো লোকের চেয়ে খারাপ লোকজনই বেশি। এদের বাদ দেন। দেখেন লোকজন কিভাবে আপনাকে সমর্থন জানায়। চুপ করে শুনছিলেন আমার কথা। মুখটা ছিল থমথমে। খাওয়ার পর পাইপ টানার অভ্যাস তার, পাইপটা টেবিলের উপর পরে থাকলেও আজ তিনি সেটা ধরাননি। চিন্তিত অবস্থায় হঠাৎ করে বলে উঠলেন,

-বাঙ্গালী জনগণরে খুব ভালো কইরা চিনি আমি।

বুঝলাম না তিনি এই উক্তিতে কি বোঝাতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পর শোবার ঘরে উঠে চলে গেলেন শেখ সাহেব। ওখানে তার কোন আত্মীয় অপেক্ষা করছিলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ কামাল এসে উপস্থিত।

-বস দিলেনতো আওয়ামী লীগ শেষ কইরা। কাজটা ভালো করেন নাই। উত্তর দিলাম,

-সব **criminals and badelements** যদি আওয়ামী লীগার হয় তার জন্য আমরা দায়ী না। সারা দিনের ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম ৩২ নম্বর থেকে। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা আমার ফেরার অপেক্ষায় তখনও জেগে বসে আছেন। বুঝতে পারলাম কুমিল্লা থেকে নিম্মী ফোন করে আমার ঢাকায় আসার খবর বাসায় জানিয়েছে।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন কি হল? সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বললেন, "তোরা কি ভেবেছিলি? শেখ মুজিব সত্যিই অপরাধীদের ধরার জন্য তোদের মাঠে নামিয়েছে? আমি ওকে ভালো করে চিনি। যখন এসএম হলে জিএস ছিলাম তখন একসাথে মুসলীম লীগের রাজনীতিও করেছি। ওর নীতি বলে কিছু নেই। সারাজীবন ক্লিকবাজী আর লাঠিবাজীর মাধ্যমে নিজের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে সে। চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের ধুরন্দর শেখ মুজিব। তোদের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব। একদিকে বর্তমানের তীব্র সরকার বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের খতম করা অন্যদিকে সেনাবাহিনী এবং জনগণের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীকে তার দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই সে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তার চালকে বানচাল করে দিয়েছিস তোরা। দেখ এখন সে কি করে। তাদের নিয়েই আমার চিন্তা। **I hope you and your other colleauges don't get victimised.** আব্বার কথাগুলো শুনে জবাবে আমার কিছু বলার ছিল না। তার বক্তব্যের সত্যতা ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন, "কুমিল্লাতে একটা ফোন করে শুয়ে পড়। **Don't over estimate Mujib, he is just an average man.** আব্বার কথায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে জেনারেল শফিউল্লাহ সেনা সদরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল হুদাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। হুদা ভাই আমাকে বললেন, **"Chief will go with us to Comilla to release all those people."** ভীষণভাবে দমে গিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হুদা ভাই ও ভীষণ আপসেট. ক্যাপ্টেন নূর জেনারেল জিয়ার এডিসি. তার কামরায় গিয়ে বললাম, বসের সাথে দেখা করতে চাই। নূরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনিও গম্ভীর। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, **"Well I know every thing.**

Don’t loose heart. Allah is there. You have done your duty sincerely so forget about the rest and be at ease.” চীফের সাথে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চীফ নিজে গিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পরিয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। বিব্রতকর অবস্থায় intolerable humiliation সহ্য করে নিতে হয়েছিল আমাদের সকলকে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল শফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন, “Prime minister’s desire is an order.” এ ঘটনার ফলে সারাদেশে ডেপ্লয়েড আর্মির মনোবল একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল শেখ মুজিব শীঘ্রই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামে মাত্র অপারেশনে ডেপ্লয়েড ছিলাম। আরোপিত দায়িত্ব পালনে কোন উৎসাহ ছিল না কারোই। কোনরকমে সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

আমার স্ত্রী এবং আমি গাজী গোলাম মোস্তফা কর্তৃক অপহরিত হই

রেডক্রস চেয়ারম্যান এবং তদানীন্তন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফা নিম্মী এবং আমাকে বন্দুকের মুখে লেডিস ক্লাব থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি ঘটে এক বর্বরোচিত অকল্পনীয় ঘটনা। দুস্কৃতিকারী দমন অভিযানে সেনাবাহিনী তখনও সারাদেশে নিয়োজিত। আমার খালাতো বোন তাহ্‌মিনার বিয়ে ঠিক হল কর্নেল রেজার সাথে। দু'পক্ষই আমার বিশেষ ঘনিষ্ট। তাই সব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছিল আমাকে এবং নিম্মীকেই। বিয়ের দু'দিন আগে ঢাকায় এলাম কুমিল্লা থেকে। ঢাকা লেডিস ক্লাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বিয়েতে অনেক গন্যমান্য সামরিক এবং বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে হোমরা-চোমরারা এসেছিলেন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠানটাই তদারক করতে হচ্ছিল নিম্মী এবং আমাকেই। আমার শ্যালক বাপ্পি ছুটিতে এসেছে ক্যানাডা থেকে। বিয়েতে সেও উপস্থিত। বিয়ের কাজ সুষ্ঠভাবেই এগিয়ে চলেছে। রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার পরিবারও উপস্থিত রয়েছেন অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইরের হলে পুরুষদের বসার জায়গায় বাপ্পি বসেছিল। তার ঠিক পেছনের সারিতে বসেছিল গাজীর ছেলেরা। বয়সে ওরা সবাই কমবয়সী ছেলে-ছোকরা। বাপ্পি প্রায় আমার সমবয়সী। হঠাৎ করে গাজীর ছেলেরা পেছন থেকে কৌতুকচ্ছলে বাপ্পির মাথার চুল টানে, বাপ্পি পেছনে তাকালে ওরা নির্বাক বসে থাকে। এভাবে দু'/তিনবার চুলে টান পড়ার পর বাপ্পি রাগান্বিত হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করে,
-চুল টানছে কে?
-আমরা পরখ করে দেখছিলাম আপনার চুল আসল না পরচুলা। জবাব দিল একজন। পুচঁকে ছেলেদের রসিকতায় বাপ্পি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণ ক্ষেপে যায়; কিন্তু কিছুই বলে না। মাথা ঘুরিয়ে নিতেই আবার চুলে টান পরে। এবার বাপ্পি যে ছেলেটি চুলে টান দিয়েছিল তাকে ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলে,
-বেয়াদপ ছেলে মশকারী করার জায়গা পাওনি? খবরদার তুমি আর ঐ জায়গায় বসতে পারবে না। এ কথার পর বাপ্পি আবার তার জায়গায় ফিরে আসে। এ ঘটনার কিছুই আমি জানতাম না। কারণ তখন আমি বিয়ের তদারকি এবং অতিথিদের নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। বিয়ের আনুষ্ঠিকতার প্রায় সবকিছুই সুষ্ঠভাবেই হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর্বও শেষ। অতিথিরা সব ফিরে যাচ্ছেন। সেদিন আবার টেলিভিশনে সত্যজিৎ রায়ের পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি 'মহানগর' ছবিটি দেখানোর কথা; তাই অনেকেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ছবিটি দেখার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই লেডিস ক্লাব প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। মাহবুবের আসার কথা। মানে এসপি মাহবুব। আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধুদের একজন। আমরা সব একইসাথে যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। কি এক কাজে মানিকগঞ্জ যেতে হয়েছিল তাকে। ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে তার ফিরতে একটু দেরী হবে। ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনরা সবেমাত্র তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ দু'টো মাইক্রোবাস এবং একটা কার এসে ঢুকল লেডিস ক্লাবে। কার থেকে নামলেন স্বয়ং গাজী গোলাম মোস্তফা আর মাইক্রোবাস দু'টো থেকে নামল প্রায় ১০-১২ জন অস্ত্রধারী বেসামরিক ব্যক্তি। গাড়ি থেকেই প্রায় চিৎকার করতে করতে বেরুলেন গাজী গোলাম মোস্তফা।
-কোথায় মেজর ডালিম? বেশি বার বেড়েছে। তাকে আজ আমি শায়েস্তা করব। কোথায় সে? আমি তখন ভেতরে সবার সাথে খাচ্ছিলাম। কে যেন এসে বলল গাজী এসেছে। আমাকে তিনি খুঁজছেন। হঠাৎ করে গাজী এসেছেন কি ব্যাপার? ভাবলাম বোধ হয় তার পরিবারকে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি। আমি তাকে অর্ভ্যথনা করার জন্য বাইরে এলাম। বারান্দায় আসতেই ৬-৭জন স্টেনগানধারী আমার বুকে-পিঠে-মাথায় তাদের অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘিরে দাড়াল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিতো হতবাক! কিছুটা অপ্রস্তুতও বটে। সামনে এসে দাড়ালেন স্বয়ং গাজী। আমি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-ব্যাপার কি? এ সমস্ত কিছুর মানেই বা কি?

তিনি তখন ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত। একনাগাড়ে শুধু বলে চলেছেন,

-গাজীরে চেন না। আমি বঙ্গবন্ধু না। চল্ শালারে লইয়া চল্। আইজ আমি তোরে মজা দেখামু। তুই নিজেরে কি মনে করছস?

অশালীনভাবে কথা বলছিলেন তিনি। আমি প্রশ্ন করলাম,

-কোথায় কেন নিয়ে যাবেন আমাকে?

আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন তার অস্ত্রধারী অনুচরদের। তার ইশারায় অস্ত্রধারীরা সবাই তখন আমাকে টানা-হেচড়া করে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিয়ের উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে; গাড়িতে আমার এস্কট সিপাইরাও রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। কন্যা দান তখনও করা হয়নি। কি কারণে যে এমন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলম এবং চুল্লুকে মারতে মারতে একটা মাইক্রোবাসে উঠালো ৩-৪ জন অস্ত্রধারী। ইতিমধ্যে বাইরে হৈ চৈ শুনে নিম্মী এবং খালাম্মা মানে তাহমিনার আম্মা বেরিয়ে এসেছেন অন্দরমহল থেকে। খালাম্মা ছুটে এসে গাজীকে বললেন,

-ভাই সাহেব একি করছেন আপনি? ওকে কেন অপদস্ত করছেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? কি দোষ করেছে ও?

গাজী তার কোন কথারই জবাব দিলেন না। তার হুকুমের তামিল হল। আমাকে জোর করে ঠেলে উঠান হল মাইক্রোবাসে। বাসে উঠে দেখি আলম ও চুল্লু দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত। ওদের মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আমাকে গাড়িতে তুলতেই খালাম্মা এবং নিম্মী দু'জনেই গাজীকে বলল,

-ওদের সাথে আমাদেরকেও নিতে হবে আপনাকে। ওদের একা নিয়ে যেতে দেব না আমরা।

-ঠিক আছে; তবে তাই হবে। বললেন গাজী।

গাজীর ইশারায় ওদেরকেও ধাক্কা দিয়ে উঠান হল মাইক্রোবাসে। বেচারী খালাম্মা! বয়স্কা মহিলা, আচমকা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মাইক্রোবাসের ভিতরে। আমার দিকে অস্ত্রতাক করে দাড়িয়ে থাকলো পাঁচজন অস্ত্রধারী; গাজীর সন্ত্রাস বাহিনীর মাস্তান। গাজী গিয়ে উঠল তার কারে। বাকি মাস্তানদের নিয়ে দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটা কোথায় যেন চলে গেল। মাইক্রোবাস দুইটি ছিল সাদা রং এর এবং তাদের গায়ে ছিল রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা। গাজীর গাড়ি চললো আগে আগে আর আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি চললো তার পেছনে। এসমস্ত ঘটনা যখন ঘটছিল তখন আমার ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হক স্বপন বীর বিক্রম ও বাপ্পি লেডিস ক্লাবে উপস্থিত ছিল না। তারা গিয়েছিল কোন এক অতিথিকে ড্রপ করতে। আমাদের কাফেলা লেডিস কালব থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে লিটুর মুখে। সবকিছু জানার পরমুহূর্তেই ওরা যোগাযোগ করল রেসকোর্সে আর্মি কন্ট্রোল রুমে তারপর ক্যান্টনমেন্টের এমপি ইউনিটে। ঢাকা ব্রিগেড মেসেও খবরটা পৌঁছে দিল স্বপন। তারপর সে বেরিয়ে গেল ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য। আবুল খায়ের লিটু আমার ছোট বোন মহুয়ার স্বামী এবং আমার বন্ধু। ও ছুটে গেল এসপি মাহবুবের বাসায় বেইলী রোডে। উদ্দেশ্য মাহবুবের সাহায্যে গাজীকে খুঁজে বের করা।

এদিকে আমাদের কাফেলা গিয়ে থামল রমনা থানায়। গাজী তার গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল থানার ভিতরে। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন গাজী। কাফেলা আবার চলতে শুরু করল। কাফেলা এবার চলছে সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে। ইতিমধ্যে নিম্মী তার শাড়ী ছিড়ে চুল্লু ও আলমের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ বেধে দিয়েছে। সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গাজীর মনে কোন দুরভিসন্ধি নেইতো? রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে নাতো? ওর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কিছু একটা করা উচিত। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম,

-গাড়ি থামাও!
আমার বলার ধরণে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। আমাদের গাড়িটা থেমে পড়ায় সামনের গাজীর গাড়িটাও থেমে পড়ল। আমি তখন অস্ত্রধারী একজনকে লক্ষ্য করে বললাম গাজী সাহেবকে ডেকে আনতে। সে আমার কথার পর গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গাজীকে গিয়ে কিছু বলল। দেখলাম গাজী নেমে আসছে। কাছে এলে আমি তাকে বললাম,
-গাজী সাহেব আপনি আমাদের নিয়ে যাই চিন্তা করে থাকেন না কেন; লেডিস ক্লাব থেকে আমাদের উঠিয়ে আনতে কিন্তু সবাই আপনাকে দেখেছে। তাই কোন কিছু করে সেটাকে বেমালুম হজম করে যাওয়া আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আমার কথা শুনে কি যেন ভেবে নিয়ে তিনি আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কাফেলা আবার চলা শুরু করল। তবে এবার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে নয়, গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চললেন ৩২নং ধানমন্ডি প্রধানমন্ত্রীর বাসার দিকে। আমরা হাফ ছেড়ে বাচলাম। কলাবাগান দিয়ে ৩২নং রোডে ঢুকে আমাদের মাইক্রোবাসটা শেখ সাহেবের বাসার গেট থেকে একটু দূরে এলকটা গাছের ছায়ায় থামতে ইশারা করে জনাব গাজী তার গাড়ি নিয়ে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন ৩২নং এর ভিতরে। সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন শেখ সাহেবের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। একবার ভাবলাম ওদের ডাকি, আবার ভাবলাম এর ফলে যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তবে ক্রস-ফায়ারে বিপদের ঝুঁকি বেশি। এ সমস্তই চিন্তা করছিলাম হঠাৎ দেখি লিটুর ঢাকা ক-৩১৫ সাদা টয়োটা কারটা পাশ দিয়ে হুস্ করে এগিয়ে গিয়ে শেখ সাহেবের বাসার গেটে গিয়ে থামল। লিটুই চালাচ্ছিল গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল এসপি মাহবুব। নেমেই প্রায় দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সে। লিটু একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষায় রইলো সম্ভবত মাহ্বুবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। লিটু এবং মাহ্বুবকে দেখে আমরা সবাই আস্বস্ত হলাম। নির্ঘাত বিপদের হাত থেকে পরম করুণাময় আল্লাহ্'তায়ালা আমাদের বাচিঁয়ে দিলেন।
লিটু যখন মাহ্বুবের বাসায় গিয়ে পৌঁছে মাহবুব তখন মানিকগঞ্জ থেকে সবেমাত্র ফিরে বিয়েতে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। হঠাৎ লিটুকে হন্তদন্ত হয়ে উপরে আসতে দেখে তার দিকে চাইতেই লিটু বলে উঠল,
-মাহ্বুব ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে গাজী বিনা কারণে ডালিম-নিম্মীকে জবরদস্তি গান পয়েন্টে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।
একথা শুনে মাহবুব স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীকেই খবরটা সবচেয়ে আগে দেওয়া দরকার কোন অঘটন ঘটে যাবার আগে। গাজীর কোন বিশ্বাস নাই; ওর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মাহবুব টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ টেলিফোনটাই বেজে উঠে। রেড টেলিফোন। মাহবুব ত্রস্তে উঠিয়ে নেয় রিসিভার। প্রধানমন্ত্রী অপর প্রান্তে,
-মাহবুব তুই জলদি চলে আয় আমার বাসায়। গাজী এক মেজর আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ধইরা আনছে এক বিয়ার অনুষ্ঠান থ্যাইকা। ঐ মেজর গাজীর বউ-এর সাথে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করছিল। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বেশি বাড় বাড়ছে সেনাবাহিনীর অফিসারগুলির।
সব শুনে মাহবুব জানতে চাইলো,
-স্যার গাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন মেজর ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কোথায় রেখেছেন তিনি?
-ওদের সাথে কইরা লইয়া আইছে গাজী। গেইটের বাইরেই গাড়িতে রাখা হইছে বদমাইশগুলারে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী।
-স্যার গাজী সাহেব ডালিম আর নিম্মীকেই তুলে এনেছে লেডিস ক্লাব থেকে। ওখানে ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ে হচ্ছিল আজ। জানাল মাহবুব।
-কচ্ছ কি তুই! প্রধানমন্ত্রী অবাক হলেন।
-আমি সত্যিই বলছি স্যার। আপনি ওদের খবর নেন আমি এক্ষুণি আসছি।
এই কথোপকথনের পরই মাহবুব লিটুকে সঙ্গে করে চলে আসে ৩২নং ধানমন্ডিতে। মাহ্বুবের ভিতরে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেহানা, কামাল ছুটে বাইরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে যায়। আলম ও চুল্লুর রক্তক্ষরণ দেখে শেখ সাহেব ও অন্যান্য সবাই শংকিত হয়ে উঠেন।

-হারামজাদা, এইডা কি করছস তুই?
গাজীকে উদ্দেশ্য করে গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নিম্মী এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। খালাম্মা ঠিকমত হাটতে পারছিলেন না। কামাল, রেহানা ওরা সবাই ধরাধরি করে ওদের উপরে নিয়ে গেল। শেখ সাহেবের কামরায় তখন আমি, নিম্মী আর গাজী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। নিম্মী দুঃখে-গ্ল্যানিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শেখ সাহেব ওকে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। অদূরে গাজী ভেজা বেড়ালের মত কুকড়ে দাড়িয়ে কাঁপছিল। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রেড ফোন। শেখ সাহেব নিজেই তুলে নিলেন রিসিভার। গাজীর বাসা থেকে ফোন এসেছে। বাসা থেকে খবর দিল আর্মি গাজীর বাসা রেইড করে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত শহরে আর্মি চেকপোষ্ট বসিয়ে প্রতিটি গাড়ি চেক করছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিডন্যাপিং এর খবর পাওয়ার পরপরই ইয়ং-অফিসাররা যে যেখনেই ছিল সবাই বেরিয়ে পড়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মীকে। সমস্ত শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে। গাজীরও কোন খবর নেই। গাজীকে এবং তার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরও খুঁজছে আর্মি তন্নতন্ন করে সম্ভাব্য সব জায়গায়। টেলিফোন পাওয়ার পর শেখ সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেল। ফোন পেয়েই তিনি আমাদের সামনেই আর্মি চীফ শফিউল্লাহকে হটলাইনে বললেন,
-ডালিম, নিম্মী, গাজী সবাই আমার এখানে আছে, তুমি জলদি চলে আসো আমার এখানে।
ফোন রেখে শেখ সাহেব গাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,
-মাফ চা নিম্মীর কাছে।
গাজী শেখ সাহেবের হুকুমে নিম্মীর দিকে এক পা এগুতেই সিংহীর মত গর্জে উঠল নিম্মী,
-খবরদার! তোর মত ইতর লোকের মাফ চাইবার কোন অধিকার নাই; বদমাইশ।
এরপর শেখ মুজিবের দিকে ফিরে বলল নিম্মী,
-কাদের রক্তের বদলে আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী? আমি জানতে চাই। আপনি নিজেকে জাতির পিতা বলে দাবি করেন। আমি আজ আপনার কাছে বিচার চাই। আজ আমার জায়গায় শেখ হাসিনা কিংবা রেহানার যদি এমন অসম্মান হত তবে যে বিচার আপনি করতেন আমি ঠিক সেই বিচারই চাই। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আপনারা জাতির কর্ণধার হয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ভুলুন্ঠিত করে তাদের গায়ে হাত দেয়ার মত সাহস কম্বলচোর গাজী পায় কি করে? এর উপযুক্ত জবাব আমি আজ চাই আপনার কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত আপনি বলতে পারবেন না ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু চেয়েছি আপনার কাছে কিন্তু আজ দাবি করছি ন্যায্য বিচার। আপনি যদি এর বিচার না করেন তবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই অন্যায়ের বিচার দিয়ে রাখলাম। তিনি নিশ্চয়ই এর বিচার করবেন।

আমি অনেক চেষ্টা করেও সেদিন নিম্মীকে শান্ত করতে পারিনি। ঠান্ডা মেজাজের কোমল প্রকৃতির নিম্মীর মধ্যেও যে এধরণের আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার কাছেও আশ্চর্য লেগেছিল সেদিন। শেখ সাহেব নিম্মীর কথা শুনে ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন,
-মা তুই শান্ত 'হ। হাসিনা-রেহানার মত তুইও আমার মেয়েই। আমি নিশ্চয়ই এর উপযুক্ত বিচার করব। অন্যায়! ভীষণ অন্যায় করছে গাজী কিন্তু তুই মা শান্ত 'হ। বলেই রেহানাকে ডেকে তিনি নিম্মীকে উপরে নিয়ে যেতে বললেন।

রেহানা এসে নিম্মীকে উপরে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার সাফায়াত জামিল এসে পৌঁছেছে। শেখ সাহেব তাদের সবকিছু খুলে বলে জেনারেল শফিউল্লাকে অনুরোধ করলেন গাজীর পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। জেনারেল শফিউল্লাহ রেসকোর্স কন্ট্রোল রুমে অপারেশন কমান্ডার মেজর মোমেনের সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোন তুলে নিলেন,
-হ্যালো মোমেন, আমি শফিউল্লাহ বলছি প্রাইম মিনিষ্টারের বাসা থেকে। ডালিম, নিম্মী, গাজী ওরা সবাই এখানেই আছে। প্রাইম মিনিষ্টারও এখানেই উপস্থিত আছেন। Everything is going to be

all right. Order your troops to stand down এবং গাজী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দাও। অপরপ্রান্ত থেকে মেজর মোমেন জেনারেল শফিউল্লাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া অফিসার এবং তার স্ত্রীকে না দেখা পর্যন্ত এবং গাজী ও তার ১৭জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের তার হাতে সমর্পন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে গাজীর পরিবারের কাউকেই ছাড়া সম্ভব নয়। শফিউল্লাহ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু মেজর মোমেন তার অবস্থানে অটল থাকলেন শফিউল্লাহর সব যুক্তিকে অসাড় প্রমাণিত করে। অবশেষে শফিউল্লাহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে অপারেশন কমান্ডার এর শর্তগুলো জানালেন। শেখ সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন মেজর মোমেনের সাথে কথা বলতে। আমি অগত্যা টেলিফোন হাতে তুলে নিলাম,

-হ্যালো স্যার। মেজর ডালিম বলছি। **Things are under control** প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন তিনি ন্যায় বিচার করবেন।

- **Well Dalim it's nice to hear from you. But as the Operation Commander I must have my demands met. I got to be loyal to my duty as long as the army is deployed for anti-miscreant's drive. The identified armed miscreants cannot be allowed to go escort free. As far as I am concerned the law is equal for everyone so there can't be any exception. Chief has got to understand this.** বললেন মেজর মোমেন।

- **Please Sir, why don't you comeover and judge the situation yourself.** অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি।

- **There is no need for me to come. However, I am sending Capt. Feroz.** বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর মোমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ফিরোজ এসে পড়ল। ফিরোজ আমার বাল্যবন্ধু। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল।

-তুই গাজীরে মাফ কইরা দে। আর গাজী তুই নিজে খোদ উপস্থিত থাকবি কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অনেকটা মোড়লী কায়দায় একটা আপোষরফা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

-আমার বোনের সম্প্রদানের জন্য গাজীর বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওকে মাফ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা হবে আমার জন্য নীতি বিরোধিতা। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি রক্তের বিনিময়ে। আমাদের গা থেকে রক্ত ঝরাটা কোন বড় ব্যাপার নয়। ইউনিফর্মের চাকুরি করি টাকা-পয়সার লোভেও নয়। একজন সৈনিক হিসাবে আমার আত্মমর্যাদা এবং গৌরবকে অপমান করেছেন গাজী নেহায়েত অন্যায়ভাবে। আপনিই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। অবৈধ অস্ত্রধারীদের খুঁজে বের করে আইনানুযায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। সেখানে আজ আমাদেরই ইজ্জত হারাতে হল অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাতে! আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে কথা দিয়েছেন এর উচিত বিচার করবেন। আমরা আপনি কি বিচার করেন সেই অপেক্ষায় থাকব।

ক্যাপ্টেন ফিরোজকে উদ্দেশ্য করে সবার সামনেই বলেছিলাম, দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারের ওয়াদা করেছেন সেক্ষেত্রে গাজীর পরিবারের সদস্যদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন কি? কর্নেল মোমেনকে বুঝিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করিস।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় শেখ সাহেব বললেন,

-আমার গাড়ি তোদের পৌঁছে দেবে।

-তার প্রয়োজন হবে না চাচা। বাইরে লিটু-স্বপনরা রয়েছে তাদের সাথেই চলে যেতে পারব।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ৩২নং এর সামনের রাস্তায় গাড়ির ভীড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা যারাই জানতে পেরেছে আমাদের কিডন্যাপিং এর ব্যাপারটা; তাদের অনেকেই এসে জমা হয়েছে স্বতঃস্ফুর্তভাবে। আমাদের দেখে সবাই ঘিরে ধরল। সবাই জানতে চায় কি প্রতিকার করবেন প্রধানমন্ত্রী এই জঘণ্য অপরাধের। সংক্ষেপে যতটুকু বলার ততটুকু বলে ফিরে এলাম লেডিস ক্লাবে। মাহবুবও এল সাথে। মাহবুবের উছিলায়

সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম চরম এক বিপদের হাত থেকে আল্লাহ্‌পাকের অসীম করুণায়। বিয়ের আসরে আমরা ফিরে আসায় পরিবেশ আবার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। সবাই আবার হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে বিয়ের বাকি আনুষ্ঠিকতা সম্পন্ন করে কন্যা সম্প্রদান করা হল। তাহমিনার বিয়ের রাতটা আওয়ামী দুঃশাসনের একটা ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে থাকলো। জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকলো আওয়ামী নেতাদের এবং তাদের ব্যক্তিগত বাহিনীর ন্যাক্কারজনক স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়নের। কী করে এমন একটা জঘণ্য ঘটনার সাথে গাজী সরাসরি নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছিল তার কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক পরে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলাম আমাদের কুমিল্লা অপারেশনের পর পার্টির তরফ থেকে শেখ মুজিবের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল আমাদের বিশেষ করে আমার ঔদ্ধত্বের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু শেখ মুজিব ঐ চাপের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, ''আর্মি কোন কাঁচা কাজ করে নাই। তারা আইন অনুযায়ী সবকিছু করছে, প্রত্যেককে ধরেছে হাতেনাতে প্রমাণসহ সে ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?'' তার ঐ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ আওয়ামী নেতাদের একাংশ। আইনের মাধ্যমে যদি কোন কিছু করা না যায় তবে অন্য কোনভাবে হলেও শিক্ষা তাদের দিতেই হবে এবং সেই দায়িত্বটাই গ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ের **Top terror and most powerful leader** বলে পরিচিত গাজী গোলাম মোস্তফা। তখন থেকেই নাকি সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি জিঘাংসা মিটাতে। বিয়ে বাড়িতে বাপ্পি এবং তার ছেলেদের মাঝে যে সামান্য ঘটনা ঘটে সেটাকেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে গাজী চেয়েছিল আমাকে উচিত শিক্ষা দিতে। এ বিষয়ে মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি তার বই 'বাংলাদেশ! সামরিক শাসন এবং গণতন্ত্রের সংকট' এ লিখেছেন, "গাজী সমর্থক লোকদের সম্ভবতঃ মেজর ডালিম ও তার স্ত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল।"

অপহরণের ঘটনা সেনাবাহিনীতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

সেই কালোরাত্রির পরদিন আমাকে সেনা সদরে তলব করে পাঠানো হয়।

আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে উপস্থিত হয়েই জানতে পারলাম চীফ আমাকে ডেকেছেন। কিন্তু তার আগেই ডাক পড়ল জেনারেল জিয়ার অফিসে। মেজর হাফিজ তখন **PS-Cord to DCAS.** সেই আমাকে খবর দিল জেনারেল জিয়া আমার সাথে কথা বলতে চান। তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন। অনুমতি নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। গতরাতে কি ঘটেছে তিনি জানতে চাইলেন। সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বেশ উত্তেজিতভাবেই বললেন,
-**This is incredible and ridiculous. This is simply not acceptable.** ঠিক আছে দেখ চীফ কি বলে।
তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই হাফিজ তার ঘরে নিয়ে গেল। নূরও ছিল সেখানে। হাফিজ বলল, "দ্যাখো ডালিম; গতরাতের বিষয়টা শুধুমাত্র তোমার আর ভাবীর ব্যাপারই নয়; সমস্ত আর্মির **Dignity, pride and honour are at stake** মানে আমরা সবাই এর সাথে জড়িত। **You got to understand this clearly ok?** অন্যান্য সব ব্রিগেডের সাথে আলাপ হয়েছে তারাও এ ব্যাপারে সবাই একমত। **This has got to be sorted out right and proper.** শেখ মুজিব কি বিচার করবে? আমরা শফিউল্লাহর মাধ্যমে দাবি জানাবো আর্মির তরফ থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে সে দাবি অবশ্যই মানতে হবে। দাবিগুলোও আমরা ঠিক করে ফেলেছি। তুমি শফিউল্লাহ কি বলে সেটা শুনে আস তারপর যা করবার সেটা আমরা করব।"

আর্মি হেডকোয়ার্টার্স এ সমস্ত তরুণ অফিসারদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। হাফিজের অফিস থেকেই চীফের **ADC** -কে ইন্টারকমে জানালাম,
-**I am through with DCAS so I am free now to see the Chief.**
Right Sir. বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো **ADC.** কিছুক্ষণ পরই **ADC** হাফিজের কামরায় এসে জানাল চীফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। চীফের অফিসে ঢুকতেই তিনি আমাকে বসতে বললেন। চেয়ার টেনে বসলাম মুখোমুখি।
-**How are you?**
-**Fine Sir.**
-**How is Nimmi?**
-**She is ok Sir, but terribly upset.**
-**Quite natural. But she is a brave girl I must say. The way she talked to the Prime minister was really commendable.** এ সমস্ত কথার পর আসল বিষয়ের অবতারনা করলেন জেনারেল শফিউল্লাহ,
-দেখ ডালিম, গতরাতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই দুঃখ এবং অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। **I am also very sorry about the whole affair.** শেখ সাহেবতো তোমাদেরও আপনজন। অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমাদের দু'জনকেই। তিনি যখন চাইছেন তুমি গাজীকে মাফ করে দাও, তার সে ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে সেটাইতো তিনি আশা করছেন। তুমি যদি গাজীকে মাফ কর তবে তিনি খুশী হবেন তাই নয় কি?
-স্যার, তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। পারিবারিকভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও আছে; সেটাও সত্য। তিনি ও তার পরিবার আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু নীতির ব্যাপারে আপোষ আমি করতে পারব না সেটা আপনার সামনেই তাকে আমি বলে এসেছি। **And I shall stick to that till the end.**
- Well that's up to you then. I have nothing more to tell you.

- Thank you Sir. বলে বেরিয়ে এসে দেখি চীফের অফিসের সামনে AHQ -র প্রায় সব অফিসার একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছে। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চাইলো চীফ কি বললেন। আমি আমাদের কথোপকথনের সবটাই তাদের হুবহু খুলে বললাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সবাই। একজন ADC কে বলল, "Go and call him out here, we want to talk to him."

ADC-র মাধ্যমে অফিসারদের অভিপ্রায় জানতে পেরে বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। সবাই তাকে ঘিরে দাড়াল। চীফ বললেন,

-বলো তোমাদের কি বলার আছে ?

-স্যার, গতরাতের ঘটনা শুধুমাত্র মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমরা আজ যেখানে দুস্কৃতিকারী দমনের জন্য সারাদেশে ডেপ্লয়েড সেই পরিস্থিতিতে বিনা কারণে গাজী ও তার সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে আমাদেরই একজন অফিসার এবং তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনীই নয়; It has compromised the honour and the dignity of the whole armed forces particularly army. We can't take it lying. It has got to be sorted out right and proper. কথাগুলো বলল একজন। জেনারেল শফিউল্লাহ জবাবে বলার চেষ্টা করলেন,

- Well, the Prime minister is personaly very sorry about the whole affair.

- That's not enough! শফিউল্লাহকে থামিয়ে দিল একজন।

- Now Sir, you being our Chief and the leader have to shoulder your responsibility to uphold the honour and the dignity of this army. সমগ্র সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আমাদের ৩টি দাবি আপনাকে জানাচ্ছি।

১। গাজীকে তার সংসদপদ এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারি পদ থেকে এই মুহূর্তে অব্যাহতি দিয়ে তাকে এবং তার অবৈধ অস্ত্রধারীদের অবিলম্বে আর্মির হাতে সোপর্দ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে; যাতে করে আইনানুযায়ী তাদের সাজা হয়।

২। গতরাতের সমস্ত ঘটনা সব প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে দেশের জনগণকে অবগত করার অনুমতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

৩। যেহেতু গাজী আওয়ামী লীগের সদস্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আপনাকে আমাদের এই ৩টি দাবি নিয়ে যেতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে এ দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। এই দাবিগুলি আপনি যদি আদায় করতে অপারগ হন তবে You have got no right to sit on your chair. You will be considered not fit enough to lead this army.

ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। থতমত খেয়ে বেসামাল অবস্থায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু তার আগেই লেফটেন্যান্ট সামশের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম তার কোমরের বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জেনারেল শফিউল্লার পায়ের কাছে,

- We serve the army for our pride, honour and dignity. If that is not there then I hate to serve that army any longer.

উত্তেজিতভাবে উপস্থিত সবাই একই সাথে বলে উঠল,

- Sir, you got to restore our lost honour and dignity. We have had enough humiliation but no more. Sir, please don't be afraid. We all are with you. Just try to understand the gravity of the problem and be one of us.

বাইরের শোরগোল শুনে জেনারেল জিয়া কখন বেরিয়ে এসেছিলেন আমরা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তিনি তার গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন,

- Boys be quite and listen to me, I have heared everything and I appreciate your sentiment. I have also understood the problem. Your demands are just and fair. Shafiullah you must go with their demands to the Prime minister and make him understand the gravity of the situation and suggest him to accept the demands for the greater interest of the nation and the armed forces.

জেনারেল শফিউল্লাহ যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন,
-আমি এখনই যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তক্ষুণি তিনি বেরিয়ে গেলেন গণভবনের উদ্দেশ্যে। তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। শফিউল্লাহ চলে যাবার পর আমরাও মেসে চলে এলাম লাঞ্চের জন্য। এখানে একটা বিষয় প্রাণিধানযোগ্য। শফিউল্লাহকে যখন ঘেরাও করা হয়েছিল তখন সেখানে কর্নেল এরশাদও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য **PSO** -দের সাথে। তিনি তখন **AG (Adjutant General)** হিসাবে হেডকোয়ার্টার্স-এ পোষ্টেড ছিলেন। এক সময় জেনারেল শফিউল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,
-এরশাদ তোমার অভিমত কি ?
- Sir, I think their demands are quite legitimate. এ ধরণের ঘটনা আপনার কিংবা আমার সাথেও ঘটতে পারত। যেখানে **Army is deployed to maintain law and order and engaged in anti-miscreant drive** সেখানে এ ধরণের একটা ঘটনাকে শুধুমাত্র ডালিম-নিম্মীর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কানসিডার করা উচিত হবে না। **It is definitely a question of honour and prestige of the entire army and you being the Chief must make this point clear to the Prime minister and advise the PM correctly to restore the lost honour by accepting the demands.**

তার জবাব শুনে আমরা বেশ কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন একজন **Repatriated officer** তিনি সাহস করে ঐ ধরণের স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। এতেই প্রমাণিত হয় পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মাঝে অনেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। সন্ধ্যার দিকে চীফ ফিরলেন গণভবন থেকে; সারাদিন দরবার করে। রাত ৮টার দিকে তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন সেনা ভবনে। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল সাফায়াত এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কুশলাদী বিনিময় করে সবাই বসলাম। চীফ শুরু করলেন,
-আমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের দাবিগুলো জানিয়েছি। তিনি সময় চেয়েছেন। প্রাইম মিনিষ্টার যখন সময় চেয়েছেন তখন তাকে সময় আমাদের দিতে হবেই। চীফের কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটছিলেন কর্নেল সাফায়াত। ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিশ্চুপ বসেছিলেন।
-স্যার 'তোমাদের দাবিগুলো' বলে আপনিকি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আপনার ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? দাবিগুলো ছিল **entire army**-র তরফ থেকে। তবে কি আমাদের বুঝতে হবে আপনি বা আপনারা মানে **the senior lots are not with us ?** জানতে চাওয়া হল জেনারেল শফিউল্লাহর কাছ থেকে। তিনি এ ধরণের কথায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। চালাক প্রকৃতির ব্রিগেডিয়ার খালেদ অবস্থা আঁচ করতে পেরে শফিউল্লাহর হয়ে জবাব দিলেন,
- Boys don't have wrong impression. Offcourse we all are together. How could we be different on this issue?
-কিন্তু স্যার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি মানবেন না। সময় চেয়ে নিয়ে তিনি প্রথমত: ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত: তার অবস্থানকে পোক্ত করার জন্যই সময় চেয়েছেন তিনি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের দাবি মানতে রাজি না হন তবে কি করা হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই আমরা।
তিনজনই এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।
- Well Sir, if you don't have any idea what to do next then we shall think what needs to be done. বলে চলে এসেছিলাম আমরা। আজিজ পল্লীর এক বাসায় বৈঠকে বসলাম আমরা। বিষয়বস্তু: দাবি মানা না হলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে। অন্যান্য ব্রিগেডের সাথে যোগাযোগ করে মতামত বিনিময় করা হচ্ছিল সবসময়। রাত প্রায় ১১টার দিকে খবর পেলাম জেনারেল শফিউল্লাহর সাদা ডাটসন কারে দু'জন লোক সিভিল ড্রেসে চাদর মুড়ি অবস্থায় ২নং গেইট দিয়ে বেরিয়ে ৩২নং ধানমন্ডির দিকে যাচ্ছে। একজন **young officer** -কে মোটর সাইকেল নিয়ে গাড়িকে ফলো করতে বলা হল। রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটে ঐ অফিসার ফিরে এসে জানাল গাড়িতে ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ এবং কর্নেল সাফায়াত। তারা গিয়ে ঢুকেছিলেন

শেখ সাহেবের বাসায়। রাত প্রায় ১২:৩০ মিনিটের দিকে খবর আসতে লাগল শহরে রক্ষীবাহিনীর মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। দুইএ দুইএ চার; মিলে গেল হিসাব। শফিউল্লাহ এবং সাফায়াত শেখ সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন বিধায় ৩২নম্বরে গিয়ে আমাদের সন্ধ্যার আলোচনার সবকিছুই জানিয়ে এসেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে শহরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে; আর্মির তরফ থেকে যেকোন **move** এর মোকাবেলা করার জন্য। নিজেদের প্রতি তার অনুকম্পা আরো বাড়াবার জন্যই ব্যক্তি পূঁজার এক ঘৃণ্য উদাহরণ! রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন বর্ডার এলাকা থেকে খবর আসতে লাগল মধ্যরাত্রির পর থেকে ভারতীয় বাহিনীর অস্বাভাবিকভাবে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তার মানে নিজের নিরাপত্তার জন্য শেখ মুজিব শুধুমাত্র তার অনুগত রক্ষীবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর তার তল্পিবাহক নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না; তাই বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যও চেয়ে বসেছেন মৈত্রী চুক্তির আওতায়। আমরা কয়েকজন শহর ঘুরে দেখলাম খবরগুলো সত্যি। দুঃখ হল, পেশাগত নিজ যোগ্যতায় নয় শেখ মুজিবের বদন্যতায় যারা একলাফে মেজর থেকে জেনারেল বনে গেছেন তারা নিজেদের চামড়া পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন শেখ সাহেব এবং তার দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল; জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনি একজন। কিন্তু কথায় আছে **Exception is never an example.** ধিক্কার এসে গিয়েছিল আমাদের মনে এসমস্ত মেরুদন্ডহীন মতলববাজ সিনিয়র অফিসারদের চারিত্রিক দুর্বলতা জানার পর। পরদিন শফিউল্লাহর ডাক পড়ল গণভবনে। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। গত দু'দিনের তুলনায় আজ তাকে বেশি **confident** দেখাচ্ছিল,
-Well Dalim, the Prime minister has asked for time as you have been already told. Meanwhile, I am ordering a court of inquiry about the whole matter that has happened so far just for an official record. Once the court of inquiry is finished you will go back to Comilla
- Right Sir. বলে সেল্যুট করে বেরিয়ে এসেছিলাম তার অফিস কক্ষ থেকে। কি অদ্ভুত যুক্তি! দোষ করল গাজী গোলাম মোস্তফা আর **court of inquiry** হবে আমার! বর্তমান অবস্থায় চীফের হুকুম মেনে নিয়ে **court of inquiry** -র পরিণাম পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে হবে সিদ্ধান্ত হল। **court of inquiry** শেষ করে কয়েকদিন পর কুমিল্লায় ফিরে এলাম।

রাষ্ট্রপতি আমাদের চাকুরী থেকে অবসর দিয়ে আমাদের প্রতি তার ন্যায় বিচার করলেন।

রাষ্ট্রপতি ৯নং আদেশ বলে ৮জন সামরিক অফিসারকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। নূর ও আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে।

মাসখানেক পর জুলাই মাসের শের্ষাধে এক সন্ধ্যায় আমার বাসায় একটা র্পাটি ছিল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সবাই এসে গেছে। বাইরে ইলশেগুড়ির বৃষ্টি হচ্ছে। হুদা ভাবীও এসে গেছেন কিন্তু হুদা ভাইয়ের পাত্তা নেই। বেশ একটু দেরি করেই এলেন কর্নেল হুদা। ভীষণ শুকনো তার মুখ। অস্বাভাবিক গম্ভীর তিনি। এসে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে এককোনায় গিয়ে বসলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, কারো সাথে কথাবার্তা বলার তেমন একটা ইচ্ছে নেই তার। সদা উচ্ছল হুদা ভাই এত নিরব কেন? ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকলো। এক ফাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
–কি হয়েছে হুদা ভাই? কোন অঘটন ঘটেনিতো?
–না কিছু না।
নিজেকে কিছুটা হালকা করে নেবার জন্য ড্রিংকসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। নিম্মী অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎ হুদা ভাই নিম্মীকে ডেকে পাশে বসালেন। প্রশ্ন করলেন,
–আচ্ছা নিম্মী ধর এমন একটা খবর তুমি পেলে যার ফলে তোমার এই সুন্দর সাজানো সংসারটা ওলট-পালট হয়ে গেল, তোমাদের এই সুখ কেউ কেড়ে নিল তখন কি করবে?
নিম্মী অবাক বিস্ময়ে হুদা ভাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল,
–আজ আপনার কি হয়েছে হুদা ভাই? কী সব এলমেলো বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। বলেন না কি হয়েছে? আমিও এরি মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিয়েছি।
–ডালিম ঢাকা থেকে কোন খবর পেয়েছ? জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হুদা।
–নাতো। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই পেতাম। প্লিজ হুদা ভাই রহস্য বাদ দিয়ে বলেন না কি হয়েছে? ব্যাপার কি?
–যা হবার নয় তাই হয়েছে। Presidential Order No-9 (PO-9) প্রয়োগ করে আর্মি থেকে ৮জন অফিসারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তুমি এবং নূরও রয়েছো এই ৮ জনের মাঝে। খবরটা অপ্রত্যাশিত; তাই হজম করতে কিছুটা সময় লাগল। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে নিম্মীকে ডেকে বললাম,
–জান, take it easy. নিজেকে সামলে নাও। Don't get upset and spoil the party. Let this be over then we shall think about it. Now be brave as you have allways been and act like a good host ok? মেয়ে মানুষ তার উপর ভীষণ স্পর্শকাতর এবং কোমল প্রকৃতি নিম্মীর। তবুও সেদিন অতিকষ্টে সব কিছুই সামলে নিয়েছিল সে। অতিথিদের কেউই কিছু বুঝতে পারেনি কি অঘটন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। খবরটা তখন পর্যন্ত কেউ জানত না। পার্টি শেষে একে একে অভ্যাগতদের সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। থেকে গেলেন শুধু হুদা ভাই ও ভাবী। ভাবীকে খবরটা দেয়া হল। খবরটা জেনে ভাবী ভেঙ্গে পড়লেন। আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। নিম্মীও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না; ক্ষোভে-কান্নায় জড়িয়ে ধরল ভাবীকে। আমি ও হুদা ভাই দু'জনে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। হুদা ভাই বললেন,
- Come on now both of you hold yourselves, this is not the end of the world. Allah is there and He is great. Please stop crying and think what should be done.
নীলু ভাবী কাঁদছেন আর হুদা ভাইকে বলে চলেছেন,
- Gudu you must do something about this injustice. You have to do whatever nessesary. This is simply outrageous you must not take this lying noway get this very clear.নিলু ভাবীর আন্তরিকতায় মন ভরে গেল।

- I got it Nilu I got it, please comedown. I promise you I shall go out of myway to redress this. Nimmi you too please stop crying, don't you have faith on your Huda Bhai? আমাকে বললেন,
-কাল তোমাকে নিয়ে আমি ঢাকায় যাব এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব। নিম্মী তুমিও যাবে আমাদের সাথে। ঠিক সেই মুহুর্তে ঢাকা থেকে ফোন এল। নূর বলল,
- Sir. we have been sacked under PO-৯. We need your presence here as soon as possible. জবাব দিলাম,
-আমি এবং হুদা ভাই কালই আসছি। টেলিফোন রেখে দিলাম। পরদিন ব্রিগেডের সবাই খবরটা জেনে গেল। কর্নেল হুদা সকালেই CO's conference call করলেন। সেখানে তিনি বললেন,
-ডালিম এবং আমি ঢাকায় যাচ্ছি। I can assure you all that I personally shall do everything to redress this shocking injustice. এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমার অসন্তোষও কম নয়।

ঢাকায় এলাম আমরা। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স এ চরম উত্তেজনা। শফিউল্লাহ অফিসে নেই। তিনি নাকি অসুস্থ। জেনারেল জিয়া আমি এসেছি জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। তিনি সিট থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বল্পভাষী লোক। বললেন,
- Have faith in Allah. He does everything for the better. This is just the beginning and I am sure manymore heads will roll.
-দোয়া করবেন স্যার। ঠিকই বলেছেন সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। বললাম আমি।
-We must keep-in touch and you can count on me for everything just as before. For any personal need my doors are always open to you.
-Thank you very much Sir, You are most kind. But you must remain alert as you are our last hope. Future will say what is there in our common destiny.
MS branch থেকে PO-৯ এর লিখিত অর্ডারটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি ও নূর সেনা সদর থেকে। Retirement order টা যখন হাতে নিচ্ছিলাম তখন মনে পড়েছিল শেখ সাহেব স্বস্নেহে নিম্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কথা দিয়েছিলেন সুবিচার করবেন তিনি। সেই সুবিচারের ফলেই আজ আমি চাকুরিচ্যুত হলাম বিনা কারণে!

সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কর্নেল হুদা গিয়ে হাজির হলেন ৩২নং ধানমন্ডিতে। অতি পরিচিত সবকিছুই। কিন্তু এবারের আসাটা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তাই পরিবেশটা কিছুটা অস্বস্তিকর। রেহানা, কামাল সবাই কেমন যেন বিব্রত! পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বললাম,
-কি কামাল বিয়ের দাওয়াত পাবোতো? আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে কামাল উত্তর দিল,
-কি যে বলেন বস! আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ও নিম্মীকে দাওয়াত করে আসব। আপনাদের ছাড়া বিয়েই হবে না। রেহানা চা-নাস্তা নিয়ে এল। হুদা ভাই চুপ করে বসে সবকিছু দেখছিলেন। বাসায় ফিরে এলেন শেখ সাহেব। ডাক পড়ল আমাদের তিন তলার অতিপরিচিত ঘরেই। একাই বসে ছিলেন শেখ সাহেব। ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাবার পর কর্নেল হুদা বললেন,
-এতবড় অন্যায়কে মেনে নিয়ে চাকুরি করার ইচ্ছে আমারও নেই স্যার। বলেই পকেট থেকে একটা পদত্যাগপত্র বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন,
-আমার এই পদত্যাগপত্রের Official copy through proper channel শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছাবে। তার এধরণের আকস্মিক উপস্থাপনায় কিছুটা বিব্রত হয়েই শেখ সাহেব বললেন,
-তোমরা সবকিছুই একতরফাভাবে দেখ। আমার দিকটা একটুও চিন্তা কর না। একদিকে আমার পার্টি আর অন্যদিকে ওরা। আমি কি করুম? পার্টির কাছে আমি বানধা। পার্টি ছাড়াতো আমার চলব না। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,
-তুই আর নূর কাইল আমার সাথে রাইতে বাসায় দেখা করবি।
শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার সময় হুদা ভাইয়ের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। পরদিন জেনারেল শফিউল্লাহর অফিসে আমার ডাক পড়ল। চীফ আমাকে নির্দেশ দিলেন কুমিল্লায় আমার

আর ফিরে যাওয়া চলবে না। নিম্মীকে পাঠিয়ে জিনিষপত্র সব নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্নেল হুদা এই নির্দেশের জোর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু শফিউল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বদলালেন না। কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না তিনি। কুমিল্লায় ফিরে আমি যদি আবার কোন অঘটন ঘটিয়ে বসি! এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর যে আর্মি গঠন প্রক্রিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম রাতদিন; সেই আর্মি থেকে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী বিদায় নেয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল আমাকে। একজন সৈনিকের জন্য এই অবমাননা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। আমি ঢাকায় রয়ে গেলাম। হুদা ভাই নিম্মী ও খালাম্মাকে নিয়ে ফিরে গেলেন কুমিল্লায়।

আমাকে কুমিল্লায় ফিরতে না দেয়ায় অফিসার এবং সৈনিকরা অসন্তোষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। একদিন দুই ট্রাক সৈনিক কুমিল্লা থেকে আমাদের মালিবাগের বাসায় এসে হাজির। আমাকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতাবলে আমাকে চাকুরিচ্যুত করেছে; তার উপর যে রেজিমেন্ট আমি শুরু থেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি সেই ইউনিটের তরফ থেকে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনাও জানাতে পারবে না ইউনিটের সদস্যরা; সেটা কিছুতেই হতে দেবে না তারা। সব বাধা উপেক্ষা করে তারা আমাকে নিয়েই যাবে। পরিণামে যা কিছুই ঘটুক না কেন; তার মোকাবেলা করা হবে একত্রিতভাবে; সে সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে ইউনিটে। **Emotionally charged** অবস্থায় পরিণামের বিষয়টি উপেক্ষা করে যে পদক্ষেপ তারা নিতে প্রস্তুত হয়েছে তার ফল তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে সেটা তারা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যুক্তিগুলো মেনে নিয়ে অনেক ব্যাথা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল তারা। ফিরে যাবার আগে আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা বলেছিল, ‘‘স্যার আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আমরা সবসময় আপনার সাথে আছি; একথাটা ভুলবেন না কখনো। প্রয়োজনে ডাক দিয়ে দেখবেন আমরা সব বাধা পেরিয়ে আপনার পাশে এসে দাড়াব।’’ একজন কমান্ডার হিসাবে অধিনস্ত সৈনিকদের কাছ থেকে এ ধরণের দূর্লভ সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর বেশি আর কি লাভ করা সম্ভব হত চাকুরিতে থাকলেও। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদভারে অনেক জেনারেল এবং কমান্ডার রয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাদের কতজনের ভাগ্যে এধরণের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জুটেছে? আবেগ এবং আত্মতৃপ্তির অনাবিল আনন্দে সেদিন নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি; খুশীর জোয়ার নেমে এসেছিল দু’চোখ বেয়ে। মনে হয়েছিল আমার সৈনিক জীবনের যবনিকাপাত অতি আকস্মিকভাবে ঘটানো হলেও স্বল্প পরিসরের এ জীবন আমার সার্থক হয়েছে। শুধু কুমিল্লা থেকেই নয়; দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকেও অফিসর-সৈনিকরা সুযোগ-সুবিধামত আসতে থাকলো সমবেদনা জানাবার জন্য। সবার একই আক্ষেপ,কেন এমন অবিচার; এতবড় অন্যায়??? জবাবে সবাইকে বলেছি, ‘‘স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যায় ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহতা’য়ালাই সব ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাতেই যেকোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে থাকে কিন্তু তার দেয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তিনিই আবার শাস্তিস্বরূপ সে ক্ষমতা কেড়ে নেন। সব অত্যাচারীর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন; এ ঈমানের জোর আমার আছে। আমি তোমাদের দোয়া চাই আর কিছুই নয়।’’

ছোট দেশ আমাদের। সেনাবাহিনী আরো ছোট। এ সংগঠনে সবাই সবার খবর রাখে। প্রত্যেকটি অফিসার কে কি চরিত্রের; কার কতটুকু যোগ্যতা এসমস্ত খবরা-খবর সৈনিকরা রাখে। পদাধিকারে প্রাপ্য মর্য্যাদা তারা সবাইকেই দিয়ে থাকে নিয়মাফিক। কিন্তু তাদের মন জয় করা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা লাভ করতে পেরেছে শুধুমাত্র পরীক্ষিত সৌভাগ্যবানরাই। নীতিগতভাবে পদাধিকার বলে যে সম্মান লাভ করা যায় তার চেয়ে অর্জিত সম্মানই আমার কাছে বেশি মূল্যবান; তাই চাকুরি জীবনে অধিনস্থ সবাইকে সে ধরণের সম্মানই অর্জন করার জন্য অনুপ্রানিত করার চেষ্টা করেছি সবসময়। আমার সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

হালে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফরকালে সেখানে রেডিওতে আমিনুল হক বাদশাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার বাবা সেনাবাহিনী গড়েছিলেন বলেই মেজর'রা জেনারেল হতে পেরেছিলেন।" একটা গুরত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি। এটা অতি সত্য কথা যে, মেজর থেকে যাদের জেনারেল বানানো হয়েছিল তাদের অনেকেরই জেনারেল হবার যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তবুও তাদের জেনারেল বানানো হয়েছিল। এর কারণ ছিল শেখ মুজিব চেয়েছিলেন অযোগ্য নেতৃত্বের অধিনে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রাখতে এবং ঐ সমস্ত অযোগ্য 'খয়ের খাঁ' টাইপের জেনারেলদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তার ঠেঙ্গারে বাহিনীতে পরিণত করতে। কিন্তু সেটা ছিল তার দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের উপর ঐ সমস্ত 'জী হুজুর!' জেনারেলরা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

নিম্মী ও খালাম্মা গিয়েছিলেন কুমিল্লায়; সংসার গুটিয়ে আনতে। বাসার সব জিনিষপত্র ট্রাকে করে বাই রোড পাঠাবার বন্দোবস্ত করে তারা বাই এয়ার ঢাকায় ফিরবেন। হঠাৎ করেই ব্রিগেড গোয়েন্দা ইউনিট খবর পেলো কুমিল্লা বিমান বন্দর থেকে আওয়ামী লীগের গুন্ডারা নিম্মীকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছে। খবরটা পেয়েই কর্নেল হুদা কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। নিরাপত্তার সব দায়িত্ব দেয়া হল ফার্ষ্ট ফিল্ড রেজিমেন্টের মেজর বজলুল হুদা এবং ক্যাপ্টেন হাইকে। কর্নেল হুদা নিজে তার ফ্ল্যাগ কারে নিম্মী এবং খালাম্মাকে সঙ্গে করে এয়ারর্পোটে এসে তাদের প্লেনে তুলে দিয়েছিলেন। প্লেন টেক অফ না করা পর্যন্ত তিনি এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। এভাবেই আমার আর্মি ক্যারিয়ারের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

ইউনির্ফম ত্যাগে বাধ্য হবার পর জীবিকা অর্জনে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি

মেজর নূর এবং আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বপনের সাথে ব্যবসায় যোগদান করি।

আমার ছোট ভাই স্বপনের সাথেই ব্যবসা করব ঠিক করলাম। সে ব্যবসাতে অভিজ্ঞ। এমবিএ-তে ভালো রেজাল্ট করার পর থেকেই ব্যবসা করছে স্বপন। কর্নেল আকবর ও মেজর শাহরিয়ার ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে দিয়েছে আমরা চাকুরিচ্যুত হওয়ার পর। মেজর শাহরিয়ার 'শ্যেরী এন্টারপ্রাইজ' নামে কোম্পানী খুলে ব্যবসা শুরু করল। কর্নেল আকবর আমাদের সাথে যোগ দিবেন ঠিক করলেন। স্বপন, কর্নেল আকবর, মেজর নূর এবং আমার নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠন করা হল **'SANS INTERNATIONAL'.** চাকুরিচ্যুত হওয়ায় বাধ্যবাধকতার ঝামেলা অনেক কমে গেল। অবাধে সব জায়গায় ইচ্ছামত যোগাযোগের সুযোগ পেলাম আমরা। সরকার ও সরকারি দল আমাদের প্রতি বিরূপ থাকলেও অনেক হিতৈষী এবং সুজন ব্যবসায় আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকি নিয়েও অনেকে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাদের সেই সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতার ঋণ কখনোই শোধ করার নয়। পরিচয় নেই এমন অনেকেও সেই দুর্দিনে নাম শুনেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহানুভূতির সাথে। ছোটখাটো ইম্পোর্ট এবং সাপ্লাই এর ব্যবসা আমাদের অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। টাকা-পয়সার আমদানি হচ্ছিল ভালোই। আইআরডিপিতে সাপ্লাই কন্ট্রাকটার হিসাবে দেশের প্রায় সব থানাতেই কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। এতে করে সব মহলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার বিশেষ সুবিধা হয়েছিল আমাদের। শহর-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে মিশে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মনোভাব বোঝার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বুঝতে পারছিলাম সরকারের অপশাসন আর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে দেশের সাধারণ মানুষ। যেখানেই গেছি পরিচয় জেনে লোকজন সম্মান দেখিয়েছেন; শ্রদ্ধার সাথে নিঃস্বার্থভাবে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করেছেন আমাদের কাজে। এভাবেই কাটছিল আমাদের সময়।

আমাদের অন্তিম বৈঠক

শেখ সাহেব নূর এবং আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততায় সেটা সম্ভব হয়নি। আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হলো। আমরা গেলাম তার সাথে দেখা করতে।

গেলাম আমি ও নূর ৩২নম্বরেই দেখা করতে। সালাম দোয়া বিনিময়ের পর শেখ সাহেবই শুরু করলেন,
-দেখ্ আমার কিছুই করার ছিল না। নেহায়েত অপারগ হয়েই তোদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আমাকে। জানি আমার এই সিদ্ধান্তে মনঃক্ষুন্ন হইছস তোরা; হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি তোদের জন্য কিছু একটা করতে চাই। বিদেশে দূতাবাসে চাকরি করতে চাইলে সেই ব্যবস্থা কইরা দিতে পারি। ব্যবসা করতে চাইলে নাসেররে কইয়া সে ব্যবস্থাও কইরা দিতে পারি; ওর অনেক ধরণের ব্যবসা আছে। তার সাথেও তোরা যোগ দিতে পারছ।
-চাচা আমরা সৈনিক মানুষ। সেনাবাহিনীর চাকরি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম টাকা-পয়সার লোভে নয়; সম্মান এবং দেশের সেবা করার জন্যই। সেটাই যখন আপনার বিচারে হারাতে হয়েছে তখন আপনার কাছে আমাদের আর অন্য কিছুই চাওয়ার নাই। এরপরও আপনি আমাদের জন্য যদি কিছু করতে চান সেটা আপনার মহানুভবতা। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন সেটাই যথেষ্ট। রিজিকের মালিক আল্লাহ। খেয়েপড়ে বাচাঁর মত কিছু একটা করতে পারব আপনাদের দোয়ায় ইনশাল্লাহ। জানি না আর দেখা হওয়ার সুযোগ হবে কিনা? বেয়াদবী নেবেন না চাচা, একটা কথা আপনাকে বলে যাই। আপনার আশেপাশে যারাই সর্বক্ষণ আপনাকে ঘিরে রাখছে তাদের বেশিরভাগই মতলববাজ। দেশের অবস্থা এবং জনগণ সম্পর্কে তারা আপনাকে সঠিক কথা বলে না। যা শুনলে আপনি খুশী হবেন চাটুকাররা সেটাই বলে থাকে মতলব হাসিল করার জন্য। খোদা না করুক তেমন দুর্দিন যদি কখনো আসে তবে এদের কেউই আপনার সাথে থাকবে না; চলে যাবে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। তখন সেই অবস্থার জন্য সব দায়দায়িত্ব আপনার উপরই আরোপ করা হবে এবং অবস্থার মোকাবেলাও করতে হবে আপনাকেই। আপনি সবসময় বলে থাকেন যে দেশের জনগণকে আপনি ভালো করে চেনেন; কিন্তু আজ আমি বলে যাচ্ছি জনগণ থেকে বর্তমানে আপনি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন কিংবা আপনাকে করা হচ্ছে। আপনি আমাদের স্নেহ করেন। আমাদের চাকুরিচ্যুত করে আপনার কতটুকু লাভ হয়েছে সেটা আপনিই ভালো বোঝেন; তবে আমরা কিন্তু বরাবরই আন্তরিকভাবে আপনার ভালোই চেয়েছি। আল্লাহপাক আপনাকে অনেক দিয়েছেন। আপনারতো আর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই থাকতে পারে না। 'চাটার দল' ছেড়ে দেশ ও জাতির নেতা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আপনার। তারই মধ্যে রয়েছে আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ত্যাগ ও পরিশ্রমের সার্থকতা।

শেখ সাহেব আমার কথাগুলো চুপচাপ শুনছিলেন আর পাইপে মৃদু টান দিচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলছেন না দেখে আমি বললাম,
-আমরা তাহলে এবার আসি? তিনি অনুমতি দিলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম ৩২ নম্বর থেকে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই কথাগুলি বলেছিলাম তাকে; ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি বলেই। এর কতটুকু তিনি বুঝেছিলেন জানি না।

আর্মি এবং রক্ষীবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের মনোভাব

জেনারেল শফিউল্লাহর ১৯৮৭ সালে ২৮শে আগষ্ট লন্ডনের বাংলা সাপ্তাহিক জনমত-কে দেয়া সাক্ষাৎকার যেটা পরে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে স্থানীয় দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে শেখ মুজিবের সেনাবাহিনী এবং রক্ষীবাহিনীর প্রতি তার মনোভাবের বিশদ প্রতিফলন ঘটে।

প্রশ্নঃ আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক নাকি ততটা ভালো ছিল না। কথাটা কি সত্য বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর আস্থা ছিল। কিন্তু পুরো সামরিক বাহিনীর উপর তাদের আস্থা ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

প্রশ্নঃ স্বাধীনতার পর আপনাকে কেন চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হল?

উত্তরঃ এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ওসমানী সাহেবের কোন সিদ্ধান্ত নয়।

প্রশ্নঃ রক্ষীবাহিনী গঠন করার আগে আওয়ামী লীগ সরকার এ ব্যাপারে কি আপনার সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করেছিল?

উত্তরঃ না। তবে গঠন করার পর আমাকে বলা হয়েছিল রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসাবে। তবে লোকমুখে আমি শুনেছি যে, রক্ষীবাহিনী গঠন করা হচ্ছে আর্মড ফোর্সের জায়গা পূরণের জন্য।

প্রশ্নঃ সামরিক বাহিনীর সাথে রক্ষীবাহিনীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

উত্তরঃ সম্পর্ক ভালো ছিল না। তার কতগুলো কারণ ছিল। তখন গুজব ছড়িয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনীকে আর্মির জায়গায় বসানো হবে। নতুন বাহিনী হিসাবে রক্ষীবাহিনীকে তখন সবকিছুই নতুন জিনিষপত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। এদিকে আর্মি দেখছে তাদের সেই পুরাতন অবস্থা। এগুলো দেখে আর্মড ফোর্সের অনেকের মনে আঘাত লাগে। যার ফলে সম্পর্কটা খারাপ রূপ নেয়। তবে এ ব্যাপারে সরকার একটা ভুল করেছিলেন, তা হল রক্ষীবাহিনীকে **'power of arrest and search'** দেওয়া। এতে সামরিক বাহিনীর অনেকেই ক্ষুব্ধ এবং চিন্তিত হন। শুধু তাই নয়; রক্ষীবাহিনী এই সময় সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারকে লাঞ্ছনা পর্যন্ত করে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা সেনাবাহিনীর চেয়েও বেশি।

প্রশ্নঃ শেখ মুজিবর রহমান সামরিক বাহিনীর উন্নতির পক্ষে ছিলেন না, এ কথা কি সত্য?

উত্তরঃ হ্যাঁ। আমি বলবো একথা সত্য।

প্রশ্নঃ গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে লেডিস ক্লাবে মেজর ডালিমের অপ্রীতিকর ঘটনার পর সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসাবে কি কোন কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তরঃ যখন গোলমালের খবর আমি জানতে পারি তখন ডালিমের পক্ষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই এর একটা বিচারের জন্য। বঙ্গবন্ধু আমার উপর রেগে গেলেন। তখন আমি বললাম, 'বঙ্গবন্ধু আমি যদি আমার অফিসারদের জন্য না বলি তাহলে কে বলবে? গাজী গোলাম মোস্তফার এই ঘটনা আপনি তদন্ত করে দেখুন। আপনি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য চান তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। যেহেতু ওরা গাজীর বিরুদ্ধে এবং আমিও তাদের পক্ষে, তাই গাজীর বিরুদ্ধেই বলেছি। তাই তিনি খুব খুশী হননি। তিনি শুধু বললেন, 'শফিউল্লাহ, আপনি জানেন কি যে আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন? (ইংরেজি ভাষায়) আমি বললাম, 'আমি জানি স্যার। আমি আমার জন্য কথা

বলছি না; আমি কথা বলছি আপনার জন্য স্যার। মানুষ আপনাকে সত্য বলেনি। ঐ সময় জিয়া ও সাফায়াত জামিলও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নঃ তারপর কি হল?

উত্তরঃ তারপর আমরা ওখান থেকে কোন বিচার না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়ে চলে আসি। পরে দেখা গেল সরকার মেজর ডালিমকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করলেন।

বহুদলীয় গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে বাকশালী স্বৈরশাসন কায়েম এবং গণপ্রতিরোধ

কারা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা?

’৭১ এর চেতনা, আশা, স্বপ্ন প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার অন্তরে ছিল জলন্ত শিখার মত। তারা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পূনর্গঠনে অন্যান্য অবদান রাখতে পারতেন। তারা পারতেন হারানো গর্ব এবং সম্মান ফিরিয়ে আনতে পুরো জাতির জন্য ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে।

যে আশা-আকাংখা এবং স্বপ্ন নিয়ে জানবাজী রেখে একদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাপিঁয়ে পড়েছিলেন সে স্বপ্ন আজো বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার বুকে তুষের আগুনের মতই জ্বলছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সুযোগ পেলে আজো তারা বিশেষ অবদান রাখতে উদগ্রীব। তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আবার জনগণের সাথে সঙ্গবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা। স্বাধীনতার মত সার্বিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেন স্বার্থপর জাতীয় বেঈমানদের পরাজিত করে। গড়ে তুলতে পারেন সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ। জাতিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাদের হারানো মর্যাদা ও গৌরব।
কারা এই মুক্তিযোদ্ধা? কি ছিল তাদের স্বপ্ন? কি হল তাদের পরিণাম? তাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করা হয়েছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১৯৭১ সালে যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যুদ্ধ করেছিল তারা সবাই ছিলেন বাংলাদেশের খেটে খাওয়া জনগণের সন্তান। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ছেলে মেয়েরাই সেদিন দেশকে স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। এর পেছনে তাদের কোন হীন স্বার্থ ছিল না। ছিল একটি মাত্র স্বপ্ন। হানাদারদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শোষণহীন আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ। তাদের এ গভীর দেশপ্রেমই ছিল তাদের ত্যাগের উৎস। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তাদের সেই নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও প্রচন্ড সাহসের ইতিহাস। তাদের সেই বীরত্ব ও ত্যাগের ফলেই স্বাধীন হল বাংলাদেশ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাঙ্খিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল না স্বাধীন বাংলাদেশে। অথচ তখনকার নেতৃত্ব যদি তাদের বিশ্বাস করে তাদের দুর্বার কর্মক্ষমতা ও আত্মত্যাগের অঙ্গীকারকে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে কাজে লাগাতে চাইতেন তবে তারা নিশ্চয়ই অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারতেন। কিন্তু তেমনটি হয়নি। তখনকার সরকার যে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের অবিশ্বাসই করেছিল তা নয়; তাদের উপর চালানো হল নির্যাতনের ষ্টিমরোলার। একটি সশস্ত্র সংগ্রামের বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলাদেশ, নব চেতনায় জন্ম নিল একটি জাতি। কিন্তু মাত্র স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জাতির ভাগ্যে নেমে এল চরম বিপর্যয়। দারিদ্র, হতাশা, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, নীতিহীনতা, আদর্শের পরাজয় এবং মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অবজ্ঞা এবং লাঞ্ছনা। পৃথিবীর ইতিহাসে মুক্তিকামী মানুষের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও রক্তদানের প্রতি এমন অবমাননা এবং অসম্মান বোধ হয় অন্য কোথাও দেখানো হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সর্বস্তরের জনগণ যুদ্ধ করল তবুও ঘৃণ্য অতীতই আবার ফিরে এল। মানুষের কাম্য জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হল না। জাতীয় পর্যায়ে বেঈমান ও শোষকের দলই ক্রমে দেশের কর্ণধার হয়ে বসল।

মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ করে তাকেই বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি বলতে শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতা বোঝায় না। মুক্তি বলতে বোঝায়- সেই সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সম্মান নিয়ে মাথা উচুঁ করে বেঁচে থাকতে পারে আপন গর্বে, দাস বা ভিক্ষুকের মত নয়। মানুষ তখনই প্রকৃত অর্থে মুক্ত হয় যখন সে তার মেধা, প্রতিভা এবং কর্মক্ষমতা প্রকাশের সমান অধিকার লাভ করে। সুযোগ পায় তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রকাশের এবং নিজ প্রজ্ঞা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তার ভাগ্যের উন্নতি করার। আর্থিক ও সামাজিক অধিকারে বৈষম্য থাকলে মানুষ মুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে, দু'বেলা ভাত পায় না, সে দেশের মানুষ মুক্ত কিংবা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে এ ধরণের উচ্চবাচ্য করা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকেই বলেন, '৭১ এর যুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না। আমি বলি ভারতীয় বাহিনী কেন তার সাথে রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীও যদি যোগ দিত তাহলেও '৭১ এর যুদ্ধে তাদের পক্ষে পাকিস্তানকে পরাজিত করা সম্ভব হত না। কারণ জয় পরাজয় নির্ভর করে জনগণের সমর্থনের উপর। অল্প কিছু লোক এবং গোষ্ঠি ব্যতিত পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনসাধারণ মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিল বলেই দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু এই জনগণকেই তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকার।

মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার হুকুম মোতাবেক সমস্ত অস্ত্র জমা নেবার পর দু/তিন দিনের নোটিশে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার হাতে ৫০ টাকা করে পথ খরচা দিয়ে খোদা হাফেজ জানায় আওয়ামী লীগ সরকার। সরকার অঙ্গীকার করল মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যারা এ সার্টিফিকেট পাবে তাদের পূর্ণবাসনের জন্য চেষ্টা করবে সরকার। পরবর্তিকালে এই সার্টিফিকেট সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ না করে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং আওয়ামী লীগের এমপি ও নেতাদের মাধ্যমে বিলি করা হয় তাদের পছন্দের লোকদের মাঝে। যদিও এদের অধিকাংশের সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক ছিল না। যুদ্ধাপরাধী এবং দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মাফ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে অনেক রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যরা নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে সার্টিফিকেট দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে সমাজের সর্বত্র। দেশদ্রোহী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের আওয়ামী সরকার ক্ষমা করেছিল মহত্বের করণে নয় বরং অভিন্ন শ্রেণী স্বার্থে এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তাদের মদদ হাসিল করে নিজেদের হাত শক্তিশালী করতে। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ। কিন্তু ১২ থেকে ২০ লাখ সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ডজন মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ১১জনই ভুয়াঁ। অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাবমুর্তি নষ্ট করার জন্য এবং স্বাধীনতা বিরোধী দালাল চক্রকে পূনর্বাসিত করার জন্যই এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশে ভুয়াঁ মুক্তিযোদ্ধাদের ভীড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রাপ্য কৃতিত্ব ও স্বীকৃতি পাবার আগেই হারিয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে হাতিয়ার নিয়ে নিলেও সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে যে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল তাদের নিরস্ত্র করা থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্রছায়ায় ঐ বাহিনীর সদস্যরা স্বাধীনতার পরমুহূর্ত থেকেই লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানী, হত্যা, লাইসেন্স পারমিটবাজীতে মেতে উঠে। ভারতীয় মারোয়াড়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে চোরাচালানেও তারাই লিপ্ত হয়। কালোবাজারী এবং মজুতদারীদের এরাই প্রটেকশন দিয়ে রাখে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দলীয় লুটপাটও করা হয় এই বিশেষ বাহিনীর যোগসাজসে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙ্গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতায় যারা সর্বপ্রকার অসামাজিক কাজ ও লুটপাট করেছিল তাদের পাপের বোঝা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আজও টানতে হচ্ছে। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে বিনা কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে এখনো বিনা বিচারে কারাবন্দী হয়ে থাকতে

হচ্ছে। সরকারের ক্ষমা প্রাপ্ত লেলিয়ে দেয়া দালালরা ছাড়া পাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে লাগে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। দালালরা সবাই ছিল যার যার নিজ এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। স্থানীয় প্রশাসন, থানা ইত্যাদির উপর এদের প্রভাব ছিল অসীম। স্বাধীন দেশের নতুন সরকার প্রশাসনিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন না করায় তাদের প্রভাবেও কোন তারতম্য ঘটেনি ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন হয়ে উঠে সঙ্গীন ও দুঃর্বিষহ।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে দেখা যায়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে যে সমস্ত দেশ এবং জাতি স্বাধীন হয়েছে ঐ সমস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে জাতীয় পুর্নঃগঠন প্রক্রিয়ায় মুক্তিযোদ্ধারাই অগ্রণী ভূমিকায় থেকেছেন। নীতি নির্ধারণ করা থেকে নীতি বাস্তবায়ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ অবদান রেখেছেন জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কিন্তু আমাদের বেলায় হল ঠিক তার বিপরীত। যে চেতনা ও সংকল্প একটা মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করে তুলে আমাদের ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল গোড়া থেকেই। যুদ্ধের জন্য আমরা মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। যুদ্ধটা ছিল আমাদের উপর আরোপিত। '৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনীর আচমকা আক্রমণের আগ পর্যন্ত বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতারা সবাই রাজনৈতিক সমাধানের রাস্তাই খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে যে কোন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যথা:- সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত নীতি আদর্শ, সংগঠন, সামরিক প্রস্তুতি এবং বিচক্ষণ নেতৃত্ব এর প্রায় সবকয়টিই ছিল অনুপস্থিত। ফলে যে নেতার নামে সংগ্রাম তিনি শুরুতেই ধরা দেন শত্রুর হাতে। আর তার সহযোগিরা নিরস্ত্র জাতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও যে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল সেটা ছিল প্রধানত: আত্মরক্ষার তাগিদে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। তবে যারা এ ধরণের প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের সাহস ও সংকল্প ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু যুদ্ধটা যে আকষ্মিক ছিল এবং সমগ্র জাতিকে সে আকষ্মিক ঘটনার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সূত্রহীন এই আকস্মিকতার একটা মহান যুদ্ধকে সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নেবার জন্য যে রাজনৈতিক আদর্শের প্রয়োজন সে আদর্শ গড়ে উঠার সুযোগ আমরা পাইনি। যুদ্ধের নেতৃত্ব যারা কব্জা করে নেয় তাদেরও এটা কাম্য ছিল না। দেশের আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরোধিতা করার জন্যই আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু জনগণের সে আশা পূরণ করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সেটা হত তাদের শ্রেণী স্বার্থের পরিপন্থী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতারণার শিকারে পরিণত হয় মূলতঃ একারণেই। কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধে সহায়তা করেছেন তারা লক্ষ্যহীন ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন তাদের বিপুল অংশই ছিলেন অরাজনৈতিক ব্যক্তি। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, মা-বোন ও দেশবাসীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধের আকাঙ্খাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল যুদ্ধে যোগ দিতে। অবশ্য আত্মরক্ষার তাগিদেও অনেকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে বেশিরভাগ লোকই স্বেচ্ছায়, আত্মত্যাগের মহৎ মনোভাব নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন করা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কিশোর-যুবক বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে বিভিন্ন সেক্টরে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা তাদের কর্মীদের নিয়ে ভারতের সহায়তায় নিজেদের নিজস্ব বাহিনী গঠন করে তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে না পাঠিয়ে তাদের অতি সযত্নে সংরক্ষিত করে রাখে স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। প্রকৃতপক্ষে ন'মাসের আগাগোড়া যারা যুদ্ধ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়ে। তারা ছিল সরলমনা। তাই যুদ্ধ শেষে বিনা দ্বিধায় তারা তাদের অস্ত্র জমা দিয়ে দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশে অস্ত্রের দাপট, পারমিটবাজী, লুটতরাজ, হাইজ্যাক, গুম, খুন, ধর্ষণ ও অন্যান্য দুঃষ্কর্মে এসব নিবেদিত প্রাণ ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সামান্য। রাজনৈতিক চেতনার অভাবে শক্তি থাকা সত্বেও এরা সংগঠিত হতে পারেননি। বাংলাদেশের বিশাল জনসমুদ্র থেকে এসে তারা আবার জনসমুদ্রেই মিশে যান। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে সুষম আর্থসামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করার মত শক্তি তাদের ছিল। এটা আঁচ করতে পেরেই আওয়ামী

লীগ সরকার শংকিত হয়ে পড়ে এবং দেশে ফিরে প্রথমেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। একই সাথে সুখী ভবিষ্যতের কথা বলে তাদেরকে ভাওতা দেয়। এভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ের পর যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুর্নগঠনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে সূর্য্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সমাজে সসম্মানে পূর্ণবাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ইস্কাটন লেডিস ক্লাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদের আহ্বানে দ্রুত দেশের প্রতিটি থানায় এবং ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অঙ্গ সংগঠন গড়ে উঠে। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে এই সংগঠনের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন হয় এবং ঐ অধিবেশনে একটি গঠনতন্ত্র এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হয়। এই কমিটির লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশের তৎকালীন গণবিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন সরকার এবং ধোকাবাজীর রাজনীতির হাতছানি মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। সরকারের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে কয়েকজন কাউন্সিল সদস্য সরকারি প্ররোচণায় সংসদের গঠনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সংসদকে আওয়ামী সরকারের লেজুড়ে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। জাতীয় নির্বাহী পরিষদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া সত্বেও নতুন নির্বাচনের বিধানকে আমল না দিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঐ চক্র এক কোরাম সভায় গঠনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে বৈধ জাতীয় নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি পরে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের এক সভায় জনধিকৃত বাকশালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের যোগদানের কথা ঘোষণা করে। সংসদের আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়ে সংসদের গঠনতন্ত্রের অবমাননার দায়ে জনাব নঈম জাহাঙ্গীর ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পচাঁত্তরের মার্চ মাসেই ঢাকা মুন্সেফ কোর্টে ঐ অবৈধ পরিষদ গঠনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। কোর্ট ইনজাংশন জারি করে অবৈধ পরিষদের গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। ফলে সংসদ বাকশালের রাহুগ্রাস থেকে সাময়িকভাবে বেচে যায়। ইনজাংশন জারি করলেও কোর্ট সরকারের রোষ এড়াবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মামলার রায় প্রদান স্থগিত রাখে।

ঐক্য প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি

স্বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য ছিল অপরিহার্য। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও সেই ঐক্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

সরকারি দল ও তাদের পেটোয়া বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো তাদের সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সর্বহারা পার্টি এবং জাসদের কর্মীরাই সরকার বিরোধিতায় মারাত্মকভাবে তৎপর। অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রগতিশীল সংগঠনগুলো তাদের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়ছে। জনগণ সাধারণভাবে আওয়ামী ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে। ঐক্যজোটের স্বৈরাচারী নির্যাতনে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সবাই দিশেহারা। জাসদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, লেনিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি, জাতীয় লীগ ইত্যাদি দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং তাদের গোপন সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। তাদের মধ্যে সরকার বিরোধিতার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়ে ঐক্যমতও রয়েছে। জনগণও আজ পিছিয়ে নেই। তারাও আজ আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরপরও কোন একটি দলের পক্ষেই পর্যাপ্ত পরিমাণের শক্তি এবং প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে না সরকারি নিষ্পেষণের কারণে। ফলে জনগণ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পেছনে দাড়াতে ভরসা পাচ্ছে না। তারা এটাও লক্ষ্য করছে যে, বিরোধী দলগুলো মোটামুটিভাবে সরকার বিরোধী একই রকমের বক্তব্য রাখছে; একইভাবে সরকারের বিরোধিতা করছে কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না। দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য না থাকায় এবং তাদের বক্তব্য এবং মতামতের মধ্যে একটা মৌলিক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়ায় তারা চাইছিল সব বিরোধী দল এবং সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হোক। এ ব্যাপারে কিছু নির্দলীয়, রাজনৈতিকভাবে সচেতন, দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছিল ঐধরণের একটা ঐক্য প্রচেষ্টার। লেখকেরও এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বিরোধী দলগুলোর কোনটাই সরকারের নির্যাতন এবং দমন নীতির মুখে এককভাবে দাড়াতে পারবে না; এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। গণআন্দোলন এবং সরকার বিরোধী সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে; এ ব্যাপারেও ঐক্যমত ছিল। এই দু'টো মূল বিষয়ই ছিল ঐক্য প্রচেষ্টার ভিত্তি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আগামী দিনগুলোতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে কারো পক্ষেই শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না বরং দলগুলোর বিলুপ্তি ঘটারই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; এ বিষয়টিও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। তাছাড়া সরকার যেভাবে দেশে প্রকাশ্য রাজনীতির পরিধি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করে আনছে তাতে করে অচিরেই আগামীতে দেশে একদলীয় শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে সরকার বিরোধী কিছু করতে গেলে তাতে শক্তিক্ষয়ই ঘটবে কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। গোপনে বৈঠকের পর বৈঠক চললো। আলোচনাকালে বোঝা গেল ঐক্যের পক্ষে যারা; তারা শীর্ষ নেতাদের জন্য তেমনভাবে তাদের মতামতও প্রকাশ করতে পারছিলেন না। সারকথা, বুঝতে পারা যাচ্ছিল ঐক্যের পথে মূল বাধা নেতারা। আবিষ্কার করতে পারলাম এর কারণও রয়েছে অনেক:- নেতৃত্বের কোন্দল, অতীতের তিক্ততা, অবিশ্বাস, নেতাদের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং নীতিগত ভুলের জন্য অতীতের ব্যর্থতা। এসব জটিল সমস্যাগুলোর উর্ধ্বে উঠার মত মানসিকতা নেতাদের মাঝে নেই। তার উপর ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে নেতৃত্বের কোন পদে কে থাকবেন; সেই প্রশ্নটি। নেতাদের সবাই যার যার হাতে সাড়ে তিন হাত! সবাই নিজেকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করছেন। এ ধরণের মনোভাব এবং পরিস্থিতিতে কোন ঐক্য গড়ে তোলা অসম্ভবই নয় অবাস্তবও বটে। তাই আমরা সেই উদ্যোগ থেকে সরে দাড়াব ভেবেছিলাম এক সময়। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হল ভেঙ্গে পরলে চলবে না; ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সব নেতাদের মধ্যে পারষ্পরিক বিভেদ থাকলেও তাদের প্রত্যেকেই আমাদের আন্তরিকতার তারিফ করেছিলেন। পরিশেষে আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে একদিন কর্নেল আকবর এসে বললেন যে, এদের নিয়ে কোন ঐক্য গড়ে

তোলা কিছুতেই সম্ভব নয় বলেই তিনি, কাজী জাফর, মেনন এবং রনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার। এই দলে আমাকে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদানের প্রস্তাব দিলেন তিনি। জবাবে আমি বলেছিলাম, ''এত তাড়াতাড়ি হতাশ হলেতো চলবে না; ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেখানে পুরনো দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে তাদের অস্তিত্বই বজিয়ে রাখতে পারবে না বলে মনে করা হচ্ছে সেখানে আর একটি নতুন দল করে লাভটা কি হবে? এরপরও আপনারা দল করতে চান ভালো কথা; তবে আমার জন্য এই মুহূর্তে নির্দলীয় থাকাটাই উচিত হবে বলে মনে করি। আপনাদের দলে যোগ না দিলেও সময়মত আমরা সবাই একত্রিত হব কোন বৃহত্তর স্বার্থে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'' এর অল্প কয়েকদিন পরেই United People's Party (UPP) আত্মপ্রকাশ করে। কর্নেল আকবর সেই পার্টিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। এরপরও আমাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে।

সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে বিয়ে হলো শেখ ভাত্রিদ্বয়ের!

যখন হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরছে তখন শেখ কামাল এবং শেখ জামালের বিয়ে হলো সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর একদিন শেখ কামাল এবং শেখ রেহানা সত্যিই এল আমাদের মালিবাগের বাসায় বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতে। দুই ভাইয়ের একই সাথে বিয়ে। শেখ জামাল ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ায় গিয়েছিল সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে কিন্তু ওখানকার পরিবেশ ভালো না লাগায় পরে কিছুদিন স্যান্ডহার্টসে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে কমিশন্ড অফিসার হিসাবে যোগ দিয়েছে জেনারেল শফিউল্লাহর নিজস্ব ইউনিট ২য় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে কিছুটা নিয়ম বর্হিঃভুতভাবেই। বিয়ে হয়েছিল নতুন গণভবনে। বিশাল আয়োজন। অগুনিত অতিথির ভীড়। মনে হচ্ছিল পুরো ঢাকা শহরটাই এসে উপস্থিত হয়েছে বিয়েতে। বর্নাঢ্য জাকজমক পরিবেশে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। বিয়ের মন্ডপে কামাল-জামাল দুই ভাই সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে বর সেজে বসেছিল। বিয়ের পরদিন প্রায় সবগুলো দৈনিক পত্রিকায় বড় করে ছাপানো হল প্রধানমন্ত্রীর দুই ছেলের সোনার মুকুট মাথায় পড়ে বিয়ের খবর। একই পাতায় ছাপানো হয়েছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট, হাড্ডিসার মুমুর্ষ মানুষ নামি কঙ্কালের ছবি এবং দুর্ভিক্ষের খবর। ১৯৭২ সালে কোন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, "কবে যে বাংলাদেশের মেয়েরা স্বর্নালঙ্কার বাদ দিয়ে বেলী ফুলের মালা পড়ে বিয়ে করবে!" তার এই খায়েশটাও বেশ ফলাও করে বেরিয়েছিল খবরের কাগজগুলোতে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের কথা আর কাজের মধ্যে কত তফাৎ! বিয়ের ব্যাপারটা হয়তো বা ছোট কিন্তু এ বিষয়টি বেশ আলোচিত হয়েছিল সব মহলেই।

সিরাজ সিকদারের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল

ঢাকার তদানীন্তন পুলিশ সুপার মাহবুব সরল বিশ্বাসে বন্ধু হিসেবে আমাকে হুশিঁয়ার করে দিয়েছিল এবং বলেছিল, সিরাজ সিকদার খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে।

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে আমার ছোট ভাই স্বপনের বিয়ে ঠিক হল আমারই ফুপাতো বোন গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামালুদ্দিনের কন্যা মুন্নির সাথে। এয়ারর্ফোস মেসে রিসেপসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইখানে এসপি মাহবুব এক ফাঁকে আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল,
- ডালিম বন্ধু হিসাবে একটা কথা বলছি কিছু মনে করিস না। ওর কথার ধরণ দেখে বললাম,
- ভনিতা ছেড়ে আসল ব্যাপারটা কি বলে ফেলতো।
- দেখ, আমি চাইনা তোর কোন বিপদ হোক। বন্ধু হিসাবে তোকে সাবধান হতে অনুরোধ করছি। **Please be careful.** কিছুদিনের মধ্যেই সিরাজ সিকদার ধরা পড়বে। **This is certain. But I don't care about it, what is bothering me is that during interrogation of one of his close associate your name has also come up This is certain. But I don't care about it, what is bothering me is that during interrogation of one of his close associate your name has also come up.** তার এক **close comrade** এর নোটবুকে তোর নাম পাওয়া গেছে।
- কারো নোটবুকে আমার নাম পাওয়া গেলে আমি কি করতে পারি? প্রশ্ন করলাম আমি।
- **Well you are matured enough.** আমি বলছি **please be very very careful about your movements and be causcious about the people you meet that is what is needed. I am pretty serious, do you understand?** আমাদের দু'জনকে একসাথে দেখতে পেয়ে একজন বেয়ারা এসে জানাল খাবার দেয়া হয়েছে। দু'জনেই খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাচ্ছিলাম আর মাহবুবের কথাগুলোর বিষয়ে ভাবছিলাম। যতটুকু সম্ভব স্পষ্ট ঈঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে মাহবুব। আরো সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে আমাকে। সরকারের বিশেষ মহলের সুনজরে পরে গেছি। অতএব সাবধান! খুব সাবধান হতে হবে আমাকে। খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে সিরাজ সিকদার; এ কথাটা এত জোর দিয়ে কি করে বলতে পারলো মাহবুব? তবে সরকার নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পেতেছে; যে ফাঁদ বুঝতে না পেরে সিরাজ সিকদার ধরা পড়বে। নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে মাহবুবের মত লোক এত দৃঢ়তার সাথে কথাটা বলতো না। সংবাদটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছে দিতে হবে। সাবধানের মার নেই। পরদিনই খবরটা জায়গামত পৌঁছে দিয়ে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। জবাব পাওয়া গিয়েছিল তেমন কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় টয়েনবি র্সাকুলার রোডের উপর আমাদের **SANS International** এর অফিস। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নিত্য নানা ধরণের লোক আসা-যাওয়া করছে। বিভিন্ন ধরণের লোকজন আসতো আমাদের অফিসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাও আসতো জনতার স্রোতে মিশে। সে অবস্থায় কোন রাজনৈতিক ব্যক্তির নোটবুকে আমার নাম পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু যেটা ভাবনার বিষয় সেটা হল, সর্বহারা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তির নোটবুকে আমার নাম পাওয়া গেছে; সেটাই আশঙ্কার বিষয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আমার যোগাযোগ রয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু মাহবুব কিছুই বলল না। তবে কি বুঝে নিতে হবে সর্বহারা দলের সদস্যদের সাথে আমিও সরকারের **priority target** -তে পরিণত হয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। সবাই মত প্রকাশ করল মাহবুবের ঈঙ্গিতকে হালকাভাবে দেখা ঠিক হবে না। উপযুক্ত নিরাপত্তার সাথেই আমাকে চলাফেরা করতে হবে। তবে জীবনের স্বাভাবিকতাও বজিয়ে রাখতে হবে। যেকোন অস্বাভাবিক আচরণ সরকারি মহলকে আরো সন্দিহান করে তুলবে।

চাকুরীচ্যুত হওয়ার পরও জনাব তাজুদ্দিন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যদিও তাজুদ্দিন আহমদের নীতিসমূহ আমরা যুদ্ধকালীন সময় সমর্থন করিনি তবুও তার কিছু ব্যক্তিগত গুনাবলীর জন্য আমরা তাকে সম্মান করতাম। তার চাকুরিচ্যুতির খবর জানামাত্র আমি সেদিন সন্ধ্যায় তার সরকারি বাসভবনে দেখা করতে যাই।

তিনি বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য গোছগাছ করছিলেন। বাড়ির লনে বসেই আলাপ হল। আলাপ শেষে বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক তখন তিনি হঠাৎ করে জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে যোগাযোগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁর সাথে দেখা করব কিনা? জবাবে বলেছিলাম, আমার তরফ থেকে কোন বাধা নেই। ঠিক হল যোগাযোগ হবে গোপনে।

একদিন অফিসে বসে আছি হঠাৎ আমার চাচা শ্বশুড় জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি-লেখক-সাংবাদিক এবং পাকিস্তান আমলে দৈনিক পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ টুডের মালিক) এসে হাজির। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে দেখে স্বসম্ভ্রমে উঠে দাড়িয়ে তাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
-কাক্কু, আপনি হঠাৎ কি মনে করে? খবর দিলেইতো পারতেন আমি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতাম।
-বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। তাজুদ্দিন তোমার সাথে জরুরীভাবে দেখা করতে চায়। সম্পর্কে কাক্কু এবং তাজুদ্দিন সাহেব ভায়রা ভাই।
-কোথায়? জানতে চাইলাম।
-তাঁতিবাজারে।
-লাঞ্চের পর আগামীকাল আমি আর নূর আসব। তিনি চলে গেলেন। পরদিন সময়মত গিয়ে পৌঁছতেই দেখি জনাব তাজুদ্দিন অপেক্ষা করছেন। আমরা দুইজনই তার বিশেষ পরিচিত। দোতালার একটি নিভৃত কক্ষে আমাদের বৈঠক শুরু হল কুশলাদি বিনিময়ের পর।
-দেশের অবস্থা সম্পর্কে কি মনে করছেন? প্রশ্ন করলেন তিনি।
-যে দেশ বানিয়েছেন তার সর্ম্পকে ভাবনার কি কোন অন্ত আছে?
-দেশতো আপনারাই স্বাধীন করেছেন।
-তাই কি? আমরাতো এভাবে দেশ স্বাধীন করতে চাইনি সেটা আপনার চেয়ে বেশি আর কারো জানার কথা নয়। চুপ করে ছিলেন তিনি। আমি বললাম,
-তাজুদ্দিন সাহেব '৭১ এর আমাদের যুক্তিগুলোর সত্যতাই কি ক্রমান্বয়ে এই বাংলাদেশে সত্যে পরিণত হচ্ছে না? যাক অতীত নিয়ে আলোচনা না করে বলেন কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? সরাসরি প্রশ্ন করলাম তাকে।
-দেশটাকে বাচাঁতে হবে।
-অবশ্যই। তবে কি করে?
-জনগণের মুক্তি আনা সম্ভব সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই।
-এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। সারাজীবন আপনারা বুর্জুয়া রাজনীতি করে এসে এখন সমাজতন্ত্র করবেন সেটা কি করে সম্ভব? আর জনগণই তা বিশ্বাস করবে কেন? আওয়ামী লীগতো একটা বুর্জুয়া সংগঠন। শেখ মুজিব কেন, কেউই এ দলের মাধ্যমে প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে পারবে না। আপনিও এ সত্য এতদিনে নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হল বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে সমাজতন্ত্রের নামে আপনারা যে বিভীষিকা তুলে ধরেছেন তাতে আগামী ৫০ বৎসরেও সমাজতন্ত্রের কথা শুনলেই এদেশের লোক আতঁকে উঠবে। তাছাড়া গ্রামে-গঞ্জে সাধারণভাবে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আলোকে বলব আমাদের জনগণ সাম্প্রদায়িক

নয় এটা ঠিক; তবে তারা সমভাবেই ধর্মভীরু। আপনারা আপনাদের রাষ্ট্রীয় চার নীতির কোনটাই গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেননি আপামর জনসাধারণের কাছে। বাংলাদেশ বলতে ঢাকা, চিটাগাং বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি ৬৪ হাজার গ্রাম যেখানে বাস করে ৯৫% লোকজন। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এ দেশের গণমানুষের কতটুকু উপকার করবে তা জানি না তবে অল্প বিদ্যায় যতটুকু বুঝি এ দেশের লোকজনকে নজর আন্দাজ করার অবকাশ নেই। উপর থেকে তাদের উপর জোর করে কিছুই চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মানুষ রক্ত মাংসের গড়া। তার জৈবিক এবং বাচাঁর চাহিদার পাশাপাশি মনের এবং আত্মিক চাহিদাও রয়েছে। মানুষ মেশিন নয়। এ সত্য বাদ দিয়ে কিছু করলে সেটা হবে নেহায়েত ক্ষণস্থায়ী। থাক, তা আপনি বলুন আপনার রাজনৈতিক পরিকল্পনা কি? আপনি একজন সুশিক্ষিত সৎ ব্যক্তি। আপনার রাজনৈতিক দর্শনের সাথে একমত না হলেও এতটুকু আস্থা রাখতে পারেন, আমরা আপনাকে একজন ভাল মানুষ বলেই মনে করি। আর একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত আমাদের জন্য যদি কিছু করে থাকে তবে সেটা তার স্বার্থেই সে করেছে। তবুও আমরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জাতি হিসাবে। কিন্তু ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করে আমাদের সহায়ক শক্তি হতে পারে? সেটাতো তাদের নিজস্ব স্বার্থের পরিপন্থী। এদের প্রতি আপনি দুর্বল এ কথা সবাই জানে। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকেই আপনার অভিমত আমরা জানতে চাই। আর সমাজতন্ত্রের দর্শন অনুযায়ী এটা কায়েম করা যায় শুধুমাত্র সর্বহারা দলের নেতৃত্বে। আপনার দল কোনটি সেটাও আমাদের জানা দরকার। গম্ভীরভাবে আমার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন জনাব তাজুদ্দিন। রাজনীতি নিয়ে এটাই ছিল আমাদের প্রথম বিশদ আলোচনা।

-রাজনৈতিকভাবে আপনারা সবাই কি এতটা সচেতন?

-সবাই বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা জানি না, তবে সেনাবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ রাজনৈতিকভাবে অবশ্যই সচেতন।

-খুব খুশি হলাম জেনে। **I can see some silver lining over the dark clouds.** সমাজতন্ত্রের নীতিতে আমি বিশ্বাসী। তবে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন পদ্ধতি সব দেশেই সেদেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই বের করতে হয়। ভারত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। তাদের দেশের অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের যে প্রভাব রয়েছে সেটা অবশ্যই সোভিয়েত মডেলের নয়। গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী দেশ ভারত নীতিগতভাবে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায়ও এ কথাই বলা চলে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব রকম সাহায্য করে চলেছে। রুশ বিরোধিতার মূলে কাজ করছে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের এ চক্রান্ত কি দেশের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনবে?

-দেখেন স্যার, আমি সে সমস্ত মানুষের মনোভাব আপনাকে জানিয়েছি যারা সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দু'টো শব্দ ঠিকমত উচ্চারণও করতে পারে না; বোঝাতো দূরের কথা। এ সমস্ত আলোচনাতো শহুরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি সমাজের মাঝেই সীমিত। তারা জনগণের ১ কিংবা ২%ও নন। আমরা মনে করি ভারত প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক দেশ নয়। গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সেখানে গত ২৫ বছর ধরে চলেছে এক পার্টির তথা এক পরিবারের শাসন। শ্রীমতি ইন্দীরা গান্ধী 'অখন্ড ভারত' নীতির বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অনেকেই তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু আজ কিছুতেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন স্বনির্ভর দেশ হিসাবে **viable** হয়ে উঠুক সেটা ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার কোনমতেই সমর্থন করতে পারে না। পরিবর্তে তারা চেষ্টা করবে আমাদের অর্থনীতিকে ভারতের অর্থনীতির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আমাদের উপর তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে। মানে আমাদের অবস্থা হতে হবে ভুটান বা সিকিমের মত। এতে করে ভারতের অভ্যন্তরে কেন্দ্রিয় শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গার আজ জ্বলে উঠেছে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া যাবে যে, স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপমহাদেশের কোন জাতির পক্ষেই আজ স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। ভারতের আজ্ঞাধীন হয়েই বেচে থাকতে হবে তাদের। বাংলাদেশকে সব ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভরশীল

করে তুলতে পারলে ঐ সমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়বে। আর আমরা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের বুকে দাড়াতে সক্ষম হই তবে সেই সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অঙ্গার দাবানলে পরিণত হয়ে ভারতকে টুকরা টুকরা করে ফেলবে অল্প সময়ের মধ্যেই। 'অখন্ড ভারতের' স্বপ্ন কর্পুরের মত উড়ে যাবে। যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলগুলো আজ ভারতীয় কেন্দ্রিয় দুঃশাসনের নিষ্পেষনে জর্জরিত সেখানে তাদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলে আমাদের অবস্থা কি হবে? বরং অধুনাকালে ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা তৈরি আজকের ভারত যদি সনাতন রূপ পরিগ্রহ করে তবেই আমাদের লাভ। শুধু আমাদেরই নয় এ ভূ-খন্ডের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বারও লাভ। বর্হিঃশক্তির শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য উপমহাদেশের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে অখন্ড ভারত সৃষ্টি করার ফলেই আজ বিকশিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো। এই দ্বন্দ্বের অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব এ অঞ্চলে সত্যিকারের স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এর কোন বিকল্প নেই। ভারত একটি বহুজাতিক দেশ সেটাই বাস্তবতা। আমার বক্তব্য শুনে জনাব তাজুদ্দিন বললেন,

-ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

তার রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদের প্রতি ঈঙ্গিত করলেন তিনি। জবাবে আমি বলেছিলাম,

-জাসদ অবশ্যই আজ সরকার বিরোধী সংগ্রামে একটি অগ্রণী ভূমিকায় আছে। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথাও বলছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসা এ দল সৃষ্টিকারীরা সত্যিই কি সমাজতন্ত্রী? তাদের নেতৃত্বের প্রায় সবারই আগমন ঘটেছে বুর্জুয়া কিংবা পেটি বুর্জুয়া শ্রেণী থেকে। কতটুকু তারা নিজেদের De-class করতে সক্ষম হয়েছে সেটা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। ঠিক এই মুহূর্তে জাসদকে একটি সর্বহারার দল হিসাবে চিহ্নিত করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এভাবেই সেদিনের বৈঠক শেষ হয়। ভবিষ্যতে আবার আলোচনায় বসবো ঠিক করে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। তত্ত্বগত দিক থেকে জাসদের নেতৃবৃন্দেরও একটি অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলে মনে করত। তাদের ধারণা অনেকটা জনাব তাজুদ্দিনের মতই। মানে রুশ এবং ভারত বাংলাদেশের গণমুক্তি এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি। কিন্তু জাসদের সাধারণ সদস্যদের বৃহৎ অংশই ছিলেন ভারত বিরোধী। পরবর্তিকালে জাসদের অবক্ষয়ের জন্য অন্যান্য কারণের সাথে এই দ্বন্দ্বটিকেও একটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা চলে। নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ভারত নীতি নিয়ে দ্বিমত ছিল সেটাও আমরা জানতাম। সেদিন জাসদের সাথে জনাব তাজুদ্দিনের সম্পর্কের কথা জেনে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে দেখা দেয়। তবে কি জাসদ সত্যিই ভারতের 'বি' টিম? তাই যদি না হবে, তবে কোন যুক্তিতে জাসদ জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্ব মেনে নেবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হবে। নারায়ণগঞ্জে কর্নেল তাহেরের ওখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম একদিন। তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করার ফাকে জেনে নেবার চেষ্টা করলাম জনাব তাজুদ্দিনের সাথে জাসদের সম্পর্ক কি? তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানালেন যে, জনাব তাজুদ্দিনের সাথে জাসদের কোন সম্পর্ক নেই। এতে ঘটনা আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল। হয়তো কর্নেল তাহের এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না কিংবা জাসদের হাইকমান্ডের সাথে কোন গোপন বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে জনাব তাজুদ্দিন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন যা জাসদ নেতৃবর্গের অনেকের কাছ থেকেই গোপন রাখা হয়েছে। আমাদেরই আর একজন জাসদের জনাব শাহজাহানের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। জনাব শাহজাহানও একই জবাব দিয়েছিলেন, জাসদের সাথে জনাব তাজুদ্দিনের পার্টিগত কোন সম্পর্ক নেই।

কয়েকদিন পর জনাব তাজুদ্দিনের সাথে আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। সে বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা হয়। আমি গত বৈঠকের জের টেনে বলেছিলাম,

- বাংলাদেশের তিনটি জিনিস ভারত কখনো মেনে নিতে পারবে না:-

১.	বাংলাদেশে স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে উঠুক।
২.	বাংলাদেশে একটি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হোক।
৩.	পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা এক হয়ে একটা ভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হোক।

এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলে জনাব তাজুদ্দিন বলেন,
–ভারত উপমহাদেশ তুলনামূলকভাবে একটা পরাশক্তি; এ সত্যকে পরিহার করলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই ভারতের সাথে একটা সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজিয়ে চলতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ তিনি নেপালকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,
–নেপালের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বহুলাংশে নেপাল অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল তাই বলে নেপালের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপরতো ভারত হস্তক্ষেপ করেনি। জবাবে আমি বলেছিলাম,
–নেপাল একটি হিন্দু রাষ্ট্র। আমার জানামতে নেপালের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব অত্যন্ত প্রচন্ড। কিন্তু নেপাল ও বাংলাদেশ কি এক? বাংলাদেশ ১০কোটি মুসলমানের দেশ। এটাওতো একটা বাস্তব সত্য। এ জাতি সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে পাকিস্তানের শোষকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য; দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়ার জন্য নয়। অস্তিত্ব হবে সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থে স্বাধীন স্বকীয়তায়। সেটাই এদেশের জনগণের আশা ও অঙ্গীকার। জনগণের এ চেতনাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে পারলে ভারত যত বড় শক্তিধর হোক না কেন; আমাদেরকে সিকিম বানাতে পারবে কি? ১০কোটি লোককে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলে তাদের সংগঠিত করে যেকোন বর্হিশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে একটি দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিণত করে গড়ে তোলা অবশ্যই সম্ভব এবং সে চেষ্টাই কি করা উচিত নয় প্রতিটি দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকের?

এর জবাবে জনাব তাজুদ্দিন সাহেব কিছু বলেননি। তার সাথে দু’দিনের আলোচনায় একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল ভারত সম্পর্কে তার একটা বিশেষ দুর্বলতা কিংবা বাধ্যবাধকতা রয়েছে যার বাইরে তিনি যেতে পারছেন না। এই দুর্বলতা কিংবা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে তিনি কখনোই আমাদের কিছু বলেননি। পরবর্তী বৈঠকগুলোতে আমরাও তাকে আর বিব্রত করিনি ভারত সম্পর্ক উত্থাপন করে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বস্থানীয় অনেক নেতাই ছিলেন মুজিব বিরোধী

সেনা পরিষদের নেতাদের সাথে অনেক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাই মুজিবের শাসন পদ্ধতিতে হতাশ এবং বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। শাসনকার্যে ব্যার্থতা এবং গণবিচ্ছিন্নতার জন্য তারা যুবনেতাদেরকেই দায়ী করতেন। কিন্তু ঐ সমস্ত যুবনেতাদের দাপটের মুখে মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ কিংবা সাহস কোনটাই তাদের ছিল না। জনাব তাজুদ্দিনের পর তারা আরো অসহায় বোধ করতে থাকেন।

অন্যান্যদের মধ্যে খন্দোকার মোশতাক আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান, জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, জনাব এ আর মল্লিক, জনাব এম আর সিদ্দিকী, জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, জনাব রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া, জনাব আব্দুল মালেক উকিল, জনাব ফণীভূষন মজুমদার, জনাব মনোরঞ্জন ধর, জনাব ফরিদ গাজী, জনাব আব্দুল মান্নান প্রমুখ সেনা পরিষদের নেতাদের সাথে ব্যাক্তিগত পর্য্যায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

শেখ মুজিবকে কি করে 'জাতির পিতা' কিংবা 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যা দেয়া যায়?

শেখ মুজিবের ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি ফিরিয়ে নেয়া হয়।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ধরণের খেতাব অযৌক্তিক বলেই প্রমাণিত হয়।

‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি এবং তার আজীবন ডাকসুর সদস্যপদও বাতিল করা হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। ৩রা জানুয়ারী পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঘোষণা করেন, “দরকার হলে আরো রক্ত দেব। তবুও সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকারকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবই।” ঐ সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি সেলিম ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ থেকে শেখ মুজিবর রহমানকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এবং সদস্যপদ বই থেকে সংশ্লিষ্ট পাতাটি জনসভায় ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন।

রাজনীতির পরিহাস, ১৯৭২ সালের ৬ই মে এই ছাত্রনেতাই শেখ মুজিবর রহমানকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। জনাব সেলিম ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিও প্রত্যাহার করে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন, “সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারে শেখ মুজিবের ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি ব্যবহার করা চলবে না।” তিনি বাড়িতে, অফিস-আদালতে ও দোকানে টানানো শেখ মুজিবর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলারও আহ্বান জানান। একই দিনে বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মনি সিং বলেন, “বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অযোগ্য।” ২রা জানুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এক বিবৃতিতে বলেন, “পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী যুবলীগ ও বহু দেশপ্রেমিক গ্রুপ সহ জনগণের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিন্দা প্রকাশ করছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি জাতি আজ যখন ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগকে অভিনন্দিত করছে এসময় জনগণকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করে দিয়ে এক শ্রেণীর অরাজকতা সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদের ধারক ও ভাসানীর পরিচালনায় উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টিকারী আলবদর, রাজাকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্টের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছে। এই বিশেষ অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো তথাকথিত বিরোধী দলের ছদ্মাবরণে এমন আচরণ প্রদর্শন করছে যা খুবই উস্কানিমূলক এবং তারা দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র করছে বলে ধরে নেয়া যায়। এসব শক্তি সমাজতান্ত্রিক রীতি নীতির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে প্রহার ও একজনকে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে। তারা মোজাফফর ন্যাপের অফিসের সামনে ছাত্রলীগের একটি মিছিলের উপরও হামলা চালিয়েছে। তারা তেঁজগাও শিল্প এলাকা ও ঢাকেশ্বরী কটন মিলে খোলা অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়েছে। এমনকি ন্যাপ সভাপতি মোজাফফর আহমদের মতো লোকও ব্যক্তিগতভাবে একটি সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালাবার চেষ্টা করেছে।”

৩রা জানুয়ারী যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি সম্পাদিত বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ নিবন্ধে বলা হয়, “ঢাকায় ২রা জানুয়ারী পূর্ণ হরতাল পালনের নামে মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া, মেনন ও মাহাবুবউল্লাহ গ্রুপদ্বয় এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বহিস্কৃত অংশের কর্মী নামধারী ফ্যাসিবাদী গুন্ডারা মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও চকবাজার এলাকায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের উপর নগ্ন হামলা চালায়। পাটুয়াটুলী এলাকায় মোজাফফর ন্যাপের গুন্ডারা ছাত্রলীগের আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব মীর জাহানকে অপহরণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরদিন মুজিববাদী ছাত্রলীগ এই হত্যার প্রতিবাদে এক জঙ্গী মিছিল বের করে।”

৩রা জানুয়ারী কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে মুজিববাদী ছাত্রলীগ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভনীয় উক্তি উচ্চারণের জন্য ন্যাপ মোজাফফর, জাসদ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য হুশিঁয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, "যদি ক্ষমা না চাওয়া হয় তাহলে জনতা ৭ই জানুয়ারীর পর থেকে বাংলার মাটিতে ন্যাপ মোজাফফর, জাসদ ও ছাত্র ইউনিয়নের কোন জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেবে না।" তিনি আরো বলেন, "যেসব লোক মন্ত্রী হবার খায়েসে সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য সরকারের কাছে শতবার তোষামোদ করছেন, তারা এবং তাদের ছত্রছায়ায় থেকে ছাত্র ইউনিয়ন আজ গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করার সাহস পাচ্ছেন।" তিনি ঘোষণা করেন, "আজ বৃহঃস্পতিবার ৪ঠা জানুয়ারী থেকে যে পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর নামের পূর্ণ মর্যাদা দেবে না সংগ্রামী জনতা বাংলার মাটিতে সেই পত্রিকার অস্তিত্ব রাখবে না।" তিনি আরো বলেন,"বঙ্গবন্ধুকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করা হয়েছে ডাকসুর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে। সুতরাং সেখানে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অন্য কারো নেই। বর্তমান ডাকসু যেহেতু ছাত্রসমাজের মতবিরোধী কাজ করছে এবং তাদের আস্থা ও ভালোবাসা হারিয়েছে তাই এই ডাকুস বাতিল।" ছাত্রনেতারা এই তৎপরতাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ইতিমধ্যে ডাকসু অফিসও তছনছ করে ফেলা হয়।

ঐ দিনই বাংলার বাণীতে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে, শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ফেলার দায়ে এক ব্যক্তির কান কেটে দেয়া হয়েছে। পরদিন ঐ একই পত্রিকা খবর ছাপে যে, একই কারণে রংপুরে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের ধারকদের চার নীতির উপর তৈরি 'মুজিববাদ' ছিল একটা জগাখিচুড়ি।

ঐ সমস্ত স্ববিরোধী নীতিসমূহ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত নীতিগুলোকে তুলে ধরা হল পাঠকদের সুবিধার্থে।

ভারতে দাসখত লিখে দিয়ে, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র গলধঃকরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগ সরকার স্ববিরোধী ঐ চার নীতিকে শাসনতন্ত্রের চার স্তম্ভে পরিণত করে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখিত গণবিরোধী নীতিগুলোর ককটেল ফর্মুলা দিয়ে দেশ শাসন করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ও সুষম সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টার ফলে দেশ ও জাতির অবস্থা কি হয়েছিল সেটা অনুধাবন করার জন্য নীতিগুলোর কিছুটা বিশ্লেষন দরকার। জনাব তোফায়েল আহ্মদের দাম্ভিক বক্তব্য, "সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র একসাথে কায়েম করে মুজিববাদকে বিশ্বের তৃতীয় রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।" এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী বলতে হয়, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দু'টো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দর্শন। গণতন্ত্রে মূল প্রেরনা এসেছে মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে। **"Man is born free and shall die free."** রাষ্ট্রকাঠামোর **Basic structure that is economics** এবং **super structure that is politics** এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের থাকবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, থাকবে তাদের মেধা ও কর্মশক্তির বিকাশের অবাধ পরিবেশ, থাকবে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। এ নীতির উপরই গড়ে উঠেছে পশ্চিমা দেশগুলোর ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও তাদের কৃষ্টি এবং সভ্যতা। বিকশিত হয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গণতান্ত্রিক সভ্যতার **anti thesis** হিসেবেই কার্ল মার্কস উপস্থাপন করেন সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শন। ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরনের **Transitionary phase** -কে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক অধ্যায়। সমাজতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য কেড়ে নেয়া হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা। জাতীয় পরিসরে চাপিয়ে দেয়া হয় একটি বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্ব। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে উৎপাদন যন্ত্রগুলোর ভাগ্য বিধাতা হয়ে উঠেন দলীয় নেতারা। উৎপাদন শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের সব সম্ভবনা ও পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। **Incentive** হীন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের মাত্রা কমে যায়। অস্বাভাবিকভাবে মানুষকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালানো হয় যন্ত্রে। যান্ত্রিক জীবনের বিভীষিকার চাপে জনগণের কর্মস্পৃহা লোপ পায়। সাধারণ জনগণের শ্রমের ফলে অর্জিত সম্পদের ভোগী হয়ে উঠেন রাজনৈতিক পার্টির নেতারা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আমলাতন্ত্র। জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান কমে যায় ক্রমান্বয়ে। ফলে ঘনীভূত হয়ে উঠে সামাজিক ক্ষোভ। তারই বর্হিপ্রকাশ সামাজিক বিপ্লবের স্রোতে ঠুনকো তাসের প্রাসাদের মত ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের নিঃসাড়তা আজ বিশ্ব পরিসরে প্রমাণিত হয়েছে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বিপর্যয়ের ফলে। সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতারা আজ সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আস্তাকুড়েঁ ফেলে দিয়ে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির নীতিকে গ্রহণ করে অতীত ভুলেরই শুধু প্রায়শ্চিত্ত করছেন তা নয়; তারা এটাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছেন গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলে সমাজতন্ত্রকে বর্জন করাটা হয়ে উঠে অপরিহার্য। এ দু'য়ের সহাবস্থান বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। প্রতিটি মানুষ তার আপন স্বাতন্ত্রে বিকশিত। এ প্রাকৃতিক নিয়মকে মেনে নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দর্শন। তাই আজও মানুষের কাছে আবেদন রয়েছে এ দর্শনের। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নিয়মকে অস্বীকার করে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা এবং যন্ত্র হিসেবে মূল্যায়ন করার ফলেই সমাজতন্ত্র দর্শন হিসেবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জনগণ ও ঠিক

একই কারণে মেনে নেয়নি সমাজতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া নীতি। বিশ্বাস করেনি আওয়ামী লীগের জগাখিচুড়ী মুজিববাদী আদর্শের ভাওতাবাজী।

এবার আলোচনা করা যাক ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার আক্ষরিক মানেটা আজ অব্দি আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যদি বোঝানো হয় সব ধর্ম থেকে সমদূরত্ব বজিয়ে চলা, তাহলে সেটা হয়ে পড়ে ধর্মহীনতারই শামিল। বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও প্রতিটি মানুষ কোন না কোন আদর্শ এবং বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই বেঁচে থাকে। তারা বাঁচার উৎপ্রেরনাও পেয়ে থাকে সে সমস্ত বিশ্বাস এবং আদর্শ থেকে। কেউ কি কোন আদর্শ কিংবা বিশ্বাস ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবনধারণ করতে পারে? হয়তো বা পারে। তবে আমার জানা মতে তেমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাত আজঅব্দি আমি পাইনি। বিশ্বাস অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন:- ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবতাবাদ, এথিজম বা নিরশ্বরবাদ, এনিমিজম, পৌত্তলিকতাবাদ প্রভৃতি। যে যাই বিশ্বাস করুক না কেন সেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। প্রত্যেকের কাছে তার বিশ্বাস তার জীবন ধর্ম। রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা জণগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার অর্থ দাড়িয়েছিল জনগণকে তাদের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস থেকে জোর করে নিরপেক্ষ রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এ ধরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সরকারিভাবে শাসনতন্ত্রের স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসের অবমাননা করেছিল। বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনতা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এ অবমাননা কিছুতেই মেনে নেয়নি। প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে এ দেশের মানুষ চিরকাল। তাছাড়া ধর্মীয় সহনশীলতার এক গৌরবময় ঐতিহ্য বাংলাদেশী জনগণ আদিকাল থেকে বহন করে এসেছে। উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধর্মীয় আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক হিংসাত্বক হানাহানি এমনকি ধর্মীয় যুদ্ধও হয়েছে। বর্তমান ভারতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে বিভিন্ন ধর্মের সম্প্রদায় শান্তিতে বসবাস করেছে যুগ যুগ ধরে, নির্ভয়ে, আপন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে। এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গৌরব। এ গৌরবকে কলুশিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে কায়েমী স্বার্থ এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে অনেকেই। কিন্তু তাদের সব চক্রান্তই ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলাদেশের সচেতন জনতা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়। ধর্ম বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই নয়, ধর্ম হচ্ছে তাদের জীবন আদর্শ (Way of Life)। তারা মনেপ্রানে ধার্মিক কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ইসলাম ধর্মের অনুশাসন তাই তারা পালন করে বিচার বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মালম্বীদের ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে শুধু তাই নয়; সংখ্যালঘু ধর্মালম্বীদের প্রতি মুসলমানদের কিংবা মুসলমান রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব সে সম্পর্কেও পরিষ্কার নির্দেশ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। সে অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করা ছিল নিঃপ্রয়োজন। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের জীবনধারার আলোকে প্রণীত হবে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র এটাই ছিল জনতার আশা ও আকাঙ্খা।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই জাতীয় পরিচিতি এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে শোরগোল তুলল। কিন্তু তারা পূর্বতন ঐতিহাসিক বাংলাদেশের এই মানবগোষ্ঠির জাতীয়তার মূল ও ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই বলল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সুযোগে অনেকেই আবার সরবে মেতে উঠল। তারা বলে বেড়াতে লাগল, "মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিল এবং পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল, সেই দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে।" অর্থাৎ পক্ষান-রে তারা এটাই বলার চেষ্টা করল যে, ১৯৪৮ সালে ভারত বিভক্তি অন্যায়ভাবে করা হয়েছিল।

এ ধরণের উক্তি নেহায়েত অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ধরণের বক্তব্যে অখন্ড ভারতের প্রবক্তাদের প্রচারণারই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকালে কংগ্রেস অনুসৃত অখন্ড ভারত এবং মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ব এই বিষয় দুইটির একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

প্রাগঐতিহাসিক যুগ থেকেই এই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে বসবাস করে এসেছে। শুধুমাত্র বহিরাগত বিজাতীয় শক্তিরাই তাদের শোষণ পাকাপোক্ত করার জন্য অস্ত্রের বলে দেশীও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই উপমহাদেশে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। বৈদিক যুগে আর্য্য ভাষীদের আগমনের কাল থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশবাদের শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস ঘাটলে এই সত্য অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

আদিকালের বর্ণ হিন্দুরা রামরাজ্য কায়েমের ধুঁয়া তুলে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি আফগান এবং মুঘল শাসকরাও। একমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই আধুনিক উচ্চুতর মানের সমরাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বদৌলতে পুরো উপমহাদেশকে একটি প্রশাসনিক রাষ্ট্রের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব যুক্তিসঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, একক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক।

উনিশের দশকে বৃটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির আন্দোলন যখন দানা বেধেঁ উঠছিল তখনই পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় দীক্ষিত বর্ণ হিন্দুদের নেতৃত্বে সৃষ্টি করা হয় কংগ্রেস পার্টি বৃটিশ প্ররোচণায়। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতি সত্বার স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করে বৃটিশ সৃষ্ট Indian Union -কে অটুট রেখে স্বাধীনতার পর তাদের ক্ষমতায় বসানো। এর ফলে বর্ণ হিন্দুরা দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন অখন্ড ভারতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাদের প্রতি বৃটিশ সহযোগিতার কারণ ছিল মূলতঃ দু'টি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উপমহাদেশ দখল করতে হয়েছিল মুসলমানদের বিরোধিতার মুখে। ফলে মুসলমানরা হয়ে উঠে তাদের চোখের বালি। প্রতিহিংসার রোষানলে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের ঘৃনা ও সন্দেহ করতে থাকে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা বৃটিশদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সাহায্যই করেছিল মুসলমানদের পরাস্ত করে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে। পুরস্কার স্বরুপ মুসলমানদের ধনসম্পদ হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে বৃটিশ অনুকম্পা ও মদদপুষ্ট হিন্দুরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। মুসলমানরা হয়ে পরে নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন। সুদীর্ঘ দুই'শ বছরের বৃটিশ গোলামীর ইতিহাসে হিন্দু সম্প্রদায় বরাবরই ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির সহযোগী মিত্রশক্তি আর মুসলমানরা পরিণত হয় নিগৃহ ও করুণার পাত্রে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ধ্যানধারণায় গড়ে উঠা উচ্চবিত্ত বর্ণ হিন্দু সমপ্রদায়ের আনুগত্য সম্পর্কে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠি ছিলেন নিশ্চিত (Convinced)। তাই তারা চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ঐ শ্রেণীকেই অধিষ্ঠিত করতে, যাতে করে সমগ্র উপমহাদেশে তাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখা সম্ভব হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কংগ্রেসকে জাতীয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি ছিল তাদের সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাবিদার বানাবার পূর্বশর্ত। সেটা অর্জন করার জন্য ধর্মীয় চেতনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। অতি কৌশলে 'বন্দে মাতরম', 'ভারতমাতা', 'হিন্দুস্তান', 'জয় হিন্দ' ইত্যাদি শ্লোগান তুলে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করে কংগ্রেসকে একমাত্র জাতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন 'নব্য চানক্যরা'। but every action has an equal and opposite reaction. বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলনের গায়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কংগ্রেস যখন হিন্দু ধর্মের নামাবলী একতরফাভাবে চাপিয়ে দিল তখন সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠিগুলো নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে শংকিত হয়ে হয়ে উঠে।

এই অবস্থায় উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার হয়ে জোর আন্দোলন গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষাপটেই কংগ্রেসের মোকাবিলায় মুসলমানদের দাবিকে রাজনৈতিক রূপ দেবার জন্যই গঠন করা হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের অখন্ড ভারত তত্বের মোকাবিলায় মুসলিম লীগ প্রচার করেছিল দ্বি-জাতি তত্ব। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান, এই দু'টো দাবিতে হিন্দু-মুসলমান এই দুই ধর্ম গোষ্ঠির মেরুকরণ ভয়াবহ সংঘাতের রূপ ধারণ করে। সংঘর্ষে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটে দু'পক্ষেই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হয়েছিল বৃটিশ সরকারকে। তর্কের খাতিরেও যদি ধরে নেয়া হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা দ্বি-জাতি তত্বকে খন্ডিত করেছে তবে যুক্তিগত কারণেই মেনে নিতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অখন্ড ভারত তত্বকেও খন্ডিত করেছে একইভাবে।

কিন্তু আমার মনে হয় ১৯৭১ সালে দ্বি-জাতি তত্বের অসাড়তা নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত একটি বহুজাতিক দেশ। একই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র বিশেষ একটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে কোন জাতিসত্বা গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে মূল ভূ-খন্ড, ভাষা, নৃ-তাত্বিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধও একইভাবে প্রভাব রাখে। নিদির্ষ্ট ভূ-খন্ডে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি, সমপ্রদায়, জাত, কুল নির্বিশেষে যখন কোন জনগোষ্ঠি এক সামগ্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তখনই জাতীয়তাবাদ প্রাণ পায়। জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এক ধরণের অনুভূতি, এক ধরণের মানসিকতা, এক ধরণের জাগ্রত চেতনা, যার সৃষ্টি হয় জনসমষ্টির প্রবাহমান ঐতিহাসিক জীবনধারায়। জাতীয় সংগ্রামের ধারায় গতিশীলতা অর্জন করার জন্য কখন কোন উপাদানটা বিশেষ ভূমিকা রাখবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সময়, বাস্তব পরিস্থিতি, জনগণের প্রত্যাশা এবং নেতাদের উপর।

অতীত সম্পর্কে গৌরববোধ, বর্তমানের উপভোগ বা বঞ্চনা আর ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করে এবং জনমনে গড়ে তোলে ঐক্যবদ্ধ সুরের মূর্চ্ছনা। এ ধরণের ঐক্যবদ্ধ চেতনা যখন কোন জনসমষ্টিকে একত্রিত করে তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। সামগ্রিক সত্বা হিসাবে তা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হয় আর তারই ফলে একটি জাতি সবরকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আদর্শিক ও দৈহিকভাবে প্রস্তুত হয়।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এখনও প্রচুর বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ বিভ্রান্তিকে আরো জটিল করে তুলেছেন তাদের ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য। এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বুদ্ধিজীবিদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তাও প্রায় অনুপস্থিত। পরিষ্কারভাবে সত্যকে আমাদের জানতে হবে। আমাদের জাতীয়তাবাদ কি? বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? না বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ?

প্রাচীন বঙ্গ অববাহিকা ও তৎসংলগ্ন ভূ-ভাগ যে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি প্রাচীন এবং সুপরিচিত স্ব-বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল অঞ্চল ছিল তার অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে বিধৃত রয়েছে। (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০-১০০০ সালের মধ্যে) ঐতরেয় অরণ্যকে বঙ্গের কথা রয়েছে। মহাভারত ও হরিবংশেও দেখা যায় বঙ্গ প্রসঙ্গ। সুতরাং বঙ্গ জনপদকে নেহায়েত অর্বাচীন বলে আখ্যায়িত করার কোন কারণ নেই। রামায়নেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন জনপদ হিসেবে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এ দেশের দু'কুল পাত্রোর্ন ক্ষৌম কার্পাসিক বস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বলেও কৌটিল্য বয়ান করেছেন। বরাহ মিহির (৫০০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তার বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ অর্থাৎ বঙ্গ দেশ, পরবর্তিকালে বাংলাদেশের অর্ন্তগত যে কয়টি জনপদের নাম করেছেন সেগুলো হল: হরিকল, গৌতক, পৌন্ড্র, বঙ্গ, বর্ধমান, তাম্রলিপ্তি, সমতট

ও উপবঙ্গ। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোর, খুলনা সংলগ্ন দক্ষিন বঙ্গের কিছু অংশকে উপ-বঙ্গরূপে শনাক্ত করেছেন। এ ছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের আর একটি প্রাচীন জনপদ সুহ্মের কথাও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের এবং আদিকালের বঙ্গ দেশের পশ্চিম এলাকার নাম ছিল সুহ্ম, অঙ্গ, বর্তমান মিথিলা ও কলিঙ্গ উড়িষ্যা প্রদেশের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তথা বঙ্গ দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

হিম যুগের পর থেকে বাংলাদেশ কখনও জনশূন্য থাকেনি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মানবগোষ্ঠির মতো বাংলাদেশেও আদিম মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল। কারণ, এখানেও প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর এবং তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোদ, বাউড়ী, কোল, ভীল, মুন্ডা, সাওঁতাল, সাবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল, রাজবংশী সমুদয় অন্তজ জাতির সমষ্টিই বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভাষার ও আকৃতির মূলগত ঐক্য হতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় জাতি একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠির বংশধর। এই মানবগোষ্ঠির সাথে অষ্ট্রেলিয়ার অদিবাসীদের চেহারার এবং ভাষার মিল পাওয়া গিয়েছিল বলে এদের বলা হয় অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক।

বাংলাদেশের দোরগোড়ায় রাজমহল পাহাড়। সেখানে বন-জঙ্গলের অধিবাসী পাহাড়ীদের ছোট্ট-খাট্টো গড়ন, চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো, নাক থেবড়া। বেদ এবং নিষাদে যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হুবহু মেলে সিংহলের ভেড্ডাদের। ফলে এদের নৃ-তাত্বিক নাম হয় ভেড্ডিড। নিষাদ জাতি বলেও তারা আখ্যায়িত হয়েছে। প্রাচীন বাংলাদেশের নানা জায়গায় নানারকম পরিবেশে এবং জল হাওয়ায় নানান দলে ভাগ হয়ে মানুষ বসবাস করত। পরে তাদের রক্তে বহিরাগতদের নানা রক্তের ধারা এসে মিশেছে। বাচঁবার আলাদা আলাদা ধরণের দরুন এবং রক্তের মেশামেশি হওয়ায় স্থানভেদে চেহারায় নানারকম ধাঁচ সৃষ্টি হয়েছে। মনের গড়নে, মুখের ভাষায়, সভ্যতার বাস্তব উপাদানে তার প্রচুর ছাপ আছে। বাংলাদেশের মাটির গুন আর সেই মাটিতে নানা জাতের মেলামেশা এরই মধ্যে বাংলাদেশী জনপ্রকৃতির বৈচিত্র আর ঐক্যের গোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীগন আর্য্য জাতির বংশগত নন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষন করে পন্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। উপরন্তু দ্রাবিড় বা আর্য্য আসলে নরগোষ্ঠির নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠির নাম মাত্র। একই নরগোষ্ঠির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার চলন থাকতে পারে। কাজেই শুধুমাত্র ভাষা দিয়ে কোন নরগোষ্ঠির নামকরণ সঠিক নয়।

আসমুদ্রহিমাচল আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ। প্রশ্ন দেখা দেয় বাংলা অথবা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তি হল কি করে? বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সমস্ত শব্দের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। জনাব আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা হল:- প্রাচীন বঙ্গ শব্দের সাথে আল শব্দ যুক্ত করে সুলতান শামসুদ্দিন বাঙ্গালী শব্দের চয়ন করেন। আল শব্দের অর্থ পানি রোধ করার ছোট-বড় বাঁধ। অন্যদিকে সুকুমার সেনের অভিমত হল প্রথমে বঙ্গ থেকে বাঙ্গালাহ্‌র সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম শাসন আমলে পারসিক বাঙ্গালাহ্‌ উচ্চারণ থেকে পুর্তুগীজরা বানিয়েছে বেঙ্গল এবং ইংরেজদের হাতে পড়ে বঙ্গ পরিণত হয়েছিল বেঙ্গলী বা বাঙ্গালীতে।

বাংলাদেশী জনগণের বাসভূমির রয়েছে একটি ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সীমানা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সীমা সংক্ষেপে বলতে গেলে, উত্তরে হিমালয় ও তার গায়ে নেপাল, সিকিম ও ভূটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারভঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সীমান্তবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে গারো, খাসিয়া, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী বেয়ে দক্ষিনে সমুদ্র পর্যন্ত। পশ্চিমে রাজমহল, সাওঁতাল পরগনা, ছোট নাগপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলসমূহ, বিহারের বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, কেওঞ্জর, ময়ুরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। এই সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীন বাংলাদেশের বা বঙ্গের গৌড়, পুন্ড্র,

বারেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বাঙ্গাল, হরিকল প্রভৃতি জনপদ গড়ে তুলেছিল বঙ্গবাসী বা বাংলাদেশীরা। কোল, ভীল, শবার, পুলিন্দ, হাড়ী, ডোম, চন্ডাল, সাওঁতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, ভূমিজ, বাগদী, বাউড়ী, পোদ, মালপাহাড়ী প্রমুখ অস্তজ জনগোষ্ঠির মিলন এবং তাদের রক্তের সাথে বহিরাগত নানা রক্তের ধারা এসে মিশে এক হয়ে সৃষ্টি হয় বঙ্গবাসী অথবা বাংলাদেশী জাতিসত্বার। সময়ের স্রোতে রাষ্ট্র বিধাতাদের হাতে বাংলাদেশীদের আবাসভূমি বাংলাদেশ খন্ড-বিখন্ড হলেও তার ঐতিহাসিক প্রাকৃতিক সীমারেখা মুছে ফেলতে পারবে না কেউ কোনদিন। রাষ্ট্রীয় সীমারেখা অপরিবর্তনীয় নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাচীন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ জনপদগুলো গড়েছেন। রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন, জন্ম দিয়েছেন বিস্ময়কর সংস্কৃতি ও শিল্প ঐতিহ্যের। এ ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় অধিকার। আজ রাষ্ট্রীয় পরিসীমা এবং জাতীয়তাবাদ নিয়ে গোষ্ঠি স্বার্থে অযথা যতই যুক্তিহীন বিতর্কের অবতারনা করা হোক না কেন, বাংলাদেশের সচেতন জনগণকে বোকা বানিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা সম্ভব হবে না বেশি দিন। তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য এবং ন্যায্য অধিকার ভবিষ্যতে একদিন না একদিন আদায় করে ছাড়বেই ইনশাল্লাহ্। পূর্ণ মর্যাদায় একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত বাংলাদেশ এবং আমরাও বিশ্বের সামনে মাথা উচুঁ করে দাড়াতে সক্ষম হব গর্বিত বাংলাদেশী হিসাবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কোন কোন পর্যায়ে বাংলা ভাষা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এ কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বললে সেটা হবে বিভিন্ন নরগোষ্ঠির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাজার বছরের ঐতিহ্যে গড়ে উঠা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপর একটি ভাষাগোষ্ঠির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, বাঙ্গালী কোন নরগোষ্ঠির নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠির নাম মাত্র।

আমার প্রাণনাশের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

উত্তরবঙ্গে কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করতে যাবার সময় ঐ ঘটনা ঘটে।

১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধে সারিয়াকান্দী এবং ধুনটেতে তখন আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। একদিন আমার উপর দায়িত্ব পড়ল কিছু মেশিনপত্র নিয়ে প্রজেক্ট পরিদর্শনে যেতে হবে। স্বপন ব্যবসার কাজে দেশের বাইরে; নূরও বিশেষ একটা কাজে ঢাকাতেই আটকে পড়েছে; তাই বাধ্য হয়েই আমাকে ঐ দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ট্রাকে মাল ভর্তি করে রওনা হলাম। আমি নিজের গাড়িতেই যাব কারণ আমাকে তাড়াতাড়ি আবার ঢাকায় ফিরতে হবে অন্য আরেকটি কাজে। আরিচা ঘাটে পৌঁছে দেখি ফেরি বিভ্রাট। নগরবাড়ি ঘাটে পৌঁছালাম বেশ রাত করে। রাতে ড্রাইভ করা সেই সময় ছিল বিপদজনক। তাই ঠিক করলাম ঘাটেই রাতটা কাটিয়ে ভোরে রওনা দেব গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। প্রায়ই উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া-আসা করতে হয় নগরবাড়ি ঘাট দিয়ে। ঘাটের ছাপড়া বেড়ার একটা রেষ্টুরেন্ট বিশেষ পরিচিত। সবসময় এই রেষ্টুরেন্টেই খাওয়া-দাওয়া করে থাকি আমরা যাত্রাকালে। সেই সুবাদে মালিক হাজী সাহেবের সাথে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছে। আমাদের সবসময় বিশেষ খাতির-যত্ন করে পছন্দমাফিক টাটকা মাছ রেধে খাওয়ান হাজী সাহেব। হাজী সাহেবকে সমস্যাটা বোঝাতে বললাম, "হাজী সাহেব রাতটাতো এখানেই কাটাতে হয় আজ।" হাসিমুখে হাজী সাহেব জবাব দিলেন, "কোন অসুবিধা নাই স্যার। চকি একটা পাইতা দিমু; বিছানাপত্র বাসা থাইকা আইনা দিমু; মশারীও একটা লাগাইয়া দিমু।" রাতের খাবারের পর বাইরে বেরিয়ে দেখি আমার ট্রাক ড্রাইভার এবং অন্য সবাই টুয়েন্টিনাইন খেলছে ট্রাকের পাশেই। ঘুম আসছিল না; ভাবলাম ওদের সাথে কিছুক্ষণ তাসই খেলা যাক। অল্প সময়েই খেলা জমে উঠল। খেলা ভীষণ জমেছে; কখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে টেরও পাইনি। হঠাৎ করে ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনতে পেলাম কাছেই। নিরাপত্তার জন্য সবাইকে ট্রাকের নিচে শুয়ে পড়তে বলে নিজেও কাভার নিলাম। ট্রাকের নিচে শোয়া অবস্থা থেকে দেখলাম হাজী সাহেবের রেষ্টুরেন্টকে টার্গেট করেই দু'জন লোক একনাগাড়ে গুলি ছুড়ে চলেছে। পাশে দাড়িয়ে আছে একটা জিপ। মিনিট খানেক গুলিবর্ষণ করে লোক দু'টো জিপে উঠার পর জিপটা উত্তর দিকে চলে গেল। হাজী সাহেবের বাসা দোকানের কাছেই। গোলাগুলির আওয়াজ থামতেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিয়ে। আমরাও বেরিয়ে এলাম ট্রাকের নিচ থেকে। আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাজী সাহেব দৌড়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বেচারা নিজেকে সামলাতে না পেরে বাচ্চাদের মত কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "আল্লাহ্ মেহেরবান, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্।" সত্যিই আল্লাহ্ মেহেরবান। অন্যরা বুঝতে না পারলেও আমি আর হাজী সাহেব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম কি উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়া হয়েছিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে ট্রাক ড্রাইভার ও অন্যদের গন্তব্যস্থানে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। এই ঘটনার ব্যাপারে বিশেষ ঘনিষ্ঠমহল ছাড়া অন্য কারো সাথেই আলাপ করলাম না। এরপর থেকে নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া আমি ঢাকার বাইরে তেমন একটা যেতাম না। বাইরের কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব নূর ও স্বপনকেই নিতে হয়।

বাকশাল ছিল দু-মুখী অস্ত্র

শেখ মুজিব বাকশালের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেখ মনি এবং তার দোসররা চেয়েছিল বাকশালকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে।

দেশের এই দূরাবস্থায় শেখ মুজিবের ক্ষমতালিপ্সা বেড়ে গেল। ক্ষমতার চূড়ায় অবস্থান করেও তার সন্তুষ্টি ছিল না। রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা তার নিজ হাতে কুক্ষিগত করার জন্য তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি মূল উপাদান ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এর জন্যই হয়তো বা শেখ মুজিব এতদিন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। তার এই মনোভাব জানতে পেরে দলীয় সুবিধাবাদী গোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই শেখ মুজিব একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণা শুরু করেন। নভেম্বর ১৯৭৪-এ মস্কোপন্থী দলগুলোও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য আহ্বান জানায়। শেখ মুজিবের একান্ত বিশ্বস্ত তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর আলীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূতাবাসে ডেকে একদলীয় সরকার কায়েমের পরামর্শ দেয়া হয়। মনসুর আলী, শেখ মনি এবং মস্কোপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্ররোচণা এবং শেখ মুজিবের নিজের ক্ষমতাকে আরো বাড়িয়ে তোলার বাসনা ও রাষ্ট্রকে সবদিক দিয়ে তার এবং তার দলের অনুগত রাখার জন্য একদলীয় সরকার কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যখন সংসদীয় দলের মিটিং এ উত্থাপন করা হয় তখন প্রস্তাবটির বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন সংসদীয় দলের বেশিরভাগ সদস্য। এ অবস্থায় মিটিং এ বলা হয়- এই প্রস্তাব এর বিরোধিতা করা হলে শেখ মুজিব পদত্যাগ করবেন নতুবা একটি মেরুদন্ডহীন সংসদ সৃষ্টি করে এ প্রস্তাব পাশ করানো হবে। এই কথা শোনার পর মুজিবের ইচ্ছাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই সবাইকে মেনে নিতে হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী জরুরী আইন ঘোষণার মাত্র ২৭দিন পর দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে এক আদেশ জারি করলেন শেখ মুজিব। সারাজীবন যে শেখ মুজিব গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে এসেছিলেন তিনিই বাংলাদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র কায়েম করে সর্বপ্রথম স্বৈরাতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করেন। বাংলাদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে দেশের সকল বিরোধী দল বাতিল বলে গন্য হয়।

বাকশাল গঠন করার আগে শেখ মুজিব কোন পদ্ধতিই অনুসরন করেননি। সংসদীয় দলের মিটিংয়ে অনেকেই বাকশাল গঠনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ৫৫মিনিট বক্তৃতা করেন। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শেখ মুজিব প্রমাদ গুনেছিলেন। তার কারণ, এ বক্তৃতাকে সংসদ সদস্যদের বৃহৎ অংশ ঘনঘন করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানান। এই বক্তৃতার পর অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করা হয়। পরদিন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জনাব শামছুল হকও বক্তৃতা করার অনুমতি চান। কিন্তু তাদের সে অনুমতি না দিয়ে জনাব শেখ মুজিব গম্ভীর স্বরে সবাইকে বলেন, "আর বক্তৃতা নয়। তোমরা আমারে চাও কি না সে কথাই শুনতে চাই।" সবাই তার এ ধরণের বক্তব্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, সব সদস্যকেই এ প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে। তিনি আবার বললেন, "বলো, আমারে চাও কিনা?" এরপর তার বিরোধিতা করার সাহস আর কারো হল না। কিন্তু বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এরপরও তার বক্তৃতায় নির্ভয়ে বলেন, "আমরা ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে মুজিব খানকে চাই না।"

এরপর ২০শে জানুয়ারী বসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংগঠিত সেই কলঙ্কিত অধিবেশন।

২৫শে জানুয়ারী সংসদে কোন রকমের বির্তক ছাড়া গণতন্ত্রকে পুরোপুরি সমাহিত করে পাশ করানো হয় চতুর্থ সংশোধনী। মাত্র এক বেলার সেই অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন জনাব আব্দুল মালেক উকিল। এই আব্দুল মালেক উকিলই মাত্র তিন মাস আগে ১৬ই অক্টোবর সংসদ ভবনে পার্লামেন্ট সংক্রান্ত এক সেমিনারে বলেছিলেন, "আমাদের জনগণের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে।" তারই পৌরহিত্যে চালু হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার। বাতিল করে দেয়া হল সকল বিরোধী দল। পাশ করিয়ে নেয়া হল একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্টকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে শপথ পড়িয়ে নিলেন সেই আব্দুল মালেক উকিলই। ঐ চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সব মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা সংসদ সদস্য না হলে ভোট দিতে পারবেন না। প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদ সদস্য হবেন তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন, তবে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করলেন কি করলেন না সে সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ঐ অধিবেশনে 'জরুরী ক্ষমতা বিল' কোন আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়ে যায়। ২৫শে জানুয়ারী দুপুর ১:১৫ মিনিটে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারিকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়, "এই আইন প্রণয়নের পূর্বে যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না এবং রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন। এই আইন প্রবর্তনের ফলে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এমনিভাবে যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধিনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি ও একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার অধিনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে যে ক্ষমতা নির্ধারণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সেই ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে কিংবা সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন প্রধানমন্ত্রী ও আবশ্যক মনে করলে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করতে এবং কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারবেন তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হন তাহলে ভোট দান করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন অথবা তার নির্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংশোধিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা জাতীয় দল নামে অভিহিত হবে। সংশোধনীতে কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।" জাতীয় দলের ঘোষণায় বলা হয়, "কোন ব্যক্তি জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ভিন্ন ধারার কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।"

ঐ সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন। কেউ বিরোধিতা করেননি। সংসদের ২ঘন্টা ৫মিনিট স্থায়ী ঐ অধিবেশনে স্পীকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। বিলের বিরোধিতা করে তিনজন বিরোধী ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য ওয়াক আউট করেন। এরা হলেন জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, আব্দুস সাত্তার ময়নুদ্দিন আহমেদ ও স্বতন্ত্র সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আতাউর রহমান খান আগেই সংসদ অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। বিলটি উত্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগের দলীয় চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার প্রেক্ষিতে কোন

প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ না দেবার আহ্বান জানান। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান খান বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনার সুযোগ দানের জন্য স্পীকার জনাব মালেক উকিলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্পীকার তা নাকচ করে দেন। পরে কন্ঠভোটে চীফ হুইপের প্রস্তাব গৃহিত হয়। তারপর আইনমন্ত্রী মনরঞ্জন ধর সংসদে 'জরুরী ক্ষমতা বিল ১৯৭৫' পেশ করেন। চীফ হুইপ এ ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ বিধি প্রয়োগ না করার আবেদন জানালে বিষয়টি কন্ঠভোটে পাশ হয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রানিধানযোগ্য। যদিও বিলটি সংসদে বিনা বাধায় পাশ হয়; তবে গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কত্বের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যেও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

পরে জেনারেল ওসমানী ও জনাব ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তাদের সংসদ সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের এই পদক্ষেপে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। বাকশাল গঠনের পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভেবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য অন্য কেউই দায়ী নন। স্বয়ং শেখ মুজিবই হত্যা করেছিলেন গণতন্ত্রকে। দেশে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বাকশাল গঠনের দিন অনেকেই বলেছিলেন, "শেখ মুজিব নিজেই আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিলেন স্বীয় স্বার্থে।" বাকশালের জগদ্দল পাথর বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর এভাবেই চেপে বসল। এ পাথরকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত মানুষের নিস্তার নেই। এর পরই সরকারি আদেশ জারি করে আইন বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক স্বাধীকার ছিনিয়ে নেয়া হয়।

আওয়ামী লীগের খন্দোকার মোশতাক এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবশালী নেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীন অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ সমস্ত তথ্যগুলো ছিল আমাদের পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। আমরা জানতে পেরেছিলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখরাই ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে কট্টর রুশ-ভারতপন্থী। বাকশালী একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, নজরুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক, মনসুর আলী, সেরনিয়াবাত, সৈয়দ হোসেন, মনি সিং এবং প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার জন্যই শেখ মুজিব এ সমস্ত উচ্চাভিলাসী নেতাদের প্রভাব ও পরামর্শ মেনে নিয়ে গণতন্ত্রের বলি দিয়ে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগের বৃহৎ অংশই মেনে নিতে পারেনি। শেখ মুজিবের ক্ষমতার প্রতাপের মুখে নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে সেদিন এরা প্রকাশ্য বিরোধিতা না করে নিরব থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবের এ সিদ্ধান্তের ফলে সংসদে সেদিন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দ ও সংসদ সদস্যেদের মাঝে। এদের অনেকেই বর্ষীয়ান নেতা খন্দোকার মোশতাকের সাথে আলোচনা করে এ ব্যবস্থার প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কোন পদক্ষেপ নিলে আওয়ামী লীগের এই বৃহৎ অংশের সমর্থন পাওয়া যাবে অতি সহজেই। তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানিয়ে সমর্থন করবেন এ ধরণের যে কোন পরিবর্তনকে। আর একটি বিষয়ও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠে সেটা হল আওয়ামী লীগের মধ্যে খন্দোকার মোশতাকের সমর্থন রয়েছে অনেক। তার ব্যক্তিগত প্রভাব ও জনপ্রিয়তা পার্টির নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে ১৫ই আগষ্টের মহান বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান

ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদকে বন্দী করা হয়। স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট এর আওতায় ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে তাকে বন্দী করা হয়।

রাজনৈতিক শূন্যতা এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে রাজনৈতিক দলগুলো যখন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল তখন ১৯৭৪ সালে দেশের কিছু বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা হয় **'Civil Liberties and Legal Aid Committee'**। মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে গঠিত হয়েছিল এই মোর্চা। বিরোধী দল ও প্রতিবাদী জনগণের উপর অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়ে উঠে এই কমিটি। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই কমিটির প্রথম সভায় শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, কবি, আইনজীবি, সাংবাদিক এবং সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীদের প্রতিনিধিগণ দাবি জানান :-

(১) শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী সমস্ত কালা-কানুন বাতিল এবং সরকার এর বিভিন্ন মহল কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ অগণতান্ত্রিক ও আইন বিরোধী।
(২) জরুরী আইন এবং স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।
(৩) রক্ষীবাহিনী আইন বাতিল করে অবিলম্বে তাদের নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
(৪) সকল রাজবন্দীদের অবিলম্বে শর্তহীনভাবে মুক্তি দিতে হবে।
(৫) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং
(৬) যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এবং হুলিয়া রয়েছে সেগুলো সরকারকে অবিলম্বে তুলে নিতে হবে।

অল্পসময়েই এই কমিটির উপর নেমে আসে সরকারি শ্বেত সন্ত্রাস। উদ্যোক্তাদের অনেকেই নির্যাতিত হন সরকারের হাতে।

২৩/১/১৯৯২ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে '৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসন প্রসঙ্গে জনাব মওদুদ আহমেদ বলেন, "১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পর ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে আমাকে বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দী করা হয়েছিল। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনতে পারেনি সেদিন। এই তোফায়েল সাহেবই রক্ষীবাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন। আর এই বাহিনীর হাতেই এ দেশের ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছে। সিরাজ সিকদারের হত্যার কথা আজো এ দেশবাসী ভুলে যায়নি। '৭২ থেকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট অব্দি আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল এ দেশের ইতিহাসে সবচাইতে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

ঘটনা প্রবাহের উত্তাল তরঙ্গ মুজিবকে ঠেলে দিয়েছিল নেতৃত্বের শিখরে

রাতারাতি অবমৃশ্যতার তমশ্যা থেকে আগরতলা মামলা শেখ মুজিবকে বানিয়ে দেয় কিংবদন্তীর নায়কে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট। তার রাজনৈতিক জিবনের দিকে তাকালে সে সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । নির্দ্বিধায় নিজের স্বার্থ উদ্বার করতে সবকিছুই তিনি করতে পারতেন। আগরতলা মামলা এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে এটা বহুলভাবে প্রচারিত করা হয়েছে যে শেখ মুজিবই ছিলেন প্রথম নেতা যিনি বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা সম্ভব। এবং তিনিই ছিলেন স্বাধীনতার মূল রূপকার। কিন্তু এর কোনটাই সত্য নয়।

সারা বাংলাদেশের মানুষকে জানানো হল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তথা বাঙ্গালী জাতিকে পাঞ্জাবী শোষণের হাত থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত করার স্বপ্নদ্রষ্টা নাকি ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু সেটা ঐতিহাসিক সত্য নয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবকে রাতারাতি কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছিল এতে কোন সন্দেহ না থাকলেও এর মূল রূপকার ছিলেন লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জাম হোসেন। এই অখ্যাত তরুণ নেভ্যাল অফিসারই প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের। পাঞ্জাবী শোষকদের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে; এটাও তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগদানের পরই। ১৯৫০ সালে তিনি মিডশিপম্যান হয়ে ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমীতে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফেরার পর কাজ আরম্ভ করেন। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রথমে মাত্র ২জন সহচর নিয়ে শুরু হয় তার বিপ্লবী কর্মকান্ড। কাজে হাত দিয়েই তিনি উপলব্ধি করলেন সবচেয়ে আগে দরকার একজন রাজনৈতিক নেতার। কারণ একজন সামরিক অফিসার হিসেবে চাকুরিতে থেকে ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ হবে না তার।

তাছাড়া শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীতে গোপন সংগঠন গড়ে তুললেই বিপ্লব করা সম্ভব হবে না। সংগঠন গড়ে তুলতে হবে দেশের জনগণের মধ্যে। তার জন্য প্রয়োজন বহুল পরিচিত একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। সুপরিচিত নেতার ডাকেই অস্ত্র হাতে তুলে নেবে কর্মীরা। তিনি যোগাযোগ শুরু করলেন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সাথে। কিন্তু বেশিরভাগ নেতারাই তার প্রস্তাবে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। যারা দিয়েছেন তারা জুড়ে দিয়েছেন বিভিন্ন শর্ত। তাদের গদি দিতে হবে। অনেকে তাকে পাগলও বলেছেন প্রস্তাব শুনে। ভয়ে আতঁকে উঠেছেন অনেক নামিদামী নেতা। ১৯৬৪ সালে তিনি শেখ মুজিবর রহমানের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন। শেখ মুজিব তার প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন, যতটুকু সম্ভব পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। এতটুকু পর্যন্তই এর বেশি কিছু নয়। ১৯৬৬ সালে কমান্ডার মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন। এতে তার তৎপরতা আরো জোরদার করার সুযোগ পান তিনি। ১৯৬৭ সালের জুন/জুলাই মাসে তিনি তার দুই প্রতিনিধি জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং জনাব আলী রেজাকে আগরতলাতে পাঠান ভারতীয় সাহায্যের আশায়। তার প্রতিনিধিদের সাথে ভারতীয় সরকারের আলোচনা তেমন ফলপ্রসু হয়নি। বিপ্লবী জনাব স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে স্বাধীনতার মাত্র একমাসের মধ্যে গুম করে ফেলা হয়। মুজিব সরকার কিংবা তার দল এ বিষয়ে বরাবরই এক রহস্যজনক নিরবতা অবলম্বন করে এসেছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে রাওয়ালপিন্ডি পাঠানো হয়। সেখানে পৌছে বিভিন্ন সূত্রে তিনি জানতে পারেন, পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স সন্দেহ করছে যে কমান্ডার মোয়াজ্জেম রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এই খবর জানতে পেরে ছদ্মনামে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ ঢাকায় চলে এসে তার ছোট ভাই এর সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িতে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকেন। ৯তারিখ রাত প্রায় ১১টার দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরিরত ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম শিশু (পরবর্তীতে 'জেনারেল রাজপুটিন অফ বাংলাদেশ') ও আরো কয়েকজন হঠাৎ করে বাড়িতে হানা দিয়ে কমান্ডার

মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি তখন শারীরিকভাবে অসুস্থ। নিয়ে যাবার সময় ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম জনাব মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী কোহিনূর হোসেনকে বলেছিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে তাকে ঢাকা ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘন্টা খানেকের জন্য। কিন্তু তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল ১৫ মাস পর। অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল তার উপর। দীর্ঘ ১৫ মাস অকথ্য অত্যাচার করেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ তার কাছ থেকে কোন কথাই বের করতে পারেনি। এর পরেই ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শুরু হয় বিখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ১নং আসামী কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। পরবর্তিকালে পাকিস্তানের অধিকর্তারা বুঝতে পারেন, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী বানানোর ফলে সারা বিশ্বের কাছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ভীষণ বদনাম হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এক ঢিলে দুই পাখি মারার। জড়ানো হয় শেখ মুজিবর রহমানকে প্রধান আসামী হিসাবে। পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক মতলব হাসিলের লক্ষ্যে মামলা শুরু হওয়ার পর কমান্ডার মোয়াজ্জেমের নাম ১নং আসামী থেকে কেটে ২নং আসামীর জায়গায় সরিয়ে নেয়। আর এভাবেই ঐ মামলা সাপে বর হয়ে মুজিবকে গড়ে তুললো কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে। '৬৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে মেরে ফেলা হল মিথ্যে অপবাদ দিয়ে। তিনি নাকি বন্দী অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনারই পূর্ণরাবৃত্তি ঘটেছিল মুজিব শাসনকালে বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদারের হত্যার মাধ্যমে। শেখ মুজিব সর্ম্পকে কমান্ডার মোয়াজ্জেম তেমন আকর্ষণ বোধ করেননি কখনোই। শেখ মুজিবের দলের উপরও তার আস্থা ছিল না। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের স্পষ্টবাদিতাকে শেখ মুজিব কখনই পছন্দ করেননি। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ভোর ৬টার দিকে হানাদার বাহিনী তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ির সামনে গুলি করলেও তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে; যার হদিস আজ অব্দি তার পরিবার পরিজন পাননি।

ধর্মপ্রাণ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। নির্ভীক এই মুক্তিযোদ্ধা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ছিলেন তার দেশ ও জাতিকে। সপেঁ দিয়ে গেলেন প্রাণ স্বাধীনতার জন্য। দেশ স্বাধীন হল। শেখ মুজিবর রহমান একচ্ছত্র নেতা বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেন, কিন্তু কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ত্যাগের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেননি তিনি। কখনো সত্যকে তুলে ধরেননি জনগণের সম্মুখে। চুপটি মেরে থেকে সব কৃতিত্ব নিজেই হজম করে গেছেন নির্বিবাদে।

আপোষহীন প্রতিবাদী কন্ঠের অধিকারীদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যই তাদের মেরে ফেলা হয় আর সুবিধাবাদী আপোষকামীদের সবসময় বাচিঁয়ে রাখা হয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। সে হিসেবেই ২৬শে মার্চ প্রাণ দিতে হয়েছিল কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে আর শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানে। এমনটি ঘটেছে সর্বদা, ঘটবে ভবিষ্যতেও। ইতিহাসও তাই বলে।

শেখ মুজিব নিজেই তার পতনের জন্য দায়ী ছিলেন। দুঃখজনক পরিণতির জন্যে অন্য কেউ নয়; স্বয়ং তিনিই দায়ী।

পৃথিবীর ইতিহাসে ক'জন নেতা দেশের মানুষের এত ভালোবাসা পেয়েছেন? কিন্তু পরিবর্তে তিনি জনগণকে আপন করে নিতে পারেননি। দুষ্কৃতিকারী কর্মী ও নেতারা তার কাছে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছে। পরিবারের অনেকের বিরুদ্ধে দুঃষ্কর্মের রিপোর্ট পেয়েও তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। কর্তৃত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণের জন্য তার চেয়ে অধিক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিসম্পন্ন কাউকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তার চরিত্রে ধৈর্য্যের অভাবও ছিল যথেষ্ট। ফলে তিনি পরীক্ষিত ও গুনবান যোগ্য সহযোগীদের কান কথায় বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে অপসারন করেন। তিনি এক পর্যায়ে আপন/পর, বিশ্বস্ত সহযোগী এবং নির্ভরশীল বন্ধু বিবেচনার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন। শেখ মুজিবের এই মানসিকতাকে তার রাজনৈতিক জীবনের চরম ব্যর্থতা ও পরিণতির জন্য একটি বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যুব নেতাদের দৌরাত্বে গোটা প্রশাসনযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। দেশে দুর্ভিক্ষ। প্রতিদিন হত্যার খবর শুনতে হয় মানুষকে। প্রকাশ্য দিবালোকে নির্বিচারে হত্যাকান্ড প্রায় প্রতিদিন সংঘটিত হয়েছে তখন। বিরোধী দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য রক্ষীবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া ছাড়াও দলীয় কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছিল। পুরো দেশ এভাবেই একটা সীমাহীন নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। যে মানুষ একদিন মুজিবের কারামুক্তির জন্য রোজা রেখেছে; নফল নামাজ আদায় করেছে; সেই মানুষই আওয়ামী-বাকশালী শাসনামলে আল্লাহ্পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে শেখ মুজিবের দুঃশাসন থেকে মুক্তি চেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের অপশাসন শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। বাকশালী একনায়কত্ব সৃষ্টি করে তিনি তার দলের মধ্যেও অন্তঃবিরোধ তীব্র করে তোলেন। তার এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি দলের অনেকেই।

বাকশাল গঠন করার আগে জোর প্রচারণা চালানো হল- শেখ মুজিব তার দল ও দলীয় কর্মীদের ক্ষমতার লোভ, লালসা ও দুর্নীতি সর্ম্পকে উদাসীন নন। তিনি বুঝতে পেরেছেন তার পার্টির চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এ পার্টি দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা আর সম্ভব নয়। তাই তিনি পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করে একদলীয় সরকার কায়েম করে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করতে যাচ্ছেন। লোকজন ভাবল, তার এই পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে কলুশিত লোকজন ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং সে জায়গায় নিয়োগ করা হবে ভালো লোকজনদের। কিন্তু সে আশা অল্প সময়েই কর্পুরের মত বিলীন হয়ে গেল। দেখা গেল পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করে তিনি যে বাকশাল গঠন করলেন সেখানে ক্ষমতাবলয়ে স্থান পেলো ধিকৃত গাজী গোলাম মোস্তফা, মনসুর আলী এবং শেখ মনি এন্ড গংরাই। তারাই হয়ে উঠল মুখ্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। যাদের অপকর্মের বদৌলতে আওয়ামী লীগ সংগঠন হিসাবে জনগণের আস্থা হারিয়েছিল; তাদের নিয়েই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' যাত্রা শুরু করলেন শেখ মুজিব। জনগণ হতাশ হয়ে পড়ল। পার্টি বিলুপ্ত করলেও চাটার দলকে বাদ দিতে পারলেন না শেখ মুজিব। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে আর একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ে পাকাপোক্তভাবে অধিষ্ঠিত করা হল তার পরিবারবর্গকে। ব্যাপারটা এমনই যেন- পুরো দেশটাই শেখ পরিবারের ব্যক্তিগত জমিদারী!

আমরা ঠিক করলাম, জাতিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে যে কোন ত্যাগের বিনিময়েই। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে মানবিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার। শুরু হল আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে সেনা পরিষদ গড়ে তোলার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। দেশের প্রতিটি সেনানিবাসের বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্টে সমমনা

অফিসার ও সৈনিকদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে গোপন সংগঠন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আগেই বিপ্লব ঘটিয়ে শেখ মুজিবের একনায়কত্ব ও বাকশালের পতন ঘটাতে হবে। বিপ্লবকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সাংগঠনিক তৎপরতা তরিৎ গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলে কেন্দ্রিয় কমিটি।

প্ল্যানিং ষ্টেজের এক পর্যায়ে একদিন লেঃ কর্নেল আব্দুর রশিদ খন্দোকার সেনা পরিষদের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে। মিটি-এ দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে লেঃ কর্নেল রশিদ অভিমত প্রকাশ করে যে, শেখ মুজিব যদি একবার পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতায় আসন গেড়ে বসে তবে তার স্বৈরাচারী সরকারের জোয়াল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করা খুবই দূরুহ হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দুর্বলতার কারণে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সে ও লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দোকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি বিকল্প সরকারের কথা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ ব্যাপারে সেনা পরিষদের নেতাদের অভিমত কি তা জানতে চায় লেঃ কর্নেল রশিদ। লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুক দু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা। সেই সময় লেঃ কর্নেল রশিদ ও লেঃ কর্নেল ফারুক যথাক্রমে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি ও ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারস এর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছিল। দু'টো ইউনিটই তখন ঢাকায়। দু'জনই সেনা পরিষদের নেতৃবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। তাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রশ্নে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই লেঃ কর্নেল রশিদকে সেনা পরিষদের সিদ্ধান্তের কথা খুলে বলা হল। সব শুনে লেঃ কর্নেল রশিদ প্রস্তাব রাখলো যৌথ উদ্যোগে অভ্যুত্থান সংগঠিত করার। তার প্রস্তাবে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলা হল, অভ্যুত্থানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সর্ম্পকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত রয়েছে সেনা পরিষদের। আলোচনা সাপেক্ষে সেগুলোতে ঐক্যমত্য হলেই সেনা পরিষদ তার প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। লেঃ কর্নেল রশিদ আলোচনা করতে রাজি হওয়ায় পরবর্তিকালে ঐ সকল বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সেনা পরিষদের তরফ থেকে লেঃ কর্নেল রশিদকে জানানো হয় বিপ্লবের পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানই হবেন চীফ অফ আর্মি ষ্টাফ। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেঃ কর্নেল রশিদ প্রস্তাব রাখে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দোকারকে অব্যাহতি দিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এমজি তোয়াবকে বিমান বাহিনী প্রধান হিসাবে নিয়োগ করার। তার এই প্রস্তাব সেনা পরিষদ মেনে নেয়। ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যৌথ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনা পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যাবলী ও নূন্যতম প্রোগ্রাম সম্পর্কে খন্দোকার মোশতাক সম্মতি প্রদান করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খবরা-খবর আদান-প্রদান ও যৌথভাবে বিপ্লবের কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এভাবেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফলে অভ্যুত্থানের সফলতার সম্ভবনা স্বাভাবিক কারণেই আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত (সেনাপরিষদ একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নেয়)

গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং দেশবাসীকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দেবার জন্য সেনা পরিষদ একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাকশাল কায়েমের ফলে দেশ এক চরম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর সব কয়টাই তখন নিষিদ্ধ এবং রাজনৈতিক তৎপরতাকে বলপূর্বক আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠেলে দিয়েছিল বাকশাল সরকার।

আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে দেশের নতুন পরিসি'তি নিয়ে মত বিনিময় করতে লাগলাম। জাতীয় অবস্থার পর্যালোচনা করে সবাই একমত হলাম, একদলীয় নিষ্পেষনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে অবিলম্বে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে গণতন্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার। বাকশালের শিকড় বাংলার মাটিতে প্রথিত হবার আগেই উপড়ে ফেলতে হবে। একনায়কত্বের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণকে মুক্ত করার সাথে সাথে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাদের সে সমস্ত দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি ও সামর্থ্য অত্যন্ত কম। স্বৈরশাসনের ষ্টিমরোলারের পেষণে তাদের আরো দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে দিন দিন। এ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সরকার বদল করার কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। শিকড় গেড়ে বসার আগেই একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক মহল থেকে অনেকেই ঈঙ্গিত দিলেন, সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক হলেই সম্ভব হবে এই একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতিকে মুক্ত করা। তাদের এ ধরণের ঈঙ্গিতের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম আমরা। যেখানে সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একনায়কত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় সেখানে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মাধ্যমেই উৎখাত করতে হয় স্বৈরাচারী সরকার। এর কোন বিকল্প থাকে না বলেই জনগণ স্বাগত জানায় ঐ ধরণের যে কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপকে। স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব অর্জন করে তার নৈতিক ও আইনগত বৈধতা। খন্দোকার মোশতাক আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রীমনা নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে একই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন বৈপ্লবিক উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বোতভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি এবং আরো অনেকেই। মোশতাক সাহেবের এ ধরণের উক্তির পেছনে আওয়ামী লীগের একটা বড় অংশের সমর্থন ছিল। ইস্তফা দেবার পর জেনারেল ওসমানীর সাথে দেখা করতে গেলে বাকশাল সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপের সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "মুজিব খানকে সরাতে হবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?"

এদিকে বাকশালী একনায়কত্ব স্থাপন করেও শেখ মুজিব তার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। সিদ্ধান্ত হল- তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা দেবে বাকশাল। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এক সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেয়ার কথা প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তাকে পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেটাতে শেখ মুজিব সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি বানাবার। আরো খবর পাওয়া গেল সমস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মাঝ থেকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় সরকার বিরোধী মনোভাবাপন্ন দুই লক্ষ লোকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা গভর্ণর ও তাদের অধিনস্থ রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে ঐ তালিকাভুক্ত লোকদের মেরে ফেলা হবে। এই নীলনকশা

বাস্তবায়িত করে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিবাদী কন্ঠকে আগামী কয়েক দশকের জন্য স্তব্ধ করে দিতে। এভাবে রাজনৈতিক বিপক্ষ শক্তিকে সমূলে উৎপাটন করার এক হীন চক্রান্ত করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশেই।

খন্দোকার মোশতাক আহমদ সম্পর্কে সেনা পরিষদের মূল্যায়ন

খন্দোকার মোশতাক আহমদ ছিলেন রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অধিকারী। বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই আমাদের নজরে পড়েন। রুশ-ভারত আধিপত্যবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি।

আমরা খন্দোকার মোশতাককে ’৭১ এর সংগ্রামকাল থেকে দেখে আসছি। তিনি ছিলেন ঘোর রুশ-ভারত বিরোধী। ধর্মপ্রাণ প্রবীণ নেতা খন্দোকার মোশতাক ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপোষহীন। একজন সাচ্চা গণতান্ত্রিক এবং উদারপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিলেন। আলাপ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের অনেকেই খন্দোকার মোশতাকের ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করে অভিমত পর্যন্ত ব্যক্ত করেছেন যে, নেতৃত্বের যোগ্যতার বিচারে খন্দোকার মোশতাকের স্থান শেখ মুজিবর রহমানেরও উপরে। তাদের এ ধরণের মনোভাব থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, খন্দোকার মোশতাকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হলে তারা অতি সহজেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বিপ্লবের পক্ষে স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জানাবেন। ফলে আওয়ামী বাকশালীদের বৃহৎ অংশকে শুধু যে নিউট্রালাইজ করাই সম্ভব হবে তা নয়; এতে করে বাকশালী যোগসাজসে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে যাবে। আওয়ামী-বাকশালী নেতাদের সমর্থন পেলে রক্ষীবাহিনীকে নিরস্ত্র করার কাজটিও সহজ হয়ে যেতে পারে। তার আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচন্ড। তিনি যে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তা নয়; তার পান্ডিত্যের গন্ডিও ছিল বিস্তৃত। রসিক এবং মিতভাসী জনাব মোশতাকের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল চমকপ্রদ। নীতি ও নিখাদ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন জনাব মোশতাক সেচ ও পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসাবে। ভারতীয় পক্ষের সব চাপকে উপেক্ষা করে তিনি বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে কোন ছাড় না দিয়ে অটল থাকেন; ফলে তাকে খেসারত হিসাবে মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়। শেখ মুজিব তাকে ঐ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেন।

এছাড়া পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতাবলয়ে একজন ধর্মপ্রাণ, উদারপন্থী, গণতন্ত্রীমনা রাজনীতিবিদ হিসেবে খন্দোকার মোশতাকের একটা ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। এ সমস্ত দেশের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের অনেকের সাথেই তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এই অবস্থায় খন্দোকার মোশতাক আহমদকে সরকারের রাষ্ট্রপতি বানালে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এবং মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর স্বীকৃতি ও সমর্থন আমরা সহজেই পেতে পারব। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিনে বেসামরিক সরকার গঠন করলে আমরা দেশে-বিদেশে এটাও প্রমাণ করতে পারব যে, বাংলাদেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে। স্বৈরশাসন ও রুশ-ভারতের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিস্তারিত বিশ্লেষনের পরই খন্দোকার মোশতাক আহমদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

সেনা পরিষদকে অনেক জটিল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কেও ভেবে দেখতে হয়েছিল নেতৃবৃন্দকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহিত তথ্যাবলী ও খবরা-খবরের ভিত্তিতেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সর্বপ্রথম ঠিক করতে হয়েছিল- কবে বিপ্লব ঘটানো হবে, কি পরিসরে সংগঠিত করা হবে বিপ্লব? খবর ছিল, ১৫ই আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ এবং কেন্দ্রিয় নেতারা ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সব বাকশালী নেতারাই উপস্থিত থাকবেন। নবনিযুক্ত জেলা গভর্ণররা এবং জেলা পর্যায়ের নেতারা ইতিমধ্যেই ঢাকা শহরে এবং শেরে বাংলা নগরের এমপি হোস্টেলে ভীড় জমিয়েছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ এবং স্পেশাল স্কোয়ার্ড। নেতাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য ছাড়াও শেখ মনি ও শেখ কামালের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অস্ত্রধারীরাও থাকবে অনুষ্ঠানে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ভার্সিটি এলাকায় টহল দেবার জন্য মোতায়েন করা হবে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন দু'জনেই ঘটনাক্রমে সেদিন দেশের বাইরে অবস্থান করবেন। ঐ দিনটি ভারতের স্বাধীনতা দিবস বিধায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনন্দ উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ভারত সরকার। ১৪-১৫ তারিখ এর রাত ঢাকা ব্রিগেডের নাইট ট্রেনিং এর জন্য নির্ধারিত।

১২ই আগষ্ট এক বৈঠকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিপ্লব সংগঠিত হবে ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেকে। যেহেতু বাকশালী নেতাদের প্রায় সবাই সেদিন ঢাকায় অবস্থান করবেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ঢাকাতে অপারেশন চালিয়ে বিপ্লবকে সফল করে তোলা সম্ভব হবে। সীমিত পরিসরে বিপ্লব ঘটালে বিপ্লবের সফলতার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তিনটি উপকরণ যথা:-

(ক) নূন্যতম শক্তির প্রয়োগ
(খ) গতিশীলতা
(গ) গোপনীয়তা

অতি সহজেই হাসিল করা যাবে। টার্গেট হিসাবে নির্ধারন করা হয় রাষ্ট্রপতি, শেখ ফজলুল হক মনি, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, সেরনিয়াবাত, সৈয়দ হোসেন, তাজুদ্দিন আহমদ, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক। এদের বন্দী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রেডিও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টিভি, ওয়্যারলেস সেন্টার, টিএন্ডটি, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর, রক্ষীবাহিনীর সাভারের মূল ক্যাম্প, সংসদ সদস্যদের হোষ্টেল, এয়ারপোর্ট, সাভার ট্রান্সমিশন-রিলে সেন্টার প্রভৃতি স্থানগুলো নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সীমিত পরিসরে নূন্যতম শক্তি প্রয়োগ করে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা হবে নির্ধারিত টার্গেটগুলোর উপর। একই সাথে দেশের অন্যান্য সেনা নিবাসের ইউনিটগুলোর সেনা পরিষদগুলোকে সর্তক অবস্থায় রাখা হবে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে; যাতে করে প্রয়োজনে যে কোন প্রতিবন্ধকতা কিংবা সীমান্তের ওপার থেকে কোনপ্রকার সামরিক হুমকির যথাযথভাবে মোকাবেলা করা যায় জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

কেন্দ্রিয় কমিটি '৭১ থেকে '৭৫ সাল অব্দি দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং বিপ্লব সর্ম্পকে একটি দলিল তৈরি করে সেনা পরিষদের সব ইউনিটে বিতরণ করে। দলিলের সারবস্তু ছিল নিম্নরূপ: -

রুশ সামাজিক সম্প্রসারণবাদ এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ১৯৭১এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল আপোষকামী শ্রেণীর প্রতিভূ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের যোগসাজসে বাংলাদেশকে তাদের একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগের প্রতারণা ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়ে উঠেছে অর্থহীন। স্বাধীকার ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতীয় সংগ্রাম নিক্ষিপ্ত হয়েছে ব্যর্থতার অন্ধ গলিতে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভ করে বটে কিন্তু জাতীয় মুক্তির পথ সুকৌশলে বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার ও তার বিদেশী প্রভুরা। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের শাসনামলের চার বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের এক চরম বিভীষিকাময় কাল। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, সম্প্রসারণবাদী নীলনকশা এবং ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠির ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্র, অবিচার, অত্যাচার এবং অবাধ দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে র্দুবিষহ। জাতীয় সম্পদের অবাধ লুন্ঠনের ফলে দেশের অর্থনীতি হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এবং দেশ আজ পৌঁছে গেছে চুড়ান্ত ধ্বংসের শেষপ্রান্তে। জাতীয় রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে চরম নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার দায়িত্ব স্বভাবতঃই বর্তায় প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উপর। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী শ্বেত সন্ত্রাস এবং সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মুখে সাংবিধানিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মুজিব সরকারকে উৎখাত করা তাদের পক্ষে আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরকারি নির্যাতন ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর অপারগতার মূল কারণ হল- তাদের অনৈক্য, তাত্বিক জ্ঞানের দেউলিয়াপনা, সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের কোন্দল এবং নেতাদের স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা। দেশ ও জাতি আজ এক চরম সংকটে নিমজ্জিত। স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে হতাশাগ্রস্থ জাতিকে মুক্ত করা আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিকের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয় বলেই এ গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করার অভিপ্রায়ে একটি জনপ্রিয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটাবার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সেনা পরিষদ। বিপ্লবের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণের উপর সামরিক শাসনের বোঝা চাপিয়ে দেয়া নয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে কিন্তু এভাবে সামরিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়ানোর পরিণামে সে সমস্ত দেশে উচ্চভিলাসী সামরিক শাসকবৃন্দের গোষ্ঠিস্বার্থই চরিতার্থ হয়েছে; জাতি ও দেশের কোন কল্যাণ হয়নি। কোন বিশেষ গোষ্ঠির স্বার্থ হাসিল করা আমাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়। এই বিপ্লবের চরিত্র হবে অন্যান্য দেশে সাধারণভাবে সংগঠিত যে কোন ক্যু'দ্যাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেনা পরিষদ দেশবাসী এবং সারাবিশ্বে প্রমাণ করবে- বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ দেশপ্রেমিক; ক্ষমতালিপ্সু, সুযোগ সন্ধানী নয়। অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনগণের রক্ষক হয়ে ভক্ষক বনে যাবার অভিপ্রায় তাদের নেই। দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নির্ভীক, নিবেদিত প্রাণ সৈনিক তারা। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিপ্লব। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো হবে যাতে করে সুষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটাবার জন্য দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সংগঠিত হতে পারেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাবাহিকতায়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব হবে দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহের। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের। সেনাবাহিনী দেশ ও জাতীয় স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে র্নিবাচিত সরকারের অধিনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে যাবে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে। প্রমাণ করা হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। জাতীয় স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠি স্বার্থ নয়। অনন্য এই বিপ্লব নিখাদ দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক হিসাবে স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ -

১। রুশ-ভারতের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা।

২। মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩। “দ্বিতীয় বিপ্লবের” নামে বাকশাল ও মুজিব সরকারের প্রতারণামূলক কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।

৪। কৌশলগত কারণে স্বল্প সময়ের জন্য সংসদকে বলবৎ রেখে সাংবিধানিকভাবে একটি দেশপ্রেমিক সর্বদলীয় অস্থায়ী / নির্দলীয় সরকার গঠন করা।

সর্বদলীয় অস্থায়ী / নির্দলীয় সরকারের দায়িত্বঃ

১। বাকশাল প্রণোদিত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, আর্ন্তজাতিক শ্রমিক আইনের পরিপন্থী শ্রমিক আইন ও অন্যান্য কালা-কানুন বাতিল করা।

২। রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে দেশে অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩। সকল রাজবন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া।

৪। সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৫। জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ছেলে-মেয়েদের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৬। সমাজতন্ত্রের নামে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব ও সরকারি সহযোগিতায় জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান ও অবাধ দুর্নীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে বিপর্যস্ত দেউলিয়া অর্থনীতির পূর্ণবিন্যাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭। জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশে আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

৮। প্রশাসন কাঠামোকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

৯। রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহে বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন নিশ্চিত করার সাথে সাথে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

১০। পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা।

উল্লেখিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই সংগঠিত করা হবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ঐতিহাসিক বিপ্লবের চুড়ান্ত পরিকল্পনা ও নির্দেশাবলী যথাসময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রিয় কমিটির তরফ থেকে জানানো হবে।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি

১২ই আগষ্ট মিটিং এর পর শুরু হয় ঘড়ির কাটায় সময় গোনার পালা ।

১৪ই আগষ্ট রাত ঢাকা বিগ্রেডের নাইট প্যারেড। এই অযুহাতে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের সব প্রস্তুতি শেষ করে ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেকে আল্লাহ্‌তা'য়ালার নাম করেই বিপ্লব শুরু করা হল। পূর্ব নির্ধারিত টার্গেটগুলোর উপর অভিযান চালানো হল। অতি সহজেই স্ট্র্যাটেজিক পজিশনগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হল। শেখ মুজিব, শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাড়ি থেকে বাধা এল। প্রথম গোলাগুলি শুরু করা হল বাড়িগুলো থেকেই। গুলিতে তিনজন বিপ্লবী শহীদ হলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমান্ডাররা নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন পাল্টা আক্রমণ চালানোর। সংঘর্ষে নিহত হলেন শেখ মুজিব ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য। শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাড়িতে অবস্থানরত অস্ত্রধারীদের কয়েকজন মারা গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সব টার্গেটগুলোই নিউট্রেলাইজ করা সম্ভব হল। রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হল, শেখ মুজিবের সরকারের পতনের কথা। একই সাথে ঘোষণা করা হল, খন্দোকার মোশতাক আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মার্শাল'ল জারি করা হল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। জনগণের কাছে আবেদন জানানো হল– বিপ্লবের সমর্থনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের পতন ঘটেছে জানতে পেরে সমগ্র জাতি সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে ঢাকার রাস্তায় লোকের ঢল নেমেছিল। জনগণ সারাদেশ জুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে। মসজিদে মসজিদে লোকজন সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল মহল্লায় মহল্লায়। শেখ মুজিব ও তার দোসরদের জন্য সেদিন বাংলাদেশের জনগণ "ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন" পড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। সবারই এক কথা, "দেশ জালিমের হাত থেকে বেঁচে গেছে।"

আমরা জানতাম বাকশালী শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি যে এতটা ধিকৃত হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে সেটা উপলব্দি করতে পেরেছিলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর জনগণের অভূতপূর্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের বহিঃপ্রকাশে। বাংলাদেশের মানুষ জাতির ক্রান্তিলগ্নে অতীতে সবসময় সঠিক রায় দিয়ে এসেছেন সেটাই তারা আরেকবার প্রমাণ করলেন ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। সমগ্র জাতির প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অভিভূত করেছিল। জনগণের দেশপ্রেম দেখে জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছিলাম আমি। নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম জাতি ও দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছিলাম ভেবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৃহৎ স্বার্থে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সার্থকতা সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলাম জনগণের দোয়া ও আন্তরিক অভিনন্দনে। জনগণের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। বুঝে নিয়েছিলাম বাংলাদেশের ৮কোটি মুসলমানকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না কোন অপশক্তিই। সব চক্রান্তের ব্যুহভেদ করে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে নিজের স্থান করে নেবে একদিন বাংলাদেশের সচেতন সংগ্রামী জনতা। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের জোয়ারে সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ল রুশ-ভারত চক্র। গণবিচ্ছিন্ন দেশ বিরোধী বিশ্বাসঘাতকরা সেদিন প্রাণের ভয়ে লেজ গুটিয়ে আত্মরক্ষার জন্য গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও রেহাই পায়নি তারা। জনগণ জাতীয় বেঈমানদের খুঁজে বের করে ধরিয়ে দিতে থাকে আইন-শৃঙ্খলা পালনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে। এ অবস্থায় বাকশালী চক্রের যে সমস্ত নেতারা জান বাঁচাবার চেষ্টায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই জনগণের কাছ থেকে কোন সাহায্য-সহযোগিতা না পেয়ে উপায়হীন হয়ে স্বেচ্ছায় সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। জনাব তোফায়েল আহমেদ এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক

তাদের মধ্যে অন্যতম। জনাব কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল থেকে একটি টেলিগ্রাম করে তাতে জানায়, সে রাষ্ট্রপতির কাছে আত্মসমর্পন করতে চায়। এ টেলিগ্রামের কোন জবাব না পেয়ে প্রাণের ভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে দেশ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সহযোগিতায় তার দ্বারা পরিচালিত এক সশস্ত্র হামলার মোকাবেলা করতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক তরুণ অফিসার ও চারজন সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জিয়া সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তার বিচার করে। বিচারে আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দীর্ঘ মেয়াদী সাজা প্রদান করে। তখন থেকেই রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে হালে বাংলাদেশে ফিরে এসে রাজনীতিতে আবার পুনর্বাসিত হয়েছে সেই কাদের সিদ্দিকী। কাদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রদ্রোহী কাদের সিদ্দিকী আবার বাংলাদেশের মাটিতে প্রকাশ্য রাজনীতি করার সুযোগ পেল এই রহস্যের উদঘাটনও ঘটবে একদিন এই বাংলাদেশের মাটিতেই।

ফিরে যাওয়া যাক ১৫ই আগষ্টে। অপারেশন শেষ। রেডিওতে সরকার পতন ও শেখ মুজিবের নিহত হবার খবর ঘোষিত হয়েছে। আমি কিছু জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম; হঠাৎ ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এসে জানাল রক্ষীবাহিনীর তিনটি ট্রাক ও একটি জিপ টিএসসি-র দিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম এরা রক্ষীবাহিনীর টহলদার ইউনিট। শেখ মুজিবের বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের মৃত্যু সংবাদ যদি শুনে থাকে তবে তাদের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর যদি না শুনে থাকে তবে তাদের খবরটা জানিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। কয়েক মুহুর্ত চিন্তা করে শাহরিয়ারকে বললাম, "আমি ওদের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য যাচ্ছি। ওদের সমর্থন না পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য তুমি তৈরি থেকো।" জিপ চালিয়ে একাই বেরিয়ে এলাম গেট দিয়ে। পিজি হাসপাতাল এর সামনে পৌঁছতেই দেখলাম কনভয়টি পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে এসে থেমেছে। আমি জিপ থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম জিপে বসে আছে রক্ষীবাহিনীর একজন লিডার। লিডার আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে স্যালুট করে দাড়াল।

— তোমরা এখানে কি করছ? প্রশ্ন করলাম।

— আমরা টহল দিচ্ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। গোলাগুলির শব্দ শুনে এদিকে এসেছি। জবাব দিল লিডার।

বুঝলাম ওরা বিপ্লব ও মুজিবের মৃত্যুর খবরটা এখনও শোনেনি। লিডার জিজ্ঞাসা করল,

— ব্যাপার কি স্যার?

বললাম,

— শেখ মুজিবের সরকারের পতন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শেখ মুজিব মারা গেছেন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে। এ পরিস্থিতিতে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তোমরা এই পরিবর্তনের পক্ষে না বিপক্ষে।

অল্পক্ষণ চিন্তা করে লিডার বলল,

— আমরা পরিবর্তনের সপক্ষে।

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ট্রুপসদের গাড়ি থেকে নামিয়ে তাদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তাদের মতামত জানতে চাইলে সবাই একবাক্যে পরিবর্তনকে সমর্থন জানাল। এরপর সবাইকে সাথে নিয়ে "নারায়ে তাকবির। আল্লাহু আকবর", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ", "সিপাই সিপাই ভাই ভাই" প্রভৃতি শ্লোগান দিতে দিতে রেডিওতে ফিরে এলাম। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে বুঝেছিলাম, ওদের সর্ম্পকে আমাদের মূল্যায়ন ছিল নির্ভুল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল (অবঃ) তাহের, কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, মেজর (অবঃ) শাহজাহান ওমর, মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন, মেজর (অবঃ) রহমতউল্লাহ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মাজেদ এবং এক্স পিএমএ ক্যাডেট মোস্তাক ও সরাফত এসে হাজির হল রেডিও বাংলাদেশে।

ঘোষণা শুনেই এসেছে তারা বিপ্লবের প্রতি তাদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে। খবর এল পরিকল্পনা অনুযায়ী মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী ইতিমধ্যেই সাভারে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পকে নিরস্ত্র করে তাদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। লেঃ কর্নেল রশিদ চলে গেছে জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে নিয়ে আসার জন্য আর আমি গেলাম মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও বাহিনী প্রধানদের নিয়ে আসতে। ঘটনাগুলো ঘটছিল অতি তরিৎ গতিতে।

ঢাকা সেনানিবাস তখন সম্পুর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে সারা ক্যান্টনমেন্টে। অতি প্রত্যুষে বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের পক্ষে তখন কিছুই করা সম্ভব ছিল না। তিনি ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন বটে কিন্তু তার অধিনস্থ রেজিমেন্ট ও ব্যাটালিয়নগুলো সবই তখন সেনা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে। শাফায়াত জামিলের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে জেনারেল শফিউল্লাহ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ) কে অনুরোধ জানান কিছু করার জন্য। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জবাবে তাকে জানান, **"Bangabandhu is dead. The army has revolted and whole army has celebrated."** এ পরিস্থিতিতে কারো কিছু করার নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমি জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দোকার, নৌবাহিনী প্রধান এমএইচ খানকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম রেডিও বাংলাদেশে। রশিদ ফিরে এল জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমেদকে নিয়ে। আমিন ফিরে এল তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রক্ষীবাহিনী প্রধান কর্নেল আবুল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে। বিডিআর প্রধানকেও ডেকে আনা হল। রাষ্ট্রপতি মোশতাক আহমদ রেডিও-তে জাতির প্রতি তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানরা সবাই রাষ্ট্রপ্রধান খন্দোকার মোশতাক আহমদের আনুগত্য প্রকাশ করে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে ভাষণ দিলেন রেডিওতে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আওয়ামী-বাকশালী নেতারা অনেকেই গ্রেফতার হন। ঐ দিনই জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করেন। অস্থায়ী বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। একই দিন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন জনাব মাহ্‌মুদুল্লাহ। মন্ত্রী পরিষদও গঠিত হয় সেদিনই।

মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ:

পূর্ণ মন্ত্রী গনের তালিকাঃ

১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
২. অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
৩. ফনিভূষণ মজুমদার
৪. মোঃ সোহরাব হোসেন
৫. আব্দুল মান্নান
৬. মনরঞ্জন ধর
৭. আব্দুল মোমেন
৮. আসাদুজ্জামান খান
৯. ডঃ এ আর মল্লিক
১০. ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী

প্রতিমন্ত্রী গনের তালিকাঃ

১. শাহ মোয়াজ্জম হোসেন
২. দেওয়ান ফরিদ গাজী
৩. তাহের উদ্দিন ঠাকুর

৪. অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
৫. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর
৬. কে এম ওবায়দুর রহমান
৭. মোসলেম উদ্দিন খান
৮. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ
৯. ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল
১০. সৈয়দ আলতাফ হোসেন
১১. মোমিন উদ্দিন আহমদ

খন্দোকার মোশতাক সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্তিকালে। বাকশাল সরকারের ১৮জন মন্ত্রীর ১০জন এবং ৯জন প্রতিমন্ত্রীর ৮জনই মোশতাক সরকারে যোগদান করেছিলেন ১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে। পাকিস্তান অভ্যুত্থানের প্রথম দিনই খন্দোকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। যে সৌদি আরব মুজিব সরকারকে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর স্বীকৃতি দেয়া থেকে বিরত ছিল সেই সৌদি আরবও অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিনে মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। গণচীন শুধু মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতিই দান করেনি; পিকিং বেতার ও ভয়েস অব আমেরিকা অভুত্থানের সমর্থনে একই সাথে হুশিঁয়ার বাণী প্রচার করে, “**বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন একটি আভ্যন্তরীন ব্যাপার। সে দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বিদেশী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন সহ্য করবে না। এ ধরণের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় গণচীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ধরণের হস্তক্ষেপে নিশ্চুপ থাকবে না। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করবে।**” শুধু হুশিঁয়ারীই নয়; গণচীনের সেনাবাহিনীকে ভারতের যে কোন আগ্রাসী হামলার মোকাবেলায় সীমান্ত অবস্থান জোরদার করে তোলার হুকুম দিয়েছিল গণচীনের সরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীনের হুশিঁয়ারী এবং দেশের জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সরকার ১৭ই আগষ্ট বাংলাদেশে আগ্রাসী সামরিক অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়; অভ্যুত্থানের ১২দিনের মাথায় জাপান, ইরান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরো ৩৯টা দেশের সাথে ভারতও মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

অস্থায়ী সরকারের গৃহিত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ

ক্ষমতা গ্রহণের পরই খন্দোকার মোশতাক শক্তহাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার হাল ধরেন। সেনা পরিষদ তাকে পর্দার অন্তরাল থেকে সার্বিক সাহায্য প্রদান করতে থাকে। অনেক কিছুই করণীয়। খুব সতর্কতার সাথে অগ্রাধিকার ঠিক করা হচ্ছিল প্রতিক্ষেত্রে।

রেডক্রস এর চেয়্যারম্যান পদ থেকে কুখ্যাত গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে বিচারপতি বি.এ সিদ্দিককে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোশতাক এক অধ্যাদেশ জারি করে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। মুজিব কর্তৃক দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে গভর্ণর নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দেশের ১৯টি জেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মুজিব সরকারের ৬জন মন্ত্রী, ১০জন সংসদ সদস্য, ৪জন আমলা এবং ১২জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিচারের জন্য দু'টো বিশেষ আদালত গঠিত হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ন অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। রাজবন্দীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়। সরকারি আদেশে মশিউর রহমান এবং অলি আহাদকে বিনাশর্তে মুক্তি দান করা হয় ২৫শে আগষ্ট। একই দিনে জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীফ অব ডিফেন্স ষ্টাফ হিসাবে এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চীফ অফ ষ্টাফ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বিমানবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ হিসাবে নিযুক্ত হন এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুইটি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৬ই আগষ্ট মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক বার্তা পাঠান। দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয় নতুন সরকার। তারা সবাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাক ঘোষণা করেন, "১৯৭৬ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে দেশে বহুদলীয় অবাধ রাজনীতি পুনরায় চালু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দেশে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করা হবে।"

এভাবেই উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা অতি অল্প সময়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিল তাই নয়; দেশের আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কল-কারখানার উৎপাদনেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। দেশে চুরি-ডাকাতি ও চোরাচালানের মাত্রা কমে যায় বহুলাংশে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে পূর্ণমাত্রায়। দেশে বিদেশে অস্থায়ী সরকারের নীতিসমূহ ও পদক্ষেপগুলি প্রশংসিত হয়।

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাপ্তাহিক দি টাইমস প্রেসিডেন্ট খন্দোকার মোশতাকের উপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করে। সেখানে তাকে তৃতীয় বিশ্বের একজন অসাধারণ স্টেটসম্যান, ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্বার অধিকারী একজন রসিক ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়। তার সম্পর্কে এও বলা হয় আকারে ছোট হলেও বুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ভারতের লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও উপরে। এ ধরণের উক্তি যে কোন জাতির জন্যই বিশেষ গর্বের বিষয়।

১৫ই আগষ্ট ছিল জাতীয় মুক্তির দিন

জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো সেই সত্যকেই তুলে ধরেছিল। ইতিহাসও সেই সত্যকেই বহন করবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সমসাময়িক দেশ বিদেশের প্রতিক্রিয়াতেই তা লেখা রয়েছে। ইতিহাসেও তা থাকবে। আজ আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৩০বছর আগে স্বাধীনতার যাত্রাকাল থেকে ক্ষমতাসীনরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করত, যদি সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা থাকত, যদি বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকত, যদি অন্যায়-অত্যাচার, হত্যা-নির্যাতন না হত, যদি সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল থাকত তাহলে দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য ’৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হত না।

১৬ই আগষ্ট ১৯৭৫ দৈনিক ইত্তেফাকে “ঐতিহাসিক নবযাত্রা” নামে সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি:- “দেশ ও জাতির এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার প্রত্যুষে প্রবীণ জননায়ক খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন এবং এক ভাবগম্ভীর অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খন্দোকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের আইন-শৃংখলাকারী সংস্থাসমূহ যথা: বাংলাদেশ রাইফেলস, পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনী প্রধানগণও নতুন সরকারের প্রতি তাদের অকুন্ঠ আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে এই পরিবর্তনের এক বিষাদময় পটভূমি রহিয়াছে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত ও অসংখ্য মা-বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা একদিন যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম সেখানে আমাদের আশা ও স্বপ্ন ছিল অপরিমেয়। কিন্তু বিগত সাড়ে তিন বছরেরও উর্ধ্বকালে দেশবাসী বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় হতাশা ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার আশা-আকাংখা রুপায়নে খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিতে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে। তারও কারণ ছিল। পূর্ববর্তী শাসকচক্র সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে কোনদিন ক্ষমতা লিপ্সার বাধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব অনেক। বাংলাদেশের এক মহা ক্রান্তিলগ্নে জননায়ক খন্দোকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সুসংহত করিতে হইলে জনগণের প্রতি অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে।”

১৫ই আগষ্টের জনপ্রিয় অভ্যুত্থান নৈতিক এবং সাংবিধানিক উভয় প্রকার স্বীকৃতি পেয়েছিল

জনগণের স্বতঃস্ফুর্ততা এবং সমর্থন দিয়েছিল নৈতিক স্বীকৃতি এবং সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহিত পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

বস্তুতঃ শেখ মুজিব তার নিজের ও পরিবারের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী একটা ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যেই বাকশালী স্বৈরাচার কায়েম করেছিলেন। এভাবেই যুগযুগ ধরে স্বৈরাচারী শাসকরা আর্বিভুত হয়। এরা একই নিয়মে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। জামার্নীর হিটলারের উত্থান ঘটেছিল এভাবেই। নাৎসী পার্টি তাকে মহামানব আখ্যায়িত করেছিল। বাকশালীরাও শ্লোগান তুলেছিল, ‘‘এক নেতা, এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।’’ ফলশ্রুতিতে মুজিব পরিণত হয়েছিলেন, একজন স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কে। ইটালীতে মুসোলিনির আবির্ভাবও ঘটেছিল একই প্রক্রিয়ায়।

আওয়ামী লীগের শাসনামল ছিল বর্বরতার নজীরে পূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করে একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারসহ সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। জাতি কখনোই এই কলংকিত ইতিহাসের কথা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারে না। আওয়ামী-বাকশালী শাসনামল ছিল মূলতঃ হত্যার ইতিহাস, নারী নির্যাতনের ইতিহাস, লুন্ঠনের ইতিহাস, শোষণের ইতিহাস, চোরাচালানের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতিকে বিকিয়ে দেবার ইতিহাস, রক্ষীবাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের ইতিহাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর ইতিহাস। রাষ্ট্রীয়করণের নামে আওয়ামী লীগ ব্যাংক, বীমা, মিল, কল-কারখানায় হরিলুট করেছিল। দেশে সম্পদ পাচাঁর করার জন্য সীমান্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আওয়ামী শাসনামলে অবাধ লুটপাটের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে ‘তলাহীন ঝুড়ি’ আখ্যা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে বিদেশী সাহায্যের বেশিরভাগ মালই ভারতের কোলকাতা ও বিশাখা পাওম বন্দরে খালাস পেতো। একাত্তরের যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞের পর বাহাত্তরে কোন দুর্ভিক্ষ না হয়ে আওয়ামী লীগের শাসন ও শোষণের ফলে ’৭৪-এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। অনাহারে মারা গিয়েছিল লাখ লাখ আদম সন্তান। ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিল মানুষ আর কুকুরে। অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের কলাপাতার কাফনে দাফন করতে হয়েছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বন্য লতা-পাতা, কচু-ঘেচু আর কলাগাছের কান্ড সংগ্রহে ব্যস্ত জাল পরা বাসন্তীরা আওয়ামী কুশাসনের ঐতিহাসিক সাক্ষী। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সরকারিভাবে ভারত থেকে সুন্দরী ও সোহাগী নামের দেড় হাত প্রস্ত ও সাত হাত দৈর্ঘ্য শাড়ী আমদানি করে আওয়ামী লীগ বস্ত্রহীন, নিরন্ন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাথে জঘণ্য মস্করা করেছিল। জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ কাপড়ের নাম দিয়েছিল “**উলঙ্গ বাহার শাড়ী**”।

আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকার তাদের শাসনামলে এ দেশের জনগণকে গণতন্ত্রের নামে দিয়েছিল স্বৈরাচার; সমাজতন্ত্রের নামে শুরু করেছিল সামাজিক অনাচার; বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে জাতিকে করেছিল বিভক্ত; আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যুগিয়েছিল ধর্মহীনতার ইন্ধন। স্বৈরাচারী মুজিব সরকার সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল! ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না হত তাহলে গণতন্ত্রের বধ্যভুমিতে আজকের শতাধিক রাজনৈতিক দলকে একদলীয় বাকশালের ধ্বজা বহন করেই বেড়াতে হত। এমনকি আওয়ামী লীগ নামক কোন দলেরও পুর্ণজন্ম হত না। আওয়ামী-বাকশালীদের অনাসৃষ্টির জন্য বিধ্বস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘানি দেশবাসীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানতে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্বর্ণ, মূল্যবান ধাতু, যানবাহন, মিল-কারখানার মেশিনপত্র, কাঁচামাল ভারতের হাতে তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র জাতিকে

প্রতিপক্ষ করে স্বাধীনতার সোল এজেন্ট সেজে বসেছিল। এসবের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দেশমাতৃকার অন্যতম সেরা সন্তান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল; প্রাণ হারাতে হয়েছিল বিপ্লবী সিরাজ সিকদার ও হাজারো মুক্তিযোদ্ধাকে। লাঞ্ছণার শিকারে পরিণত হতে হয় অনেক দেশপ্রেমিককে। দীর্ঘমেয়াদী অসম চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখেছিল আওয়ামী লীগই। লালবাহিনী, নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনীসহ ইত্যাকার নানা রকমের বাহিনী গঠনের দ্বারা দুঃসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বিনা বিচারে ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ সংহার করার কালো ইতিহাস আওয়ামী-বাকশালীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করার পর শেখ মুজিব স্বয়ং সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতার দম্ভে বলেছিলেন, "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?"

জাতির আশা-আকাংখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে ব্যবস্থা টিতে থাকেতে পারে না। জনসমর্থন ছাড়া কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। জাতীয় বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা যখন জাতির কাঁধে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্রের বোঝা চাপিয়ে দেয়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের জন্য মীরজাফর বা রাজাকার-আলবদরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য তাদের দুঃশাসন উৎখাত করার জন্য দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যুগে যুগে। একই যুক্তিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বিপ্লব সংগঠিত করেছিল বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ। সেই বিপ্লব ছিল একটি সফল অভ্যুত্থান। দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ ও স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। বাকশাল সরকারের উৎখাত ও মোশতাক সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এ কথাই প্রমাণ করেছিল জনগণের আশা-আকাংখার সাথে বাকশালের কোন সম্পর্ক ছিল না। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনও ছিল না। ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন পেয়ে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় সংসদে মরহুম শেখ মুজিবের উপর একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম জিয়াউর রহমান এবং স্পীকার ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। কোন মৃত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে প্রথাগতভাবে তার জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনানো হয় এবং সংসদের কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেখ মুজিবের উপর যে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তা উত্থাপন করেন স্বয়ং মীর্জা গোলাম হাফিজ। তার পঠিত শেখ মুজিবের জীবন বৃত্তান্তের শেষ লাইনে বলা হয়, "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

এটাই মূল কথা। শেখ মুজিবের মৃত্যু একটি সাধারণ হত্যাকান্ড নয়। শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায়। একই দিনে শেখ মুজিবের পতনের রাজনৈতিক দিকটি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে ব্যাখ্যা করে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। সেটা তিনি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুমোদনক্রমে। তিনি বলেছিলেন, "১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কুখ্যাত কালা-কানুন পাস করে বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরাচারী জগদ্দল পাথর দেশের তৎকালীন ৮ কোটি লোকের বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; সেটা ছিল একটা সংসদীয় ক্যু'দাতা (অভ্যুত্থান)। ঐ একদলীয় স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।" একই অধিবেশনে পরে তিনি ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি ২৪১ ভোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়। ফলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে সংবিধানে সংযোজিত হয় এবং দেশের শাসনতন্ত্রের অংশে পরিণত হয়। এভাবেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নির্বাচিত সাংসদরা

১৫ই আগষ্টের বিপ্লবের স্বপক্ষে চুড়ান্ত ফয়সালা করে বিপ্লব ও বিপ্লব সংগঠনকারীদের সাংবিধানিক বৈধতা দান করেছিলেন।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর বৈপ্লবিক সফল অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে নিজ মহিমায়। সেদিন আগষ্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাটি থেকে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল এবং উম্মোচিত হয়েছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বার। আগষ্ট বিপ্লব বাকশালী কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি করে সূচনা করে এক নতুন দিগন্তের।

১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভুত্থান ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মেষ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তারই ধারা আজও দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির প্রতীক ১৫ই আগষ্টের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার চেতনা সর্বকালে সর্বযুগে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে নব্য সৃষ্ট মীরজাফর ও জাতীয় বেঈমানদের উৎখাত করতে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জ্বলন্ত নিদর্শন ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব।

প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত, মোশতাক সরকার এবং সেনা পরিষদ

মোশতাক সরকার গঠিত হবার পর খুবই নাজুক পরিস্থিতিতে সেনা পরিষদ তাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিজয়কে আপামর দেশবাসী স্বতঃস্ফুর্তভাবে অভিনন্দন জানালেও পরাজিত বাকশালী চক্র ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মহল সহজে এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছিল না। তারা জনসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষভাবে এই বিপ্লবের বিরোধিতা করতে না পেরে গোপনে তাদের হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার আশায় তাদের বিদেশী প্রভুদের যোগসাজসে চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে বিপ্লবের পরমুহূর্ত থেকেই। তাদের এ ধরণের তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। বিপ্লবের পর পরাজিত শক্তিকে সমূলে বাংলাদেশের মাটি থেকে উপড়ে ফেলার জন্য আমরা সচেষ্ট ছিলাম। সর্বদলীয় সরকার কায়েম করে তার তত্বাবধানে যতশীঘ্র সম্ভব নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। একই সাথে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে proper screening এর পর সেনাবাহিনীর সাথে একত্রীভূত করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পুর্নগঠন করে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তিকে সুসঙ্গবদ্ধ করার। সেনা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানকারী জেনারেল ওসমানীকে নিয়োগ করা হয় প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের উপেক্ষিত সামরিক বাহিনীর সার্বিক কাঠামো নতুন করে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাঁচে গড়ে তোলা। সেনাবাহিনীর পুর্নগঠনের কাজটি তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল খুবই জটিল এবং দূরহ একটি কাজ। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাছাই করে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। সেনাবাহিনী থেকে বাকশালীমনা, দুর্নীতিপরায়ন এবং উচ্চাভিলাসীদের বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত ইউনিটগুলোর পুর্নবিন্যাশ করতে হবে। কমান্ড স্ট্রাকচারে প্রচুর রদবদল করতে হবে। সর্বোপরি সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ সমস্ত কাজে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সেনা পরিষদের সদস্যরাই ছিল জেনারেল জিয়ার মূল শক্তি। তাদের সার্বিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করেই জেনারেল জিয়া তার দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। আওয়ামী-বাকশালী আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের সামরিক বাহিনীতে পুনর্বহালের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং এই নীতি কার্যকরী করার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সাথে আমরা তখন দেশের দেশপ্রেমিক-জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, গ্রুপ এবং ব্যক্তিবর্গের সাথে দেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক কাঠামো, জাতীয় সরকার, নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মত বিনিময় করছিলাম। এই প্রক্রিয়াটাও ছিল ভীষণ জটিল। বিগত ঐক্য প্রক্রিয়ার মত এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনাকালে সব রাজনৈতিক দলই তাদের দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। এমনকি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবটি খন্দোকার মোশতাক আহমদও প্রথমে মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাইছিলেন সরকার প্রধান থেকে একটি নিজস্ব দল গঠন করে তার অধিনস্থ অস্থায়ী সরকারের অধিনেই নির্বাচন করতে। কিন্তু আমাদের জোরালো যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব। যে সংসদ গণতন্ত্রের বলি দিয়ে বাকশাল কায়েম করেছিল তাদের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর মোশতাক সরকার ও গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে সর্বদলীয় সরকার

গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম আমরা। বামপন্থী রাজনৈতিক অনেক দলই বিশেষ করে জাসদ চাচ্ছিল একটি বিপ্লবী সরকার কায়েম করে তাদের দলীয় কর্মসূচী আমরা বাস্তবায়ন করি। কিন্তু তাদের সেই সব প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করার কোন ইচ্ছা নেই আমাদের এমনকি রাজনীতিতে সরাসরিভাবে সেনাবাহিনীর অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে সেনা পরিষদ। জাতীয় কিংবা নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে কোন বিশেষ দলের কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য নয়। তাদের দায়িত্ব হবে দেশে একটি সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের অধিকার অর্জন করবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাজনৈতিক দল।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে

জেনারেল জিয়া জানালেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল তার কাজে বাঁধার সৃষ্টি করছে। কিছু বাকশালীমনা অফিসার তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল। তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু বাকশালপন্থী অফিসার। ব্রিগেডিয়ার খালেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু ভীষণ উচ্চাভিলাসী। তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য অতি কৌশলে যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি তার শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করে আসছিলেন। মুজিব সরকার ও বাকশালীদের সহানুভূতিও ছিল তার প্রতি। আচমকা বাকশালী সরকারের পতনের ফলে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে কোন উপায়েই তার পরিকল্পনা কার্যকরী করে তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করতে। তার এই হীন চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ থেকে তাকে কিছুতেই নিরস্ত্র করতে পারছিলেন না জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার প্রতি ব্রিগেডিয়ার খালেদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল বাকশালী চক্র এবং তাদের মুরুব্বী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দোসর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। ১৫ই আগষ্ট পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় দেশকে নিয়ে যাবার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূচনা ঘটানো হল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রির্পোটেও এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রধান উস্কানিদাতা ছিল কর্নেল শাফায়াত। শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ এই অফিসার কিছুতেই বাকশালী সরকারের পতনকে মেনে নিতে পারছিলেন না। কুখ্যাত আত্রাই অপারেশনের চ্যাম্পিয়ন কর্নেল শাফায়াত জামিল যাকে পরে ঢাকায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ করে শেখ মুজিব পুরস্কৃত করেছিলেন; সেই শাফায়াত জামিলের অধিনস্থ ঢাকা ব্রিগেডই মুজিব সরকারের পতন ঘটালো এই humiliation তার পক্ষে কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে এই গ্লানি তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। এর জন্যই সে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে মোশতাক সরকার এবং জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে উস্‌কে দিয়ে তাকে বাকশালী চক্র ও তাদের বিদেশী প্রভুদের ক্রিয়াণকে পরিণত করেছিল। তাদের সাথে জোট বেধেছিল রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আগরতলা মামলার আসামীদের কয়েকজন অফিসার। প্রথমত: আমরা এবং কর্নেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এ ধরণের আত্মঘাতী এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে পারেন সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু ক্রমে যখন বিভিন্ন সেনা নিবাসগুলো থেকে সেনা পরিষদের সদস্যরাও একই ধরণের খবর পাঠাতে লাগল তখন বিষয়টি চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। বোঝা যাচ্ছিল সংকট ঘনিয়ে আসছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে এ ধরণের সর্বনাশা চক্রান্ত থেকে সরে দাড়াবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হল না।

৩৬ জন সেনা অফিসারকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়

কোন অঘটন ঘটাবার চক্রান্ত বানচাল করার লক্ষ্যেই ঐ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল, ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত এবং তাদের সহযোগিদের অবিলম্বে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করতে হবে। দেশ এবং জাতিকে দাসত্বের হাত থেকে বাচানোর আর কোন উপায়ই ছিল না।

অনেক বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হল- অসৎ এবং কট্টর বাকশালপন্থী অফিসারদের সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। সর্বমোট ৩৬জন অফিসারকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কাজটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সব যোগ্য কমান্ডারদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষন এবং আনুগত্য ছিল তাদের অধিনস্ত যোদ্ধাদের। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে চাকুরিচ্যুত করলে সেনাবাহিনীতে একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে কিন্তু আমরা নিশ্চিত ছিলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের চক্রান্তের আসল উদ্দেশ্য সৈনিকদের সামনে তুলে ধরলে ব্যক্তিগত আনুগত্য যাদের আছে তারাও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী হীন চক্রান্তকে সমর্থন করবে না। আমাদের তরফ থেকে সিদ্ধান্তের কথাটা জেনারেল জিয়াই জেনারেল ওসমানীকে জানালেন। সব শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না খালেদ এবং শাফায়াত এ ধরণের ন্যাক্কারজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে! কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানরা যখন বিস্তারিত রির্পোট তার সামনে পেশ করলেন তখন অসহায় আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

বৃহত্তর চক্রান্তের বড়ে খালেদচক্র

ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসররা বৃহত্তর চক্রান্ত বড়ে হিসেবেই শুধুমাত্র ব্যবহারিত হচ্ছিল। গোয়েন্দা রির্পোট থেকে বোঝা যাচ্ছিল তাজুদ্দিন আহমদ পরবর্তী সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

গোয়েন্দা রির্পোটগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, এই চক্রান্ত হাত রয়েছে বাকশালীদের একটি চক্র এবং তাদের সার্বিকভাবে মদদ যোগাচ্ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা চালাচ্ছে আর্মির মধ্যে কিছু লোকের মাধ্যমে একটা প্রতি বিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে ২৫ বছরের আওতায় বাংলাদেশে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আবার একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা। রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেল, এই নীল নকশা বাস্তবায়নে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দূতাবাস যৌথভাবে অত্যাধিক মাত্রায় তৎপর রয়েছে। তাদের পরামর্শে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ভাই সাবেক সাংসদ বাকশালী নেতা জনাব রাশেদ মোশাররফ সংশ্লিষ্ট মহল এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই চক্রান্তের সম্পর্কে পরবর্তিকালে জনাব এনায়েতউল্লাহ খানের পত্রিকা সাপ্তাহিক হলিডে-তে এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। "Bangladesh The Unfinished Revolution" গ্রন্থে জনাব লিফ্‌স্যুলজ লিখেছেন, "রয়টার সংবাদদাতা জনাব আতিকুল আলমের হাতে ভারতীয় হাই কমিশনার জনাব সমর সেনের কাছে অভ্যুত্থান বিষয়ক জনাব তাজুদ্দিনের স্বহস্তে লিখিত একটি চিঠি পৌঁছেছিল।"
জনাব জিল্লুর রহমান খান **'Leadership crisis in Bangladesh'** গ্রন্থে লিখেছেন, "খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেলে চার নেতা অবহিত ছিলেন। এটা ছিল একটি মুজিবপন্থী পাল্টা অভ্যুত্থান। কারণ চার নেতা বীরদর্পে জেল থেকে বের হয়ে এসে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।"

জেনারেল জিয়া নিজের অজ্ঞাতেই সতর্ক ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন

৩৬ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন- কর্নেল রউফ এবং কর্নেল মালেকের অব্যাহতি ফাইল সই করিয়ে নিলেন তিনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে।

একই সাথে মুজিব আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের পুনর্বহালের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার জন্য জেনারেল জিয়াকে অনুরোধ জানানো হয়। এর কয়েকদিন পরেই আমরা আবার চাকুরিতে পুনর্বহাল হই। এতে করে সেনাবাহিনীতে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তি বৃদ্ধি পায়। জেনারেল জিয়ার হাতও এতে করে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে। জেনারেল জিয়া অবিলম্বে আমাদের সবাইকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলোতে নিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমাদের সেনাবাহিনীতে পূর্ণবাসনের ফলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সমর্থকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তারা বুঝতে পারেন, সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসলে তাদের কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। তারা এটাও বুঝতে পারলেন যে, তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই তারা অস্থির হয়ে উঠলেন মরণ কামড় দেবার জন্য। ঐ সময়ে একদিন জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কাছ থেকে কর্নেল রউফ (শেখ মুজিবের আমলে তার বিশেষ আস্থাভাজন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান) এবং কর্নেল মালেকের চাকুরিচ্যুতির ফাইল সই করিয়ে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে তাদের অবসর প্রদানের আদেশ জারি করলেন। ব্যাপারটা জানতে পেরেই আমি শংকিত হয়ে পড়লাম। ছুটে গেলাম জেনারেল জিয়ার কাছে,

— স্যার এটা আপনি কি করলেন! কথা ছিল ৩৬ জনকে একই সাথে অবসর প্রদান করা হবে। সেটা না করে মাত্র দু'জনকে অবসর প্রদান করে বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের হুশিঁয়ার করে দিলেন আপনি। এটা কি ঠিক হল?

জবাবে জেনারেল জিয়া আমাকে বললেন,

— **Don't worry, let me move step by step. Things would be all right. Let me handle the affairs in my own way.**

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা

একটি তরুণ প্রতারক আমার নাম ভাঙ্গিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে।

একদিন রাতে ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হবার পর মন্ত্রীমহোদয়গণ বঙ্গভবনের করিডোরে বেরিয়ে এসেছেন। হঠাৎ মন্ত্রী জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া আমাকে ডেকে একটু নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন,

— ডালিম, তোমার পাঠানো লোকটার কাজটা করে দিয়েছি। কালই পারমিটটা ইস্যু করে দেবার জন্য সেক্রেটারী সাহেবকে অর্ডার দিয়েছি।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

— চাচা, আমিতো কোন লোককে পাঠাইনি আপনার কাছে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলুনতো?

আমার জবাবে তিনি একটু বিব্রত হলেন। বললেন,

— এক যুবক সকালে আমার অফিসে এসে বলল, তুমি তাকে পাঠিয়েছ অনুরোধ জানিয়ে তাকে যাতে ৫০ লক্ষ টাকার একটা কাঠের পারমিট দিয়ে দেয়া হয় যত শীঘ্র সম্ভব।

সব শুনে আমি 'থ হয়ে গেলাম। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাকে বেচার চেষ্টা করছে কেউ! লোকটা কে জানার একটা কৌতুহল হল। বললাম,

— এক কাজ করেন চাচা, আগামীকাল লোকটা যখন পারমিটটা নিতে আসবে তখন আপনি আমাকে জানাবেন, আমি আসব দেখার জন্য লোকটা কে! আপনি আমার পরিচয় দেবেন আপনার দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় বলে। বাকিটা ঘটনাস্থলেই দেখবেন কি হয়।

পরদিন সকালে যুবক পৌঁছামাত্র আমি ফোন পেলাম। আমি কয়েকজন আইবির লোক সঙ্গে করে উপস্থিত হলাম মন্ত্রী সাহেবের দফতরে। চেম্বারে ঢুকে দেখি এক কেতাদুরস্থ তরুণ চাচার মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছে। আমি সালাম জানিয়ে বসলাম যুবকের পাশেই। যুবকটি আমার পরিচিত নয়। চাচাকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— স্যার, আপনি বলেছিলেন আজ আসতে আমার ছোট ভাই এর আর্মিতে অফিসার র‍্যাঙ্কে ভর্তির ব্যাপারে। আপনি বলেছিলেন মেজর ডালিমের খুব ঘনিষ্ঠ কেউ আসবে আজ যার মাধ্যমে কাজটা করিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন আপনি।

আমার কথার ধরণ বুঝে নিয়ে মিনিষ্টার সাহেব বললেন,

— হ্যা, এই ভদ্রলোকই সেই ব্যক্তি।

বলেই আমাকে তার দূর সর্ম্পকের আত্মীয় বলে পরিচয় করিয়ে অনুরোধ জানালেন,

— ভাই সাহেব, এর ছোট ভাই কমিশন র‍্যাঙ্কের জন্য আইএসএসবির অপেক্ষায় আছে। বুঝতেইতো পারেন এদেশে সুপারিশ ছাড়া কিছুই হয় না; আপনি মেজর সাহেবের খাস লোক তাই অনুরোধ জানাচ্ছি ওর কাজটা যদি করে দিতেন তবে খুবই উপকার হত।

কথা শেষ হতেই যুবক বলল,

— কি যে বলেন মিনিষ্টার সাহেব, এতো খুবই সামান্য একটা কাজ। এর জন্য মেজর ডালিমের প্রয়োজন নেই। জেনারেল জিয়া কিংবা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলে দিলেই যথেষ্ট।

কথা শেষ করে যুবক আমার দিকে ফিরে তার একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলল,

— আমার সাথে দেখা করবেন। আপনার সামনেই জেনারেল জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদকে ফোন করে আপনার সমস্যার সমাধান করে দেবো। তার সাহস ও আত্মপ্রত্যয় দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যুবক দিব্যি আরামে বসে সিগারেট টানছিল আর কথা বলছিল। চাচার সাথে চোখাচোখি হল; দু'জনকেই কৃতজ্ঞতা এবং সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষারত আইবির লোকদের বললাম, "লোকটা ধুরন্দর ঠগ; ভিতরে গিয়ে আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। তদন্তের রির্পোটটা আমাকে দেখাবেন।" পরে তদন্তে দেখা গিয়েছিল যুবকের নাম-ঠিকানা সবই ভূয়াঁ।

রিপোর্টে ঠিক বোঝা যায়নি সমস্ত ব্যাপারটা একটা ঠগবাজী প্রতারণা ছিল নাকি এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। ঘটনাটি হাতে নাতে ধরা না পড়লে আমার নামে র্দুনীতির অভিযোগ রটানো যেত অবশ্যই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এধরণের প্রতারণার ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। আমরাও বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম। চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে।

আবেদুর রহমান অতি কৌশলে ঘুষ দেবার ধৃষ্টতা দেখান

প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই মনে করে যেকোন জিনিষই টাকায় কেনা যায়।

অক্টোবরের শেষাশেষি ঘটলো আরেকটি ঘটনা। এক সন্ধ্যায় মেজর শাহরিয়ার রেডিও কন্ট্রোল থেকে জরুরী ফোন করে ডেকে পাঠালো।

— হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম।
— ওয়ালাইকুম আসসালাম।
— আজ রাতে আবেদুর রহমানকে **custody** থেকে বের করে লন্ডন পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন প্রেসিডেন্ট; এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি? বলল শাহরিয়ার।
— না তো; এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।
— স্যার, দুর্নীতির অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের এভাবে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়া হলে এ সরকারের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। লোকজন বলাবলি করবে আবার সেই পুরনো খেলাই শুরু হল, টাকা-পয়সার লেনদেনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজরা নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
— তুমি ঠিকই বল্‌ছো শাহরিয়ার। তোমার খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে কিছুতেই আবেদুর রহমানকে বিদেশে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। তুমি পুনরায় তাকে আটক করার ব্যবস্থা করো। তাকে ধরতে হবে এয়ারপোর্ট থেকে; যাতে করে এর পিছনের মূল ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিযুক্ত কাউকে ছেড়ে দেবার অধিকার কারো নেই। **After you get him let me know.**
— **OK Sir, I shall do everything that is necessary.** টেলিফোন রেখে দিল শাহরিয়ার।

মাঝ রাতের লন্ডনগামী ফ্লাইটে বিশেষ ব্যবস্থায় তুলে দেয়া হয়েছিল আবেদুর রহমানকে। প্লেনের ভিতর থেকেই **off load** করে ধরে এনেছিল শাহরিয়ারের পাঠানো টাস্কফোর্স। খবর পেয়ে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম শাহরিয়ারের কন্ট্রোল রুমে। আইজি জনাব নূরুল ইসলাম এবং গ্রেফতারকৃত বিশেষ ব্যক্তিদের ইনচার্জ ডিআইজি জনাব ই.এ. চৌধুরীকেও ডেকে আনা হল। কারণ, খবর পাওয়া গিয়েছিল এ ব্যাপারে তাদের হাত রয়েছে। জনাব ই.এ. চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম,

— স্যার, দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের দায়িত্বেতো আপনিই রয়েছেন তাই না?
— জ্বী হ্যাঁ। জবাবে বললেন জনাব চৌধুরী।
— সেক্ষেত্রে জনাব আবেদুর রহমানকে ছাড়পত্র দিয়ে প্লেনে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করলেন কার হুকুমে?

আমার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কিছুটা ভড়কে গেলেন জনাব চৌধুরী। আমতা আমতা করে বললেন,

— আইজি সাহেবের হুকুমেই এ ব্যবস্থা করেছিলাম আমি।
— আইজি সাহেব আপনি কি করে এ ধরণের হুকুম দিলেন ? থতমত খেলেন আইজি সাহেব।
— প্রেসিডেন্টের কথামত কাজ করেছি আমি।
— প্রেসিডেন্ট সাহেব এ ব্যাপারে কোন লিখিত অর্ডার দিয়েছেন কি? প্রশ্ন করলাম।
— জ্বী না। টেলিফোনে বলেছিলেন।
— টেলিফোনের কথা যদি এখন প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেন তখন আপনার অবস্থা কি হবে আইজি সাহেব? আইনের রক্ষক হয়ে এ ধরণের কাজ করাটা ঠিক হয়েছে কি আপনার?

আমার কথায় ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন পুলিশের জাদরেল অফিসার জনাব ইসলাম। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন,

— মেজর সাহেব, উপরওয়ালাদের ইচ্ছা আমাদের মত জুনিয়রদের জন্য হুকুমেরই সমান।
— বাহ্! বেশ বলেছেন! ঔপনিবেশিক আমলাদের এই বিশেষ গুনটি ভালোই জানা আছে

আপনার। কিন্তু বাংলাদেশতো একটি স্বাধীন দেশ। এক্ষেত্রে এমন একটি আইন বিরোধী কাজ করতে এতটুকুও বাধলোনা আপনার! বাধবেই বা কেন? ঘুনে ধরা ব্যবস্থার শিকার আপনারা আমরা সবাই। স্বাধীনতা পূর্বকালে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই শোষণ কায়েম রেখেছিল বিদেশী শাসকরা। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর সেই আমলাতন্ত্রের অবকাঠামো অটুট রেখে দেশকে লুটেছে সাদা চামরার জায়গায় জাতীয় ব্রাউন সাহেবরা! তাদের ঐ অপশাসন-শোষণে সবসময়েই মদদ যুগিয়ে এসেছে ভাগীদার হিসাবে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র। অসৎ রাজনীতিবিদ এবং আমলাতন্ত্রের মাঝে জাতীয় সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে এসেছে সব আমলেই। কিন্তু এই লুটপাটের দায়-দায়িত্ব কখনোই বহন করতে হয়নি আমলাতন্ত্রকে, সব দায় বহন করতে হয়েছে শুধু রাজনীতিবিদদেরই। আমলারা হেফাজতে থেকেছেন সব সময়েই **back stage player** হিসাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সেই অপকর্মের ধারাবাহিকতা বজায়ে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ কিংবা আগষ্ট বিপ্লব হয়নি। এই দু'টো সংগ্রামই করা হয়েছে জাতীয় পরিসরে সর্বক্ষেত্রে গণমুখী পরিবর্তন আনার জন্য। সেক্ষেত্রে সময়ের দাবিতে আমাদের মন-মানসিকতা বদলাতে হবে তা না হলে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আইজি সাহেব প্রেসিডেন্ট যদি আপনাকে সে ধরণের কোন কথা বলেও থাকেন তখন একজন অভিজ্ঞ অফিসার হিসাবেতো আপনার বলা উচিত ছিল যে, কাজটা বেআইনী বিধায় করা ঠিক হবে না; তাই নয় কি? আশা করি আগামীতে এধরণের ঘটনা আর ঘটবে না। আবেদুর রহমানকে ধরে আনা হয়েছে যাবার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আইন সবার জন্যই সমান; কথাটা কাজেও প্রমাণিত হওয়া উচিত; কি বলেন?

তাদের সাথে আলাপ শেষ করে জনাব আবেদুর রহমানকে ডাকিয়ে আনা হল। আমাদের সামনে এসেই তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে বলতে লাগলেন,

— স্যার, আমি জীবনে অনেক অন্যায় কাজ করেছি। যথেষ্ট টাকা-পয়সাও অর্জন করেছি অসৎ উপায়ে। আমি তার প্রায়ঃশ্চিত্ত করতে চাই। আমাকে একটা সুযোগ দেন আপনারা। বলেই বিদেশী একটি ব্যাংকের চেক বুক বের করে তার কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক পাতায় সই করে সেটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললেন,

— বিদেশে আমার যা গচ্ছিত আছে তার সবটাই আমি আপনাদের দিয়ে দিতে চাই স্বেচ্ছায়।

কি সাংঘাতিক লোক! প্রকারন্তরে ঘুষ দিতে চাচ্ছেন তিনি। উপস্থাপনাটা অতি অভিনব এবং চমৎকার। তার সাথে আর কোন কথা বলতে রুচিতে বাধলো। শাহরিয়ারকে বললাম,

— আমি চললাম, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি আবেদুর রহমান সাহেবকে আইজি সাহেবকে হ্যান্ড ওভার করে দাও বলে ফিরে এসেছিলাম।

টিপিক্যাল আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা

পররাষ্ট্র সচিব আমার শ্বশুড় মহাশয়ের চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার সুপারিশ করে আমাকে খুশি করতে চাইলেন।

একদিন পররাষ্ট্র সচিব কাজে এসেছিলেন বঙ্গভবনে। মিলিটারি সেক্রেটারীর ঘরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,

— এই যে মেজর সাহেব, আপনাকেই খুঁজছি।

— কেন বলুনতো ? জানতে চাইলাম।

— আপনার শ্বশুড় জনাব আরআই চৌধুরী আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি এ মাসেই রিটায়ার করছেন। তার মত একজন অভিজ্ঞ লোকের খুবই প্রয়োজন আমাদের লন্ডন মিশনে; বিশেষ করে এই সময়ে। তাই ভাবছি প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলে তিন বছরের একটা এক্সটেনসন করিয়ে দেই, কি বলেন? প্রেসিডেন্টের বিশেষ কারণে যেকোন অফিসারকেই সর্বাধিক তিন বছর পর্যন্ত এক্সটেনসন দেবার ক্ষমতা রয়েছে।

ধৈর্য্য সহকারে তার কথা শুনে বললাম,

— স্যার, আমার শ্বশুড় সরকারি চাকুরির নিয়মানুযায়ী রিটায়ার করছেন। তাকে এক্সটেনসন দেবার প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আপনার departmental affairs, সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। এক্ষেত্রে আমার মতামত কিংবা পরামর্শ নেবার যৌক্তিকতাটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

আমার জবাবে সেক্রেটারী সাহেব কেমন যেন একটু দমে গেলেন; কিন্তু ঝানু লোক যেতে যেতে বলে গেলেন,

— না মানে ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে রাখা আর কি; এছাড়া আর কিছুই নয়।

উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তিনি আমাকে জানান দিয়ে গেলেন, আমার শ্বশুড়ের extension-টা হচ্ছে তারই উদ্যোগে। তিনি পরে ঠিকই প্রেসিডেন্টের কাছে ফাইলটা পাঠিয়েছিলেন strongly recommend করে। তবে আমিই সেটা হতে দেইনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করে। আমার যুক্তি ছিল, সাধারণভাবে সরকারের নীতি যেখানে extension এর বিরুদ্ধে সেখানে আমার শ্বশুড়কে extension দিলে লোকজন কথা বলার সুযোগ পাবে।

তোষামোদকারীরা রাষ্ট্রপতিকে খুশি করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল

সাধারণভাবে মানব চরিত্র তোষামোদের প্রতি দুর্বল হয়ে থাকে। মোসাহেবদের দল মানুষকে আরও দুর্বল করে তুলতে পারে।

একদিন দেখি জাতীয় ব্যাংকের গভর্ণর জোরেশোরে লবি করে চলেছেন – নতুন নোট যেটা ছাপাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের ছবিই ছাপানো উচিত। কয়েকজন পদস্থ আমলাও কোরাসে যোগ দিয়ে একই কথা বলে বেড়াচ্ছেন। এক ফাঁকে আমি গভর্ণর সাহেবকে কাছে পেয়ে বললাম, "স্যার, অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির ছবি ছাপানোর জন্য এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেন?" আমার প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে না পেয়ে কিছু না বলেই কেটে পড়লেন। এমনিভাবে একদিন শুনতে পারলাম, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু আমলা বিতর্কের ঝড় তুলেছেন – আমাদের কোন নির্দিষ্ট জাতীয় পোষাক নেই। একটা জাতীয় পোষাক নির্ধারণ করতে হবে; পোষাক যেটাই সাব্যস্ত হোক না কেন 'মোশতাক টুপি'-কে অবশ্যই জাতীয় পোষাকের অংশ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মুসলমান হিসাবে জাতীয় পোষাকে টুপি থাকতে পারে যুক্তিসঙ্গত কারণেই; কিন্তু সেটা 'মোশতাক টুপি' হতেই হবে কোন যুক্তিতে; সেটাই বোধগম্য হচ্ছিল না। তাই একদিন তদবীরকারীদের একজন জাদরেল নেতাকে অনুরোধ করেছিলাম যুক্তিটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে। তিনি তেমন কোন ঠোস যুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরপর হঠাৎ করেই এই তদবীরে ভাটা পরেছিল যে কোন কারণেই হোক। সব জায়গাতেই কেমন যেন পচঁনের র্দুগন্ধ। ধসে পড়ছে চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ। যেকোন রাষ্ট্রের জন্য সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র হল মেরুদন্ড। সেখানে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পচঁন ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। সেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে জাতীয় পরিসরে। সেখানে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে কতটুকু পরিবর্তন আনা সম্ভব সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন ও ভাবনার বিষয়। দ্রুত এই পচঁন ও অবক্ষয়ের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচানো অত্যন্ত দুরূহ কাজ। অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রক্রিয়া শুরু করার পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই আজ আমাদের উপর বর্তেছে। এই গুরু দায়িত্ব পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি আমরা পাহাড় সমান প্রতিবন্ধকতার মুখে। জানি না কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এই প্রক্রিয়াকে! এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পরেছিলাম।

পরদিন অভ্যাস মতো ভোর ৬টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে কাপড় পরছিলাম সেই সময় প্রেসিডেন্টের আরদালী এসে জানাল প্রেসিডেন্ট সাহেব নাস্তার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার কামড়ায় গিয়ে দেখলাম আমাদের প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত। আমি একটা খালি চেয়ারে বসলাম প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে। ভাবছিলাম, প্রেসিডেন্ট গতরাতে আবেদুর রহমানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু সে বিষয়ের কোন উল্লেখ না করে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "বাবা, আমগো মইধ্যে কম্যুনিষ্ট কেডা কেডা?" অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা করেই তিনি আমাদের সবাইকে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে। মুখে ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় হাসি। আমাদের কেউই তার প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলল না। তিনিই আমাদের সবাইকে নিশ্চুপ দেখে আবার বললেন, "যারাই কম্যুনিষ্ট হওনা কেন; তোমরা জাইন্যা রাইখো আমি সবচেয়ে বড় কম্যুনিষ্ট।" এরপর আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হল না। নাস্তা শেষে আমরা সবাই বেরিয়ে এলাম। মনে খট্‌কা লাগল, প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে এমন একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন কেন? তবে কি তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিদের সাথে আমাদের বিশেষ করে আমার গোপন যোগাযোগের বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন? নাকি তিনি ঈঙ্গিতে আমাদের কাছে নিজেকে প্রগতিবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করলেন কিছুই ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার সেই উক্তি রহস্যাবৃত্তই রয়ে গেল আমাদের সবার কাছে।

মেজর নূর পেল শেষ আলটিমেটাম

মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল জেনারেল জিয়াকে চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরানোর ব্যাপারে তাদের শেষ কথা জানিয়ে দেয়।

এদিকে আমাদের চাকুরিতে পুনর্বহালের **Gazette notification** বেরুলেও পোষ্টিং অর্ডার তখন পর্যন্ত বেরোয়নি। লিষ্টেড অফিসারদের চাকুরিচ্যুতির ফাইলটিও সই হয়ে আসেনি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। বুঝতে পারলাম বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের কূটচালের পরিপ্রেক্ষিতেই এই দু'টো বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্বিত হচ্ছে। গলদটা যে কোথায় সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেও কোন হদিস পেলাম না আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচের গোলক ধাঁধাঁয়। সংকট ঘণীভূত হতে থাকলো।

সেপ্টেম্বরের শেষে এক দুপুরে মেজর নূর এসে উপস্থিত হল আমার ঘরে।

— কী ব্যাপার নূর; তোমাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে?
— চিন্তারই বিষয় স্যার। গত দু'দিন যাবৎ মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথেই আছি। শেষবারের মত ওরা আমার মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছে, তাদের প্রস্তাবটা উপেক্ষা না করে পুর্নবিবেচনা করার জন্য। ওরা চুড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জেনারেল জিয়াকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদ থেকে সরাবার প্রস্তাব সেনা পরিষদ যদি মেনে না নেয় তবে তারাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নূরের কথায় বুঝতে পারলাম, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। যে কোন সমঝোতার ভিত্তিতেই হোক হাফিজ ও ইকবাল ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে এক হতে চলেছে। ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে হাফিজ ও ইকবালের। ১ম ইষ্টবেঙ্গলকে হাত করতে পারলেই সম্ভব হবে ব্রিগেডিয়ার খালেদের পক্ষে ঢাকায় জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতি বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া আর সেটা হবারই আলামত দেখা যাচ্ছে। মেজর নূরের কাছে তাদের প্রকাশিত মনোভাব সেই ঈঙ্গিতই বহন করছে। চিন্তিতভাবেই নূরকে বলেছিলাম,

— ওদের বলে দিও, যা ইচ্ছে তাই ওরা করতে পারে, তাতে বাধা দিতে না পারলেও সমর্থন আমরা কিছুতেই দিতে পারব না। এ বিষয়ে মিটিং-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটাই বলবৎ থাকবে।
— আমিও আপনার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত স্যার। দেশের স্বার্থে আর কিছু করতে না পারলেও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যেকোন চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাব শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে; তবু নীতির প্রশ্নে অটল থাকতে হবে আমাদের। আপনি জেনারেল জিয়াকে সাবধান হতে বলেন স্যার। যেকোন সময় চরম একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

নূরের সাথে আলাপের পর সেদিনই ছুটে গিয়েছিলাম জেনারেল জিয়ার কাছে। তার বাসার লনে বসেই কথা হচ্ছিল,

— স্যার, কি অবস্থা সেনানিবাসের ?
— খালেদ ও শাফায়াতের ঔদ্ধত্যের মাত্রা সকল সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওদের সন্দেহমূলক আচরনের খবরা-খবর আসছে সব দিক থেকেই। তাদেরকে কি করে হ্যান্ডেল করা যায় সেটাই ভাবছি।
— স্যার, শুনতে পাচ্ছি ব্রিগেডিয়ার খালেদ নাকি ১ম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে হাত করার চেষ্টা করছেন? এ ব্যাপারে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। ১ম বেঙ্গলকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারলে ঢাকায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ যে কোন একটা চুড়ান্ত অঘটন ঘটিয়ে ফেলার ঝুঁকি নিতে পারে।
— **Don't you worry. The advanced party of the 1st Field Regiment has already**

arrived from Comilla and the mainbody is on the way. They should be here just within a few days.

— ১ম ইষ্টবেঙ্গল সম্পর্কে ভেবো না। ওটাতো আমারই নিজস্ব ব্যাটালিয়ন। How could Khaled lay his hand on it? স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন জেনারেল জিয়া।

— তবুও সাবধানের মার নেই স্যার। সবদিকেই সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলতে হবে আপনাকে এখন থেকে। Please don't under estimate your opponent. ভালো কথা, আমাদের পোষ্টিং অর্ডারগুলো এখনো বেরুচ্ছে না কেন? এ ব্যাপারে গড়িমসি করছে কেন MS branch. Our postings at the different strategically important units would immensely strengthen your hand to deal with Brig. Khaled & Co, particularly in the present complex and explosive situation. You should have been able to get the retirement orders signed by the President by now. I tell you Sir, time is running out and you must exert yourself to get these things done before it is too late.

— I understand! জবাব দিলেন জেনারেল জিয়া।

বাইরে প্রকাশ না করলেও তিনি যে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন সেটা আমি তাকে একান্তভাবে জানি বলেই বুঝতে পারছিলাম। এভাবেই সেদিন আমাদের আলাপ শেষ হয়েছিল। সেটাই ছিল ২-৩রা নভেম্বরের আগে তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ।

আসন্ন বিপর্যয় মোকাবেলার রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় সেনা পরিষদ

বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য সব মহলের কাছ থেকেই রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়।

আসন্ন বিপর্যয়ের মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছিল সেনা পরিষদ। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম; যেকোন প্রতিবিপ্লবের মোকাবেলা করার জন্য বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করা উচিত। আলোচনা হল সাম্যবাদী দলের নেতা তোহা ভাই, সর্বহারা পার্টির মাহবুব, জাসদের মেজর জলিল এবং গণবাহিনীর নেতা কর্নেল তাহেরের সাথে।

সোভিয়েত-ভারত মদদপুষ্ট যেকোন প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন সবাই। সব কিছু জানার পর কর্নেল তাহের বলেছিলেন, "এই মুহূর্তে জেনারেল জিয়ার বিরোধিতা করা দেশদ্রোহিতারই সমান। কারণ, বর্তমান অবস্থায় সেনাবাহিনীর পুর্নঃগঠন এবং ঐক্যের প্রয়োজনে জেনারেল জিয়ার কোন বিকল্প নাই। তাছাড়া যেকোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার জন্য জিয়ার ভাবমূর্তি, ব্যক্তিত্ব এবং ভাবমূর্তিও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তাই জিয়াকে আমাদের যে করেই হোক না কেন; বাঁচিয়ে রাখতে হবে বিপ্লবের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে আরো বলেছিলেন, "অবশেষে খালেদ যদি সত্যিই জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে তার নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী সেনা পরিষদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চক্রান্তের বিরোধিতা করবে। আবার আমরা শুরু করব সমাজ পরিবর্তনের অসমাপ্ত বিপ্লব। বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার স্বার্থে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করতে হবে অন্যান্য সব জাতীয়তাবাদী এবং প্রগতিশীল দলগুলোর সাথে।" এ ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন মহলের সাথে আলোচনার কথা শুনে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। সেদিন আমাদের আলাপ হচ্ছিল পুরনো বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। একান্ত বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতার সাথে আলোচনা করেছিলাম আমরা। সেদিন কোন বিশেষ দলের নেতা হিসাবে কথা বলছিলেন না কর্নেল তাহের। তার অঙ্গীকারে খুঁজে পেয়েছিলাম নিষ্কলুশ-নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিক একজন সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধার আন্তরিক উৎকন্ঠা। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একদিন কোয়েটা থেকে একত্রে পালিয়ে আসার পরিকল্পনা প্রণয়নে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল সেই একই অনুপ্রেরণায় আজ আবার জাতির এক মহা ক্রান্তিলগ্নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম জাতীয় স্বার্থ বিরোধী যেকোন চক্রান্তের মোকাবেলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। রাজনৈতিক দর্শন এবং লক্ষ্য হাসিলের পদ্ধতিতে আমাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকলেও সেটা দেশ ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয়। সে প্রশ্নে আমরা এক ও অভিন্ন। সিদ্ধান্ত নেয়া হল, যেকোন হুমকির মোকাবেলা করার জন্য সেনা পরিষদ এবং গণবাহিনীকে যৌথভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে অতি সতর্কতার সাথে। কর্নেল তাহের এবং আমাদের মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের বন্দোবস্ত করা হল।

৩রা নভেম্বরের ব্যর্থ ক্যু'দাতা এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার সফল বিপ্লব

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সঙ্গীরা প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দাতা ঘটাবার চেষ্টা করে

সেই ক্রান্তিলগ্নে নিম্মী ছিল আমার পাশেই। সর্বদাই ও আমার সব দুঃখ-কষ্টের সমান ভাগীদার হয়ে থেকেছে। সব বিপদ-আপদের মোকাবেলা করতেও কুন্ঠিত হয়নি কখনো।

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। গত বেশ কয়েকদিন কাজের চাপে বাসায় যাওয়া হয়নি। ঠিক করলাম দুপুরের পর কিছু সময়ের জন্য বাসায় যাব। প্ল্যান মাফিক লাঞ্চের পর এক ফাঁকে চলে এলাম মালিবাগে। বেশ কয়েকদিন বিরতির পর হঠাৎ আমার আগমনে বাসার সবাই খুব খুশী হল। সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় করা হল আনন্দঘন পরিবেশে। সন্ধ্যায় নিম্মীকে নিয়ে গেলাম মিনু ফুপ্পুর বাসায়। রাতের খাওয়া ওখানেই খেতে হল। বেশ রাত অব্দি গল্প-গুজব করে আমি আর নিম্মী ফিরছিলাম মালিবাগে। হঠাৎ নিম্মী বলল, "আজ আমি তোমার সাথে বঙ্গভবনে থাকব।" ১৫ই আগষ্টের পর থেকেই বেচারী ভীষণভাবে অবহেলিত। একদম সময় দিতে পারছিলাম না ওকে। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। দু'জনে ফিরলাম বঙ্গভবনে। সময় তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। তেমন কোন ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় আমার কামরার দিকে এগুচ্ছি, ডিউটিরত হাবিলদার এগিয়ে এসে বলল, "স্যার মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবাল সাহেব বঙ্গভবন ছেড়ে চলে গেছেন। ১ম ইষ্টবেঙ্গলের গার্ড রিপ্লেসমেন্ট ও এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি ঢাকা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স থেকে। সবাই আপনাকে খুঁজছেন। কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক এবং অন্যান্য সব অফিসাররাই প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে বৈঠক করছেন।" আচমকা খবরটা পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যেভাবে অবস্থা গড়াচ্ছিল তাতে এমন কিছু একটা ঘটতে পারে সেটা অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বিগত দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই ধরে নিয়েছিলাম সমস্ত ব্যাপারটাকে। নিম্মীকে কামরায় যেতে বলে দ্রুত গিয়ে হাজির হলাম প্রেসিডেন্টের স্যুইটে। প্রেসিডেন্ট সাহেব বেশ কিছুটা বিরক্ত এবং উত্তেজিতভাবে একটা সোফায় পা গুটিয়ে তার নিজস্ব স্টাইলে বসে তার পাইপে তামাক ভরছিলেন। কর্নেল রশিদ রেড টেলিফোনে কার সাথে যেন যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। কর্নেল ফারুক আরেকটি সোফায় নিশ্চুপ বসেছিল। ঘরে ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সালাম জানিয়ে কর্নেল রশিদের কাছে জানতে চাইলাম,

— ব্যাপার কি রশিদ, কি হয়েছে?
— যা এতদিন সন্দেহের পর্যায়ে ছিল তাই হয়েছে। তোর দুই বন্ধু হাফিজ এবং ইকবাল ১ম ইষ্টবেঙ্গলের সব troops withdraw করে নিয়ে গেছে বঙ্গভবন থেকে। প্রথমে সবাই মনে করেছিলাম এটা routine replacement এর ব্যাপার। কিন্তু সন্ধ্যার পরও যখন replacement এসে পৌঁছালো না তখন থেকেই ক্যান্টনমেন্টে ফোন করে চীফ জেনারেল জিয়া, সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত কাউকেই কন্ট্যাক্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে খবর পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে অস্বাভাবিক troops movements হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই কিছু পরিষ্কার করে বলতে পারছে না ক্যান্টনমেন্টে কি ঘটছে। জেনারেল ওসমানীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি কিন্তু তিনিও সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। তিনি বঙ্গভবনে আসছেন। জেনারেল ওসমানী ব্রিগেডিয়ার খলিলকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন বিডিআর-এর দু'টো রেজিমেন্ট বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দিতে। হাফিজ এবং ইকবালকেও পাওয়া যাচ্ছে না টেলিফোনে। আমার সাথে কথা শেষ করে কর্নেল

ফারুককে বলা হল রেসকোর্সে তার ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের কাছে চলে যেতে। কর্নেল ফারুক রেসকোর্সে যাবার জন্য উঠে দাড়াতেই আমি বললাম, "ফারুক তুই অবশ্যই রেসকোর্সে যাবি তবে **you would not move under any provocation or circumstances whatsoever.** সব বিষয়ে পরিষ্কার হবার পরই আমাদের করণীয় কি হবে সেটা বিবেচনা করা হবে। এর আগে আমাদের তরফ থেকে কোন মুভ নেয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রথমত: চেষ্টা করতে হবে এই সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় কিনা। এর জন্য আমি নিজেই যাব ক্যান্টনমেন্টে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা আমার কোন কিছু না হওয়া পর্যন্ত **no action at all, is that clear?"** ইতিমধ্যে জেনারেল ওসমানীও এসে পৌঁছেছেন। তিনিও আমার অভিমতকে সমর্থন জানালেন। আমরা যখন আলোচনায় ব্যস্ত তখন বিডিআর-এর দু'টো রেজিমেন্ট এসে পৌঁছে গেছে সে খবর নিয়ে এল মেজর পাশা, মেজর শাহরিয়ার এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। নিম্মীই গিয়ে তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেজর শাহরিয়ার চলে গেল তার রেডিও বাংলাদেশের কন্ট্রোল সেন্টারে। ক্যাপ্টেন হুদা প্রেসিডেন্ট, জেনারেল ওসমানী এবং কর্নেল রশিদকে সাহায্য করার জন্য বঙ্গভবনেই থাকবে সেটাই সিদ্ধান্ত হল। বাকিরা সবাই প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট এবং ডেপ্লয়েড ইউনিটগুলোর কমান্ড নেবার জন্য যার যার পজিশনে চলে গেল। আমি বেরিয়ে আসছিলাম ঠিক সেই সময় কর্নেল রশিদ আন্তরিকভাবেই বলেছিল,

— ডালিম ভেবে দেখ, এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া ঠিক হবে কিনা?

সেই তরল অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়াটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছিলাম,

— এই ক্রান্তিলগ্নে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে **someone has to clean the dirty linen then why not me?**

প্রেসিডেন্টের স্যুইট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম আমার কামরায়। বেচারী নিম্মী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল,

— এখন কি হবে? আমি বললাম,

— তুমি বঙ্গভবন ছেড়ে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। ঠিক বুঝতে পারছি না ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয়। যাই হোক না কেন; বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।

ড্রাইভারকে ডাকিয়ে এনে নির্দেশ দিলাম,

— বেগম সাহেবের হুকুম মত তার সাথেই থাকবে তুমি যতক্ষণ তিনি চান। নিম্মী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নিশী রাতে একা একা বেরিয়ে গেল একরাশ আশঙ্কা মনে নিয়ে অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

যাবার সময় অশ্রুসিক্ত চোখে ধরা গলায় শুধু বলে গেল,

— আল্লাহর হাতেই তোমাকে সোর্পদ করে দিয়ে গেলাম। সাবধানে থেকো।

শান্তির সন্ধানে

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংঘাত এবং রক্তক্ষয় এড়ানোটাই ছিল প্রথম কাজ। সৈনিকদের সাথে কথা বলার পর আমার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম রক্তক্ষয় এবং সংঘাত দু'টোই এড়ানো সম্ভব হবে।

আমিও ইউনির্ফম পড়ে নিয়ে আমার বিশ্বস্ত গার্ড, এস্কট, অয়্যারলেস অপারেটার এবং ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম আজিমপুরে মিসেস মোয়াজ্জেম কহিনূর ভাবীর বাসায়; মেজর নূর রয়েছে সেখানে। সব শুনে নূর বলল,

— রক্তপাত বন্ধ করার একমাত্র উপায় মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালের সাথে সরাসরি দেখা করা। এছাড়া রক্তপাত কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হবে না।

আমিও নূরের সাথে একমত হয়ে বললাম,

— সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য।

ঠিক করলাম, ক্যান্টনমেন্টে যাবার আগে সার্বিক অবস্থাটা সরেজমিনে আরো একটু ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার। আমরা জিপে করে গিয়ে উপস্থিত হলাম ফুলার রোডে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের বাসায়। ওখানে তখন মহুয়া এবং লিটু থাকত। উদ্দেশ্য খাকি পোষাক বদলে সাধারণ কাপড় পরে নেবো। ঘুম থেকে মহুয়াদের ডেকে তুললাম। সংক্ষেপে মহুয়া এবং লিটুকে অবস্থা বুঝিয়ে লিটুর কয়েকপ্রস্ত কাপড় চেয়ে নিয়ে আমরা সবাই ড্রেস পরিবর্তন করে নিলাম। মহুয়া জিজ্ঞেস করল,

— নিম্মী কোথায়? বললাম,

— বঙ্গভবনে ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বলে এসেছি ও যেন কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। তুই আত্মীয়-স্বজনদের ফোন করে সতর্ক করে দিস।

এরপর আমরা বেরুলাম শহর প্রদক্ষিন করতে। পুরো ভার্সিটি এলাকা, পিলখানা, নিউ মার্কেট, সেকেন্ড ক্যাপিটাল, রামপুরা টিভি ষ্টেশন, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া, রাজারবাগ পুলিশ লাইন। কোথাও কোন অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সৈনিকদের সুরক্ষিত চেকপোষ্টগুলোই নজরে পড়ল। **strategically deployed tanks** গুলোও দেখলাম ঠিকমতই রয়েছে। প্রায় সারা শহরটাই ঘুরে এলাম শাহরিয়ারের কন্ট্রোল রুমে। ওর ঘরে ঢুকতেই দেখি ও কারো সাথে টেলিফোনে কথা বলছে। আমাদের দেখে সংক্ষেপে কথা সেরে জানতে চাইলো,

— কি অবস্থা স্যার, কি বুঝছেন!

আমরা ঘুরে ফিরে যা দেখেছি তাই বললাম। শাহরিয়ার জানাল, তার খবরা-খবরও প্রায় একই রকম; তবে সাভারের বুষ্টার ষ্টেশনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অজানা কারণে। ফলে রেডিও ষ্টেশন থেকে কোন কিছু প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে না। টিভির প্রচারণাও একই কারণে সম্ভব নয়। তাকে আমরা জানালাম,

— আমরা ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ করার চেষ্টায়। নিজেদের মধ্যে যে কোন প্রকার সংঘর্ষ বন্ধ করতেই হবে যে কোন উপায়ে যাতে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ না পায়।

শাহরিয়ার আরো জানিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও জেনারেল জিয়ার সাথে সে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। শাহরিয়ারের ওখানে যাবার আগেই সোনাটেঙ্গরে আমার প্রিয় মেঝো ফুপ্পুর (বিভা ফুপ্পু) বাসায় গিয়েছিলাম কতগুলো বিশেষ জরুরী টেলিফোন কল সেরে নেবার জন্য। তাদের ফোনটা খারাপ ছিল কিন্তু ইমান আলী ফুপ্পা পাশেই তার এক কলিগের বাসা থেকে ফোন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই আমাদের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন ইউনিটের সেনা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে বুঝলাম তারা প্রায় সবাই অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। তাদের সংক্ষেপে প্রতিবিপ্লবী

অভ্যুত্থানের আশংকার কথা জানিয়ে অবস্থার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে জেনারেল জিয়ার বাসায় ফোন করে বুঝতে পারলাম তার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের সাথেও যোগাযোগ করেছিলাম সেই বাসা থেকেই। যোগাযোগের পর বুঝতে পারলাম ঘটনাটা ঘটানো হচ্ছে অতি সীমিত পরিসরে ঢাকা ভিত্তিক। এতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হবে।

শাহরিয়ারের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চললাম ক্যান্টনমেন্টের দিকে। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে একটু এগুতেই দুই ট্রাক সৈনিক দেখতে পেলাম মাউন্টেড অবস্থায়। কাছে যেতেই দেখলাম তারা ৪র্থ ইষ্টবেঙ্গলের। **Contingent commander**-কে জিজ্ঞাসা করলাম,

— তোমরা এখানে কেন?

জবাবে সুবেদার সাহেব স্যালুট করে জানাল,

— আগামীকাল আওয়ামী লীগের প্রসেশন বের হবার সম্ভাবনা আছে; তাই হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের এয়ারপোর্ট এলাকায় ডেপ্লয়েড থাকতে হবে আইন-শৃংখলা বজায়ে রাখার জন্য।

তার জবাব শুনে বুঝতে পারলাম, খালেদ চক্র ট্রুপসদের কাছে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলেনি সৈনিকদের সমর্থন না পাওয়ার ভয়ে। তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত তার অধিনস্থ ৪র্থ বেঙ্গলকে চতুরতার সাথে মোতায়েন করেছে **just as show of force** হিসাবে আমাদের ভয় দেখাবার জন্য। সৈনিকদের কাছে খুলে বলা হয়নি সরকার এবং জিয়া বিরোধী পাল্টা অভ্যুত্থানের কথা। মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেনারেল জিয়াকে প্রায় বন্দী করা অবস্থায় রাখা হয়েছে এ কথাটা বলার মত সাহস হয়নি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের। কারণ তারা ভালোভাবেই জানতেন, এ ধরণের কোন পদক্ষেপকে কিছুতেই মেনে নেবেনা দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ অফিসার ও সৈনিকরা। সবকিছু দেখে শুনে বুঝলাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরাসরি ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সাথেও আলোচনা করা সম্ভব। তার বাসাতেই গেলাম প্রথম। বাসায় তাকে পাওয়া গেল না। বাসা থেকে বলা হল, তিনি সেনা সদরে গেছেন। পৌঁছালাম সেনা সদরে। সেখানেও কেউ নেই। সেন্ট্রি, ডিউটি অফিসার ও ক্লার্ক ছাড়া পুরো সেনা সদরটা নিস্তব্ধ। সেখান থেকে গেলাম মেজর হাফিজের বাসায়। হাফিজ বাসায় নেই। ইকবালের খোঁজ করে তাকেও পাওয়া গেল না। এরপর গেলাম কর্নেল শাফায়াত জামিলের বাসায়। সেখান থেকে জানানো হল তিনি ব্রিগেড হেডকোয়াটার্স এ গেছেন। সেখান থেকে ব্রিগেড হেডকোয়াটার্স এ যাবার পথে দেখলাম জেনারেল জিয়ার বাসার সামনে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। ডিউটিরত গার্ডসরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। ব্রিগেড হেডকোয়াটার্সেও নেই তারা। সেখান থেকে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের গেইট দিয়ে ঢুকতেই দেখি ট্রুপসরা সেখানে সব **stand to** অবস্থায় পজিশন নিয়ে আছে। এ ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কেন জানতে চাইলে আমাদের বলা হল যে, সন্ধ্যার পর রাতের আধাঁরে ৪র্থ বেঙ্গল ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টের দিকে তাক করে তাদের **RR (Recoilless Rifle)** এবং সৈন্য মোতায়েন করেছে; তাই তারাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ৪র্থ বেঙ্গল এবং ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট পাশাপাশি দু'টি ইউনিট। তাদের মধ্যে এ ধরণের উত্তেজনা যেকোন সময় বিষ্ফোরন ঘটাতে পারে। উত্তেজনা কমানোর জন্য সেনা পরিষদের সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বুঝিয়ে তাদের বললাম, এই অবস্থায় সতর্ক অবশ্যই থাকতে হবে সবাইকে। আরো জানালাম, আমরা ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে খুঁজছি। ওদের পেলেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক কার্যক্রম বন্ধ করার বন্দোবস্ত করব। সেখানেই জানতে পারলাম মহারথীরা সব ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স এ রয়েছেন। ৪র্থ বেঙ্গলের গেইট দিয়ে ঢুকতেই নজরে পড়ল সাজ সাজ রব। ভীষণ ব্যস্ততা! সৈনিকদের রনসজ্জায় সজ্জিত করে রাখা হয়েছে। কিছুদূর এগুতেই ক্যাপ্টেন কবিরের দেখা পেলাম। একটি এসএমজি কাঁধে ঝুলিয়ে সে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল কবির। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

— **Where is Brig. Khaled and Col. Shaffat?**

— **They all here Sir.** জবাব দিল কবির।

কবিরের সাথে কথা বলছিলাম এমন সময় ল্যান্সারস-এর ক্যাপ্টেন নাছের এসে উপস্থিত হল।

— Assalamu Alaicum, welcome Sir. বলেই করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন নাছের।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েই করমর্দন করলাম আমি ও নূর।

— স্যার, মোশতাক এবং জিয়াকে দিয়ে আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সফল করা সম্ভব হবে না। Both of them are self centered and hypocrite. They are not the right kind of people Sir. তাই আমরা ওদের অপসারন and I am sure both of you would be definitely with us.

ওকে অনেকটা থামিয়ে দিয়েই বললাম,

— Is Brig. Khaled around?

— সবাই এখানেই আছেন। মেজর হাফিজ এবং ক্যাপ্টেন ইকবালও রয়েছেন এখানে।

— Naser do me a favour, please find out Hafiz and tell him I would like to talk to him.

— "Ok sir. আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে নিয়ে আসার জন্যে। আপনারা ততক্ষণ এ্যাডজুটেন্টের অফিসে অপেক্ষা করুন" বলে চলে গেল নাসের।

এ্যাডজুটেন্টের ঘরে ঢুকে দেখি ইউনির্ফম পরা অবস্থায় কর্নেল আমিনুল হক বীর উত্তম ও লেফটেন্যান্ট মুনিরুল ইসলাম চৌধুরী বিষন্ন হয়ে চুপচাপ বসে আছে। কর্নেল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলাম,

— কি ব্যাপার স্যার, আপনাদের এই দশা কেন? What's up?

— You must be jocking at our miserable plight is'nt it Dalim? তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছ না ইউনিট কমান্ডার এবং এ্যাডজুটেন্ট হয়েও নিজেদের ব্যাটালিয়নেই আমাদের এমন নিঃক্রিয় অবস্থায় বসে থাকতে হচ্ছে তার মানেটা কি?

— কিছু মনে করবেন না স্যার। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? এমন কিছু যে ঘটতে পারে সেটাতো অজানা ছিল না আপনাদের অনেকেরই। সময়মত এ্যাকশন না নেবার ব্যর্থতার জন্যই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় কি?

আমার প্রশ্নের ঈঙ্গিত বুঝে কর্নেল আমিন চুপ করে রইলেন। বস্তুতঃ কর্নেল আমিন ও লেফটেন্যান্ট মুন্নাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করায় তাদের প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাখা হয়েছে তাদের নিজস্ব ইউনিটেই। খবর পেয়েই হাফিজ এবং ইকবাল এল। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালো পাশের একটি খালি কামরায়।

— এ কি করলে হাফিজ! শেষ পর্যন্ত অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লে?

— অঘটন বলছ কেন? জিয়া এবং মোশতাকের ঘোড়েল মনের পরিচয় পাবার পরও তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে মোটেও আন্তরিক নয় সেটা তোমরা বুঝেও মেনে নিতে পারছ না কেন? Both of them are betraying our cause. উল্টো প্রশ্ন করল হাফিজ। ওদের বাদ দিয়েই এগুতে হবে। আওয়ামী লীগের গড়া সংসদকেও আর কাল বিলম্ব না করে ভেঙ্গে দিতে হবে। এই সঠিক উদ্যোগে বিশেষ করে তোমার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, শাহরিয়ার এর মাধ্যমে সেনা পরিষদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাব আশা করছি আমরা। আমি জানি ব্রিগেডিয়ার খালেদ সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত reservations আছে; সেগুলোকে আমিও অস্বীকার করছি না কিন্তু এরপরও ব্রিগেডিয়ার খালেদের চীফ হবার lifelong ambition fulfill করে দিলে জিয়ার তুলনায় তাকে দিয়ে more efficiently কাজ করানো যাবে।

— দেখ হাফিজ, আমি স্বীকার আগেও করেছি এখনো করছি, আশানুরুপভাবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হতে হচ্ছে জেনারেল জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাকের জন্য। শুধু তাই নয়; অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করছেন তারা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, কিন্তু তাই বলে হঠাৎ করে এ ধরণের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর্মির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে অপশক্তিকে সুযোগ করে দিতে হবে to stage back and reverse the process সেটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও

সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তা যাক, এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; আমার ধারণা- এসমস্ত বোঝাবুঝির সময় পার হয়ে গেছে কারণ যে অঘটন কখনোই সম্ভব হত না সেটাই ঘটিয়ে বসেছো তোমরা। এই অবস্থায় কোন রক্তপাতের সূত্রপাত যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছি। এখন চলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে সঙ্গে করে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক এই সংকটের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে কি করে উদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে সেটাও বলো পরিষ্কার করে। সেক্ষেত্রে আমরা ফিরে যাব। এরপর যা হবার তা হবে।

সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষনের পর আমার এবং নূরের বিশ্বাস জন্মেছিল, আলোচনার প্রস্তাব কিছুতেই না মানা সম্ভব না খালেদ চক্রের কাছে; কারণ তাদের বিশেষ করে হাফিজ এবং ইকবালের অজানা ছিল না ঢাকায় তো বটেই অন্যান্য সেনানিবাসগুলোতেও সেনা পরিষদের শক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে তাদের চেয়ে অনেক বেশি। কি যেন ভাবল হাফিজ এরপর বলল,

— ঠিক আছে, তাই হবে। চলো আমাদের সাথে।

হাফিজ, আমি, নূর এবং ইকবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার মঈন, ক্যাপ্টেন নাছের, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, কর্নেল রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ সবাই অফিস ব্লকের সামনে লনে দাড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে অভিবাদন জানাতেই তিনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

— আরে এসো এসো, **welcome.** আমি জানতাম তোমরা দু'জন আসবেই।

তার কথা শেষ হতেই বললাম,

— শেষটায় অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লেন।

— **What do you mean? It's not my doing. Believe you me Dalim it is their's doing, these young officers. They think Zia can't deliver. They also think he will do nothing to achieve the goals of the 15th August revolution at the same time he is also totally incapable to protect the interest of the armed forces. Therefore, they want a change.**

— বুঝতে পারলাম স্যার, জেনারেল জিয়ার জায়গায় বসে সেই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্যই এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন অথবা করানো হয়েছে।

— **No! No! Not at all. I don't want to be the Chief. Believe me, I have no such ambition.** ছেলেরা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে তাই আমি এসেছি। দ্যাটস ইট!

কথার মাঝেই কে একজন বলে উঠল,

— **We don't mind to accept Brig. Khaled's leadership.**

— **Come on keep quite.**

ব্রিগেডিয়ার খালেদ সেই কন্ঠকে চুপ করিয়ে দিলেন।

— যাক স্যার, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার সময় এটা নয়; এতে কোন লাভও নেই। আমি ও নূর এসেছি কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যাতে শুরু না হয় সেটা নিশ্চিত করতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। রশিদ এবং ফারুককে বলে এসেছি আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার ফলাফল জানার আগ পর্যন্ত বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংক কিংবা ট্রুপস এর কোন মুভমেন্ট করা হবে না। এখন বলেন, আলোচনায় আপনারা রাজি আছেন কিনা?

আমার কথার ধরণে তারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সবাই। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ঠিক পাশেই দাড়িয়ে ছিল হাফিজ। সে নীচু স্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কিছু বলল। হাফিজের কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

— তোমাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা। আলোচনা হবে।

— কিন্তু আসার পথে দেখলাম এয়ারপোর্টের কাছে কিছু সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। অবশ্য, তাদের যে কথা বলে ডেপ্লয় করা হয়েছে তার সাথে আপনাদের কার্যকলাপ সঙ্গতিহীন।

যাক, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু ৪র্থ বেঙ্গলের উস্কানিমূলক ডেপ্লয়মেন্টকে কেন্দ্র করে ২য় ফিল্ড রেজিমেন্টে যে ভয়ংকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সেটা প্রশমিত না করলে যেকোন মুহুর্তে বিষ্ফোরন ঘটতে পারে আর সেটা ঘটলে আমাদের আলোচনার কোন সুযোগই থাকবে না। তাই আমার অনুরোধ, খালেদ ভাই আপনি আলোচনায় বসার আগে ৪র্থ বেঙ্গলকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে **stand down** করার।

আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াতকে নির্দেশ দিলেন ৪র্থ বেঙ্গলকে **stand down** করানোর জন্য। কর্নেল শাফায়াত চলে গেলেন নির্দেশ কার্যকরী করতে।

ঐতিহাসিক এনকাউন্টার

অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য কী করা প্রয়োজন সেটা ঠিক করার জন্য আমি আলোচনার প্রস্তাব দেই। আমার প্রস্তাব গৃহিত হয়। আমরা সবাই ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের অফিসে আলোচনায় বসি।

আমরা সবাই গিয়ে বসলাম কমান্ডিং অফিসারের ঘরে। প্রথমেই আমি জানতে চাইলাম জেনারেল জিয়ার সম্পর্কে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ জানালেন তিনি তার বাসাতেই আছেন এবং ভালোই আছেন। তার নিরাপত্তা এবং দেখাশুনার জন্য কিছু অতিরিক্ত সৈনিকে তার বাসার কাছে অবস্থান নিতে বলা হয়েছে এবং কাউকে তার সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না সাময়িকভাবে; এর বেশি কিছুই নয়। তার মানে হল, তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে এবং এই কথাটাও সৈনিকদের জানাবার সাহস হয়নি খালেদ চক্রের। আলোচনার আগেই জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। আমি সোজা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বললাম,

— স্যার কোন আলোচনায় বসার আগে একটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই- জেনারেল জিয়ার সাথে এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে এর বেশি কিছু করা হলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে **you have to give me your explicit assurance.**

বুদ্ধিমান লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। কোন সময় না নিয়েই তিনি জবাব দিলেন,

— Be rest assured, no harm would be done to him. At the most he may be removed as the chief of army staff that's all. Nothing more than that…

আলোচনা শুরু হল। একদিকে আমি ও নূর অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে ওদের তরফের উপস্থিত প্রায় সবাই। শুরুতেই আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম,

— দেশে একটি জনপ্রিয় সরকার থাকতে এ ধরণের একটা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি?

আমার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেমন যেন থমকে গেলেন। মনে মনে সবাই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কর্নেল শাফায়াত বলে উঠলেন,

— We want to dismiss the Mushtaq government and the present parliament because the present parliament is the parliament of Awami-Bksalites.

জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

— তারপর?

— We don't want Gen. Zia to remain as our Chief.

— দেশ চালাবে কে? প্রশ্ন করলাম।

— "We shall form a 'Revolutionary Council" ক্যাপ্টেন ইকবাল জবাব দিল।

কর্নেল শাফায়াত আবার বলে উঠলেন,

— Khandakar Mushtaq will handover power to the chief justice.

ব্রিগেডিয়ার খালেদ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন,

— Continuation must be maintained and therefore, Khandaker Mushtaq will remain as the President but three Cheif's must be removed.

বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না কোন নির্দিষ্ট ব্লু প্রিন্ট ছাড়াই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন তারা। কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা কিংবা মতানৈক্য কোনটাই নেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের। আলোচনা চলছে হঠাৎ আকাশে জঙ্গী বিমান উড়ার বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠলাম। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলাম,

— Sir, why the MIGS are up? For heaven's sake stop this provocative act. Otherwise, it would be simply impossible to holdback Col. Farooq. He will

roll his tanks towards the cantonment.

ব্রিগেডিয়ার খালেদ টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে নিয়ে এয়ারফোর্স কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত নিজের উদ্যোগেই মিগ নিয়ে আকাশে উড়েছে। খবরটা জেনে তক্ষুণি **Air traffic control** -এর মাধ্যমে লিয়াকতকে অবিলম্বে নেমে আসার নির্দেশ দিয়ে তাকে ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স এ আসার জন্য বললেন। রিসিভার নামিয়ে রাখার পরপরই মেস ওয়েটার এসে জানাল প্রাতঃরাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গরম গরম আলুভাজি, ডালপুরি এবং চায়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে রেজিমেন্টের ফিল্ড মেসে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ আমন্ত্রণ জানালেন নাস্তার জন্য। নাস্তা শেষ করে বেরিয়ে এসেছি হঠাৎ নজরে পড়ল কর্নেল মান্নাফ ইউনির্ফম পরে দাড়িয়ে আছেন। ব্রিগেডিয়ার বেরিয়ে আসামাত্র তিনি তার দিকে ত্রস্তপায়ে এগিয়ে এসে সেল্যুট করে বললেন, **Khaled you are the Boss, I salute you as a deciplined soldier and I am with you.** তার ব্যবহার দেখে ভাবলাম কি বিচিত্র চরিত্রের মানুষ এই কর্নেল মান্নাফ! ১৫ই আগষ্ট সকালে ঠিক একই কায়দায় তিনি আমাকে একই কথা বলেছিলেন। সেদিন একজন সিনিয়র অফিসার হিসাবে তার ঐ ধরণের ব্যবহারে আমি বেশ বিব্রতবোধ করেছিলাম। সামান্য একটা চাকুরির জন্য আত্মসম্মানও যারা বিকিয়ে দিয়ে গিরগিটির মত রূপ পাল্টাতে পারেন সেই সমস্ত র্দুবল চরিত্রের অফিসারদের পক্ষে কখনোই তাদের অধিনস্থ সহকর্মীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য লাভ করা সম্ভব নয়। তার ঐ ধরণের গায়ে পড়া মোসাহেবীপনা সবার কাছেই হাস্যকর মনে হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। মুচকি হেসে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন,

— **Let's get down to business, we have to discuss a lot.**

আমরা সবাই আবার গিয়ে বসলাম আলোচনায়। আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার পর কর্নেল সাব্বিউদ্দিন এসে আলোচনায় শরিক হলেন।

— তুমি অযৌক্তিকভাবেই সব ঘটনার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছ। যা ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র একা আমি দায়ী নই। জিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছে কোন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। মোশতাক এবং জিয়ার উপর বিতশ্রদ্ধ্য; তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে এদের বিরুদ্ধে।

বলেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন কবির প্রমুখদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এদের অনুরোধেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

বুঝলাম, তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী চতুর ব্রিগেডিয়ার খালেদ অতি কৌশলে গা বাঁচিয়ে অন্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

— জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বটা কি আপনিই নিবেন স্যার?

আমার প্রশ্নের জবাবে নিজের সাফাই দেবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

— তুমি কি মনে কর চীফ হওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি?

— আমি কিছুই মনে করছি না, শুধু জানতে চাইছি আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? কি আপনাদের দাবি-দাওয়া? আপনাদের দাবিগুলো পরিষ্কারভাবে জানার পরইতো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা সম্ভব তাই নয় কি স্যার? ক্ষমতার লড়াই এবং রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যেইতো ছুটে এসেছি আমি ও নূর। ইনশাল্লাহ্ দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবোই যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে।

আমার বক্তব্য শেষ হতেই ল্যান্সারস এর ক্যাপ্টেন নাসের উঠে বলল,

— **Yes, we want Brigadier Khaled to be our Chief.**

"Yes, Yes" উৎসাহী সমর্থন শোনা গেল কিছু তরুণ অফিসারের গলায়। ঠিক সেই সময় **duty officer** খবর নিয়ে এল স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত এসেছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ **duty officer**-

কে বলল লিয়াকতকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে। লিয়াকত ঘরে ঢুকে সেল্যুট করতেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ জিজ্ঞাসা করলেন,

— **What's up man! Why did you took off?**

— **Sir, I got information that Col. Farooq had started up his tanks at the racecourse and was mooving towards the cantonment that's why I went up.**

— ডালিম, তুমি বলছ রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যই তোমরা এখানে এসেছ অথচ তোমাদেরই একজন ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের পায়তারা করছে। **Is in't a contradiction? How can you justify this?**

— **Sir, please have trust on me. Let me check what is happening. I assure Sir, nothing of that kind would ever happen.**

বলেই পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলাম কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগের জন্য। ঘরে ঢুকেই দেখি এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াবকে ইতিমধ্যেই ধরে আনা হয়েছে। বিমর্ষ চিত্তে নির্বাক হয়ে বসেছিলেন তিনি। পাশেই নেভ্যাল চীফ রিয়ার এডমিরাল এম.এইচ. খানও বসে আছেন দেখলাম। তারও একই অবস্থা। শংকা-উদ্বেগে দু'জনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তারা দু'জনেই যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। এয়ার চীফ ত্রস্তে উঠে এসে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন,

— ডালিম, তুমি এখানে! কি হচ্ছে বলতো?

তার প্রশ্নের জবাবে শুধু বললাম,

— স্যার ঘাবড়াবেন না। **Take it easy.** চুপচাপ বসে দেখেন কি হচ্ছে।

টেলিফোন তুলে নিয়ে বঙ্গভবনে কর্নেল রশিদের সাথে যোগাযোগ করলাম।

— রশিদ, ডালিম বলছি ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। এখানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ, কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল এবং অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব এবং রিয়ার এডমিরাল এম.এইচ. খানও আছেন। জেনারেল জিয়াকে তার বাসাতেই রাখা হয়েছে। আমার সাথে নূরও রয়েছে। আলোচনা চলছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদের নির্দেশে লিয়াকত মিগ উড়ানো বন্ধ করে এখানে ফিরে এসেছে। তারা অভিযোগ করছেন কর্নেল ফারুক নাকি তার ট্যাংক বহর নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে; যদি খবর সত্যি হয়ে থাকে তবে তাকে এ ধরণের উদ্যোগ নিতে নিষেধ কর। **No tanks should roll down the street whatsoever.** ওদের দাবি-দাওয়া জেনে নিয়ে আমি আসছি বঙ্গভবনে **as soon as possible.** ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বলেছি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের হাত থেকে দেশও জাতিকে বাঁচাবার শানি-পূর্ণ উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্যই আমি ও নূর এসেছি। তারা আলোচনায় যখন রাজি হয়েছেন এবং আলোচনা চলছে সেক্ষেত্রে **you have to ensure that no provocative action is initiated from our side. Please talk to Farooq and tell him to restrain himself.**

— "আমি এক্ষুণি কর্নেল ফারুকের সাথে যোগাযোগ করে তাকে বলছি এ ধরণের কোন উদ্যোগ না নিতে।" জবাব দিল কর্নেল রশিদ।

কনফারেন্স রুমে ফিরে এসে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— **Don't worry Sir, Col. Farooq will not move his tanks.**

আমার কথা শোনার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন,

— **Where is Air Vice Marshal Twab?**

— "**He is here Sir.**" জবাব দিল অফিসার।

— "**Bring him in.**" নির্দেশ দিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

এভিএম তোয়াবকে নিয়ে আসা হল কনফারেন্স রুমে। ভিতরে ঢুকে সবাইকে দেখে তিনি কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন,

— **Well Khaled, would you please tell me why the aircheif has been brought here in such a disgraceful way! What's happening? Where do I stand? Am I still the Chief?**

তার কথা শেষ না হতেই ক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে গর্জে উঠল স্কোয়ার্ডন লিডার লিয়াকত,

— **Shut up you! You are no more the Chief. I have taken over the command of the air force.**

লিয়াকতের কথার ধরণে স্লিপিং স্যুট পরিহিত এভিএম তোয়াব কুকঁড়ে গিয়ে বসে পড়লেন খালি একটা চেয়ারে।

— **"Make him sit in some other place."** বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

তার আদেশে জনাব তোয়াবকে আবার পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এই ড্রামার পর আবার আমাদের আলোচনা শুরু হল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন,

ডালিম, আমাদের দাবি চারটি:-

১। খন্দোকার মোশতাকই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

২। বর্তমানের তিন চীফ অফ স্টাফকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের জায়গায় গ্রহণযোগ্য নতুন চীফ অফ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে আর্মি, এয়ারফোর্স এবং নেভীতে।

৩। আর্মিতে **chain of command re-establish** করতে হবে। বঙ্গভবন এবং শহরে **deployed** সমস্ত ট্রুপস এবং ট্যাংকস ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

৪। বাকশালী শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে বর্তমানের সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। বহুদলীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

বুঝতে পারলাম, বর্তমানে জনগণের মানসিকতা এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করেই দাবিগুলো র্নিধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার সাথে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে উল্টে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এ ধরণের সুক্ষ্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের কাজ নয় এবং এর পিছনে যে অজানা চানক্যরা রয়েছেন সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হল না আমার। যাই হোক, সব শুনে আমি বললাম,

— ঠিক আছে খালেদ ভাই। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন তবে বঙ্গভবনে যাওয়া যাক।

আমার প্রস্তাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যরা কেন জানি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কর্নেল শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদের হয়ে জবাব দিলেন,

— ব্রিগেডিয়ার খালেদ বঙ্গভবনে যাবেন না। তার প্রতিনিধি পাঠানো হবে।

জবাব শুনে রসিকতাচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— আমরাতো নিজেরাই ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সাথে কোন আলোচনা করতে আদৌ রাজি হবেন কিনা সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তবু এসেছি। আপনাদের সাথে বসে আলোচনা করতে আমাদেরতো কোন ভয় হচ্ছে না; সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিধি পাঠাতে চাচ্ছেন কেন? নিজেই চলুন না আমাদের সাথে। ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার? **For heaven's sake have a heart! We must have mutual trust and confidence and that is the only basis on which we shall succeed to find out a way to salvage the nation from this uncalled for crisis. Don't you agree with me Sir?**

আমার রসিকতার কোন জবাব দিলেন না খালেদ ভাই। ঠিক হল, তাদের তরফের প্রতিনিধি হয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক যাবেন আমাদের সাথে বঙ্গভবনে। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দু'জনকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম বঙ্গভবনে।

আসার পথে দেখলাম রাস্তাঘাটে মানুষজন র্নিলিপ্তভাবে চলাফেরা করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকা শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। স্বাভাবিক অবস্থার আড়ালে কি ভীষণ বিষ্ফোরন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে জনগণ এখন পর্যন্ত বে-খবর। অন্যান্য দিনের মতই আজও তারা বেরিয়ে পড়েছে জীবিকার তাড়নায়।

বঙ্গভবন

রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ ছিল স্বাভাবিক। রাজকীয় এবং মনোরম। অস্বাভাবিকতা কিংবা আতংকের কিছুই দৃশ্যতঃ চোখে পড়ছিল না।

বঙ্গভবনের গেটেই নজরে পড়ল বিডিআর-এর সশস্ত্র সৈনিকরা পজিশন নিয়ে আছে। মিলিটারি সেক্রেটারীর কামরায় কর্নেল মান্নাফ ও মেজর মালেককে বসিয়ে আমি ও নূর গিয়ে ঢুকলাম প্রেসিডেন্টের কামরায়। সেখানে প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল ওসমানী ও কর্নেল রশিদকে আলাপরত অবস্থায় পেলাম। হুদা ব্যস্ত ছিল নোট নেয়ায়। আমরা ঢুকতেই তারা জানতে চাইলেন, ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা কি? আমি বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলে জানালাম, ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বেই ঘটেছে সব কিছু। তাদের সবার তরফ থেকে চারটি দাবি নিয়ে এসেছেন কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। এরা দু'জনেই জেনারেল ওসমানীর কাছে বিশেষভাবে পরিচিত; তাই নাম শুনতেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন,

— How could they give their allegiance to Khaled!

জবাবে আমি বললাম,

— স্যার, মানুষের চরিত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীল। এ নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই এখন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূল সমস্যা নিয়েই ভাবতে হবে।

সবাই আমাদের অভিমত কি সেটা জানতে চাওয়ায় নূর ও আমার পক্ষ থেকে আমিই আমাদের অভিমত জানালাম,

প্রথমত: আমি মনে করি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের এই putch কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমরাই বেশি শক্তিশালী। জনগণ এবং সৈনিকরা যখন তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে তখন এই ক্যু'দাতা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। শুধু তাই নয়; তখন তারা এর বিরোধিতা করার জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের তরফ থেকে কোন প্রকার সামরিক অভিযানের তৎপরতা হবে আত্মঘাতী। তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়ার আগে কোন প্রকার সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পরলে দেশের জনগণ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের সৈনিকরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়বে ফলে দেশে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটবে; জনগণ এটাকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীন ক্ষমতার লড়াই হিসাবে বিবেচনা করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পরে সব কিছু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়েও রাখতে পারে। এই দুই ধরণের অবস্থারই পূর্ণ সুযোগ নিবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ত্রানদাতা হিসাবে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরাজিত শক্তিকে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে দেশকে আবার নিয়ে যাবে আগষ্ট বিপ্লবের পূর্বাবস্থায়; জনগণের কিছু বোঝার আগেই। এ ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি এই সময় কোন প্রকার দ্বন্দ্বে না গিয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরে দাড়াই তবে আমার বিশ্বাস, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খালেদ চক্রের নিজস্ব কীর্তিকলাপের মাধ্যমেই খসে পরবে তাদের মুখোশ; ফলে দেশবাসী এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা জানতে পারবে তাদের আসল পরিচয়। সবাই যখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে যে, পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরশাসন এবং ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিনিময়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য তাদের উস্কানি এবং মদদ নিয়েই পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন; তখন যদি কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় খালেদ চক্রের বিরুদ্ধে তবে সেই উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও সমর্থন জানাবে দেশবাসী। ঠিক একইভাবে যেমনটি তারা জানিয়েছিল ১৫ই আগষ্ট বিপ্লবকে। সেক্ষেত্রে জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের যেকোন হুমকির মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে

জাগ্রত জনতা। সিপাহী-জনতার ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে; যেমনটি হয়নি আগষ্ট বিপ্লবের পর।

দ্বিতীয়ত: আমি মনে করি জাতিকে ধোকা দেবার জন্য কৌশল হিসাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা প্রেসিডেন্ট মোশতাককে সামনে রেখে আমাদের নিয়োজিত চীফ অফ স্টাফদের অপসারন করে সমস্ত সামরিক বাহিনীর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার হীন প্রচেষ্টা করছে। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে এই কাজটি হাসিল করার পর অতি সহজেই তাঁকে সরিয়ে তাদের রাজনৈতিক দোসরদের ক্ষমতায় পুনর্বহাল করবে তারা। তাই আমি মনে করি, জাতীয় বেঈমানদের নীলনকশা বাস্তবায়নে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কোনরূপ ভূমিকা রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। যদি রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হয় তবে সেটা তাকে করতে হবে আগষ্ট বিপ্লবের চেতনার আলোকেই; তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজিয়ে রেখেই। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের হাতে ক্রিয়াণক হয়ে নয়। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রকে পরিষ্কার করে বলে দেয়া উচিত। তারা যদি প্রেসিডেন্টের শর্ত মেনে নিতে রাজি না হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের ছেড়ে দেওয়াই উচিত হবে বলে মনে করি আমি। আমার বক্তব্যের আলোকে রুদ্ধদ্বার অবস্থায় আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। আমার যুক্তি মেনে নিয়ে সবাই একমত হলেন এই মুহূর্তে কোনরূপ সামরিক সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের প্রতিনিধিদের কি বলা হবে সেটাও ঠিক করে নেয়া হল।

একজন পাকা স্টেটস্‌ম্যান হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করলেন রাষ্ট্রপতি খন্দোকার মোশতাক আহমদ

প্রতিনিধিদের মুখোমুখি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখলেন তিনি। অতি কঠোর এবং যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন তার নিজস্ব চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

আমাদের আলোচনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেককে ডেকে পাঠানো হল প্রেসিডেন্টের অফিস কক্ষে। তারা দু'জনেই কামরায় ঢুকে প্রেসিডেন্টকে সেল্যুট করে দাড়াল। ভাব গম্ভীর পরিবেশ। আমরাও রয়েছি একপাশে। প্রেসিডেন্ট মোশতাক জানতে চাইলেন,

— বলো, তোমাদের কি বলার আছে ? কর্নেল মান্নাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদদের তরফের দাবিগুলি একটা একটা করে ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্টের জবাব জানতে চাইলেন।

সব কিছু শুনে খন্দোকার মোশতাক ধীর স্থিরভাবে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বললেন,

— - Well I have heard you patiently, go back and tell the people at the cantonment, if they want me to continue as the President then I shall execute my responsibilities at my own terms for the best interest of the nation and the country. I am not at all prepared to remain as the head of state and government to be dictated by some Brigadier. Before anything I want the chain of command be restored immediately and Khaled should allow my three chief of staffs to come over to Bangabhaban without any further delay. Khaled should also withdraw the troops from the relay station so that the national radio and TV can resume normal broadcasting at the soonest possible time. My priority at this time is to bring back normalcy in the country. আমার নির্দেশ যদি খালেদ মানতে রাজি না হয়; তবে তাকে বলবে he should come over to Bangabhaban and takeover the country and do whatever he feels like. আমি একটা রিক্সা ডাইকা আগামসী লাইনে যামুগা।

ফিরে গেলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্সে

রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক শেষ করে আমরা ফিরলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্সে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ চাইছিলেন আমরাও তার সাথে যোগ দেই।

প্রেসিডেন্টের জবাব শুনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেকের সঙ্গে ফিরে এলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়াটার্স এ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যান্য সবাই আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

কর্নেল মান্নাফ সবার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খন্দোকার মোশতাকের কাঁধে বন্দুক রেখে তার অভিসন্ধি হাসিল করা সম্ভব হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের চাল যে করেই হোক না কেন তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী জনাব মোশতাক ধরে ফেলেছেন এবং তাই তিনি তার ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। মুহূর্তে চাঁপা আক্রোশে ফেটে পড়ল সবাই। কর্নেল শাফায়াত ক্ষোভে বলে উঠলেন,

— **How dare he speak like that?**

তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বলে উঠলেন,

— **Allright, we shall see.**

বলেই কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মঈন, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, কর্নেল রউফ, মেজর মালেক প্রমুখকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের রুমে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসলেন। খালেদ চক্রের মূল সমস্যা ছিল, সেনা পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার এবং জাতীয় পরিসরে মোশতাক সরকারের জনপ্রিয়তা। আমাদের সমস্যা ছিল খালেদ চক্রের বাকশালপন্থী চেহারা উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ২৫বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় ভারতীয় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ না করে দেয়া। মিনিট বিশেক পর তারা ফিরে এলেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা শেষ করে।

— "ডালিম, খন্দোকার মোশতাক যখন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছেন না; সেক্ষেত্রে তাকে প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।" বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।
— "জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটা হবে সংবিধান বিরোধী। তাছাড়া, আইনের মানুষ হয়ে জাষ্টিস সায়েম কি অসাংবিধানিকভাবে এভাবে রাষ্ট্রপ্রতি হতে সম্মত হবেন?" জবাবে প্রশ্ন করলাম আমি।
— **Well,** যে ভাবেই হোক না কেন; এই হস্তান্তরকে আইনসম্মত করে নিতে হবে। জাষ্টিস সায়েমকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা থেকে আঁচ করতে অসুবিধা হল না কোন অদৃশ্য সুতার টানে তিনি এ ধরণের সংবিধান বর্হিভূত একটা সমীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন; কোন একটা বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।

— এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপ না করে আমরা কিছুই বলতে পারব না স্যার। আপনি আপনার প্রতিনিধিদের আমাদের সাথে দিয়ে দেন; বঙ্গভবনে ফিরে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের পর তার জবাব তারা আপনার কাছে নিয়ে আসবেন।
— "বেশ তাই হবে।" সম্মত হলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।
— **Well Sir, if there is nothing else from your side then I think we should leave now.**

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। সেই ক্ষণে অপ্রত্যাশিতভাবে খালেদ ভাই বললেন,

— ডালিম, একটা কথা- আমরা জানি তুমি, নূর, পাশা, শাহরিয়ার, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন ও

অন্যান্যরা সবাই নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। স্বাধীনতা যুদ্ধকাল থেকেই দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণাও প্রায় এক। আমাদের তরফ থেকে আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, কর্নেল রশিদ এবং কর্নেল ফারুক ছাড়া কারো বিরুদ্ধেই আমাদের তেমন কোন অভিযোগ নেই। **Rather we expect your co-operation to fulfill our dreams. I request earnestly, please join us and strengthen our hands for the cause.**

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা শুনে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। অভাবনীয় প্রত্যাশা! বুঝতে পারছিলাম না তার এ প্রস্তাবে কতটুকু আন্তরিকতা রয়েছে। পাল্টা ক্যু'দাতার তাৎপর্য কি ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসররা বুঝতে পারছেন না? এটা অসম্ভব! আর সব বুঝে শুনে এ ধরণের প্রস্তাব রাখার মানে হল এটাও একটি অতি সূক্ষ্ম চাল। প্রেসিডেন্টের মত আমাদেরও এই রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন চক্রান্তকারীরা। একটু ভেবে নিয়ে আমি জবাব দিলাম,

— স্যার, এখন পর্যন্ত নিজেদের সম্পর্কে ভাববার কোন সময়ইতো পেলাম না তাছাড়া ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া আমাদের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক করা হবে আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব। স্যার, আপনার স্বপক্ষে যারা রয়েছে তাদের অনেকেই ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় আমাদের স্বপক্ষেই ছিল। এ সম্পর্কে আপনিও অবগত রয়েছেন। আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করেই বলছি, জেনারেল জিয়া আমাদের কিংবা আগষ্ট বিপ্লবের তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অথবা সেনাবাহিনীর স্বার্থ রক্ষা করে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এর কোনটাই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। এ ধরণের অভিযোগ এবং প্রচারণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে করি আমরা। বিনা কারণে তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে তার উপর অনাস্থা আনার অজুহাতে এই ধরণের একটা জাতীয় সংকট সৃষ্টি করার উদ্যোগ কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি করার প্রস্তাবর পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এতটুকুই বলবো, ১৫ই আগষ্টের চেতনা এবং ৩রা নভেম্বরের উদ্দেশ্য এক নয়। ১৫ই আগষ্ট এবং ৩রা নভেম্বরের ঘটনা কোন দিনই বাংলাদেশের ইতিহাসে একইভাবে লেখা হবে না।

স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের নাগপাশ এবং বিদেশী প্রভুদের জাতাকল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীনতার চেতনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব। আগষ্ট বিপ্লবের সফলতা এবং এর প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এক উজ্জ্বল-অবিস্মরণীয় মাইলফলক হয়ে চিহ্নিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। আপোষহীন সংগ্রামী বাংলাদেশীদের জন্য জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিভু হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে ১৫ই আগষ্টের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। পক্ষান্তরে, ৩রা নভেম্বরের ঘটনা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তের কালো অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হবে ইতিহাসে। জানি, আমার এই বক্তব্য ঠিক এই মুহূর্তে আপনাদের কারো কাছেই গ্রহণীয় নয়; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতই আমার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করবে। আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করি সেটা যথা সময়ে আপনারা জানতে পারবেন।

এভাবেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগিদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে বঙ্গভবনে ফিরে এলাম। সঙ্গে এসেছিলেন তাদের দুই প্রতিনিধি কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক। পথে নূর আমায় বলল,

— স্যার আপনি যেভাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কথাগুলো বলছিলেন তাতে আমি কিন্তু বেশ কিছুটা শংকিতই হয়ে উঠেছিলাম।

নূরের কথার কোন জবাব না দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম-

যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে নূর। এতটা খোলাখুলিভাবে ঐ ধরণের কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ছিল একটা বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কথাগুলি বেফাঁস বেরিয়ে

এসেছিল মুখ দিয়ে অটোম্যাটেকেলি। নিঃস্বার্থভাবে কোন সঠিক এবং মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলে প্রয়োজনীয় সাহসিকতা হয়তো বা আল্লাহ্‌তা'য়ালাই যুগিয়ে দেন।

বঙ্গভবনে ফিরে এসে প্রেসিডেন্টকে জানালাম, চক্রান্তকারীরা জাষ্টিস সায়েমের মাধ্যমে ক্ষমতা পুনর্দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সব শুনে প্রেসিডেন্ট মোশতাক জাষ্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার এ সিদ্ধান্তের কথা জেনে নিয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক বঙ্গভবন থেকে ফিরে যান।

সেনা পরিষদ সাময়িকভাবে চিহ্নিত নেতাদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা ছিল একটি সাময়িক কৌশল মাত্র।

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের পর সেনা পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠক হয়। বৈঠকে বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের exposed নেতারা কৌশলগত কারণে দেশ ত্যাগ করে দেশের কাছাকাছি কোন রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে অবস্থান নেবে। সার্বিক বিবেচনায় ব্যাংকক-কেই সর্বত্তোম জায়গা হিসাবে বিবেচিত করা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কি করে খালেদ চক্রের পতন ঘটাতে হবে সেই বিষয়ে। জাতীয় বেঈমান পরাজিত আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি এবং তাদের মুরুব্বী ভারতের হাতে ক্রিয়াণক খালেদ চক্রকে উৎখাত করার জন্য সেনা পরিষদ কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন গণবাহিনী এবং জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক অন্যান্য দল ও গ্রুপ নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে খালেদ চক্রের মুখোশ উন্মোচিত হবার পর উপযুক্ত সময়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট মোশতাক এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সম্পর্কে। সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ চক্রের পতনের পর সর্বপ্রথম কাজ হবে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাকে আবার সেনা প্রধান হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। নিজ পদে অধিষ্ঠিত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আহবান জানাবেন। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, নেতৃবৃন্দের যে অংশ ব্যাংককে অবস্থান করবে তার সাথে প্রয়োজনমত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে সেনা পরিষদ। জরুরী বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের ইউনিটগুলোকে জানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। কর্নেল তাহেরও তখন বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। বৈঠক যখন শেষ হয় তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংককে যাবার সব ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েট থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদকে আমাদের দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য ফোন করলাম,

— স্যার, আমাদের ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি হয়তো বা জেনেও থাকতে পারেন। তবুও কথা দিয়ে এসেছিলাম তাই কথা রক্ষার্থে জানাচ্ছি: রশিদ, ফারুক, শাহরিয়ার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, মোসলেম, হাশেম, মারফত এবং আমি স্বপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতেই চলে যাব আমরা। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীয়েটের মাধ্যমে। আপনার সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না স্যার। দেশ ও জাতির জন্য ভবিষ্যতে আর কিছু করার তৌফিক আল্লাহ্পাক যদি নাই দেন সেটা মেনে নিতে পারব; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে '৭১ এর চেতনা এবং নীতির প্রশ্নে আপোষ করে জাতীয় বেঈমান হিসাবে পরিচিতির যে গ্ল্যানি সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়; হবেও না কোনদিন।

— "রশিদ-ফারুক সম্পর্কে আমাদের বিরুপ মনোভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে যেতে চাইতে পারে কিন্তু তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ কেন সেটা এখনো বুঝতে পারছি না।" আবার কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

মুখে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও বুঝেছিলাম আমাদের দেশ ত্যাগের খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়েই বেচেঁছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগিরা এটা ভেবে যে, তাদের প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠির threat থেকে রেহাই পেলেন তারা।

এভাবেই দেশ ও জাতিকে একটি সম্ভাব্য আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে খালেদ চক্র ও নব্য চানক্যদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার কৌশলগত কারণেই ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটি স্পেশাল ফ্লাইটে আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ সালের বৈপ্লবিক সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান

ব্যাংককের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশ ত্যাগের পর মাত্র ৩ দিনের মধ্যেই সেনা পরিষদ এবং গণবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। অন্যান্য দেশপ্রেমিক এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহও ঐ অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। দেশপ্রেমিক বীর সেনানীদের সাথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগ দেয় জাগ্রত জনতা।

আমাদের দেশ ত্যাগের মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে মূলতঃ সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্থ গণবাহিনীর যৌথ নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লব। ক্ষমতাচ্যুত হয় খালেদ চক্র। জাতীয় বেঈমান ও তাদের বিদেশী প্রভুদের সব চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন করে দেয় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা। দেশের আপামর জনসাধারণ ৭ই নভেম্বরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জানিয়ে সেনাবাহিনীর বীর জোয়ানদের সাথে যোগ দেয় ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা সমর্থন জানিয়েছিল আগষ্ট বিপ্লবকে। এই দুই ঐতিহাসিক দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগ্রামী জনতার ঢল নেমেছিল পথে-প্রান্তরে, অলিতে-গলিতে, শহরে-গ্রামে। নামাজে শুক্‌রানা আদায় করেছিলেন মুসল্লিরা মসজিদে-মসজিদে। শহর-বন্দরে খুশীতে আত্মহারা জনগণের মাঝে মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং জনগণের একাত্মতায় সৃষ্টি হয়েছিল এক দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য। সেই দুই ক্রান্তিলগ্নে সম্মিলিতভাবে তারা বাংলাদেশকে পরিণত করেছিল এক দুর্জয় ঘাঁটিতে। সমগ্র জাতি প্রস্তুত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যেকোন আগ্রাসন কিংবা হুমকির বিরোধিতা করার জন্য। সফল বিপ্লবের পর কুচক্রীদের নেতা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং তার কয়েকজন ঘনিষ্ট সহযোগী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। কর্নেল শাফায়াত জামিল ও অন্যান্যদের বন্দী করা হয়। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে আবার তাকে আর্মি চীফ অফ স্টাফের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার আবেদন জানান। কিন্তু জনাব খন্দোকার মোশতাক আহমদ জেনারেল জিয়াউর রহমানের আবেদনে পুনরায় রাষ্ট্রপতি হতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ না করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি ঐদিনই জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দান করে ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনা দুইটি একই সূত্রে বাঁধা। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল এই দুইটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। ১৫ই আগষ্ট অগ্রণীর ভূমিকায় ছিল সেনা পরিষদ আর ৭ই নভেম্বর একই দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেছিল সেনা পরিষদ এবং কর্নেল তাহেরের অধিনস্থ গণবাহিনী। এই দুইটি ঐতিহাসিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনা, ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার চেতনা, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার চেতনা- এক কথায় বলতে গেলে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

৩রা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর এই সময়ের আমার এ ঘটনা বিবরণের স্বপক্ষে প্রমাণ হয়ে আছে ৭ই নভেম্বর সফল বিপ্লবের পর সৈনিক-জনতার মুখে ধ্বনিত শ্লোগানগুলি। সেদিন ঢাকার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল গগনবিদারী শ্লোগানে,

নারায়ে তাক্‌বীর। আল্লাহু আক্‌বর।

সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। খালেদ চক্রের রক্ত চাই।
খন্দোকার মোশতাক জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
মেজর ডালিম জিন্দাবাদ। কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ।
ডালিম তাহের ভাই ভাই। বাকশালীদের রক্ষা নাই।
রশিদ-ফারুক জিন্দাবাদ। খালেদ মোশাররফ মুর্দাবাদ।
জেনারেল জিয়া যেখানে, আমরা আছি সেখানে।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ এর বৈপ্লবিক সফল অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে নিজ মহিমায়। সেদিন আগষ্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাটি থেকে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটেছিল এবং উম্মোচিত হয়েছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্বার। আগষ্ট বিপ্লব বাকশালী কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে গতিশীলতার সৃষ্টি করে সূচনা করে এক নতুন দিগন্তের। '৭৫ এর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময় বাকশালী প্রবীণ নেতা মরহুম আব্দুল মালেক উকিল লন্ডন সফর করছিলেন। মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তখন সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "**বাংলাদেশে ফেরাউনের পতন হয়েছে।**" আওয়ামী-বাকশালী নেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ খন্দোকার মোশতাক সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে ছুটে গিয়েছিলেন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে আগষ্ট বিপ্লবের অপরিহার্যতা বুঝিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করার জন্য। জনাব আবু সাইদ চৌধুরী মুজিব সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতিও স্বেচ্ছায় খন্দোকার মোশতাকের বিশেষ দূত হিসেবে ও পরবর্তিকালে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র সফর করে আগষ্ট বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সে সমস্ত দেশের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৫ই আগষ্ট বৈপ্লবিক অভুত্থান ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মেষ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তারই ধারা আজও দুর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির প্রতীক ১৫ই আগষ্টের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার চেতনা সর্বকালে সর্বযুগে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিক ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে নব্য সৃষ্ট মীরজাফর ও জাতীয় বেঈমানদের উৎখাত করতে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জ্বলন্ত নিদর্শন ১৫ই আগষ্টের মহান বিপ্লব।

গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল!

শেখ মুজিবকে জাতির পিতা কিংবা বঙ্গবন্ধু হিসেবে মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতার মর্যাদা দেবার বিষয়টি জনগণের আবেগের সাথে জড়িত। শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা আইনের দাপটে ঐ আবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। স্বাধিকারের আন্দোলনের মুজিবের অবদান অন্যান্য নেতাদের মতই সর্বজন স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব যখন ক্ষমতাসীন হন তখন তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তার আমলেই দেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, সেখানে তাকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য জনগণের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। মাত্র তিন বছরের মাথায় দুঃশাসনের জন্য তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। '৭৫ এর জানুয়ারীতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারী একদলীয় বাকশাল কায়েম করে তিনি পারিবারিক রাজতন্ত্রই কায়েম করেছিলেন। স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে জনগণকে মুক্ত করেছিল ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের পর খন্দোকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান তার সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বাকশালীয় সাংসদরা মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদও করলেন না; শেখ মুজিবের মন্ত্রীদের বৃহদাংশ মোশতাক সরকারে যোগ দিলেন। রক্ষী বাহিনীর প্রধান কোন প্রতিক্রিয়াও দেখালেন না। পক্ষান্তরে জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল সে কথা ঐ সময়ে যাদের বয়স অন্ততঃ ১০/১২ বছর তাদেরও স্পষ্ট মনে থাকার কথা। গত ১৫ই জুলাই ২০০১ সালের রাতে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হবার পরপরই স্বতঃস্ফুর্তভাবে জনগণ বিপুল সংখ্যায় মুক্তির আনন্দ যেভাবে প্রকাশ করেছে, '৭৫ এর আগষ্টে জনগণ এর চেয়েও বহুগুন বেশি আবেগ-উচ্ছাস ও আনন্দে মেতে উঠেছিল। উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিবকে জনগণ জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করেনি। বরং তার কুশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করেছে। এবং আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, শেখ মুজিব কখনোই জনগণের মনে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তা না হলে তার নিহত হবার কারণে রাস্তায় নেমে জনগণ অবশ্যই বিলাপ করতো। বিলাপ করা তো দূরের কথা কেউ প্রকাশ্যে সেদিন "ইন্নালিল্লাহ...." পড়েছে বলেও নাকি জানা যায়নি। বঙ্গবন্ধু উপাধিতে যারা তাকে ভূষিত করেছিল তারাই আবার সে উপাধি ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম

২রা নভেম্বর ১৯৭৫ সাল। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও তার সঙ্গীরা প্রতিবিপ্লবী ক্যু'দাতা ঘটাবার চেষ্টা করে

১৯৪৬ সালে জন্ম। বি. এস. সি গ্রাজুয়েট। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর তিনি বিমান বাহিনী থেকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই সুদূর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে যে দলটি সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও কৃতিত্বের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন। একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

শেখ মুজিবের স্বৈর শাসনকালে ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং ৯ (PO-9) এর প্রয়োগে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর তাঁকে সেনাবাহিনীতে পুর্ণঃনিয়োগ করা হয় এবং লেঃ কর্ণেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত হবার পর গণচীনে তাঁকে কূটনীতিক হিসাবে প্রেরণ করা হয়। ১৯৮০ সালে লন্ডন হাই কমিশনের সাথে তিনি এ্যাটাচ্‌ড হন। ১৯৮২ সালে কমিশনার হিসাবে হংকং এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কেনিয়ায় পোষ্টেড হন। একই সাথে তাঁকে তানজানিয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইউনেপ (UNEP) এবং হেবিটাট (HABITAT) এ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সোমালিয়ায় যুদ্ধকালীন সময়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর অংশ হিসাবে প্রেরিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক তত্বাবধানের বিশেষ দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর লাভ করেন। এরপর দেশে ফিরে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। তিনি বিবাহিত এবং এক কন্যার জনক। তার শখ হল বই পড়া, ভ্রমণ, খেলাধুলা এবং সঙ্গীত।

....সমসাময়িক ভাবনা

জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫
এবং
অব্যাহতি আইনসমুহ

এই অবিস্মরনীয় দিনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে। তখন থেকেই দেশবাসী শ্রদ্ধার সাথে এই দিনটি উদযাপন করে আসছেন। শুধুমাত্র শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী-বাকশালীরা দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করতে অস্বীকার করে আসছেন বোধগম্য কারণে। এমনটি করলে তাদের অতীত ঐতিহাসিক ব্যর্থতাকে মেনে নিতে হয়। তেমন ঔদার্য্য দেখানো শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা কখনোই সম্ভব নয়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে হিজাব ধারণ করে, হাতে তাসবিহ্ নিয়ে নিজেদের অতীত ভুলভ্রান্তির জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে দেশবাসীর কাছে ভোট ভিক্ষা করেন শেখ হাসিনা। ছলনাময়ী আচড়ন, অস্থায়ী সরকারাধীন প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ সুযোগ সন্ধানী একটি গোষ্ঠীর চক্রান্তের পরও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পেরে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে সমর্থ হন হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ; দীর্ঘ ২১ বছর পর। কিন্তু ক্ষমতায় বসার পরমুহূর্তেই হিজাব ও তাসবিহ্ এর লেবাস পরিত্যাগ করে অল্প সময়ের মধ্যেই জনসম্মুখে শেখ হাসিনা এবং তার সহচরগণ স্বরুপে নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটান। জনগণ বুঝতে পারেন আওয়ামী লীগে কোন পরিবর্তন তো হয়নিই বরং জিঘাংসা ও প্রতিহিংসা চিরতার্থ করার জন্য তারা জলার পেত্নীর চেয়েও আরো বেশি হিংস্র ও ভয়ংকর মহিরুহতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে ২০০১ সালের নির্বাচনে ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও নিজেদের বাচাঁবার জন্য জাতি আওয়ামী লীগকে ছুড়ে ফেলে দেয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। শোচনীয় পরাজয় ঘটে শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের। ক্ষমতা গ্রহণের পরেই জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে উদযাপনের জন্য ঘোষিত সরকারি ছুটির দিন বাতিল করে দেয় আওয়ামী সরকার। সংবিধানের তোয়াক্কা না করে অবৈধভাবে ১৫ই আগষ্টের জনসমর্থিত সফল বিপ্লবের নায়কদের বিরুদ্ধে শুরু করা হয় 'মুজিব হত্যা' ও 'জেল হত্যা' বিচারের প্রহসন।

৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় একটা বিরল ঘটনা। এমন ঘটনা জাতীয় ইতিহাসে ঘটে বিশেষ কোনো ক্রান্তিলগ্নে বিশেষ এক পটভূমিকায়। আজ অব্দি ৭ই নভেম্বর নিয়ে নানা ধরণের বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারণা করা হলেও কি ছিল এর পটভূমি? কোন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, কিসের বিরুদ্ধে, কাদের নেতৃত্বে ঘটেছিল এই অভ্যুত্থান সেই সর্ম্পকে কিছুই বলা হয়না। দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহলও এই বিষয়টিকে রহস্যজনকভাবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন সতর্কতার সাথে।

৭ই নভেম্বরের তাৎপর্য্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে দেশবাসী বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মকে অবশ্যই পরিষ্কারভাবে জানতে হবে কয়েকটি প্রশ্নের জবাব :-
কি উদ্দেশ্যে, কোন চেতনা প্রেরণা যুগিয়েছিল সেই অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটাতে?
অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন কারা?

(১) কেন ঘটেছিল সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান?
(২) কি উদ্দেশ্যে, কোন চেতনা প্রেরণা যুগিয়েছিল সেই অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটাতে?
(৩) কিসের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল বিপ্লব?

(৪)   অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন কারা?

এই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে না পেলে জাতীয় সংহতি দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতাই হয়ে থাকবে। জাতীয় চরিত্রে এর মুল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা কখনোই সম্ভব হবে না। ৭ই নভেম্বরের চেতনা ও উদ্দেশ্য সর্ম্পকে জানতে হলে '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকেই শুরু করতে হয়।

২৫শে মার্চ '৭১ এর কালরাত্রিতে তদানীন্তন পাকিস্তানের অর্বাচীন সামরিক জান্তার নির্দেশে সামরিক বাহিনী যখন হায়নার মত নজিরবিহীন পাশবিক বর্বরতায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল তখন প্রস্তুতিহীন জাতিকে তোপের মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপদ আস্তানায় পাড়ি জমান। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি ছাত্র সমাজ ও আপামর জনগণের সব মিনতি ও অনুরোধ উপেক্ষা করে তার দলীয় নেতাদের প্রাণ বাচানোর জন্য পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার আকুতিকে শেখ মুজিব খারিজ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে বন্দুকের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। শেখ মুজিবের স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যগণ হলেন সরকারী অতিথি। তার এই ধরণের কাপুরুষোচিত বিশ্বাসঘতকতায় জাতি ক্ষণিকের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সন্ধিক্ষনে সেনাবাহিনীর এক অজ্ঞাত তরুণ অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো কয়েকজন সমমনা তরুণ সহকর্মীদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় চট্টলার কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন স্বাধীনতার। জাতির প্রতি আহ্বান জানালেন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার। তার সেই দিক নির্দেশিকার ফলেই সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, আনসার-মুজাহিদ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের কেন্দ্র করে সকল স্তরের জনগণ গড়ে তুলেছিলেন দেশব্যাপী জাতীয় প্রতিরোধ। তারই পরিণতিতে গড়ে উঠে স্বাধীনতার সংগ্রাম।

কিন্তু আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের কর্ণধার চানক্য গোষ্ঠি। বন্ধুত্বের আবরণে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন চিরতার্থ করার জন্য প্রণয়ন করে সুদুরপ্রসারী এক নীলনকশা। মূল লক্ষ্য তাদের পরম শত্রু পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে তার শক্তির ভিতকে দূর্বল করে 'অখন্ড ভারত' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চিরন্তন খায়েশ কায়েমের পরিকল্পনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একই সাথে স্বাধীন বাংলাদেশকে তাদের করদ রাজ্যে পরিণত করা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সব কৃতিত্বের একক দাবিদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানোর ভারতীয় সমর্থন ও অঙ্গিকারের পরিপ্রেক্ষিতে তদকালীন কোলকাতা নিবাসী অস্থায়ী প্রবাসী সরকার এবং পরবর্তীকালে মুজিব সরকার ভারতের সেবাদাসের ভূমিকা পালনের দাসখত লিখে দেয়। শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে এবং লাখো শহীদের রক্ত ও হাজারো মা-বোনের ইজ্জতের সাথে বেঈমানী করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। শুধু কি তাই? '৭১ থেকে আজাব্দি জাতিয় মুক্তি সংগ্রামের একচ্ছত্র দাবিদার বনবার র্নিলজ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করে দেশকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত করল মুজিব সরকার। মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং বাকশালী একদলীয় স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এবং বিভিষিকায় আজো আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠে বাংলার মানুষ।

শেখ মুজিবের উত্তরসূরী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তাদের বিগত ৫ বছরের অপশাসন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুজিব আমলের সেই বিভিষিকাময় ইতিহাসকেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে ফেরার পথে সদ্য প্রসুত দেশের জন্য দুটো উপহার নিয়ে আসলেন।

১। তিনি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চারটি নীতিকে আমাদের শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভে প্রতিষ্টিত করলেন। হিটলারের 'মেইন ক্যাম্ফ' এর অনুকরনে 'মুজিববাদ' নামক এক উদ্ভট রাজনৈতিক দর্শণ উদভাবন করলেন। দেশবরেন্য রাজনীতি বিশারদ এবং চিন্তাবাদীদের কেউই তার সেই উদভট সৃষ্টিকে রাজনৈতিক দর্শণ হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন না। বরং তারা 'মুজিববাদ' এর মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক এক নায়কত্বেরই পূর্বাভাষ দেখতে পান।

২। তিনি ভারতীয় জাতীয় সঙ্গিত রচয়িতার একটি কবিতাকেই পছন্দ করে সেটাকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গিতের মর্যাদা দিলেন। এ ধরনের হঠকারিতা কার পক্ষে সম্ভব; একজন দেশ প্রেমিক না একজন দেশদ্রোহীর? এ বিচারের ভার থাকল স্বদেশবাসীর উপরই।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই চানক্যদের ওই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই। তাদের পক্ষে প্রবাসী সরকার ও শেখ মুজিবের সেবা দাসত্ব মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। তারা কখনোই শুধুমাত্র ভৌগলিক স্বাধীনতার নামে ইসলামাবাদের গোলামীর পরিবর্তে দিল্লীর দাসত্ব মেনে নিতে পারেননি। তাদের চেতনা ছিলো সত্যিকার অর্থে স্বাধীন, সমৃদ্ধ, সুখী এক বাংলাদেশ। তাই স্বাধীনতা উত্তরকালে তারাই আওয়ামী-বাকশালী স্বৈরচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে গড়ে তোলেন সংগঠিত প্রতিরোধ সংগ্রাম। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শ্বেত সন্ত্রাসের জাতাকলে প্রতিপক্ষের শক্তিকে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে। তাদের বেশির ভাগই ছিল জানবাজ মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার পর মুজিব সরকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয় জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে। স্বৈরশাসনের স্বার্থে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে মুজিব সরকার এবং আওয়ামী লীগ কখনোই জনগণের বিরুদ্ধে দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনি। এর মূল কারণ; বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল পরিক্ষিত জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তান থেকে দীর্ঘ কারা নির্যাতন ভোগকারী সেনা সদস্যদের সমন্বয়ে। তাই যুক্তিগত কারণেই বিশ্বের অন্য কোন পেশাদার সামরিক বাহিনী থেকে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর চরিত্র হল ভিন্ন প্রকৃতির। দেশ ও জনগণের স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য; কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি কিংবা দলের কায়েমী স্বার্থ নয়। এর ফলে সামরিক বাহিনীকেও পরতে হয় মুজিব সরকারের রোষানলে। পরিণামে সেনাবাহিনীতেও সময়ের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে দুটি গোপন সংগঠন। 'সেনা পরিষদ' ও 'গণবাহিনী'। জাতীয়তাবাদ ও দেশেপ্রেমের প্রশ্নে এই দুটি সংগঠন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সংগঠন-গ্রুপগুলোর অঙ্গীকার ছিল এক ও অভিন্ন। পার্থক্য ছিলো নীতি আদর্শের। সেনা পরিষদের আদর্শ ছিলো দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। গণবাহিনীর আদর্শ ছিলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

আওয়ামী-বাকশাল শাসনামল ছিল বর্বরতার নজীরে পূর্ণ। হাজারো পৃষ্ঠায় তার বিবরণ শেষ হবার নয়। তবুও স্বৈরশাসনের একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল।

আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করেন। জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেন স্বৈরতান্ত্রিক এক দলীয় বাকশালী শাসনের জোঁয়াল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারসহ সকল রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। সরকারি নিয়ন্ত্রনে মাত্র ৪টি দৈনিক রেখে বাকি সব প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিচার বিভাগের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে বিচার বিভাগকে প্রশাসনের অধিনস্থ করা হয়। এভাবেই আইনের শাসনের কবর রচিত হয়। আওয়ামী-বাকশালী শাসনামল ছিল মূলতঃ হত্যার ইতিহাস, নারী নির্যাতনের ইতিহাস, লুণ্ঠনের ইতিহাস,

শোষণের ইতিহাস, চোরাচালানের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার ইতিহাস, জাতীয় অর্থনীতিকে বিকিয়ে দেবার ইতিহাস, রক্ষীবাহিনীর শ্বেত সন্ত্রাসের ইতিহাস, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা ও লাখো শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানীর ইতিহাস। রাষ্ট্রীয়করণের নামে আওয়ামী লীগ ব্যাংক, বীমা, মিল, কল-কারখানায় হরিলুট করেছিল। দেশে সম্পদ পাচাঁর করার জন্য সীমান্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। আওয়ামী শাসনামলে অবাধ লুটপাটের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে 'তলাহীন ঝুড়ি' আখ্যা পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের আমলে বিদেশী সাহায্যের বেশিরভাগ মালই ভারতের কোলকাতা ও বিশাখা পাট্টম বন্দরে খালাস পেতো। একাত্তরের যুদ্ধ আর ধ্বংসযজ্ঞের পর বাহাত্তরে কোন দুর্ভিক্ষ না হয়ে আওয়ামী লীগের শাসন ও শোষণের ফলে '৭৪-এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও বাকশাল সরকার তাদের শাসনামলে এ দেশের জনগণকে গণতন্ত্রের নামে দিয়েছিল স্বৈরাচার; সমাজতন্ত্রের নামে শুরু করেছিল সামাজিক অনাচার; বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে জাতিকে করেছিল বিভক্ত; আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যুগিয়েছিল ধর্মহীনতার ইনদ্ধন।

এভাবে স্বৈর সন্ত্রাসের নাগপাশে সমগ্র জাতিকে আবদ্ধ করে শ্বাসরুদ্ধকর অসহায় অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রসের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সরকার বিরোধীদের সব শক্তি শেষ করে দেয়া হয়েছিল। সাংবিধানিক এবং গনতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যেই এসমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

এভাবেই জাতির জীবনে নেমে আসে এক চরম হতাশা। চারিদিকে দেখা দেয় ঘোর অন্ধকার। প্রানভরে শ্বাস নিতেও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পরেছিল সাধারন জনগণ।

সেই সন্ধিক্ষনে আবারো শেখ মুজিবের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি সোচ্চার হয়ে উঠেন সেনাবাহিনীর আরেক তরুণ অফিসার বঙ্গ সার্দুল কর্ণেল জিয়াউদ্দিন। ১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, **"Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."**

নির্ভিক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পঁচিশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন,
-We fought without him and won. If need be we will fight again without him.

১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না হত তাহলে গণতন্ত্রের বধ্যভূমিতে আজকের শতাধিক রাজনৈতিক দলকে একদলীয় বাকশালের ধ্বজা বহন করেই বেড়াতে হত। এমনকি আওয়ামী লীগ নামক কোন দলেরও পুনর্জন্ম হত না। আওয়ামী-বাকশালীদের অনাসৃষ্টির জন্য বিধ্বস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘানি দেশবাসীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানতে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, গোলাবারুদ, স্বর্ণ, মূল্যবান ধাতু, যানবাহন, মিল-কারখানার মেশিনপত্র, কাঁচামাল ভারতের হাতে তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগ সমগ্র জাতিকে প্রতিপক্ষ মনে করতে থাকে। এসমস্ত কিছুর পরও আওয়ামী লীগ নিজেদের স্বাধীনতার সোল এজেন্ট বানাবার চেষ্টা করে আসছে র্নিলজ্জভাবে। এসবের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দেশমাতৃকার অন্যতম সেরা সন্তান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল বীর উত্তম কে গ্রেফতার করা হয়েছিল;

প্রাণ হারাতে হয়েছিল বিপ্লবী সিরাজ সিকদার ও হাজারো মুক্তিযোদ্ধাকে। লাঞ্ছণার শিকারে পরিণত হতে হয় অনেক দেশপ্রেমিককে। ২৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদী অসম চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বন্ধক রেখেছিল আওয়ামী লীগই। লালবাহিনী, নীলবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, রক্ষীবাহিনীসহ ইত্যাকার নানা রকমের বাহিনী গঠনের দ্বারা দুঃসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বিনা বিচারে চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ সংহার করার কালো ইতিহাস আওয়ামী-বাকশালীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রাজনৈতিক নেতা জনাব সিরাজ সিকদারকে নির্মমভাবে পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করার পর শেখ মুজিব স্বয়ং সংসদ অধিবেশনে ক্ষমতার দম্ভে বলেছিলেন, "কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?" ২৩/১/১৯৯২ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে '৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসন প্রসঙ্গে জনাব মওদুদ আহমেদ বলেন,
"১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পর ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে আমাকে বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দী করা হয়েছিল। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনতে পারেনি সেদিন। এই তোফায়েল সাহেবই রক্ষীবাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন। আর এই বাহিনীর হাতেই এ দেশের ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছে। সিরাজ সিকদারের হত্যার কথা আজো এ দেশবাসী ভুলে যাননি। '৭২ থেকে '৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট অব্দি আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল এ দেশের ইতিহাসে সবচাইতে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

জাতির আশা আকাংখাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে ব্যবস্থা টিতে থাকেতে পারে না। জনসমর্থন ছাড়া কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। জাতীয় বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা যখন জাতির কাঁধে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্রের বোঝা চাপিয়ে দেয়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থ হাসিলের জন্য মীরজাফর বা রাজাকার-আলবদরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর তাগিদে, তাদের দুঃশাসন উৎখাত করার জন্য দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যুগে যুগে। একই যুক্তিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বিপ্লব সংগঠিত করা হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের নেতৃত্বে। সেই বিপ্লব ছিল একটি সফল অভ্যুত্থান। দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ ও স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। বাকশাল সরকারের উৎখাত ও মোশতাক সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন এ কথাই প্রমাণ করেছিল জনগণের আশা আকাংখার সাথে বাকশালের কোন সম্পর্ক ছিল না। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনও ছিল না। এমনকি আওয়ামী লীগের বৃহদাংশেরও সমর্থন ছিল না শেখ মুজিবর রহমানের একদলীয় স্বৈরশাসনের প্রতি। ১৫ই আগষ্টের অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থন পেয়ে একটি জনপ্রিয় বিপ্লবে পরিণত হয়।

১৪ই আগষ্ট রাতে ঢাকা বিগ্রেডের নাইট প্যারেড তাই ১৫ই আগষ্ট সুবেহ্ সাদেক বিপ্লবের দিন ঠিক করা হল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে। বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের সব প্রস্তুতি শেষ করে আল্লাহ্‌তা'য়ালার নাম নিয়েই বিপ্লব শুরু করা হল, প্রভাতের প্রথম প্রহরে সমগ্র জাতি তখন গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত। সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করা হল প্রথম প্রতিপক্ষের তরফ থেকেই। গুলিতে তিনজন বিপ্লবী শহীদ হলেন। শুরু হল পাল্টা আক্রমন। অল্প সময়ের মধ্যে সফল অভ্যুত্থানে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ঘটল। রেডিও বাংলাদেশের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হল, শেখ মুজিব সরকারের পতনের কথা। একই সাথে ঘোষণা করা হল, খন্দোকার মোশতাক আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কারফিউ জারি করা হল দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। জনগণের কাছে আবেদন জানানো হল, বিপ্লবের সমর্থনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য।

স্বৈরাচারী মুজিব সরকারের পতন ঘটেছে জানতে পেরে সমগ্র জাতি সেদিন স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে ঢাকার রাস্তায় লোকের ঢল নেমেছিল।

জনগণ সারাদেশ জুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলন স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে। মসজিদে মসজিদে লোকজন সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল মহল্লায় মহল্লায়। শেখ মুজিব ও তার দোসরদের জন্য সেদিন বাংলাদেশের জনগণ "ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন" পড়তেও ভুলে গিয়েছিলেন। সবারই এক কথা, "**দেশ জালিমের হাত থেকে বেঁচে গেছে।**"

বাকশালী শাসনে জনগণ ছিলেন অতিষ্ঠ। কিন্তু আওয়ামী-বাকশালী গোষ্ঠি যে এতটা ধিকৃত হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে সেটা উপলব্দি করতে পারা গিয়েছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর জনগণের অভূতপূর্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের বহিঃপ্রকাশে। বাংলাদেশের মানুষ জাতির ক্রান্তি-লগ্নে অতীতে সবসময় সঠিক রায় দিয়ে এসেছেন সেটাই তারা আরেকবার প্রমাণ করলেন ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। আগষ্ট বিপ্লবের নৈতিক বৈধতার প্রমান দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় সংসদে মরহুম শেখ মুজিবের উপর একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম জিয়াউর রহমান এবং স্পীকার ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। কোন মৃত ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে প্রথাগতভাবে তার জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনানো হয় এবং সংসদের কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেখ মুজিবের উপর যে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তা উত্থাপন করেন স্বয়ং মীর্জা গোলাম হাফিজ। তার পঠিত শেখ মুজিবের জীবন বৃত্তান্তের শেষ লাইনে বলা হয়, "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।" (সংসদ কার্যবিবরণীর সংরক্ষিত দলিল।)

এটাই মূল কথা। শেখ মুজিবের মৃত্যু একটি সাধারণ হত্যাকান্ড নয়। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায়। একই দিনে শেখ মুজিবের পতনের রাজনৈতিক দিকটি খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। সেটা তিনি করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুমোদনক্রমে। তিনি বলেছিলেন,
-১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কুখ্যাত কালা কানুন পাস করে বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরাচারী জগদ্দল পাথর দেশের তৎকালীন ৮ কোটি লোকের বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; সেটা ছিল একটা সংসদীয় ক্যু'দাতা। ঐ একদলীয় স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সংগঠিত হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।" (সংসদ কার্যবিবরণীর সংরক্ষিত দলিল।)

একই অধিবেশনে পরে তিনি ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি ২৪১ ভোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়ে আইনে পরিনত হয়। ফলে ইনডেমনিটি আইন পঞ্চম সংশোধনী হিসেবে সংবিধানের অংশে পরিণত হয়। এভাবেই জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নির্বাচিত সাংসদরা ১৫ই আগষ্টের বিপ্লবের স্বপক্ষে চূড়ান্ত ফয়সালা করে বিপ্লব ও বিপ্লব সংগঠনকারীদের সাংবিধানিক বৈধতা দান করেছিলেন।

আজঅব্দি অতিত এবং বর্তমান সরকার প্রদত্ত ইনডেমনিটিগুলোর সাংবিধানিক বৈধতা দান করার বিষয় সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা বিবৃতি এবং লিখিত প্রতিবেদন জনগনের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, পক্ষে ও বিপক্ষে। এর বেশিরভাগই অস্বচ্ছ এবং প্রশ্নবোধক। এইসব আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার দেখা যায় আওয়ামী লীগকে। বিশেষ করে দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এই বিষয়ে অতিমাত্রায় বিশেষভাবে বিষেদ্‌গার করে চলেছেন। আওয়ামীপন্থী কিছু চিহ্নিত বুদ্ধিজীবিও ঐ কোরাসে একই সুরে তান তুলেছেন।

একজন সচেতন নাগরিক এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইনডেমনিটি সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত তথ্য পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি যুক্তিসঙ্গত কারণেই। কিছুটা হলেও এই তথ্যসমূহ জনমনে ধুম্রজাল সৃষ্টি করার যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রবাহে ঘটিত বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে নিয়ে; সেই কথার মারপ্যাঁচের আচ্ছাদনের ভেতর থেকে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন সেই প্রত্যাশায়।
ইনডেমনিটি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'ক্ষতিপুরন থেকে আইনি অব্যাহতি প্রদান।' এ ধরনের ইনডেমনিটি দেয়ার রেওয়াজ বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম চালু করা হয়নি। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কোন বিশেষ কার্যক্রম এবং তদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষদের আইন আদালতের উর্দ্ধে রাখার জন্যই এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আজকের বিশ্বে তথাকথিত সভ্যতার প্রতিক, পশ্চিমা দেশগুলি যারা বর্তমানে বিশ্ব পরিসরে মানবাধিকার- গণতন্ত্র ইত্যাদির একচ্ছত্র প্রচারক ও ধারক-বাহক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছে তারাই এই ইনডেমনিটি দেবার রীতি চালু করেছে। শুধু তাই নয়, আজঅব্দি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দেশের প্রচলিত আইনের আওতা বর্হিভুত রাখার রীতিটাও তাদেরই প্রণীত।

এই ধরনের ইনডেমনিটি প্রদানের নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে বৃহত্তর রাষ্ট্রিয় এবং জাতীয় স্বার্থ যথা: - একনায়কত্ব, স্বৈরশাসনের অবসান, বর্হিশক্তির আগ্রাসন থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, মানবাধিকার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি ফেরানো যাক বাংলাদেশের প্রতি।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মরহুম শেখ মুজিবর রহমানের সরকারই ইনডেমনিটি প্রবর্তনের ইতিহাস সৃষ্টি করে। ১৯৭২ সালে সরকারি এক অধ্যাদেশ জারি করে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সব কর্মকান্ড, ঘটনাবলী এবং যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের ইনডেমনিটি দেয়া হয়। এই আইন পাশ করানোর যুক্তিও ছিল রাষ্ট্রিয় এবং জনস্বার্থ। সামরিক স্বৈরশাসন, অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামকে আইনী বৈধতা দান করা হয়েছিল ঐ আইনের মাধ্যমে। ৬ই মে ১৯৭৪ শেখ মুজিবর রহমানের সরকার দ্বিতীয় ইনডেমনিটি আইন পাশ করেন কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী এবং তাদের সমস্ত পাশবিক কার্যক্রমকে আইনি বৈধতা দান করে।

শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার প্রদত্ত প্রথম ইনডেমনিটির বিষয়ে জনাব আবদুল জলিল সাধারন সম্পাদক আওয়ামী লীগ বলেছেন, "১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত একটি ইনডেমনিটি আওয়ামী লীগ সরকার জারি করেছিল।" (দৈনিক যুগান্তর ১৩ই মার্চ ২০০৩)। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও এই সত্যতা সংসদে স্বীকার করেছেন ১১ই মার্চ ২০০৩ প্রধাণমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে। কিন্তু তারা দুজনই রক্ষীবাহিনীকে দেয়া ইনডেমনিটি বিষয়টির ব্যাপারে নিঃশ্চুপ থাকেন।

তৃতীয়বার ইনডেমনিটি জারি করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জনপ্রিয় বিপ্লবের পর। ১৫ই আগষ্ট ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশে সাময়িকভাবে জরুরি অবস্থা এবং মার্শাল ল' জারি করা হয় ফলে রাষ্ট্রপতি খন্দোকার মোশতাক আহমদ ১৫ই আগষ্টের ঘটনাবলী এবং বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের এক অর্ডিনেন্স জারির মাধ্যমে ইনডেমনিটি প্রদান করেন। এই অর্ডিনেন্স জারি করার যুক্তিও ছিল জাতীয় ও জনস্বার্থ।

এক দলীয় বাকশালী স্বৈরশাসনের নাগপাশে আবদ্ধ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে জাতিকে মুক্ত করে দেশে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন পূণঃ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই সংগঠিত হয়েছিল ১৫ই আগষ্টের বিপ্লব। এরই ধারাবাহিকতায় ৩রা নভেম্বর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক ক্যু' ঘটায়। বন্দী করা হয় আগষ্ট বিপ্লবের পর সেনা পরিষদের প্রতিনিধি এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট খন্দোকার মোশতাক আহমদকেও। এই

প্রতি বিপ্লবী ক্যু' দাতার উদ্দেশ্য ছিল দেশ ও জাতিকে ১৫ই আগষ্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে বাকশালী স্বৈরশাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে চক্রান্তকারীদের সব প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেয় ৭ই নভেম্বরের মহান সিপাহী-জনতার বিপ্লব। চক্রান্তকারী নেতাদের কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে ক্ষিপ্ত সিপাহী-জনতার হাতে। অন্যদের বন্দী করা হয়। ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লবে অগ্রণীর ভূমিকায় ছিলেন ১৫ই আগষ্ট বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরাও। যার ফলে যুক্তিগত কারণেই সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদে প্রেসিডেন্ট খন্দোকার মোশতাক আহমদের জারিকৃত ইমডেমনিটি অধ্যাদেশের পরিসীমা বর্ধিত করে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম ও তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষদের স্বার্থে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধিত ইনডেমনিটি বিলটি সংসদে পাশ করানোর ফলে উক্ত ইনডেমনিটি আইন হিসাবে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অংশে পরিগনিত হয় ১৯৭৯ সালে। এই ঐতিহাসিক আইনটি প্রণয়ন করেছিল শহীদ জিয়ার নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত তৎকালিন বি.এন.পি সরকার।

২০০১ সালের নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশের ও বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বি.এন.পি এর নেতৃত্বে জোট সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সৃষ্ট সার্বিক নৈরাজ্য ও ভেঙ্গে পড়া আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বেসামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনে আনতে ব্যর্থ হয়ে জাতির প্রতি অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে জোট সরকার সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে পরিক্ষিত দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনীকে নিয়োগ করে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' পরিচালনা করার জন্য। ফলে অতি অল্প সময়ে সারা দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। যার ফলে শান্তিপ্রিয় আপামর জনসাধারন অভিনন্দন জানান 'অপারেশন ক্লিনহার্ট'-কে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করিয়ে আইনে পরিনত করা হয়েছে তৃতীয় ইনডেমনিটি বিলটি। এ ক্ষেত্রেও প্রেক্ষাপট জাতীয় এবং জনস্বার্থ।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি ইনডেমনিটি বিলটির বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনডেমনিটি সর্ম্পকে নিশ্চুপ থেকে তৃতীয় এবং চতুর্থ ইনডেমনিটি আইন দুইটির বিরুদ্ধে জোর গলায় সোচ্চার হয়ে নানা ধরনের উদ্ভট অযৌক্তিক প্রচারনায় মেতে উঠেছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা বি. এন. পি নেতৃত্তাধীন জোট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে।

শুধু কি তাই?
১৯৯৬ এর নির্বাচনের পর ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়েই সংবিধান কিংবা প্রচলিত আইনের বিধি বিধানের কোন তোয়াক্কা না করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অংশ ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব সম্পর্কে প্রদত্ব ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে 'মুজিব হত্যা বিচার' এবং 'জেল হত্যা বিচার' এর প্রহসন শুরু করে চরম ধৃষ্টতার পরিচয় দেয় বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারের সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আদালতের শরনাপন্ন হলে, সরকার মনোনিত কয়েকজন আওয়ামী পন্থী আইনজীবির দ্বারা গঠিত একটি 'এমিকাস কিউরি' সৃষ্টি করে সরকারের পক্ষে বক্তব্য দেয়ানো হয় যে, "সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর ইনডেমনিটি অংশটি একটি 'কালা কানুন' বিধায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্টতা ছাড়াও ঐ আইন বাতিল করার সরকারি সিদ্ধান্ত সঠিক!"

এরপর আদালত এই বিষয়ে আর কোন যুক্তিতর্ক শুনতে রাজি হয়নি। হঠকারি উন্নাসিকতার এক অদ্ভুত নিদর্শন!

কোন আইনের ব্যাখ্যা সংবিধানের বিধান অনুযায়ি অবশ্যই আদালত দিতে পারেন। কিন্তু আইনজিবীদের দ্বারা শুধুমাত্র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে কোন আইন বাতিল করা কিংবা কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন করার সরকারি সিদ্ধান্তকে সঠিক বলানো শুধু যে সংবিধানের

অবমাননা তাই নয়, এ ধরনের আচরন সমস্ত নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ ও নীতি–আদর্শ যার উপর সামাজিক আইন প্রতিষ্ঠিত তার মূলেই কুঠারাঘাতের শামিল।

সরকারি চাঁপের মুখেই হউক, আর লাঠির ভয়েই হউক, কিংবা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্যই হউক, যে সমস্ত আইনজীবি নৈতিকতা এবং পেশাগত দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে সরকারের তাঁবেদারী করে আইন বিভাগের সুনাম ক্ষুন্ন করেছেন তাদের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে; জনধিকৃত, বিবেকবর্জিত আইন লঙ্ঘনকারী হিসাবে। তাদের এই ধরনের হঠকারিতা ক্ষমার অযোগ্য হয়ে থাকবে চিরকাল।

আইন এবং সংসদ বিষায়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ ১২ই মে ২০০৩ তার মন্ত্রনালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, "যৌথ অভিযান ছিল সময়ের দাবি। ১৪ কোটি মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য যাদের মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে তাদের বিষয়টি ব্যক্তি পর্য্যায়ের ত্যাগ হিসাবে সরকারকে মেনে নিতে হচ্ছে।"

দায়মুক্তি সর্ম্পকে তিনি বলেন,
"রক্ষীবাহিনী ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী কাজ শুরু করে, ৮ই মার্চ আইন করে বৈধতা দেয়া হয়। এই বাহিনী ৪০ হাজার লোককে খুন করে কিন্তু একটি খুনের ও বিচার হতে পারেনি। ১৯৭৪ সালের ৬মে এই আইনটি সংশোধণ করে বাহিনীটিকে দায়মুক্তি করতে ১৬এ ধারা সংবিধানে সংযোজনের ফলে এ বিচার সম্ভব হয়নি। ৪০ হাজার লোকের হত্যার জন্য রক্ষীবাহিনীকে দায়মুক্তি প্রদানের পর যৌথ অভিযাণের দায়মুক্তির ব্যপারে সমালোচনা করার অধিকার আওয়ামী লীগের আর থাকতে পারে না।" (দৈনিক যুগান্তর ১৩.৩.২০০৩)।
ঠোস্ যুক্তি বটে!

তার এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই বলা চলে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বর সম্পর্কে প্রদত্ব দায়মুক্তি আইনটি শুধুমাত্র একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাতিল করে বিচারের প্রহসন করার অধিকার ও আওয়ামী লীগের ছিল না। এই বিষয়ে কিন্তু মহামান্য মন্ত্রী তার বিবৃতিতে কিছুই উল্লেখ করলেন না। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন কিনা সেটা সময়তেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যাই হউক না কেন, তার এই একই যুক্তির ভিত্তিতে জনগণের প্রশ্ন: –
"*মহামান্য আইনমন্ত্রী জনাব মওদুদ আহমদ, বর্তমান সরকারের আমলে ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের নায়কদের কারা প্রকোষ্ঠের ডেথ্ সেলে এখনো বন্দী করে রাখা হয়েছে কোন অধিকারে?*"

বর্তমান জোট সরকারের কাছে দেশপ্রেমিক, সচেতন জনগনের প্রত্যাশা: – ইনডেমনিটির বিষয়ে প্রয়োজনে এমন শক্ত আইন প্রণয়ন করা হউক যাতে করে দেশ ও জাতিয় স্বার্থবিরোধী কোন অপশক্তিই ভবিষ্যতে কখনোই সংবিধানের অবমাননা করার ধৃষ্টতা দেখাতে সক্ষম না হয়। একইসাথে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার অসংবিধানিকভাবে জিয়া সরকারের প্রদত্ব ইনডেমনিটি আইনটি বাতিল করে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং '৭৫ এর নিঃস্বার্থ সূর্য্য সন্তানদের বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে কারা প্রকোষ্ঠে তিলে তিলে মারার যে হীন পরিকল্পনা করেছিল; আইনগতভাবে সেই পরিকল্পনাকে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষিত করা হউক।

এটা সত্যিই এক নির্মম পরিহাস! জাতীয় বীররা এখনো কারা প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর দিন গুনছে জোট সরকারের আমলেও! জনমনের সব সন্দেহের অবসান ঘটানোর জন্য বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের উচিত কালবিলম্ব না কর্বে তাদের মুক্তি দান করে এবং যারা বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় রয়েছেন তাদের দেশে ফেরার পথ সুগম করে দিয়ে জনগণের কাছে প্রমাণ করা যে, জোট সরকার সংবিধানের পবিত্রতা বজিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর।

একটি সত্য আজ সবাইকেই বুঝতে হবে জাতির গৌরব আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ কারোর জন্যই সৃষ্টি করার কোন অবকাশ নেই। কারণ জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা এবং অস্তিত্ব কায়েম রাখার শেষ আধার তারাই।

ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান জোট সরকারের নেত্রী শহীদ জিয়ার যোগ্য উত্তরশুরী সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন হিসাবে বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। তাঁর এই ইমেজকে আরো দৃঢ়ভাবে জনগনের মনে প্রথিত করতে হবে যাতে করে আগামীতে যে কোন ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এবং অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদীরা তাঁর উপর নিরংকুশ বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে চিহ্নিত জাতিয় বিশ্বাসঘাতক এবং তাদের দোসর এবং বিদেশী প্রভুদের দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক অপরাজয়ী শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

বিভিন্নমুখী চক্রান্তের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করতে হলে শুধুমাত্র দল বা জোট নয়; সেনাবাহিনী এবং জনগনের আস্থা ও শক্তির উপরেই শুধুমাত্র বর্তমান জোট সরকারকেই নয় আগামীতেও যে সমস্ত সরকার নিজেদের জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে দাবী করবেন তাদের সবাইকেই নির্ভরশীল হতে হবে। কারো পক্ষেই অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে জাতীয় রাজনীতির ধারা প্রবাহে এই প্রপঞ্চটি একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসাবেই প্রমানিত।

চারিত্রিক দৃঢ়তা সততা, বিচক্ষনতার সাথে সময়ের দাবি মেনে নেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। তেমনটি না করা হলে অতীতের অত্যাবশ্যক ঘটনাসমুহ যথা: -২৬-২৭শে মার্চ ১৯৭১ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষনা।
১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।
৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব এবং অপারেশন ক্লিনহার্ট এর মতো প্রতিটি ঘটনার সাথে যেখানে জড়িয়ে আছে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এবং দেশের সাচ্চা ও নিবেদিত প্রান জাতীয়তাবাদী জনগণ তার পুনরাবৃত্তি কখনও ঘটবে বলে আশা করা যায় না। তাদের কেউই ভবিষ্যতে জাতীয় সংকটের সন্ধিক্ষনে বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যগের মহৎ উদ্দেশ্যে আগুয়ান হওয়ার উদ্দীপনা, উৎসাহ, প্রেরনা কিংবা সাহস কখনোই পাবেন না। পরিশেষে জাতি নিমজ্জিত হবে আত্মঘাতী এক চরম হতাশায়। দেশকে যারা ভালোবাসেন তারা এমন হতাশাগ্রস্ত বাংলাদেশ কখনোই চান না।

দুঃখজনক-শক্তিহীন নেতিবাচক মানসিকতার শিকড় জাতীয় পরিসরে প্রথিত হবার আগেই এর আশু প্রতিবিধান একটি অত্যাবশ্যিক করণীয়।

বর্তমানে প্রচলিত যে আইন ও সংবিধানীক বিধিবিধান রয়েছে তাকে আরো জোরদার করতে হবে। নিচ্ছিদ্র করতে হবে আইনকে সব ফাঁক ও চোরা গলিগুলো বন্ধ করে দিয়ে। প্রয়োজনে প্রণয়ন করতে হবে নতুন আইন এবং সংবিধানিক বিধিবিধানে এই বিষয়ে এমনভাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে যাতে সেনাবাহিনী ও জাতীয়তাবাদীদের কে কেউই ভবিষ্যতে যেন আর কখনোই কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে যাবার সাহস না পায় জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে সংকট মোকাবেলার দায়িত্ব পালন এবং কৃতকর্মের জন্য। এই ধরনের ঔদ্ধ্যত্ব তাদের জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের প্রকাশ্য অপমান বিধায় অসহনীয় এবং সম্পূর্ণরুপে অগ্রহনীয়। শুধুমাত্র এ ধরনের ফলপ্রসু আইন এবং সংবিধানিক বিধিবিধানের পরিবর্তনই হতে পারে বর্তমান ও ভবিষ্যত বাংলাদেশের একমাত্র রক্ষাকবচ। শুধু তাই নয় সর্বকালের জন্য বাংলাদেশ পরিনত হতে পারে এক দুর্জয় ঘাঁটিতে। যত সত্বর শুভ বুদ্ধির উদয় হবে জনগণ ও নেতা নেত্রীদের মানসিকতায় এবং উপরে যা লিপিবদ্ধ করা হল তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ততই মঙ্গল হবে দেশ ও জাতির।